NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

ELECTIVE BOTANY HONOURS

EBT 02

Fungi, Lichen and Plant Pathology

BLOCKS 1 & 2

- Fungi, Lichen
- Plant Pathology

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ও রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, 2018

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : উদ্ভিদবিদ্যা

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায় : EBT 02 : 01-02

	রচনা	সম্পাদনা
একক ☐ 1 - 8	ড. স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	ড. ঐন্দ্রিলা চন্দ্র
একক ☐ 9 - 16	ড. স্বপন ভট্টাচার্য	ড. ঐন্দ্রিলা চন্দ্র

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EBT - 02

ফানজাই, লাইকেন ও উদ্ভিদ রোগবিদ্যা

পর্যায়

1

ফান্‌জাই, লাইকেন

একক	1	❒	ছত্রাক (ফানজাই) সম্পর্কে কিছু ধারণা	7-23
একক	2	❒	ফাইকোমাইসিটিস (Phycomycetes)	24-42
একক	3	❒	অ্যাসকোমাইসিটিস (Ascomycetes)	43-71
একক	4	❒	বেসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes)	66-95
একক	5	❒	ফাংগি ইমপারফেক্টি (Fungi imperfecti)	96-112
একক	6	❒	রাইজোপাস (Rhizopus) ও পেনিসিলিয়ামের (Penicillium) জীবন বৃত্তান্ত	113-132
একক	7	❒	অ্যাগারিকাস (Agaricus) ও হেল মিনথোস্পোরিয়ামের (Helminthosporium) জীবন বৃত্তান্ত	133-147
একক	8	❒	লাইকেন	148-164

পর্যায়

. 2

উদ্ভিদ রোগবিদ্যা

একক 9 ❐ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক পারিভাষিক শব্দ এবং তাদের সংজ্ঞা 165-183

একক 10 ❐ উদ্ভিদ রোগের সাধারণ লক্ষণ 184-207

একক 11 ❐ রোগের বিস্তার ও প্যাথোজেনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব 208-222

একক 12 ❐ সংক্রমণের বাহ্যিক ও রাসায়নিক রূপরেখা 223-255

একক 13 ❐ উদ্ভিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 256-281

একক 14 ❐ উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণ 282-307

একক 15 ❐ কয়েকটি সুপরিচিত উদ্ভিদরোগ 308-336

একক 16 ❐ ভারতবর্ষে ফসলের ক্ষতিসাধনকারী কিছু রোগের সনাক্তকরণ 337-372

একক 1 □ ছত্রাক সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
1.2 ছত্রাক কি
1.3 ছত্রাকের গুরুত্ব
1.4 ছত্রাকের অঙ্গজ গঠন
1.5 ছত্রাকের পুষ্টি
1.6 ছত্রাকের জনন সহবাসিতা ও ভিন্ন বাসিতা
1.7 ছত্রাকের শ্রেণিবিন্যাস
1.8 সারাংশ
1.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
1.10 উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা

আপনারা নিশ্চয়ই ছত্রাক শব্দটির সাথে পরিচিত, যার ইংরাজী প্রতিশব্দ ফাংগাস (Fungus. Pl. Fungi)। আপনারা পেনিসিলিন ঔষধের নাম তো জানেন, এটা কিন্তু ছত্রাক থেকে উৎপন্ন। আমাদের মাথার খুস্কি, দাদ বা হাত পায়ের নখে সংক্রমণ, এসবই ছত্রাক ঘটিত। বাজারে গিয়ে মাশরুমতো (ব্যাঙের ছাতা) সবাই না হোক অনেকেই তো কেনেন, যা দিয়ে রান্না করে একটি বিশেষ রকমের ভাল পদ তৈরি হয়; এটাও এক ধরনের ছত্রাক। এছাড়াও রয়েছে ফল ও নানান খাদ্য, কাঠ, সুতি বস্ত্রের পচে যাওয়ার সমস্যা। এসবেরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী ছত্রাক। আর ছত্রাক ঘটিত গাছের নানা রোগের কথা প্রায়ই শুনে থাকেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে ছত্রাক আমাদের জীবনের সাথে ওতোপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। ছত্রাক উদ্ভিদ বিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাই ছত্রাক সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ছত্রাক কি তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- ছত্রাকের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- ছত্রাকের গঠন, পুষ্টি ও জনন সংক্রান্ত তথ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অন্যান্য উদ্ভিদের সাথে ছত্রাকের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন।
- আদর্শ ছত্রাকের সংজ্ঞা ও তার শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণ করতে পারবেন।

1.2 ছত্রাক কি?

ছত্রাক এক প্রকার ক্লোরোফিল (Chlorophyll বা সবুজ কণা) বিহীন থ্যালাস (thallus) দেহ যুক্ত উদ্ভিদ, অর্থাৎ এদের দেহ প্রকৃত মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত নয় এবং দেহে প্রকৃত সংবহন তন্ত্র অনুপস্থিত। এদের দেহ এককোশী অথবা বহুকোশী সূত্র বা মাইসীলিয়াম (Mycelium) যা শাখান্বিত। কোশগুলি এক বা একাধিক আদর্শ নিউক্লিয়াস যুক্ত ও কাইটিন নির্মিত প্রাচীর দ্বারা আবৃত। পুষ্টি-পরভোজী এবং বিশোষণ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। প্রধান সঞ্চিত খাদ্যবস্তু সাধারণত গ্লাইকোজেন (শর্করা) ও স্নেহজাতীয় বস্তু। ছত্রাক স্থলবাসী অথবা জলবাসী জনন-অঙ্গজ (Vegetative), অযৌন (asexual) ও বা যৌন (sexual) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। অযৌন ও যৌন জননে উৎপন্ন হয় রেণু (spore)। রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।

ছত্রাক সম্পর্কিত বিদ্যাকে বলা হয় মাইকোলজি (Mycology) বা ছত্রাক বিদ্যা।

1.3 ছত্রাকের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্ব :

ছত্রাক আমাদের তথা সমগ্র জীবজগতকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। ছত্রাকের যেমন রয়েছে নানান অর্থনৈতিক গুরুত্ব তেমনি জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণায় ছত্রাক তার গুরুত্ব প্রমাণ করেছে।

অর্থনৈতিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ছত্রাক যেমন আমাদের নানা উপকার সাধন করছে তেমনি নানা অপকার সাধনও করছে।

1.3.1 ছত্রাকের উপকারী ভূমিকা :

i) ছত্রাক মাটিতে অবস্থিত জটিল জৈব পদার্থকে (গাছের পাতা, ডাল, প্রাণীর বর্জ্যপদার্থ ইত্যাদি) ভেঙে উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী সরল পদার্থে পরিণত করে। এইভাবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে উদ্ভিদ তথা সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব ধরে রাখতে সাহায্য করে।

ii) অ্যালকোহল ও পাঁউরুটি প্রস্তুতিতে *Saccharomyces (স্যাকারোমাইসিস)* বা ইষ্ট, চীজ প্রস্তুতিতে পেনিসিলিয়াম *(Penicillium)* গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

iii) বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন পেনিসিলিন (Penicillin), সেফালোস্পোরিন (Cephalosporin) গ্রিসিওফালভিন (griseofulvin) ইত্যাদি ছত্রাকজাত। এর মধ্যে পেনিসিলিন ও গ্রিসিওফালভিন উৎপন হয় পেনিসিলিয়াম *(Penicillium)* থেকে এবং সেফালোস্পোরিন উৎপন্ন হয় সেফালোস্পোরিয়াম *(Cephalosporium)* থেকে।

iv) ছত্রাক বিভিন্ন জৈব অম্ল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন *Aspergillus niger (অ্যাসপারজিলাস নিগার)* সাইট্রিক অ্যাসিড ও গ্লুকোনিন অ্যাসিড প্রস্তুতিতে, *Rhizopus nigricans (রাইজোপাস নিগ্রিক্যানস)* ফিউম্যারিক অ্যাসিড, *A. flavus (অ্যাসপারজিলাস ফ্লাভাস)* কোজিক অ্যাসিড *(Cozic acid)* প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

v) ছত্রাক বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক (enzyme) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়; যেমন অ্যামাইলেজ (amylase) প্রস্তুতিতে অ্যাসপারজিলাস, ইনভারটেজ (invertase) প্রস্তুতিতে ইষ্ট ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ভিটামিন B_{12}, রিবোফ্ল্যাভিন (riboflavin) ইত্যাদি উৎপাদনে ইষ্ট, অ্যাসপালজিলাস ইত্যাদি ছত্রাক গুরুত্বপূর্ণ।

vi) মাশরুমের (mushroom) চাষ আজ এক লাভজনক ব্যবসা। আমরা বিভিন্ন মাশরুম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি যেমন *Agaricus bisporus (অ্যাগলারিকাস বাইস্পোরাস), Pleurotus sajor-kaju (প্লিউরোটাস সাজোর-কাজু), Volvariella volvacea (ভলভারিএল্লা ভলবাসিয়া),* Lentinus edodes *(লেনটাইনাস ইডোডেস)* ইত্যাদি।

vii) বিভিন্ন মিথোজীবি ছত্রাক উচ্চতর উদ্ভিদের মূলের সাথে মহাবস্থান করে মাইকোরহিজা (Mycorrhiza) গঠন করে এবং ঐ সমস্ত উদ্ভিদকে অনুর্বর মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহে সাহায্য করে ও উহাদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ছত্রাকের এই সহযোগিতা না থাকলে আজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেত।

1.3.2 ছত্রাকের অপকারী ভূমিকা ঃ

i) ছত্রাক উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাণী অপেক্ষা উদ্ভিদে ছত্রাকের সংক্রমণ অনেক বেশি। ছত্রাক ঘটিত কয়েকটি উদ্ভিদরোগের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় *Phytophthora infestans (ফাইটোফথোরা ইনফেসট্যান্স)* কর্তৃক সৃষ্ট আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ, *Puccinia graminis tritici (পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস ট্রিটিস)* ও পাকসিনিয়া অন্যান্য প্রজাতি কর্তৃক সৃষ্ট গমের মরিচা রোগ (Rust), *Helminthosporium oryzae (হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজি)* কর্তৃক ধানের বাদামী দাগ রোগ ইত্যাদি। এই সমস্ত রোগের ফলে উক্ত ফসলগুলির ফলন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মানুষ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে নানা রোগ উৎপাদনের জন্য ছত্রাক দায়ী, তবে ছত্রাক ঘটিত রোগগুলির মধ্যে চর্মরোগই অধিক দেখা যায়। ছত্রাক ঘটিত কয়েকটি রোগের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় *Candida albicans (ক্যানডিডা অ্যালবিক্যানস্)* কর্তৃক ক্যানডিডিয়াসিস *(Candidiasis)*, অ্যাসপারজিলাস কর্তৃক সৃষ্ট অ্যাসপারজিলোসিস *(Aspergillosis), Rhizopus (রাইজোপাস)* ও *Mucor (মিউকর)* কর্তৃক সৃষ্ট জাইগোমাইকোসিস *(Zygomycosis)* ইত্যাদি। এছাড়া জলজ ছত্রাক যেমন স্যাপ্রোলেগনিয়া *(Saprolegnia)* মাছের রোগ সৃষ্টি করে।

ii) অ্যাসপারজিলাস, মিউকর, রাইজোপাস ইত্যাদি ছত্রাক আমাদের নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য পচিয়ে নষ্ট করে। *Serpul;a lacrymans (সারপুলা ল্যাক্রিম্যানস্)* কাঠের শুষ্ক পচন (Dryrot) ও *Coniophora cerebella (কোনিওফোরা সেরিবেলা)* কাঠের ভেজা পচন (wet rot) ঘটিয়ে কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের ক্ষতি সাধন করে। সুতী বস্ত্রের ও সুতার পচন ঘটানোর জন্য দায়ী *Chaetomium (কিটোমিয়াম)* নামক ছত্রাক।

iii) অনেক ছত্রাক রয়েছে যারা আবার বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। ভুলবশতঃ ঐ সমস্ত ছত্রাক খেয়ে ফেললে মানুষ অথবা অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে নানা বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। *Amanita*

phalloides (অ্যামানিটা ফওালোইডিস) এরূপ একটি বিষাক্ত মাশরুম। এছাড়া *Aspergillus flavus (অ্যাসপারজিলাস ফ্লাভাস)* সংক্রামিত বাদাম, ভুট্টা ইত্যাদিতে আফ্ল্যাটকসিন (Aflatoxin) নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ বা মাইকোটক্সিন (Mycotxin) সৃষ্টি হয় যা যকৃত ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

1.3.3 ছত্রাকের অন্যান্য গুরুত্ব :

জীব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছত্রাকের গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়; যেমন বংশগতি বিজ্ঞানের (জিনেটিকস) ক্ষেত্রে *Neurospora* (নিউরোস্পোরা) নামক ছত্রাকের গুরুত্ব অসীম। বিভিন্ন জীব রাসায়নিক প্রক্রিয়া জানতে অনেক ক্ষেত্রে ছত্রাককে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সন্ধান (যেমন কোহল সন্ধান, Alcoholic fermentation) সংক্রান্ত পরীক্ষায় ইস্টের ব্যবহার এবং জিব্বারেলিন নামক হরমোন বা উদ্বোধক উৎপাদনে *Gibberella fujikuroi (জিব্বারেলা ফুজিকুরোই)*-এর ভূমিকা উদ্ভিদ-শারীর বিদ্যা গবেষণায় ছত্রাকের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী - 1

নিচের প্রদত্ত শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দ / শব্দগুচ্ছ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(a) ছত্রাক এক প্রকার __________ বিহীন __________ দেহ যুক্ত __________।

(b) ছত্রাক সাধারণত __________ বাসী, তবে __________ বাসী ছত্রাকও আছে।

(c) ছত্রাকের কোশ প্রাচীর প্রধানত __________ নির্মিত।

(d) ছত্রাকের পুষ্টি __________ ও __________ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।

(e) ছত্রাকের প্রধান সঞ্চিত শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তু হল __________।

(f) ছত্রাক সম্পর্কিত বিদ্যাকে বলা হয় __________।

(g) সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনকারী ছত্রাক __________ ও কোজিক অ্যাসিড উৎপাদনকারী ছত্রাক __________।

(h) অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস একটি __________ ছত্রাক।

(i) গমের মরিচা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক __________।

(j) প্রাণীর ক্যান ডিডিয়াসিস রোগের জন্য দায়ী ছত্রাক __________।

(k) অ্যামানিটা ফ্যালোইডিস একটি __________ মাশরুম।

(l) বংশগতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছত্রাক __________।

(জল, স্থল থ্যালাস, উদ্ভিদ, কাইটিন, ক্লোরোফিল, গ্লাইকোজেন, পরভোজী, মাইকোলজি, বিশোষন, অ্যাসপারজিলাস ফ্লাভাস, অ্যাসপারজিলাস নিগার, বিষাক্ত, নিউরোস্পোরা, ক্যানডিডা অ্যালবিক্যান্স, পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস ট্রিটিসি, ভক্ষণীয়)।

1.4 ছত্রাকের অঙ্গজ গঠন ঃ (চিত্র-1.1)

ছত্রাকের দেহ এককোশী ও একনিউক্লিয়াস যুক্ত হতে পারে (যেমন-ইষ্ট) বা এককোশী বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত সূত্রাকার গঠন হতে পারে (যেমন-ফাইটোফথোরা) অথবা বহুকোশী সূত্রাকার গঠন হতে পারে, যার কোশগুলি এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট (যেমন-অ্যাগারিকাস)। ছত্রাকের সূত্রাকার দেহ শাখান্বিত এবং এই দেহকে বলা হয় মাইসীলিয়াম। মাইসীলিয়ামের প্রতিটি সূত্রাকার শাখাকে বলা হয় অণুসূত্র বা হাইফা (Hypha)। প্রতিটি হাইফা অণুপ্রস্থে 0.5 মাইক্রণ (μ) থেকে (100μ) পর্যন্ত হয়। হাইফার প্রাচীর প্রধানত কাইটিন নামক নাইট্রোজেনঘটিত বহুশর্করা দ্বারা গঠিত। কিছু ছত্রাকের (উমাইসিটিস, Oomycetes উপশ্রেণিভুক্ত অধিকাংশ সদস্য) কোশপ্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ নামক বহুশর্করা দ্বারা গঠিত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মাইসীলিয়াম এককোশী বা বহুকোশী হতে পারে; অর্থাৎ মাইসীলিয়াম বিভেদ প্রাচীর বা সেপ্টাম (Septum) যুক্ত অথবা বিভেদপ্রাচীর বিহীন হতে পারে (চিত্র-1.1)। বিভেদ প্রাচীর বিহীন বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত মাইসীলিয়ামকে সিনোসাইটিক (Coenocytic) মাইসীলিয়াম বলে। এক্ষেত্রে মাইসীলিয়ামের হাইফাগুলির বৃদ্ধির সময় নিউক্লিয়াসের বিভাজন হলেও সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে না। বিভেদ প্রাচীর যুক্ত মাইসীলিয়ামের বিভেদ প্রাচীরে সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রটি একটি সরল ছিদ্র (Simple pore) হতে পারে (অ্যাসকোমাইসিটিস সদস্য) অথবা ডাল ছিদ্র (Dolipore) নামক এক বিশেষ প্রকার ছিদ্র হতে পারে (বেসিডিওমাইসিটিস সদস্য)। ছত্রাকের বিভেদ প্রাচীরগুলির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সাইটোপ্লাজমের অখণ্ডতা বজায় থাকে। সরল ছিদ্রের মধ্য দিয়ে নিউক্লিয়াসও চলাচল করতে পারে।

ছত্রাকের কোশ আদর্শ নিউক্লিয়াস যুক্ত ইউক্যারিওটিক (Eukaryotic)। কাজেই অন্যান্য ইউক্যারিওটিক কোশের ন্যায় স্বাভাবিক কোশ অঙ্গাণু যেমন মাইটোকনড্রিয়া, গল্গি যন্ত্র, এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা, রাইবোসোম, ভ্যাকুওল থাকে।

1.5 পুষ্টি ঃ

ছত্রাকের ক্লোরোফিল না থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না, তাই এরা পরভোজী। ছত্রাক পরভোজী হওয়ায় এদের কার্বনের (C) জন্য প্রয়োজন কোন জৈব উৎস। কার্বন ছাড়া ছত্রাকের প্রয়োজন হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), সালফার (S), ফসফরাস (P), পটাশিয়াম (K) এবং ম্যাগনেশিয়াম (Mg) মৌল। এই অত্যাবশ্যকীয় মৌলগুলি অধিকমাত্রায় প্রয়োজন তাই এগুলিকে অতিমাত্রিক মৌল বা ম্যাক্রোএলিমেন্ট (Macroelement) বলে। এছাড়া লৌহ (Fe), তামা (Cu), দস্তা (Zn), ম্যাঙ্গানিজ (Mn) এবং মলিবডেনাম (Mo) খুব স্বল্প পরিমানে ছত্রাকের প্রয়োজন; তাই এগুলিকে স্বল্পমাত্রিক মৌল বা ট্রেস এলিমেন্ট (Trace element) বলে। এই ট্রেস এলিমেন্টগুলির মধ্যে Cu, Zn এবং Fe অত্যাবশ্যক। উপরোক্ত মৌলগুলি ছাড়াও অনেক ছত্রাকের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় ভিটামিন। ছত্রাক উপরোক্ত পুষ্টিগুলি জৈব এবং অজৈব উৎস থেকে সংগ্রহ করে।

পুষ্টি পদ্ধতি অনুযায়ী ছতরাককে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ মৃতজীবী (saprophytes), পরজীবী (Parasites) ও মিথোজীবী (symbionts)।

1.5.1 মৃতজীবি ছত্রাক ঃ

এই সমস্ত ছত্রাক মৃত ও পচা বস্তুতে জন্মায়। মৃতজীবি ছত্রাক উৎসেচক নিঃসরণ করে বাহিরের জটিল জৈব বস্তুকে ভেঙ্গে সরলীকৃত দ্রবণীয় খাদ্যে পরিণত করে। এরপর বিশোষনের মাধ্যমে সেগুলিকে গ্রহণ করে ও শরীরে অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই এরা বহিঃপরিপাক পদ্ধতি অবলম্বনে পুষ্টি গ্রহণ করে। যে হাইফাগুলি পুষ্টি সংগ্রহ করে স্বাভাবিক কারণে তারা ধাত্রের (substrate) মধ্যে প্রোথিত থাকে।

মৃতজীবি ছত্রাক দু ধরনের হতে পারে—বাধ্যতামূলক মৃতজীবি ও ওবলিগেট স্যাপ্রোফাইট (Obligate saprophyte) এবং স্বেচ্ছামূলক মৃতজীবী বা ফ্যাকালটেটিভ স্যাপ্রোফাইট (Facultative saprophyte)।

1.5.1.1 বাধ্যতামূলক মৃতজীবী ঃ এই সমস্ত ছত্রাক কেবলমাত্র মৃতজীবী হিসাবেই বাঁচতে পারে যেমন— *অ্যাগারিকাস (Agaricus)*

1.5.1.2 স্বেচ্ছামূলক মৃতজীবী ঃ এই সমস্ত ছত্রাক পরজীবী হিসাবেই সাধারণত ঃ বেঁচে থাকে তবে প্রয়োজনে মৃতজীবী হিসাবেও জীবন ধারণ করতে পারে; যেমন *Phytophthora infestans (ফাইটোফথোরা ইনফেস্ট্যান্স)*।

1.5.2 পরজীবি ছত্রাক ঃ

এই সমস্ত ছত্রাক অন্য কোন জীব দেহের (পোষক) উপর বা অভ্যন্তরে জন্মায় এবং ঐ পোষক (host) থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। যে সমস্ত পরজীবী ছত্রাক পোষকে রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী তাদেরকে প্যাথোজেন (Pathogen) বা রোগ উৎপাদনকারী ছত্রাক বলে।

পরজীবী ছত্রাক মৃতজীবী ছত্রাকের ন্যায় দু প্রকার—বাধ্যতামূলক পরজীবী (Obligate parasite) এবং স্বেচ্ছামূলক পরজীবী (Facultative parasite)।

1.5.2.1 বাধ্যতামূলক পরজীবী ঃ এই সমস্ত ছত্রাক কেবলমাত্র পরজীবী হিসাবেই বেঁচে থাকে; যেমন *Peronospora (পেরোনোস্পোরা), Ustilago (ইউস্টিল্যাগো)* ইত্যাদি। এই ছত্রাকগুলি পোষক কলায় প্রবেশের ক্ষেত্রে পোষককে কম উত্যক্ত করার পারদর্শিতা দেখায় ও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ শোষণ অঙ্গ, হস্টোরিয়ামের (Haustorium) সাহায্যে পোষক কোষ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে (চিত্র-1.2)। এরা সাধারণভাবে পোষককে নিহত করা তেকে বিরত থাকে এবং এরা সুনির্দিষ্ট পোষকেই কেবল সংক্রমণ ঘটায়। কারণ ঐ পোষক থেকেই তারা তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে পারে।

1.5.2.2 স্বেচ্ছামূলক পরজীবী ঃ এরা সাধারণত মৃতজীবী হিসাবেই বেঁচে থাকে তবে প্রয়োজনে অর্থাৎ উপযুক্ত পোষক পেলে তাতে সংক্রমণ ঘটায় ও পরজীবী হিসাবে জীবন ধারণ করে; যেমন *Fusarium (ফিউসেরিয়াম)*।

1.5.3 মিথোজীবী ঃ

যখন দুটি জীবের মধ্যে পারস্পরিক পুষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে সহাবস্থান ঘটে, তখন ঐ জীবগুলিকে মিথোজীবি বলে। চত্রাক দু ধরনের মিথোজীবীত্ব প্রদর্শন করে লাইকেন (Lichen) ও মাইকোরহিজা (Mycorrhiza)।

1.5.3.1 লাইকেন ঃ এক্ষেত্রে ছত্রাক ও শৈবালের মধ্যে মিথোজীবিত্ব ঘটে। মিথোজীবিত্বে অংশগ্রহণকারী ছত্রাক, বেসিডিওমাসিটিস (Besidiomycetes) ও অ্যাসকোমাইসিটিক (Ascomycetes) শ্রেণিভুক্ত এবং শৈবাল, সিয়ানোফাইসি (Cyanophyceae) ও ক্লোরোফাইসি (Chlorophyceae) শ্রেণিভুক্ত সদস্য। শৈবাল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শর্করা জাতীয় খাদ্য ছত্রাককে সরবরাহ করে এবং ছত্রাক জল ও খনিজ লবণ শৈবালকে সরবরাহ করে। এছাড়াও শৈবাল প্রখর সূর্য্য কিরণ থেকে ছত্রাককে রক্ষা করে এবং ছত্রাক জল সংরক্ষণ করে প্রতিকূল পরিবেশে শৈবালকে রক্ষা করে। লাইকেন সাধারণত পাথরের গায়ে, গাছের গুঁড়িতে এবং বৃষ্টি সমৃদ্ধ জঙ্গলে গাছের ডাল থেকে ঝুলতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ *Usnea (উসনিয়া) Cladonia (ক্ল্যাডোনিয়া)* ও *Multiclavula (মালটিক্ল্যাভিউলা)* ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

1.5.3.2 মাইকোরহিজা ঃ এক্ষেত্রে ছত্রাক ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের মূলের মধ্যে মিথোজীবিত্ব ঘটে। যদিও বিভিন্ন শ্রেণির ছত্রাক মাইকোরহিজা গঠনে অংশগ্রহণ করে তবে বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক ও ব্যাপারে অগ্রণী। এইরূপ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে পোষক উদ্ভিদ শৈবালের ন্যায় সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন শর্করা জাতীয় খাবার ছত্রাককে সরবরাহ করে এবং পরিবর্তে ছত্রাক নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ ইত্যাদি ঘটিত খনিজ লবণ পোষককে সরবরাহ করে। এছাড়াও জীবাণুর সংক্রমণ হতে পোষক উদ্ভিদের মূলকে ছত্রাক রক্ষা করে।

> মাইকোরহিজা ঃ মাইকোরহিজা তিন প্রকার - (i) একটোমাইকোরহিজা (Ectomycorrhiza) (ii) এণ্ডোমাইকোরহিজা (Endomycorrhiza) ও (iii) একটু-এণ্ডোমাইকোরহিজা (Ectendomycorrhiza)
>
> (i) একটোমাইকোরহিজা- এক্ষেত্রে পোষক মূলের উপর মাইসীলিয়াম একটি পুরু আবরণ তৈরি করে এবং সেই স্থান থেকে হাইফা মূলের মধ্যে প্রবেশ করে আন্তঃকোশীয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করে।
>
> (ii) এণ্ডোমাইকোরহিজা- এক্ষেত্রে পোষক মূলের উপর ছত্রাক কোন সুস্পষ্ট আবরক তৈরি করে না। হাইফা মূলের মধ্যে অন্তঃকোশীয় ও আন্তঃকোশীয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করে।
>
> (iii) একটু-এণ্ডোমাইকোরহিজ- এক্ষেত্রে ছত্রাক মূলের উপর একটি পাতলা আবরক সৃষ্টি করে এবং হাইফা অন্তঃকোশীয় ও আন্তঃকোশীয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করে।

অনুশীলনী - 2

নিচের প্রদত্ত শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দ / শব্দগুচ্ছ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(a) মাইসীলিয়ামের প্রতিটি সুতার ন্যায় গঠনকে ____________ বলে।

(b) কাইটিন একপ্রকার ____________ ঘটিত বহুশর্করা।

(c) বিভেদ প্রাচীর বিহীন বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত মাইসীলিয়ামকে ____________ মাইসীলিয়াম বলে।

(d) বিভেদ প্রাচীরে অবস্থিত ছিদ্রটি ____________ ছিদ্র অথবা ____________ ছিদ্র হতে পারে।

(e) ছত্রাকের কোশ ____________ নিউক্লিয়াসযুক্ত।

(f) ছত্রাক ____________ জীবী, ____________ জীবী অথবা ____________ জীবী হতে পারে।

(g) পেরোনোস্পোরা হল ____________, কিন্তু অ্যাগারিকাস হল ____________।

(h) লাইকেন হল ছত্রাকের সঙ্গে ____________ এর মিথোজীবিত্ব আর মাইকোরহিজা হল ছত্রাকের সঙ্গে ____________ মিথোজীবিত্ব।

(নাইট্রোজেন, হাইফা, সরল, সিনোসাইটিক, ডাল, পর, আদর্শ, মৃত, বাধ্যতামূলক পরজীবী, মিথো, বাধ্যতামূলক মৃতজীবী, উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মূলের শৈবাল)

1.6 জনন

ছত্রাক সাধারণত অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এই তিন প্রকার পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে। তবে ফাংগি ইমপারফেক্টি (Fungi imperfecti) শ্রেণির সদস্যে হয় যৌন জনন দেখা যায় না অথবা অনুপস্থিত। ছত্রাকের অযৌন ও যৌন জনন রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এককোশী ছত্রাকের ক্ষেত্রে (যেমন ইস্ট) সমগ্র দেহটাই জননাঙ্গ হিসাবে কাজ করে। এই প্রকার ছত্রাককে হলোকার্পিক (holocarpic) ছত্রাক বলে। আবার মাইসীলিয়াম দেহ বিশিষ্ট ছত্রাকের ক্ষেত্রে (যেমন পেনিসিলিয়াম) দেহের কোন অংশ মাত্র জননাঙ্গ গঠনে বা জননে অংশগ্রহণ করে। এইরূপ ছত্রাককে ইউকার্পিক (Eucarpic) ছত্রাক বলে।

1.6.1 অঙ্গজ জনন :

অঙ্গজ জননের ক্ষেত্রে কোন রেণু উৎপন্ন হয় না। ছত্রাকের মাইসীলিয়ামের কোন অংশ খণ্ডিত হলে সেই খণ্ডাংশ থেকে নতুন মাইসীলিয়াম গঠিত হয়।

1.6.2 অযৌন জনন :

ছত্রাক তার অযৌন জনন অচল রেণু বা অ্যাপ্ল্যানোস্পোর (Aplanospore) অথবা চল রেণু বা জুস্পোর (Zoospore)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করে।

অচল রেণু নানা প্রকার হতে পারে; যেমন— স্পোরানজিওরেণু, কনিডিওরেণু, ওয়িডিওরেণু, ক্ল্যামাইডোরেণু ইত্যাদি।

চলরেণু ফ্ল্যাজেলা যুক্ত হয়। ফ্ল্যাজেলার সংখ্যা একটি অথবা দুটি হতে পারে।

এই বিভিন্ন প্রকার অযৌন রেণু পরবর্তী একক গুলিতে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

1.6.3 যৌন জনন :

যৌন জননে একটি মাতৃ নিউক্লিয়াস ও একটি পিতৃ নিউক্লিয়াসের মধ্যে মিলন ঘটে। এই দুই নিউক্লিয়াস দুটি গ্যামেট অথবা দুটি গ্যামেট্যানজিয়া অথবা সরাসরি দুটি হাইফার সাধারণ কোশ হতে আসতে পারে। যৌন জননে অংশ গ্রহণকারী ঐ দুটি নিউক্লিয়াস পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে এবং ঐ আকর্ষণ নির্দিষ্ট কিছু ফ্যাক্টর (Factors) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আকর্ষণ অনুভবকারী দুটি নিউক্লিয়াসের একটিকে অপরটির কম্প্যাটিবল

(Compatible) বা উপযুক্ত মিলন সঙ্গী বলে। পক্ষান্তরে একই প্রজাতির ছত্রাকে দুটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে এরূপ আকর্ষণ অনুপস্থিত থাকলে ঐ নিউক্লিয়াস দুটিকে ইনকম্প্যাটিবল (Incompatible) বা অনুপযুক্ত মিলন সঙ্গী বলে।

ছত্রাকের যৌন জননের তিনটি পর্যায় হল প্লাজমোগ্যামী, ক্যারিওগ্যামী ও মিয়োসিস বা হ্রাসবিভাজন।

1.6.3.1 প্লাজমোগ্যামী **(Plasmogamy)** ঃ এক্ষেত্রে যৌন মিলনে অংশগ্রহণকারী দুটি কোশের সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে ও উভয় কোশের নিউক্লিয়াস পরস্পরের কাছাকাছি এসে পাশাপাশি অবস্থান করে; ফলে একটি দ্বি নিউক্লিয় কোশ বা ডাইক্যারিয়নের (Dikaryon) সৃষ্টি হয়।

1.6.3.2 ক্যারিওগ্যামী **(Karyogamy)** ঃ এক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামীর ফলে কাছাকাছি আসা দুটি নিউক্লিয়াস পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে একটি ডিপ্লয়েড (Diploid) নিউক্লিয়াস গঠন করে। কোন কোন ছত্রাকের ক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামীর পরপরই ক্যারিওগ্যামী ঘটে। আবার কোন কোন ছত্রাকের ক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামীর অনেক পর ক্যারিওগ্যামী অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এই দুই ঘটনার মধ্যে দ্বিনিউক্লিয় অন্তবর্তী দশা বা ডাইক্যারিওটিক (Dikaryotic) দশা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

1.6.3.3 মিয়োসিস ঃ ক্যারিওগ্যামীর ফলে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সাধারণত মিয়োসিস বা হ্রাস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয় ও হ্যাপ্লয়েড (n) রেণু উৎপন্ন করে। অনেক সময় এই হ্রাস বিভাজনের পর সমবিভাজন বা মাইটোসিস হয় ফলে অধিক সংখ্যক হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন হয়। এই হ্যাপ্লয়েড রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন হ্যাপ্লয়েড মাইসীলিয়াম উৎপন্ন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ছত্রাকের দেহ যদিও সাধারণত হ্যাপ্লয়েড কিন্তু কিছু ছত্রাক রয়েছে যাদের দেহ ডিপ্লয়েড। এই ডিপ্লয়েড দেহ যুক্ত ছত্রাকের ক্ষেত্রে গ্যামেট উৎপাদনের সময় মিয়োসিস বিভাজন ঘটে। ফলে ক্যারিওগ্যামীর পর উৎপন্ন ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াসের মাইটোসিস বা সমবিভাজন হয় এবং ডিপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন করে। ঐ রেণু নতুন থ্যালাস বা ডিপ্লয়েড মাইসীলিয়াম উৎপন্ন করে।

ছত্রাকের বিভিন্ন প্রকার যৌন জনন পদ্ধতি সম্পর্কে পরের একক গুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

1.6.3.4 সহবাসিতা বা হোমোথ্যালিসম **(Homothallism)** এবং ভিন্নবাসিতা বা হেটোরোথ্যালিসম **(Heterothallism)** ঃ আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে যৌন জননে দুটি নিউক্লিয়াসের (পিতৃ ও মাতৃ নিউক্লিয়াস) মিলন ঘটে। এই দুটি নিউক্লিয়াস যদি একই থ্যালাস বা মাইসীলিয়ামের অন্তর্গত হয়, অর্থাৎ কোন ছত্রাকের থ্যালাস বা মাইসীলিয়াম একক ভাবে যৌন জনন সম্পূর্ণ করতে পারে তাহলে ঐ ছত্রাককে সহবাসী বা হোমোথ্যালিক (Homothallic) ছত্রাক এবং ঘটনাটিকে সহবাসিতা বা হোমোথ্যালিসম বলে। পক্ষান্তরে কোন ছত্রাকের ক্ষেত্রে যৌন মিলনে অংশগ্রহণ কারী নিউক্লিয়াস দুটি যদি দুটি ভিন্ন থ্যালাস বা মাইসীলিয়াম থেকে আসে তাহলে ঐ ছত্রাককে ভিন্নবাসী বা হেটোরোথ্যালিক (Heterothallic) ছত্রাক এবং ঘটনাটিকে ভিন্নবাসিতা বা হেটোরোথ্যালিসম বলে।

হোমোথ্যালিসম দু প্রকার ঃ প্রাথমিক হোমোথ্যালিসম (Primary homothallism) ও গৌণ হোমোথ্যালিসম (Secondary homothallism)। ইতিপূর্বে হোমোথ্যালিসমের যে সংজ্ঞা আপনারা পেয়েছেন সেটি প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক হোমোথ্যালিসমকেই বোঝায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় প্রাথমিক হোমোথ্যালিসম দেখা যায় *Coprinus sterquilinus (কোপ্রাইনাস স্টারকুইলিনাস), Penicillium vermiculatum (পেনিসিলিয়াম ভারমিকুলেটাম) Rhizopus sexualis (রাইজোপাস সেকসুঅ্যালিস)* ইত্যাদি ছত্রাকে। গৌণ হোমোথ্যালিসমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ছত্রাকটি মূলতঃ হেটেরোথ্যালিক কিন্তু সে আবার এমন রেণুও উৎপন্ন করে যা অঙ্কুরিত হয়ে হোমোথ্যালিসম প্রদর্শন করে। এর অর্থ হেটারোথ্যালিক ছত্রাক সাধারণত যে রেণু (যৌন রেণু) উৎপন্ন করে তা একটি মাত্র হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হয়। কিন্তু কোন হেটারোথ্যালিক ছত্রাক যদি উপরোক্ত রেণু ছাড়াও এমন যৌন রেণু উৎপন্ন করে যা দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এবং ঐ নিউক্লিয়াস দুটি একে অপরের কম্প্যাটিবল, সেক্ষেত্রে ঐ রেণু হতে প্রাপ্ত মাইসিলীয়াম হোমোথ্যালিসম প্রদর্শন করে। এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় *Neurospora tetrasperma (নিউরোস্পোরা টেট্রাস্পারমা), Agaricus bisporus (অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস)* ইত্যাদি ছত্রাকে।

হেটেরোথ্যালিসম মূলতঃ দু প্রকার বাইপোলার (Bipolar) ও টেট্রাপোলার (Tetrapolar)।

(ক) বাইপোলার ঃ এক্ষেত্রে যৌন জননে অংশ গ্রহণকারী দুটি নিউক্লিয়াসের মিলন এক জোড়া জিন বা অ্যালীল (Aa) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; অর্থাৎ একটি নিউক্লিয়াসে যদি 'A' জিন থাকে তাহলে এর কম্প্যাটিবল নিউক্লিয়াসে 'a' জিন থাকবে। কিন্তু দুটি 'A' জিন বহনকারী নিউক্লিয়াস পরস্পরের ইনকম্প্যাটিবল। একইভাবে দুটি 'a' জিন বহনকারী নিউক্লিয়াস পরস্পরের ইনকম্প্যাটিবল, এই ঘটনাগুলিকে নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হলঃ

পিতৃ নিউক্লিয়াস

		A	a
মাতৃ নিউক্লিয়াস	A	–	+
	a	+	–

'–' চিহ্ন বুঝায় নিউক্লিয়াস দুটির মধ্যে মিলন হচ্ছে না,

'+' চিহ্ন বুঝায় নিউক্লিয়াস দুটির মধ্যে মিলন ঘটছে।

বাইপোলার হেটারোথ্যালিসমের উদাহরণ— *Puccinia graminis (পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস), Ustilago nuda (উস্টিল্যাগো নুডা)* ইত্যাদি।

(খ) টেট্রাপোলার ঃ এক্ষেত্রে যৌন জননে অংশ গ্রহণকারী দুটি নিউক্লিয়াস মিলন দু'জোড়া জিন (Aa ও Bb) বা অ্যালীল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ চারটি জিন চারটি পৃথক ক্রোমোজোমে অবস্থিত। যেহেতু টেট্রাপোলার ছত্রাকের ক্ষেত্রে মিলনে অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি নিউক্লিয়াসে দুটি করে জিন একসাথে থাকে, অতএব দু'জোড়া জিনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজালে চার প্রকার সম্ভাব্য নিউক্লিয়াস পাওয়া যাবে (AB, Ab, aB ও ab) এইরূপ চার প্রকার মাতৃ নিউক্লিয়াসের সাথে চার প্রকার মাতৃ নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটাতে গেলে কি ফল হবে তা ছকের সাহায্যে দেখানো হল। ছক থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে কম্প্যাটিবল নিউক্লিয়াস দ্বয় হবে AB ও ab অথবা aB ও Ab; অর্থাৎ প্রতিটি লোকাসে থাকবে বিপরীত ধর্মী জিন।

পিতৃ নিউক্লিয়াস

মাতৃ নিউক্লিয়াস	AB	Ab	aB	ab
AB	−	−	−	+
Ab	−	−	+	−
aB	−	+	−	−
ab	+	−	−	−

'—' চিহ্ন বুঝায় যৌন মিলন ঘটছে না অর্থাৎ নিউক্লিয়াসদ্বয় ইনকম্প্যাটিবল।

'+' চিহ্ন বুঝা যৌন মিলন ঘটছে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসদ্বয় কম্প্যাটিবল।

টেট্রাপোলার হেটারোথ্যালিসম দেখা যায় *Schizophyllum commune (সাইজোফাইলাম কমিউন), Coprinus cinereus (কোপ্রাইনাস সাইনেরিয়াস)* ইত্যাদি ছত্রাকে।

1.7 শ্রেণি বিন্যাস

ছত্রাক প্রায় 40,000 প্রজাতি সমন্বিত উদ্ভিদ বিদ্যার এক শাখা। এই বিপুল সংখ্যক সদস্য সম্পর্কে আলোচনার বা জানার সুবিধার জন্য তাদেরকে গোষ্ঠীবদ্ধ তথা শ্রেণিবিন্যাস করা প্রয়োজন। এই গোষ্ঠীবদ্ধকরণ সদস্যগুলির গঠন, জনন ইত্যাদি বিষয়ের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে করা হয়। ছত্রাককে বিভিন্ন ছত্রাক বিদ বিভিন্নভাবে শ্রেণি বিভক্ত করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কোশপ্রাচীর বিহীন এক প্রকার পরভোজী জীবগোষ্ঠীকে (স্লাইম মোল্ড ও ঐ জাতীয় সদস্য নিয়ে গঠিত) ছত্রাকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পুস্তকে মূলতঃ গুইন-ভাউগান ও বার্নেস (Gwynne-Vaughan and Barnes, 1927) প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস (যার বহুল ব্যবহার রয়েছে) অনুযায়ী ছত্রাককে আলোচনা করা হয়েছে। এই শ্রেণি বিন্যাসে কেবলমাত্র কোশপ্রাচীর যুক্ত ছত্রাককেই ছত্রাক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নিচে এই শ্রেণিবিন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত ছক (শ্রেণি পর্যায় পর্যন্ত) দেওয়া হল ঃ—

ছত্রাক (**Fungi**)

- থ্যালাস বা মাইসীলিয়াম সাধারণত বিভেদ প্রাচীরবিহীন (Aseptate)
  - শ্রেণি-ফাইকোমাইসিটিস (Phycomycetes)
- মাইসীলীয়াম বিভেদ-প্রাচীর যুক্ত (Septate)
  - বৈশিষ্টপূর্ণ রেণু-অ্যাসকোরেণু (Ascospore) যা একপ্রকার অন্তঃরেণু (অ্যাসকাসের মধ্যে সজ্জিত)
    - শ্রেণি-অ্যাসকোমাইসিটিস (Ascomycetes)
  - বৈশিষ্টপূর্ণ রেণু-বেসিডিওরেণু (Basidiospore) যা একপ্রকার বহিঃরেণু (বেসিডিয়ামের উপর সজ্জিত)
    - শ্রেণি বেসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes)
  - অ্যাসকোরেণু এবং বেসিডিওরেণু অনুপস্থিত বা দেখা যায় না।
    - শ্রেণি-ফাংগি ইম্পারফেকটি (Fungi imperfecti)

অনুশীলনী - 3

নিচের প্রদত্ত শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দ/ শব্দগুচ্ছ নিয়ে শূন্যস্থান পুরণ করুন।

a) জননে দেহ বা দেহাংশ অংশ গ্রহণর বিচারে ইষ্ট হল ________ ছত্রাক, কিন্তু পেনিসিলিয়াম হল ________ ছত্রাক।

b) ছত্রাক তার অযৌন জনন ________ রেণু অথবা ________ রেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন করে।

c) যৌন জননে পিতৃ ও মাতৃ নিউক্লিয়াস, যারা একে অপরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তাদেরকে ________ নিউক্লিয়াস বলে।

d) ছত্রাকের যৌন জননের তিনটি পর্যায় হল ________, ________ ও মিয়োসিস।

e) যৌন জননে অংশগ্রহণকারী দুটি নিউক্লিয়াসের উৎস যদি একটি মাত্র মাইসীলিয়াম হয় তাহলে যে ছত্রাকে এটা দেখা যায় তাকে ________ ছত্রাক বলে। পক্ষান্তরে যে ছত্রাকে যৌন জননের জন্য দুটি মাইসীলিয়ামের প্রয়োজন হয় সেই ছত্রাককে ________ ছত্রাক বলে।

f) হোমোথ্যালিসম দু প্রকার ________ ও ________ এবং হেটোরোথ্যালিসম দু প্রকার ________ ও ________।

g) গুইন - ভাউগান ও বার্নেস ছত্রাককে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এগুলি হল ________, ________, ________ ও ________।

(বেসিডিওমাইসিটিস, অচল, হলোকার্পিক, চল, ইউকার্পিক, কম্প্যাটিবল্, ভিন্ন বাসী, সহবাসী, ফাইকোমাইসিটিস, টেট্রাপোলার, প্রাথমিক, বাইপোলার, গৌণ, অ্যাসকোমাইসিটিস, ফাংগি ইমপারফেকটি, ক্যারিওগ্যামী, প্লাসমোগ্যামী।)

1.8 সারাংশ ঃ

এই এককটি পড়ে আপনারা শিখেছেন—

- ছত্রাক একপ্রকার ক্লোরোফিল বিহীন পরভোজী উদ্ভিদ। কোশপ্রাচীর সাধারণত কাইটিন নির্মিত এবং সঞ্চিত শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তু গ্লাইকোজেন।
- ছত্রাকের রয়েছে নানা প্রকার উপকারী ও অপকারী বৈশিষ্ট্য।
- ছত্রাকের দেহ সাধারণত মাইসীলিয়াম, যার একক হল হাইফা, হাইফা সিনোসাইট অথবা বিভেদ প্রাচীর যুক্ত। বিভেদ প্রাচীর একটি কেন্দ্রীয় ছিদ্র যুক্ত। ছিদ্রটি সরল অথবা ডলি ছিদ্র।
- ছত্রাক সাধারণত অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এই তিন প্রকার পদ্ধতিতে জনন সম্পন করে। অযৌন ও যোন জননে রেণু উৎপন্ন হয়।

- ছত্রাক যেমন সহবাসী বা হোমোথ্যালিক হতে পারে তেমনি ভিন্নবাসী বা হেটারোথ্যালিক হতে পারে।
- সহবাসিতা বা হোমোথ্যালিসম দু প্রকার—প্রাথমিক ও গৌণ সহবাসিতা। আবার ভিন্নবাসিতা দু প্রকার—বাইপোলার ও টেট্রাপোলার। বাইপোলার ভিন্নবাসিতা এক জোড়া ও টেট্রাপোলার ভিন্নবাসিতা দু জোড়া জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- ছত্রাককে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে গুইন-ভাউগান ও বার্নেস প্রদত্ত শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী এবং এর ভিত্তি হল—মাইসীলিয়ামে বিভেদ প্রাচীর আছে কি নেই, যৌন রেণু উৎপন্ন হয় কি হয় না ও যৌন রেণুর প্রকারভেদে।

1.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ
   a) ছত্রাক কি ?
   b) ছত্রাকের পুষ্টির জন্য অতিমাত্রিক ও স্বল্পমাত্রিক মৌলগুলি কি কি ?
   c) ছত্রাকের অঙ্গজ দেহ কয় প্রকার ও কি কি ?
2. ছত্রাকের তিনটি উপকারী ও তিনটি অপকারী ভূমিকা উল্লেখ করুন? মাইকোরহিজা কি? এটির গঠন কারী দুই অংশীদারের মধ্যে কিভাবে মিথোজীবিত্ব গড়ে উঠেছে উল্লেখ করুন।
3. ছত্রাকের সহবাসিতা (হোমোথ্যালিসম্) ও ভিন্ন বাসিতা (হেটারোথ্যালিসম্) বলতে কি বুঝায়? বিভিন্ন প্রকার সহবাসিতা ও ভিন্নবাসিতা সম্পর্কে উদাহরণ সহ বর্ণনা করুন।
4. পুষ্টি পদ্ধতি অনুযায়ী ছত্রাককে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং সেগুলি কি কি ? প্রতিটি বিভাগ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

1.10 উত্তরমালা

অনুশীলনী- 1

a) ক্লোরোফিল, থ্যালাস উদ্ভিদ
b) স্থল, জল
c) কাইটিন
d) পরভোজী
c) গ্লাইকোজেন
f) মাইকোলজি
g) অ্যাসপারজিলাস নিগার

h) ভক্ষণীয়

i) পাকসিনিয়া গ্র্যামিনিস ট্রিটসি

j) ক্যানডিডা অ্যালবিকানস্

k) বিযাস্ত

l) নিউরোস্পোরা

অনুশীলনী- 2

a) হাইফা

b) নাইট্রোজেন

c) সিনোসাইটিক

d) সরল, ডলি

e) আদর্শ

f) পর, মৃত, মিথো

g) বাধ্যতামূলক পরজীবী, বাধ্যতা মূলক মৃতজীবী

h) শৈবাল, উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের মূলের

অনুশীলনী- 3

a) হলোকার্পিক, ইউকার্পিক

b) অচল, চল

c) কম্প্যাটিবল

d) প্লাসমোগ্যামী, ক্যারিওগ্যামী

e) সহবাসী, ভিন্নবাসী

f) প্রাথমিক, গৌণ, বাইপোলার, টেট্রাপোলার

g) ফাইকোমাইসিটিস, অ্যাসকোমাইসিটিস, বেসিডিওমাইসিটিস ও ফাংগি ইমপারফেক্টি।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. a) অনুচ্ছেদ 1.2 দেখুন।

   b) ছত্রাকের পুষ্টির জন্য C, H, O, N, S, P, K এবং Mg — এই আটটি মৌল অতিমাত্রিক ও অত্যাবশ্যকীয়। Fe, Cu, Zn, Mn এবং Mg পাঁচটি স্বল্পমাত্রিক মৌলের মধ্যে Cu, Zn এবং Fe ছত্রাকের পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক।

   c) ছত্রাকের অঙ্গজ দেহ সাধারণত তিনপ্রকার—এককোশী ও এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট (যেমন-ইষ্ট), বিভেদ প্রাচীর বিহীন বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মাইসীলিয়াম-সিনোসাইটিক মাইসীলিয়াম (যেমন-ফাইটোফথোরা) ও বিভেদ প্রাচীর যুক্ত এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মাইসীলিয়াম (যেমন- অ্যাগারিকাস)। মাইসীলিয়াম শাখান্বিত হয়।

2. উপকারী ও অপকারী ভূমিকার জন্য যথাক্রমে 1.3.1 ও 1.3.2 অনুচ্ছেদ দেখুন, মাইকোরহিজার জন্য 1.5.3.2 অনুচ্ছেদ দেখুন।

3. অনুচ্ছেদ 1.6.3.4 দেখুন।

4. পুষ্টি পদ্ধতি অনুযায়ী ছত্রাককে তিনভাগে ভাগ করা যায়—মৃতজীবী, পরজীবী ও মিথোজীবী। পরবর্তী উত্তরের জন্য 1.5.1, 1.5.2 ও 1.5.3 অনুচ্ছেদগুলি দেখুন।

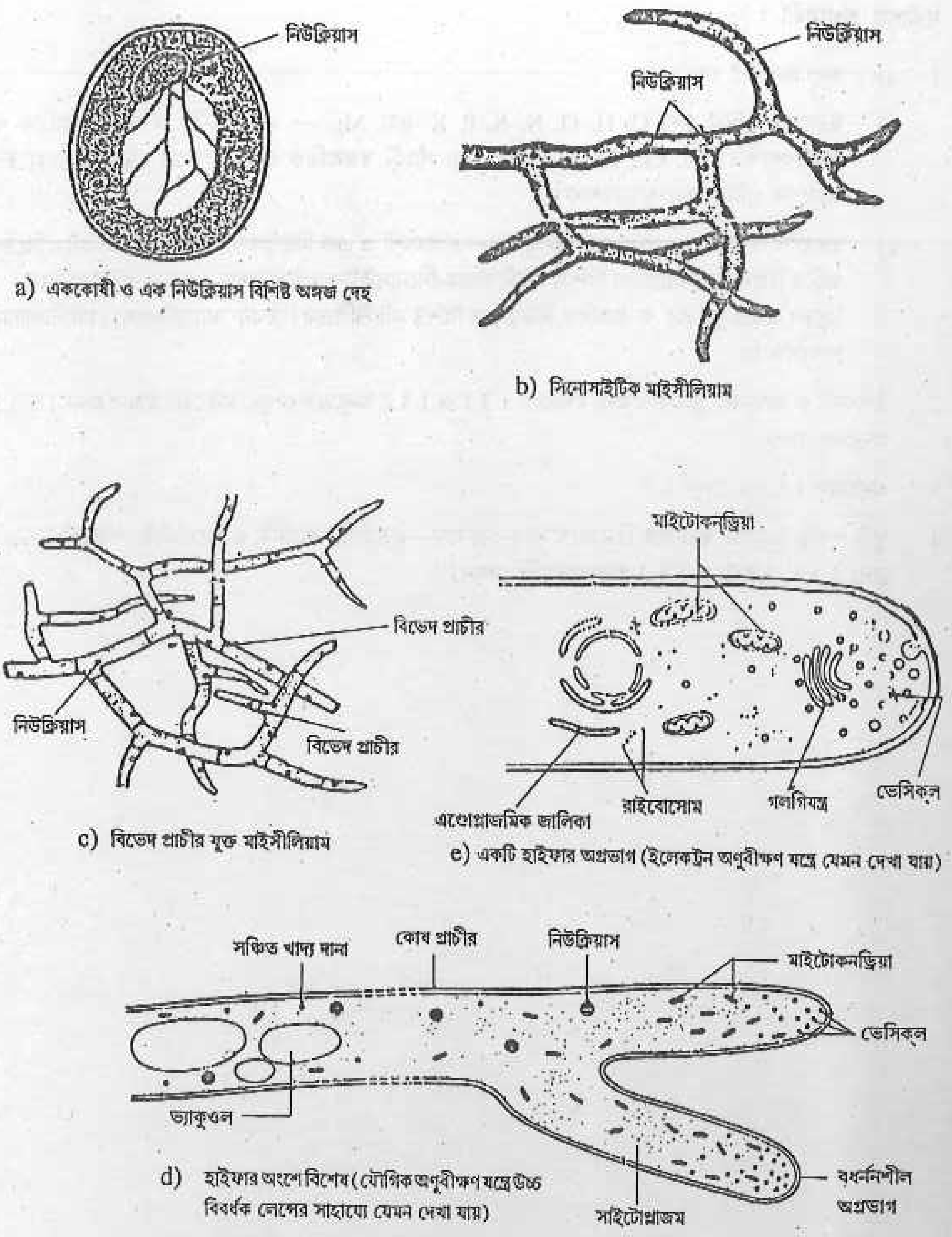

চিত্র নং 1.1 : ছত্রাকের বিভিন্ন প্রকার অঙ্গজ দেহ এবং হাইফা মধ্যস্থ কোশ অঙ্গাণু।

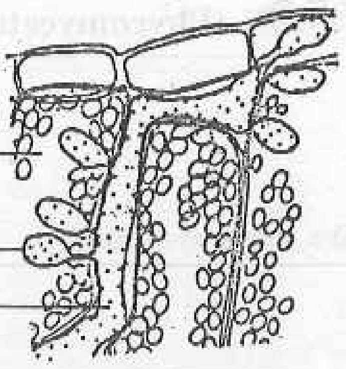

চিত্র নং 1.2 : পোষক উদ্ভিদের মধ্যে আন্তঃকোশীয় হাইফা ও হস্টোরিয়াম

একক 2 □ ফাইকোমাইসিটিস (Phycomycetes)

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

2.2 অবস্থান, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও অঙ্গজ গঠন

2.3 জনন

2.4 জীবনচক্র

2.5 শ্রেণিবিন্যাস

2.6 সারাংশ

2.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

2.8 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা

আপনারা পূর্ববর্তী এককটি থেকে জানতে পেরেছেন যে ছত্রাক কোশপ্রাচীর বিশিষ্ট এবং একে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই চারটি শ্রেণির মধ্যে প্রথম শ্রেণিটি হল ফাইকোমাইসিটিস। এই শ্রেণিটির মাইসীলিয়াম বিভেদ প্রাচীর বিহীন ও বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট অর্থাৎ মাইসীলিয়াম সিনোসাইটিক। আপনারা এটাও জেনেছেন যে ছত্রাকের কোশপ্রাচীর প্রধানত কাইটিন নির্মিত হলেও কিছু ছত্রাক রয়েছে যাদের প্রধান কোশপ্রাচীর বস্তু সেলুলোজ আর এই সেলুলোজ নির্মিত কোশপ্রাচীর বিশিষ্ট ছত্রাকগুলি ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত। কাজেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফাইকোমাইসিটিসে রয়েছে নানা বৈচিত্র। আর এই বৈচিত্র্য শুধু তার গঠনে সীমাবদ্ধ নয়। এই বৈচিত্র আছে তার অবস্থানে, জননে, অর্থনৈতিক গুরুত্বে। আবার ক্রমবিবর্তনের ধারায় এই শ্রেণিটিকে প্রাথমিক বা আদি পর্যায়ের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই শ্রেণিটি সম্পর্কে আরও বিশদ ভাবে জানা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির সদস্যরা কিরকম পরিবেশে বাস করে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই শ্রেণিটির গুরুত্ব নির্দিষ্ট করতে পারবেন।
- শ্রেণিটির সদস্যদের গঠন গত বৈচিত্র্য নির্ধারণ করতে পারবেন।
- শ্রেণিটির অযৌন জননের প্রকার ভেদ ও যৌন জননের নানা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শ্রেণিটির সাধারণ জীবনচক্র এবং সেইসঙ্গে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- শ্রেণিটিকে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কি কি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

2.2 অবস্থান, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও অঙ্গজ গঠন

2.2.1 অবস্থান :

এই শ্রেণির ছত্রাক জলবাসী অথবা স্থলবাসী হতে পারে। জলবাসী ছত্রাক মিঠা হলে (যেমন স্যাপ্রোলেগনিয়া *Saprolegnia*) অথবা সমুদ্রের লোনা জলে যেমন [*Pythium marinum (পিথিয়াম ম্যারিনাম)*], জন্মাতে পারে। জলবাসী ছত্রাক পরজীবী [যেমন *Saprolegnia parasitica (স্যাপ্রোলেগনিয়া প্যারাসিটিকা)*], হিসাবে অন্যান্য জীবদেহে জন্মাতে পারে অথবা মৃতজীবী হিসাবে (পিথিয়াম ম্যারিনাম) উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ বা প্রাণীর বর্জ্যপদার্থে জন্মাতে পারে। জলবাসী ছত্রাক সাধারণত প্রোটিন সমৃদ্ধ ধাত্র পছন্দ করে।

স্থলবাসী ছত্রাক পরজীবী, মৃতজীবী বা মিথোজীবী হিসাবে প্রকৃতিতে অবস্থান করে। বিভিন প্রকার স্থলবাসী ছত্রাকের উদাহরণ নিচে দেওয়া হল—

বাধ্যতামূলক পরজীবী — *Peronospora (পেরোনোস্পোরা)*

স্বেচ্ছামূলক পরজীবী — *Pythium aphanidermatum (পিথিয়াম অ্যাফানিডারমেটাম)*

বাধ্যতামূলক মৃতজীবী — *Mucor mucedo (মিউকর মিউসিডো)*

স্বেচ্ছামূলক মৃতজীবী — *Phytophthora infestans (ফাইটোফথোরা ইনফেসট্যান্স)*

2.2.2 অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণিতে উপকারী ও অপকারী উভয় প্রকার সদস্যই আছে।

উপকারী সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Endogone lactiflua (এন্ডোগন ল্যাকটিফ্লুয়া)*, *Glomus (গ্লোমাস)*, *Gigaspora (জাইগ্যাসপোরা)* ইত্যাদি যা বিভিন প্রকার উদ্ভিদের (ব্রাওফাইটা, টেরিডোফাইটা ও জিমনোস্পার্ম কিন্তু পাইনাসী গোত্র ব্যতীত) সাথে মাইকোরহিজা উৎপাদন করে মিথোজীবিত্ব প্রদর্শন করে। কিছু জলজ ছত্রাক প্রাকৃতিক জলশোধনকারী হিসাবে কাজ করে। *Rhizopus nigricans (রাইজোপাস নিগ্রিক্যান্স)* বিভিন্ন স্টেরয়েডের জারণ ঘটিয়ে উহাদের আনবিক গঠন পাল্টে দেয়, ফলে নতুন স্টেরয়েড (Steroid) উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া উক্ত ছত্রাকটি ফিউম্যারিক অ্যাসিড নামক জৈব অম্ল উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

অপকারী সদস্যদের মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক। ফাইটোফথোরা ইনফেসট্যান্স আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ সৃষ্টি করে, পেরোনোস্পোরা ও *Plasmopara (প্লাসমোপ্যারা)* বিভিন্ন উদ্ভিদে ডাউনি মিলডিউ (Downy Mildew) রোগ সৃষ্টি করে। *Mucor (মিউকর)* ও *Rhizopus (রাইজোপাস)* ফল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পচিয়ে নষ্ট করে। *Saprolegnia parasitica (স্যাপ্রোলেগনিয়া প্যারাসিটিকা)* মাছের রোগ সৃষ্টি করে। মিউকর ও রাইজোপাসের কিছু প্রজাতি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ফুসফুসে রোগ সৃষ্টি করে।

2.2.3 অঙ্গজ গঠন :

আদি পর্যায়ের ফাইকোমাইসিটিসের দেহ এককোশী ও এক নিউক্লিয়াস যুক্ত [যেমন *Synchytrium (সিনকিট্রিয়াম)*]। কিছুটা উন্নত ফাইকোমাইসিটিসের দেহ স্বল্প সৃষ্ট মাইসীলিয়াম বা রাইজোমাইসীলিমার প্রকৃতির

(যেমন *Nowakowskiella নওয়াকওস্কিএল্লা*) এক্ষেত্রে স্বল্প পরিমানে ও রাইজয়েডের মত সিনোসাইটিক মাইসীলিয়াম দেখতে পাওয়া যায়। উন্নত ফাইকোমাইসিটিস সদস্যদের দেহ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ও বিস্তৃত সিনোসাইটিক মাইসীলিয়াম। মাইসীলিয়াম সাধারণত বিভেদ প্রাচীর বিহীন হলেও দুটি ক্ষেত্রে বিভেদ প্রাচীর সৃষ্টি হতে পারে, যেমন প্রবীন হাইফার ক্ষেত্রে ও জননাঙ্গের নিচে বিভেদ প্রাচীর সৃষ্টি হয়। এরূপ বিভেদপ্রাচীর সৃষ্টির যুক্তি হল হাইফা পুরাতন হলে তা অটোলাইসিস (Autolysis) প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে হাইফার যে পর্যন্ত অটোলাইসিস হয় ঠিক তার আগে বিভেদ প্রাচীর সৃষ্টি হয়। আবার জননাঙ্গগুলির ক্ষেত্রে জনন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে রেণু নিষ্ক্রমণের জন্য ফেটে যায়। কাজেই এই দুই ক্ষেত্রে বিভেদ প্রাচীর সৃষ্টি করে বাকী মাইসীলিয়ামকে জীবাণুর সংক্রমণ হলে রক্ষা করে। এই বিভেদ প্রাচীরগুলি হয় নিরেট ও ছিদ্রবিহীন। ফাইকোমাইসিটিসের হাইফাল প্রাচীর সাধারণভাবে কাইটিন নির্মিত হলেও উমাইসিটিস নামক উপশ্রেণির বেশিরভাগ সদস্যের প্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ নির্মিত ও কাইটিন অনুপস্থিত। এই সেলুলোজ অবশ্য গঠনগত ভাবে অন্যান্য উদ্ভিদের কোশপ্রাচীরের সেলুলোজ থেকে ভিন্ন। তাই এই সেলুলোজকে ছত্রাকীয় সেলুলোজ বা ফাঙ্গাল সেলুলোজ (Fungal cellulose) বলে।

অনুশীলনী - 1

নিচের তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(a) ফাইকোমাইটিস শ্রেণির ছত্রাক ________ বাসী বা ________ বাসী হতে পারে।

(b) স্যাপ্রোলেগনিয়া প্যারাসিটিকা এক একটি বাসী ________ জীবী ছত্রাক এবং পেরোনোস্পোরা পিসি হল একটি ________ বাসী ________ জীবী ছত্রাক।

(c) ফাইটোফথোরা ইনফেস্ট্যান্স আলু গাছের ________ রোগ সৃষ্টি করে।

(d) আদি পর্যায়ের ফাইকোমাইসিটিসের দেহ ________ এবং উন্নত পর্যায়ের ফাইকোমাইসিটিসের দেহ ________।

(e) উমাইসিটিস উপশ্রেণির ছত্রাকের হাইফার প্রাচীর প্রধানত ________ দ্বারা নির্মিত।

(f) ফাইকোমাইসিটিসে বিভেদ প্রাচীর সাধারণত থাকে না, কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে বিভেদ প্রাচীর উৎপন্ন হলে তা ____ বিহীন হয়।

(হলোকার্পিক, বিলম্বিতা ধ্বসা, স্থল, সেলুলোজ, জল, ছিদ্র, স্থল, পর, জল, পর, ইউকার্পিক)

4.3 জনন (Reproduction) :

ফাইকোমাইসিটিসের জনন অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এই তিনপ্রকার প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। অযৌন ও যৌন জনন রেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ফাইকোমাইসিটিসের হলোকার্পিক সদস্যের (সিনকিট্রিয়াম) সমগ্র দেহ এবং ইউকার্পিক সদস্যের (ফাইটোফথোরা) দেহাংশ জননে লিপ্ত হয়।

2.3.1 অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction) : ইহা কেবলমাত্র মাইসীলিয়াম দেহবিশিষ্ট ছত্রাকে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মাইসীলিয়ামের খণ্ডাংশ থেকে নতুন মাইসীলিয়াম উৎপন্ন হয়। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে গেম্মার মাধ্যমে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে হাইফার অগ্রভাগ অসমভাবে স্ফীত হয়ে একপ্রকার গঠন

সৃষ্টি করে। এই বহুনিউক্লিয় গঠনটিতে থাকে প্রচুর পরিমানে সঞ্চিত খাদ্য বস্তু এবং একে গেমা (**Gemma**) বলে। এই গেমা হাইফা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম উৎপন্ন করে। স্যাপ্রোলেগনিয়া, *Achlya (অ্যাক্‌লিয়া)* ইত্যাদি ছত্রাকে গেম্মা দেখা যায় (চিত্র 2.2)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই গেমাকে কোন কোন ছত্রাকবিদ একপ্রকার ক্লামাইডোরেণু (Chlamydospore) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এটি অযৌন জনন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

2.3.2 অঙ্গজ জনন (Asexual reproduction) : ফাইকোমাইসিটিস সাধারণত রেণুস্থলী বা স্পোরানজিয়ামর (Sporangium) ভিতর উৎপন্ন রেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন করে। এছাড়া ক্লামাইডোরেণু, স্পোরানজিয়াম-পরিবর্তিত-কনিডিওরেণু (Conidiospore) ইত্যাদির মাধ্যমেও অযৌন জনন সম্পন্ন করতে পারে।

2.3.2.1 রেণুস্থলীতে দুপ্রকার রেণু উৎপন্ন হতে দেখা যায়, এগুলি হল চলরেণু বা জুস্পোর (zoospore) বা প্ল্যানোস্পোর (Planospore) এবং অচর রেণু বা অ্যাপ্ল্যানোস্পোর (Aplanospore)

(a) চলরেণু ঃ চলরেণু ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত হয়। ফ্ল্যাজেলাম দু'প্রকার দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলি হল টিনসেল ও হুইপল্যাশ ধরনের ফ্ল্যাজেলাম। টিনসেল (Tinsel) ধরনের ফ্ল্যাজেলাম খেতে পাখির পালকের মত বা রোমযুক্ত আর হুইপল্যাশ (Whiplash) ফ্ল্যাজেলাম চাবুকের মত দেখতে এবং এর তল মসৃণ। চলরেণুতে ফ্ল্যাজেলামের সংখ্যা একটি অথবা দুটি হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী চলরেণু দু'প্রকার একক ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত চলরেণু ও দ্বিফ্ল্যাজেলা যুক্ত চলরেণু।

(i) একক ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত চলরেণু (চিত্র 2.3) :

এই প্রকার চলরেণুর ফ্ল্যাজেলামটি রেণুর সামনের দিকে অথবা পিছনের দিকে থাকতে পারে। রেণুর সামনের দিকে যুক্ত ফ্ল্যাজেলামটি হয় টিনসেল প্রকৃতির (যেমন *Rhizidiomyces, রাইজিডিওমাইসিস*) আর পিছনের দিকে যুক্ত ফ্ল্যাজেলামটি হয় হুইপল্যাশ প্রকৃতির (যেমন *Synchytrium, সিনকিট্রিয়াম*)। টিনসেল ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত রেণু ফ্ল্যাজেলামের দিকে চলন প্রদর্শন করে আর হুইপল্যাশ ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত ফ্ল্যাজেলামের বিপরীত দিকে চলন প্রদর্শন করে (চিত্র 2.3)।

(ii) দ্বি-ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত চলরেণু (চিত্র 2.4) :

দ্বি-ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত চলরেণু দু'রকমের দেখতে হয়—ন্যাসপাতি আকৃতির (যেমন স্যাপ্রোলেগনিয়ার প্রাথমিক চলরেণু) ও বৃক্কাকৃতির (যেমন স্যাপ্রোলেগনিয়ার গৌণ চলরেণু, ফাইটোফথোরার চলরেণু)। ন্যাসপাতি আকৃতির চলরেণুতে ফ্ল্যাজেলাম দুটি সামনের দিকে অবস্থিত এবং ফ্ল্যাজেলামের একটি টিনসেল ধরনের ও অপরটি হুইপল্যাশ ধররে হয়। বৃক্কাকৃতি চলরেণুর ফ্ল্যাজেলাম দুটির অবস্থান পার্শ্বীয় এবং একটি খাঁজে এই ফ্ল্যাজেলাম দুটি প্রোথিত। চলার সময় টিনসেল ফ্ল্যাজেলামটি সামনের দিকে এবং হুইপল্যাশ ফ্ল্যাজেলামটি পিছনের দিকে মুখ করে থাকে।

চলরেণু উৎপাদনকারী রেণুস্থলী বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে যেমন গোলাকৃতি, ন্যাসপাতি আকৃতি, নলাকৃতি ইত্যাদি। সাধারণত একটি পরিণত রেণুস্থলী হতে রেণু নির্গত হয়ে গেলে রেণুস্থলীটি বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন স্যাপ্রোলেগনিয়া) রেণুস্থলী হতে রেণু নির্গত হয়ে গেলে ঐ রেণুস্থলীর ভিতর দ্বিতীয় রেণুস্থলী বা স্পোরানজিয়াম উৎপন্ন হয় ও এরূপ বারে বারে হতে পারে। এই ঘটনাকে স্পোরানজিয়াল প্রোলিফ্যারেশন (Sporangial proliferation) বলে (চিত্র 2.5)।

সাধারণ রেণুস্থলী হতে নির্গত চলরেণু কিছু সময় সন্তরনের পর ফ্ল্যাজেলা খসিয়ে ফেলে ও বিশ্রাম দশায় প্রবেশ করে। বিশ্রাম দশা অতিক্রান্ত হলে নতুন অঙ্গজ দেহ গঠন করে। এক্ষেত্রে একটি সন্তরণ দশা থাকায় এটিকে মোনোপ্ল্যানেটিসম (Monoplanetism) বলে। কিন্তু সাধারণত ন্যাসপাতি আকৃতির দ্বি-ফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট রেণুগুলি রেণুস্থলী থেকে নির্গত হয়ে সন্তরণ ও বিশ্রাম দশার পর অঙ্গজ দেহ গঠনের পরিবর্তে দ্বি-ফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট বৃক্কাকৃতি চলরেণু সৃষ্টি করে। এই বৃক্কাকৃতি রেণুগুলি সন্তরণ ও বিশ্রম দশার পর অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে। এরূপ ক্ষেত্রে দুটি সন্তরণ দশা থাকার ঘটনাটিকে ডাইপ্ল্যানেটিস্‌ম (Diplanctism) বলা হয় (উদাহরণ—স্যাপ্রোলেগনিয়া) (চিত্র 2.6), এক্ষেত্রে ন্যাসপাতি আকৃতির চলরেণুগুলিকে বলা হয় প্রাথমিক চলরেণু বা প্রাইমারী জুস্পোর (Primary zoospore) আর বৃক্কাকৃতি চলরেণুগুলিকে বলা হয় গৌণ চলরেণু বা সেকেন্ডারী জুস্পোর (Secondary zoospore)। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পলিপ্ল্যানেটিস্‌ম লক্ষ্য করা যায়— (উদাহরণ— *Dictyuchus* ডিকটিউকাস)। এক্ষেত্রে উৎপন্ন গৌণ চলরেণু সন্তরণ ও বিশ্রাম দশার পর অঙ্গজ দেহ গঠনের পরিবর্তে আবার বৃক্কাকৃতি চলরেণু উৎপন্ন করে এবং এই প্রক্রিয়া বেশ কয়েকবার চালিয়ে যেতে পারে ও পরিশেষে অঙ্গজ দেহ গঠন করে। কিন্তু বৃক্কাকৃতি দ্বিফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট রেণুগুলি সাধারণত যখন রেণুস্থলী থেকে সরাসরি উৎপন্ন হয়ে নির্গত হয় তখন স্বাভাবিক নিয়মে সন্তরণ ও বিশ্রম দশার পর নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে অর্থাৎ একক সন্তরণ দশা বা মনোপ্ল্যানেটিস্‌ম (Monoplanetism) প্রদর্শন করে (যেমন-ফাইটোফথোরা), (চিত্র 2.6)।

(b) অচলরেণু : এই রেণুগুলি ফ্ল্যাজেলাম বিহীন। অচল রেণু উৎপাদনকারী রেণুস্থলী গোলাকৃতি বা নলাকৃতি হতে পারে (চিত্র 2.7) নলাকৃতি রেণুস্থলী বা স্পোরানজিয়ামকে মেরোস্পোরানজিয়াম (Merosporangium) বলে (উদাহরণ — *Syncephalastrum,*, *সিনসেফাল্যাসট্রাম*) (চিত্র 2.7 c)। সাধারণত প্রতিটি রেণুস্থলীতে বহুসংখ্যক অচলরেণু উৎপন্ন হয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক রেণুও উৎপন্ন হয়। এরূপ স্বল্প সংখ্যক রেণুযুক্ত রেণুস্থলী বা স্পোরানজিয়ামকে স্পোরানজিওলাম (Sporangiolum) বলে (উদাহরণ- *Blakeslea trispora,* ব্ল্যাকেসলিয়া ট্রাইস্পোরা) (চিত্র 2.7 b)। অচল রেণুগুলি রেণুস্থলী হতে নিষ্ক্রান্ত হলে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।

2.3.2.2 স্পোরানজিয়াম - পরিবর্তিত - কনিজিওরেণু (চিত্র 2.8) :

কোন কোন ছত্রাকের ক্ষেত্রে (উদাহরণ-ফাইটোফথোরা) দেখা যায় যে রেণুস্থলী তার পরিবেশের তারতম্যের ভিত্তিতে ভিন্ন রূপে ব্যবহার করে। 12-15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও বাতাসে অধিক জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে উক্ত রেণুস্থলী চলরেণু উৎপন্ন করে। কিন্তু 18-24 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও বাতাসে কম জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে রেণুস্থলী সাধারণত চলরেণু উৎপন্ন না করে সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে, অর্থাৎ কনিডিওরেণুর ন্যায় ব্যবহার করে।

2.3.2.3 ক্ল্যামাইডোরেণু (চিত্র 2.9) :

ফাইকোমাইসিটিসের কোন কোন সদস্যে (উদাহরণ-মিউকর, পিথিয়াম) হাইফার অংশবিশেষ পুরু প্রাচীর যুক্ত হয়ে একপ্রকার রেণু উৎপন্ন করে একে ক্ল্যামাইডোরেণু বলে। এই রেণুর মধ্যে প্রচুর পরিমানে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু থাকে। পুরু প্রাচীর ও সঞ্চিত খাদ্যবস্তু থাকায় এই রেণুর মাধ্যমে ছত্রাক প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশে রেণুটি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।

অনুশীলনী - 2

নিচের তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(a) গেমা উৎপাদন ফাইকোমাইসিটিসের ________ জননে ঘটে।

(b) অযৌন জননে উৎপাদিত রেণুগুলি ________, ________ ও ________।

(c) একক ফ্ল্যাজেলামযুক্ত চলরেণুর ক্ষেত্রে টিনসেল ফ্ল্যাজেলাম থাকে রেণুর ________ দিকে এবং হুইপলাশ ফ্ল্যাজেলাম থাকে রেণুর ________ দিকে।

(d) দ্বি-ফ্ল্যাজেলামযুক্ত চলরেনু ________ আকৃতির ও ________ আকৃতির হয়।

(e) স্যাপ্রোলেগনিয়াতে দুইপ্রকার চলরেণু হল ________ চলরেণু এবং ________ চলরেণু। এর অযৌন জীবনচক্রে এই দুইপ্রকার চলরেণু উৎপন্ন হওয়ার ঘটনাকে বলা হয় ________।

(ক্ল্যামাইডোরেণু, অযৌন, অচলরেণু, সামনের, ডাইপ্ল্যানেটিসম, চলরেণু, পিছনের, বৃক্ক, প্রাথমিক, ন্যাসপাতি, যৌন)

2.3.3 যৌন জনন :

2.3.3.1 ফাইকোমাইসিটিসের সদস্যগুলি সহবাসী (Homothallic) অথবা ভিন্নবাসী (Heterothallic) হতে পারে। এই শ্রেণির সদস্যদের মধ্যে যৌন জনন প্রক্রিয়ায় নানা বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। কেউবা গ্যামেটের সাহায্যে আমরা কেউবা গ্যামেট্যাঞ্জিয়ামের সাহায্যে যৌন মিলন সম্পন্ন করে। নিচে বিভিন্ন প্রকার যৌন জনন পদ্ধতি বর্ণনা করা হল :

(a) গ্যামেটের মিলন বা গ্যামেটিক ইউনিয়ন (Gametic Union) (চিত্র 2.10) :

এক্ষেত্রে দুটি গ্যামেটের মধ্যে মিলনের মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন হয়। মিলনে অংশগ্রহণকারী গ্যামেটদ্বয় যদি সদৃশ হয় অর্থাৎ গঠনগতভাবে এক এবং দুটি গ্যামেটেই গমনে সক্ষম, এরূপ মিলনকে আইসোগ্যামী (Isogamy) বলে (যেমন সিনকিট্রিয়াম)। আবার মিলনে অংশগ্রহণকারী গ্যামেটদ্বয়ের একটি ছোটি ও অপরটি বড় এবং উভয়েই ফ্ল্যাজেলাম যুক্ত, অর্থাৎ গঠনগতভাবে অসম কিন্তু উভয়েরই গমনে সক্ষম গ্যামেটদ্বয়ের মিলনকে অ্যানাইসোগ্যামী (Anisogamy) বলে (উদাহরণ - *Allomyces, অ্যালোমাইসিস*)। মিলনে অংশগ্রহণকারী গ্যামেটদ্বয় যদি সম্পূর্ণরূপে বিসদৃশ হয় অর্থাৎ একটি ছোটি ও গমনে সক্ষম এবং অপরটি বড় ও গমনে অক্ষম, এরূপ মিলনকে উগ্যামী (Oogamy) বলে (উদাহরণ - *Monoblepherella, মেনোব্লেফেরেল্লা*)।

(b) গ্যামেট্যানজিয়াল কনট্যাক্ট (Gametangial contact) (চিত্র 2.11) :

এক্ষেত্রে দুটি গ্যামেট্যানজিয়াম সরাসরি যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করে। গ্যামেট্যানজিয়াম দুটির একটি পুরুষ বা অ্যানথেরিডিয়াম এবং অপরটি স্ত্রী বা উগোনিয়াম। উক্ত গ্যামেট্যানজিয়াম দুটি একে অপরকে স্পর্শ করে এবং নিষেক সম্পন্ন করে, নিষেক পরবর্তী পর্যায়েও গ্যামেট্যানজিয়াম দুটি তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখে।

অ্যানথেরিডিয়ামটি যখন উগোনিয়ামের সংস্পর্শে আসে তখন একটি নিষেখ নালিকা (Fertilization tube) উৎপন্ন করে যা উগোনিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করে ও অ্যানথেরিডিয়াম হতে পুং নিউক্লিয়াস বহন করে নিয়ে গিয়ে

উগোনিয়াম মধ্যস্থ ডিম্বানু বা উস্ফিয়ারকে নিষিক্ত করতে সাহায্য করে। যদিও এই সমস্ত ক্ষেত্রে সুগঠিত ডিম্বাণু উগোনিয়ামের মধ্যে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অ্যানথেরিডিয়ামের মধ্যে সুগঠিত পুং গ্যামেট উৎপন্ন হয় না। অ্যানথেরিডিয়াম মধ্যস্থ নিউক্লিয়াস পুংগ্যামেট হিসাবে কাজ করে। উগোনিয়ামের সাথে অ্যানথেরিডিয়ামের দু'প্রকার সজ্জা পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। *Pythium debaryanum (পিথিয়াম ডিব্যারিয়ানাম), Phytophyhora cactorum (ফাইটোফথোরা ক্যাকটোরাম).*ইত্যাদি ছত্রাকে অ্যানথেরিডিয়ামটি বর্ধিত হয়ে উগোনিয়ামের প্রাচীরে স্পর্শ করে, উগোনিয়ামের সাথে অ্যানথেরিডিয়ামের এরূপ সজ্জা পদ্ধতিকে প্যারাগাইনাস *(Paragynous)* সজ্জা পদ্ধতি বলে। আবার *Phytophthora infestans (ফাইটোফথোরা ইনফেসট্যান্স)* ইত্যাদি ছত্রাকে উগোনিয়াম উৎপাদনকারী হাইফা উৎপাদনশীল অ্যানথেরিডিয়ামকে ভেদ করে বেড়িয়ে আসে এবং এরপর ফুলে ওঠে ও গোলাকৃতি ধারণ করে। অ্যানথেরিডিয়ামটি তখন উগোনিয়ামের নিচে কলারের ন্যায় অবস্থান করে। অ্যানথেরিডিয়ামের এরূপ সজ্জা পদ্ধতিকে অ্যাম্ফিগাইনাস *(Amphigynous)* সজ্জা পদ্ধতি বলে।

(c) গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশন (Gametangial copulation) (চিত্র 2.12) :

এক্ষেত্রে যৌন মিলনে অংশগ্রহণকারী দুটি গ্যামেটানজিয়াম নিষেক পরবর্তী পর্যায়ে তাদের পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। গ্যামেটানজিয়াম দুটি সদৃশ (যেমন *মিউকর Mucor*) বা অসম (*Zygorhynchus heterogamus, জাইগরহিংকাস হেটারোগ্যামাস*) হতে পারে। গ্যামেট্যানজিয়ামগুলিকে কোন সুগঠিত গ্যামেট তৈরি হয় না, গ্যামেটগুলির কাজ নিউক্লিয়াস করে। গ্যামেট্যানজিয়াম দুটির (সদৃশ বা অসম) মিলনে উৎপন্ন ডইগোটকে জাইগোস্পের বলা হয়।

2.3.3.2 উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার যৌন জনন পদ্ধতিতে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে গ্যামেটিক ইউনিয়নে সুগঠিত গ্যামেট উপস্থিত এবং যৌন মিলনে উক্ত গ্যামেটগুলি অংশগ্রহণ করছে। গ্যামেট্যান্‌জিয়াল কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে দুটি গ্যামেট্যানজিয়াম সরাসরি যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে এবং দুটি গ্যামেট্যানজিয়ামের একটিতে (স্ত্রী) সুগঠিত গ্যামেট উৎপন্ন হলেও অপরটিতে (পুং) নিউক্লিয়াস গ্যামেটের কাজ করছে। আবার গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশনের ক্ষেত্রে যৌন মিলনে অংশগ্রহণকারী দুটি গ্যামেট্যানজিয়ামের কোনটিতেই সুগঠিত গ্যামেট উৎপন্ন হয় না, উভয় গ্যামেট্যানজিয়ামেই নিউক্লিয়াসগুলি গ্যামেটের প্রতিনিধিত্ব করছে। কাজেই গ্যামেটিক ইউনিয়ন থেকে শুরু করে গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশনের দিকে অগ্রসর হলে আপনারা ক্রমান্বয়ে চাক্ষুস যৌনতার অবলুপ্তি (Degeneration of visible sexuality) দেখতে পাচ্ছেন। ছত্রাক তার ক্রমবিবর্তনে এই ধারাই ধরে রেখেছে।

2.4 জীবনচক্র

ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির অযৌন জীবনচক্রে দেখা যায় থ্যালাস দেহ সাধারণত সামগিক ভাবে (হলোকার্পিক সদস্যের ক্ষেত্রে) অথবা আংশিকভাবে (ইউকার্পিক সদস্যের ক্ষেত্রে) রেণুস্থলী বা স্পোরান্‌জিয়ামে পরিবর্তিত হয় এবং উক্ত রেণুস্থলী থেকে রেণু নির্গত হয়ে অঙ্কুরিত হয় ও নতুন থ্যালাস দেহ অর্থাৎ মাইসীলিয়াম গঠন করে।

ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির যৌন জীবনচক্র অ্যাসকোমাইসিটিস ও বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির জীবনচক্রের তুলনায় সরল প্রকৃতির। ফাইকোমাইসিটিসের যৌন জীবনচক্রে কখনো দেখা যায় গ্যামেট্যানজিয়াম থেকে গ্যামেট উৎপন্ন হয়ে গ্যামেটিক ইউনিয়নের মাধ্যমে জাইগোট উৎপন্ন করে। আবার এও দেখা যায় গ্যামেট্যানজিয়ামগুলি সুগঠিত গ্যামেট উৎপন্ন না করে সরাসরি যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করে। মিলনের সময় প্লাজমোগ্যামীর ফলে

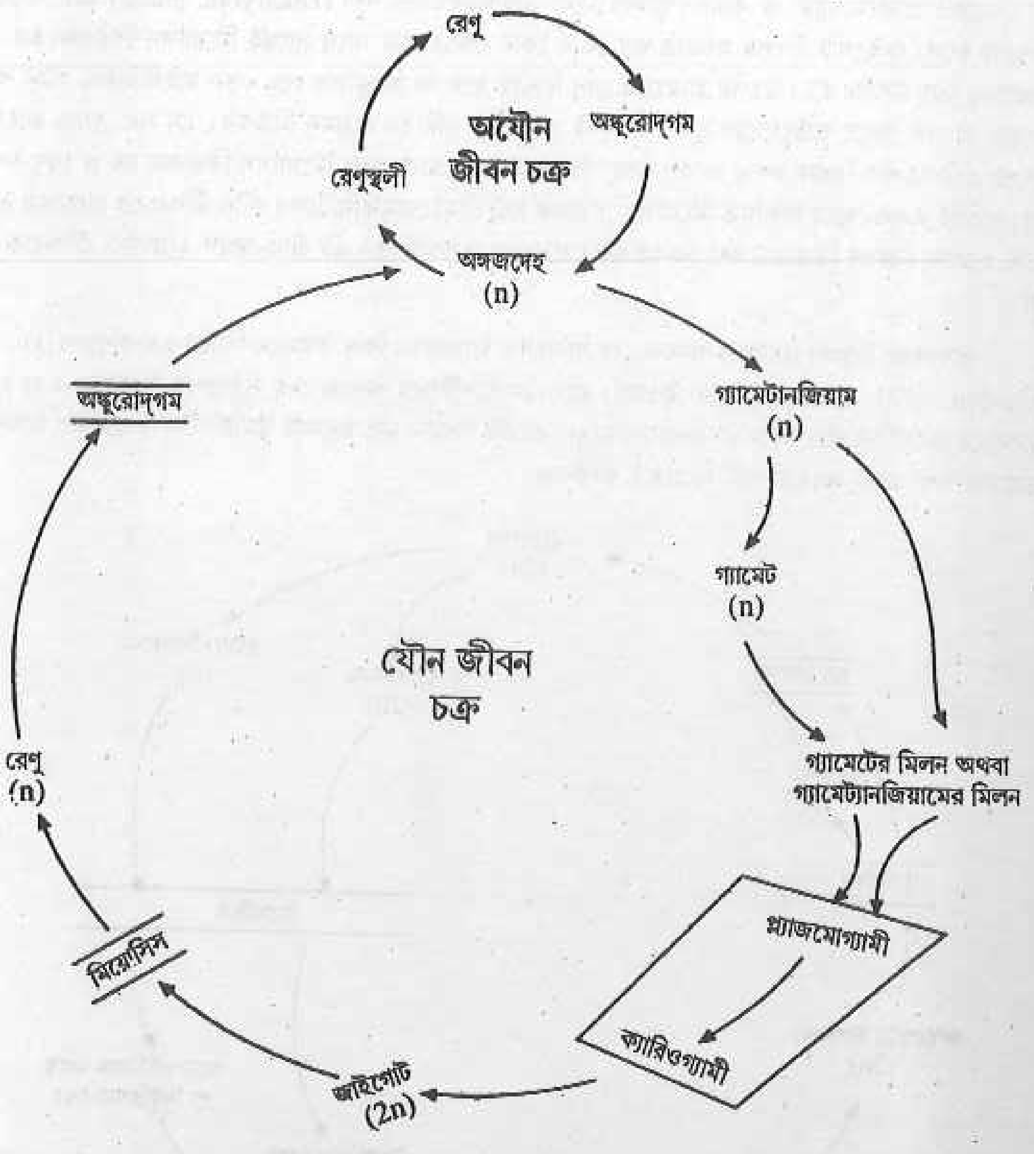

ফাইকোমাইসিটিসের সাধারণ জীবনচক্র (শব্দ ভিত্তিক)

কম্প্যাটিবল্ নিউক্লিয়াসগুলি পরস্পরের কাছে আসার প্রায় সাথে সাথেই ক্যারিওগ্যামী সম্পন্ন হয় ও জাইগোট উৎপন্ন হয়। কাজেই প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর মধ্যে ডাইক্যারিওটিক দশা (Dikaryotic phase) প্রায় থাকে না বললেই চলে। জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার পর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় সাথে সাথেই মিয়োসিস বিভাজন হয় এবং হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হ্যাপ্লয়েড রেণু নিষ্ক্রান্ত হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে। আবার যে সব ক্ষেত্রে জাইগোটের চারদিকে খুবই পুরুপ্রাচীর সৃষ্টি হয় (যেমন মিউকর), সে সব ক্ষেত্রে জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার পর বিশ্রাম দশায় প্রবেশ করে। বিশ্রাম দশা অতিক্রান্ত হলে মিয়োসিস বিভাজন হয় ও রেণু উৎপন্ন হয়। কাজেই এসব ক্ষেত্রে বিলম্বিত মিয়োসিস বিভাজন ঘটে। ফাইকোমাইসিটিসের যৌন জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড দশাটি প্রকট হওয়ায় (কারণ ডিপ্লয়েড দশা কেবল জাইগোট দ্বারা উপস্থাপিত) এই জীবনচক্রকে হ্যাপ্লয়েড জীবনচক্র বলা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ছত্রাকের অঙ্গজ দেহ সাধারণত হ্যাপ্লয়েড। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ছত্রাকবিদের (Dick & Win-Tin, 1973; Webster, 1980 ইত্যাদি) মতে উমাইসিটিসের অঙ্গজ দেহ সাধারণত ডিপ্লয়েড এবং এদের জীবনচক্রে মিয়োসিস ঘটে গ্যামেট্যানজিয়ামের মধ্যে। কাজেই বর্তমান মত অনুযায়ী উমাইসিটিস উপশ্রেণির জীবনচক্রে ডিপ্লয়েড দশা প্রকট হওয়ার এটি ডিপ্লয়েড জীবনচক্র।

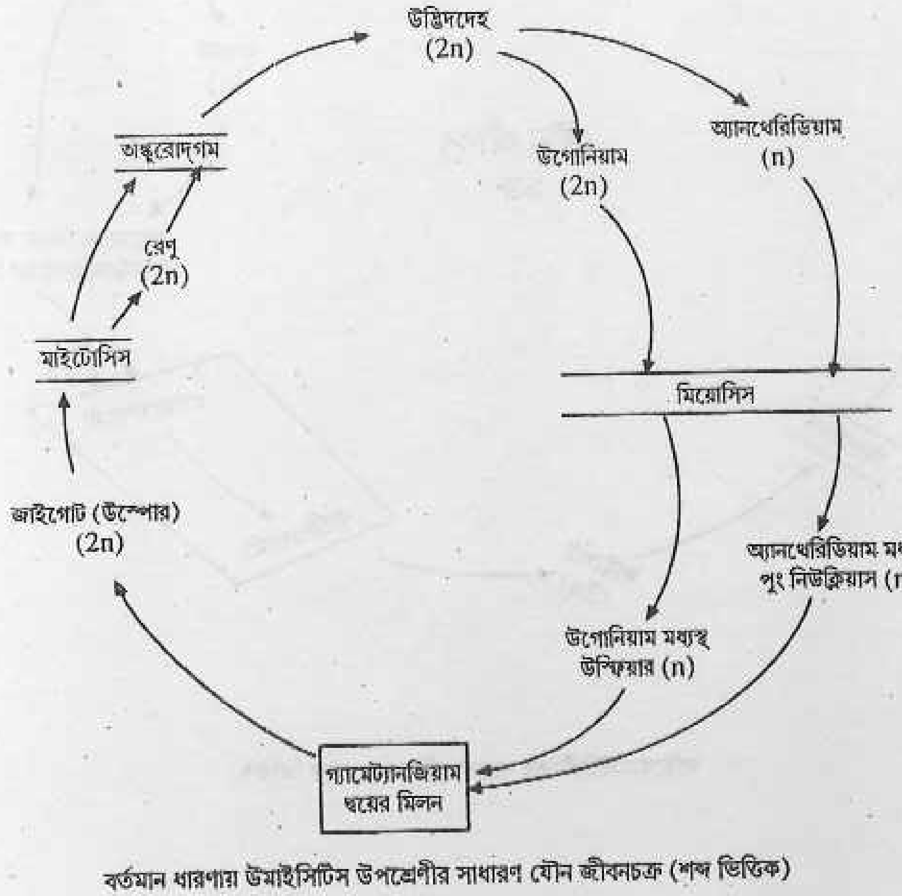

বর্তমান ধারণায় উমাইসিটিস উপশ্রেণীর সাধারণ যৌন জীবনচক্র (শব্দ ভিত্তিক)

2.5 শ্রেণিবিন্যাস :

ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণিটিকে মূলতঃ গুইন-ভাউগান ও বার্নেস (1927) (Gwynne-Vaughan and Barnes) প্রদত্ত শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে : —

ফাইকোমাইসিটিস (শ্রেণি)

মাইসীলিয়াম অনুপস্থিত বা প্রাথমিক পর্যায়ের

↓

উপশ্রেণি I আর্কিমাইসিটিস (Archimycetes)
(ছত্রাকের দেহ বা থ্যালাস একটিমাত্র বৃহৎ কোশদ্বারা গঠিত)
(উদাহরণ - *Synchytrium endobioticum*, *(সিনকিট্রিয়াম এন্ডোবায়োটিকাম)*, *Olpidium (ওলপিডিয়াম)* ইত্যাদি)

মাইসীলিয়াম সুগঠিত

যৌন জননে উস্পোর (Oospore) উৎপন্ন হয়; অন্যান্য রেণু সাধারণত সচল রেণু

↓

উপশ্রেণি II উমাইসিটিস (Oomycetes)
(ছত্রাকের দেহ বা থ্যালাস সু-পরিস্ফুটিত মাইসীলিয়াম দ্বারা গঠিত; জনন কোশাধারীর স্পর্শ বা গ্যামেট্যানজিয়াল কনট্যাক্ট প্রক্রিয়ায় যৌনজনন ঘটে থাকে) (উদাহরণ - *Phytophthora infestans (ফাইটোফথোরা ইনফেস্টান্স)*, *Pythium (পিথিয়াম)* ইত্যাদি।)

যৌন জননে জাইগোস্পোর (Zygospore) উৎপন্ন হয়; কেবলমাত্র অচল রেণু সৃষ্টি হয়

↓

উপশ্রেণি III জাইগোমাইসিটিস (Zygomycetes)
(ছত্রাকের দেহ বা থ্যালাস সুগঠিত মাইসীলাম দ্বারা গঠিত; জনন কোশাধারীর মিলনের দ্বারা গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউডউলেশন যৌন জনন ঘটে থাকে)
(উদাহরণ- *Rhizopus nigricans (রাইজোপাস নিগ্রিকানস)*, *Pilobolus (পাইলোবোলাস)* ইত্যাদি

অনুশীলনী - 3

নিচের তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(a) ফাইকোমাইসিটিসের যৌনজনন পদ্ধতি তিন প্রকার এগুলি হল ________, ________ ও ________।

(b) গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে অ্যানথেরিডিয়াম যে নালিকার ভিতর দিয়ে পুং নিউক্লিয়াস উগোনিয়ামের মধ্যে পাঠায় তাকে ________ নালিকা বলে।

(c) ফাইটোফথোরা ইনফেস্টান্সে অ্যানথেরিডিয়ামের সজ্জা পদ্ধতি ________ কিন্তু পিথিয়াম ডিব্যারিয়ানামে অ্যানথেরিডিয়ামের সজ্জপদ্ধতি ________।

(d) উমাইসিটিস উপশ্রেণিতে যৌন জননে উৎপন্ন জাইগোটকে ________ বলে এবং জাইগোমাইসিটিস উপশ্রেণিতে উৎপন্ন জাইগোটকে ________ বলে।

(e) বর্তমান ধারনায় উমাইসিটিস উপশ্রেণিতে ________ জীবনচক্র দেখা যায় এবং মিয়োসিস ________ এ ঘটে। জাইমাইসিটিস উপশ্রেণিতে ________ জীবনচক্র দেখা যায় এবং মিয়োসিস ________ এ ঘটে।

(f) ফাইকোমাইসিটিসের যৌন জীবনচক্রে ________ দশা অনুপস্থিত।

(নিষেক, গ্যামেটিক ইউনিয়ন, উস্পোর, অ্যাম্ফিগাইনাস, গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্ট, ডিপ্লয়েড, হ্যাপ্লয়েড, ডাইক্যারিওটি, জাইগোস্পোর, গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশন, জাইগোট, গ্যামেট্যানজিয়াম, প্যারাগাইনাস)

2.6 সারাংশ :

এই এককটি পড়ে এখন আপনারা ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরতে পারছেন। আপনারা বলতে পারছেন

- ফাইকোমাইসিটি শ্রেণির ছত্রাক জলবাসী অথবা স্থলবাসী হতে পারে। এরা পরজীবী, মৃতজীবী অথবা মিথোজীবী হিসাবে জীবন ধারণ করতে পারে।
- ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন ছত্রাকের বেশিরভাগই রোগ উৎপাদনকারী। এরা উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তবে উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী প্রজাতির সংখ্যাই বেশি। উপকারী ছত্রাকের মধ্যে রয়েছে মাইকোরহিজা উৎপাদনকারী সদস্য, জৈব অম্ল উৎপাদনকারী সদস্য ইত্যাদি।
- ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণিটি আদি পর্যায়ের। এই শ্রেণিটির মধ্যে গঠনগতভাবে আদি পর্যায়ের ছত্রাক এককোশী, এক নিউক্লিয়াসযুক্ত ও হলোকার্পিক। উন্নত ছত্রাকগুলি সিনোসাইটিক মাইসীলিয়াম যুক্ত এবং এগুলি প্রচুর শাখা প্রশাখা যুক্ত, বিস্তৃত ও ইউকার্পিক। অন্তবর্তী পর্যায়ের ছত্রাকগুলি স্বল্প মাইসীলিয়াম বিশিষ্ট ও সিনোসাইটিক। ছত্রাকের কোশপ্রাচীর যদিও সাধারণত কাইটিন নির্মিত, উমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাকের কোশপ্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত।
- ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করতে পারে।
- অঙ্গজ জনন মাইসীলিয়ামের খণ্ডাংশের মাধ্যমে ও গেমার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

- অযৌন জনন চলরেণু, অচলরেণু ও ক্ল্যামাইডোরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। চলরেণু ও অচলরেণু সাধারণত রেণুস্থলী বা স্পোরানজিয়ামের মধ্যে উৎপন্ন হয়। চলরেণু এক ফ্ল্যাজেলা বা দ্বি-ফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট হয়।
- যৌন জনন গ্যামেটিক ইউনিয়ন, গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্ট ও গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশন-এই তিনপ্রকার প্রক্রিয়ায় ঘটে। আদি পর্যায়ের ছত্রাকের ক্ষেত্রে যৌন জননে সুগঠিত গ্যামেটগুলি অংশগ্রহণ করে। কিন্তু উন্নত ছত্রাকের ক্ষেত্রে সুগঠিত গ্যামেট অনুপস্থিত এবং গ্যামেটের কাজ গ্যামেট্যানজিয়াম মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসগুলি করে। এই ভাবে ঘটেছে ছত্রাকের বিবর্তনের চাক্ষুস যৌনতার ক্রমাবিলুপ্তি।
- ফাইকোমাইসিটিসের সদস্যদের মধ্যে যেমন রয়েছে হ্যাপ্লয়েড যৌন জীবনচক্র তেমনি রয়েছে ডিপ্লয়েড যৌন জীবনচক্র। হ্যাপ্লয়েড যৌন জীবনচক্রে মিয়োসিস বিভাজন ঘটে জাইগোটে কিন্তু ডিপ্লয়েড যৌন জীবনচক্রে মিয়োসিস বিভাজন ঘটে গ্যামেট্যানজিয়ামে।
- ফাইকোমাইসিটিসকে সুগঠিত মাইসীলিয়ামের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির বিচারে এবং যৌন জননে উৎপন রেণু (স্পোর) উস্পোর বা জাইগোস্পোরের ভিত্তিতে তিনটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে—আর্কিমাইসিটিস, উমাইসিটিস ও জাইগোমাইসিটিস।

2.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) ডাইপ্ল্যানেটিসম ও পলিপ্ল্যানেটিসম কি? একটি করে উদাহরণ দিন।

(b) ফাইকোমাইসিটিসে কয় প্রকার অঙ্গজ দেহ দেখা যায় এবং কি কি?

(c) অ্যানথেরিডিয়ামের প্যারাগাইনাস ও অম্ফিগাইনাস সজ্জ প্রধতি বলতে কি বুঝায়? উদাহরণ সহ উল্লেখ করুন।

(d) বাধ্যতামূলক পরজীবী ও স্বেচ্ছামূলক মৃতজীবী ফাইকোমাইসিটিসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

2. ফাইকোমাইসিটিস ছত্রাকের বিভিন্ন প্রকার অযৌন জনন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।
3. ফাইকোমাইসিটিসের বিভিন্ন প্রকার যৌন জনন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।
4. 'চাক্ষুস যৌনতার অবলুপ্তি' এই উক্তিটির যথার্থতা ফাইকোমাইসিটিসের বিভিন্ন প্রকার যৌন জননের ভিত্তিতে বুঝিয়ে বলুন।
5. নিচের উপশ্রেণিগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও একটি করে সদস্যের নাম প্রদত্ত তালিকায় উল্লেখ করুনঃ

উপশ্রেণির নাম	গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য	সদস্যের নাম
আর্কিমাইসিটিস		
উমাইসিটিস		
জাইগোমাইসিটিস		

6. ফাইকোমাইসিটিসের সাধারণ জীবনচক্র অঙ্কন করুন (শব্দ ভিত্তিক) এবং বর্তমান ধারনায় উমাইসিটিস উপশ্রেণির যৌন জীবন চক্রটি অঙ্কন করুন (শব্দ ভিত্তিক)।

7. ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

2.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

a) জল, স্থল; b) জল, পর স্থল, পর; c) বিলম্বিত ধ্বসা;

d) হলোকার্পিক, ইউকার্পিক; e) সেললোজ; f) ছিদ্র।

অনুশীলনী - 2

a) অঙ্গজ, b) চলরেণু, অচলরেণু ও ক্ল্যামাইডোরেণু;

c) সামনের, পিছনের; d) ন্যাসপাতি, বৃক্ক; e) প্রাথমিক, গৌণ, ডাইপ্ল্যানেটিসম।

অনুশীলনী - 3

a) গ্যামেটিক ইউনিয়ন, গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্ট, গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশন; b) নিষেক,

c) অ্যাম্ফিগাইনাস, প্যারাগাইনাস; d) উস্পোর, জাইগোস্পোর; e) ডিপ্লয়েড, গ্যামেট্যানজিয়াম, হ্যাপ্লয়েড, জাইগোট; f) ডাইক্যারিওটিক।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. a) উমাইসিটিস উপশ্রেণিতে সাধারণত দেখা যায় যে রেণুস্থলী হতে নির্গত চলরেণু কিছু সময় সন্তরণের পর ফ্ল্যাজেলা খসিয়ে ফেলে ও বিশ্রাম দশায় প্রবেশ করে। বিশ্রাম দশা অতিক্রান্ত হলে নতুন অঙ্গজ দেহ গঠন করে। এক্ষেত্রে অযৌন জীবনচক্রে একটি মাত্র সন্তরণ দশা থাকায় একে মনোপ্ল্যানেটিসম বলে। কিন্তু কোন কোন ছত্রাকে রেণুস্থলী হতে নির্গত ন্যাসপাতি আকৃতির দ্বি-ফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট প্রাথমিক রেণু সন্তরণ ও বিশ্রাম দশার পর অঙ্গজ দেহ গঠনের পরিবর্তে দ্বি-ফ্ল্যাজেলা বিশিষ্ট বৃক্কাকৃতি চলরেণু (গৌণ চলরেণু) সৃষ্টি করে। এই বৃক্কাকৃতি রেণুগুলি সন্তরণ ও বিশ্রাম দশার পর অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে। এরূপ ক্ষেত্রে দুটি সন্তরণ দশা থাকায় ঘটনাটিকে ডাইপ্ল্যানেটিসম বলে। উদাহরণ - স্যাপ্রোলেগনিয়া।

পলিপ্ল্যানেটিসমের ক্ষেত্রে উৎপন্ন বৃক্কাকৃতি গৌণ চলরেণু সন্তরণ ও বিশ্রাম দশার পর অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্গজ দেহ গঠনের পরিবর্তে পুনরায় বৃক্কাকৃতি চলরেণু সৃষ্টি করে এবং এই প্রক্রিয়া বেশ কয়েকবার চালিয়ে যেতে পারে এবং পরিশেষে অঙ্গজ দেহ সৃষ্টি হয়। কাজেই এক্ষেত্রে অযৌন জীবনচক্রে দু'য়ের অধিকবার সন্তরণ দশা পরিলক্ষিত হয়, উদাহরণ - ডিকটিউকাস।

b) 2.2.3 অনুচ্ছেদ দেখুন।

c) 2.3.3, (b) অনুচ্ছেদ দেখুন।

d) বাধ্যতামূলক পরজীবী ফাইকোমাইসিটিস : —

ফাইকোমাইসিটিসের এই সদস্যগুলি কেবলমাত্র পরজীবী হিসাবেই বেঁচে থাকতে পারে। এই ছত্রাকগুলি পোষক কলায় প্রবেশের ক্ষেত্রে পোষককে কম উত্যক্ত করার পারদর্শিতা দেখায় ও সাধারণত হস্টোরিয়ামের সাহায্যে পোষক কোশ হতে পুষ্টি পদার্থ শোষণ করে। উদাহরণ - পেরোনোস্পোরা।

স্বেচ্ছামূলক মৃতজীবী ফাইকোমাইসিটিস : —

ফাইকোমাইসিটিসের এই সদস্যগুলি পরজীবী হিসাবেই সাধারণত বেঁচে থাকে তবে প্রয়োজনে মৃতজীবী হিসাবেও জীবন ধারণ করতে পারে। এই সমস্ত ছত্রাক পোষকের মধ্যে থাকাকালীন পোষক কলাকে যথেচ্ছভাবে বিনষ্ট করে ও পোষকের মৃত্যু ঘটলে তাতে মৃতজীবী হিসাবেও বসবাস করে।

উদাহরণ - ফাইটোফথোরা ইনফেসট্যান্স।

2) 2.3.2 অনুচ্ছেদ দেখুন।

3) 2.3.3.1 অনুচ্ছেদ দেখুন।

4) 2.3.3.2 অনুচ্ছেদ দেখুন।

5) 2.5 অনুচ্ছেদ দেখুন।

6) 2.4 অনুচ্ছেদ দেখুন।

7) 2.6 অনুচ্ছেদ দেখুন।

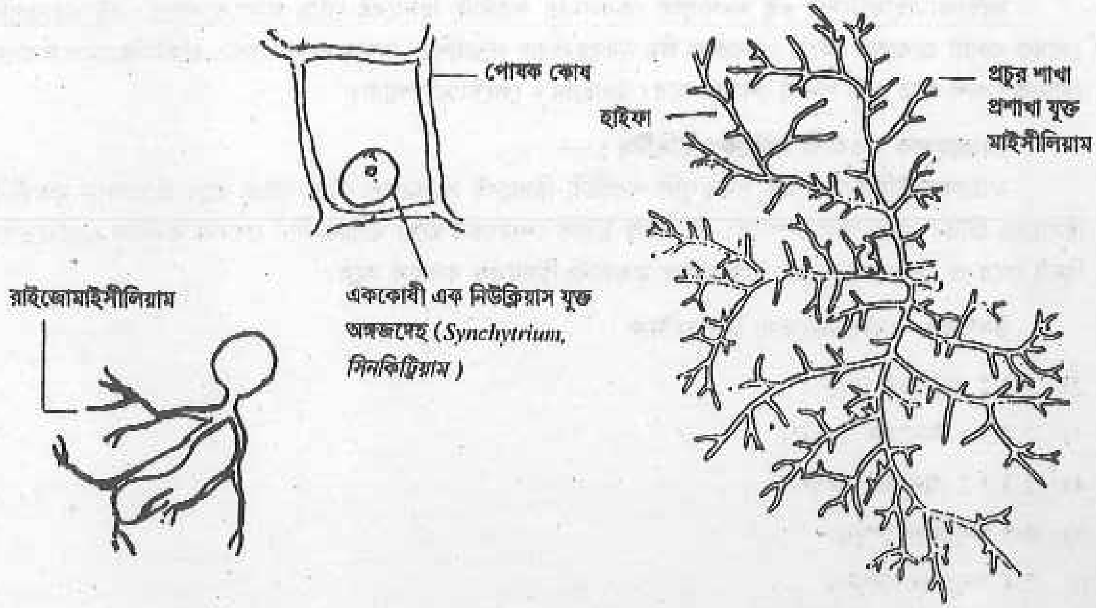

চিত্র নং 2.1

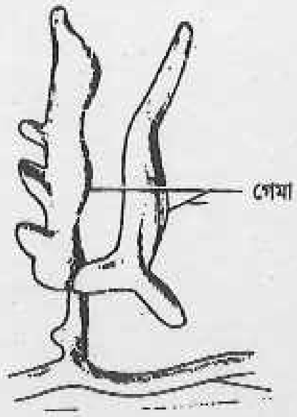

চিত্র নং 2.2

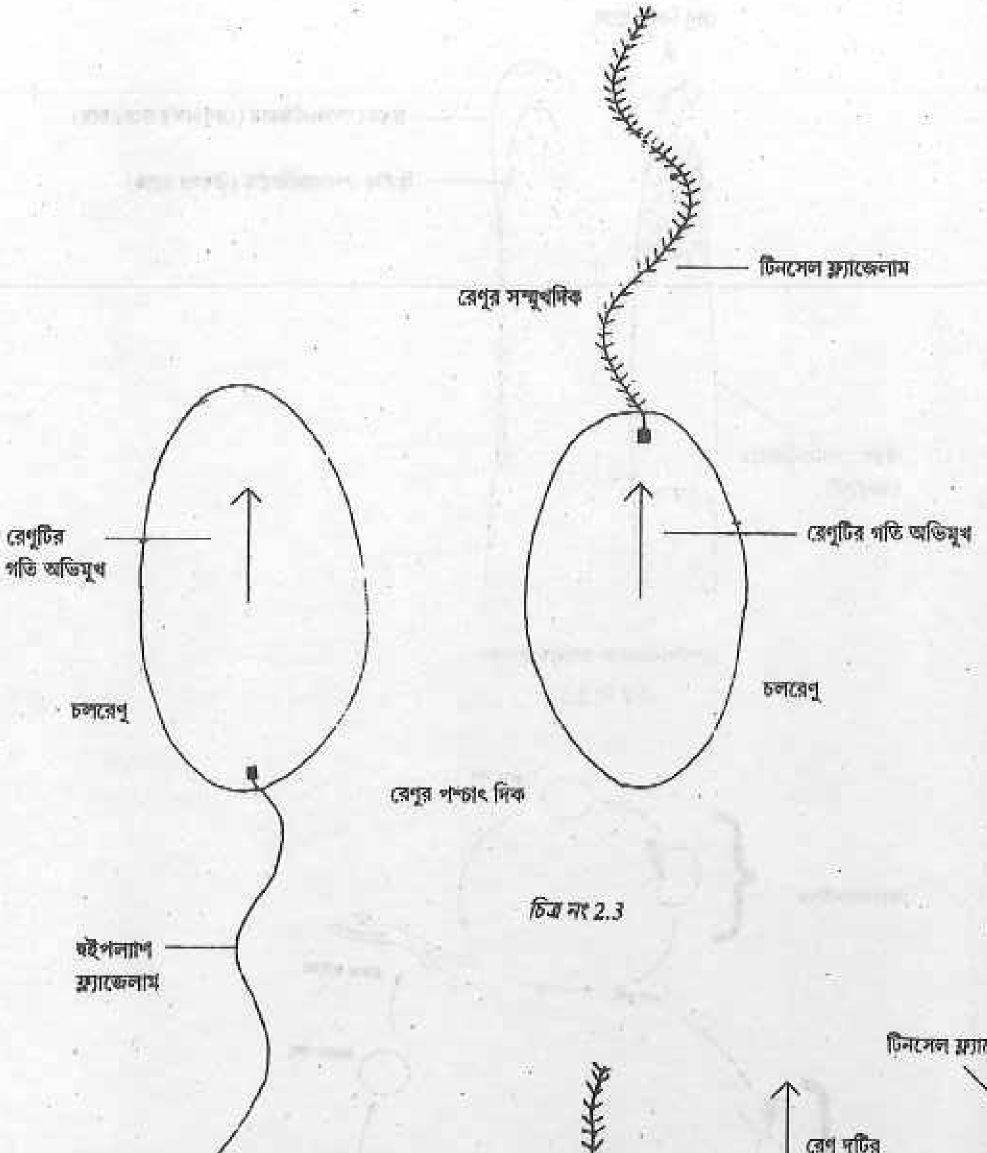

চিত্র নং 2.3

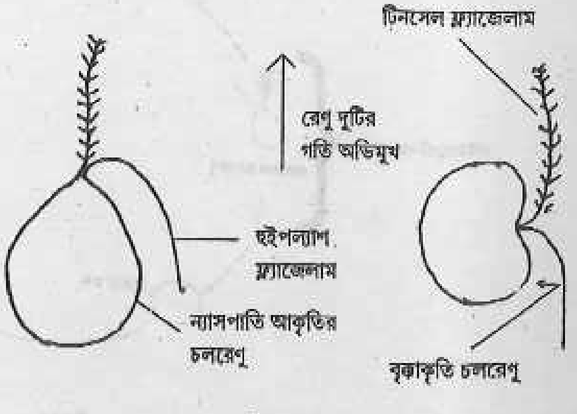

চিত্র নং 2.4

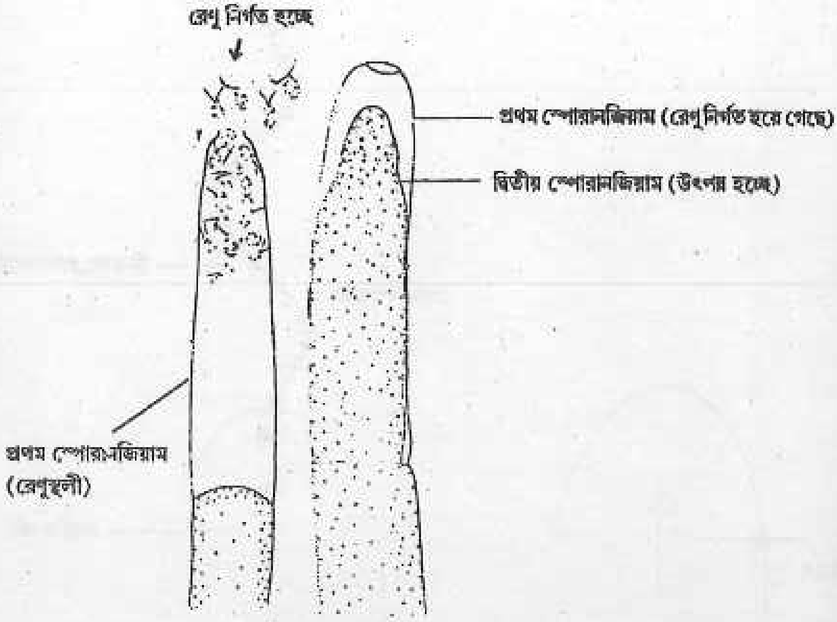

স্পোরানজিয়াল প্রালিফ্যারেশন

চিত্র নং 2.5

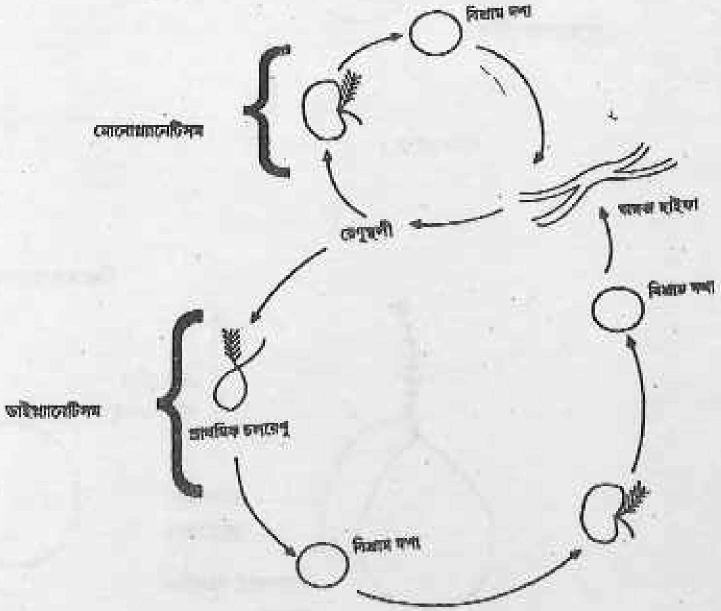

চিত্র 2.6

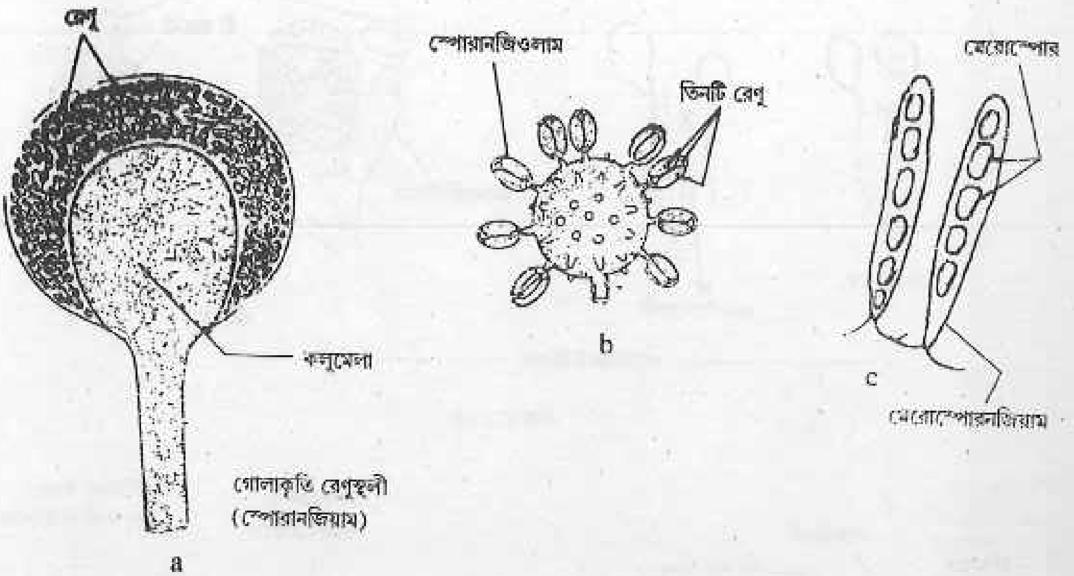

চিত্র নং 2.7

চিত্র নং 2.8

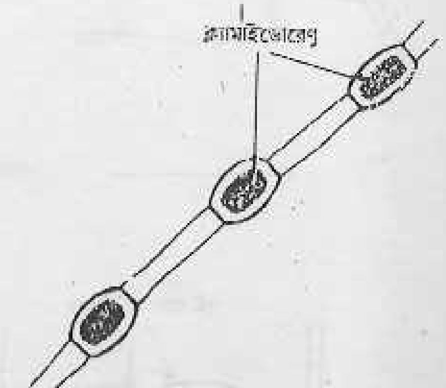

চিত্র নং 2.9

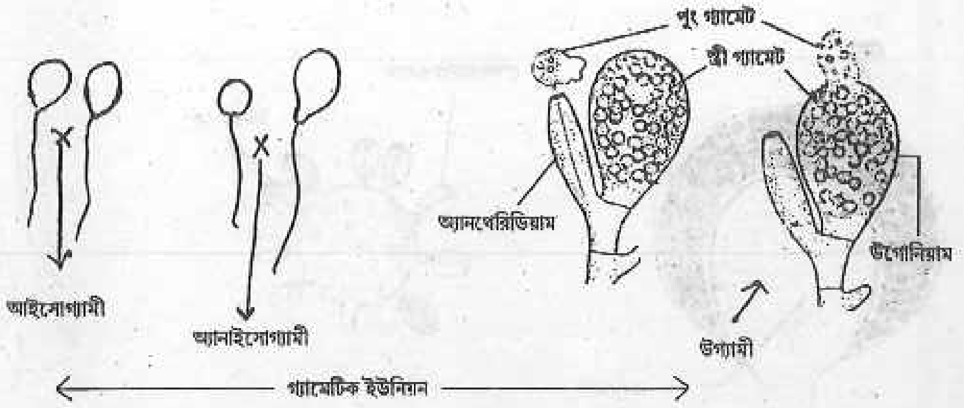

চিত্র নং 2.10

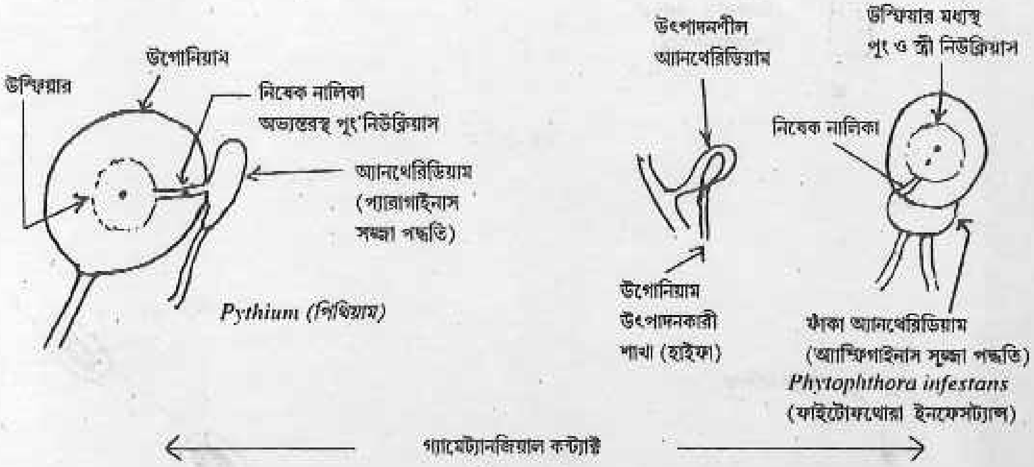

চিত্র নং 2.11

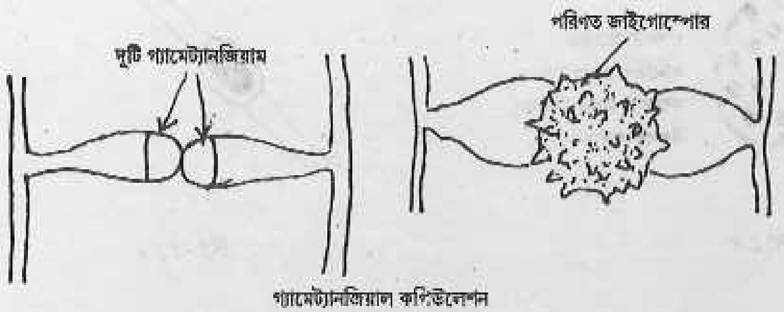

চিত্র নং 2.12

একক 3 ❐ অ্যাসকোমাইসিটিস (Ascomycetes)

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

3.2 প্রাকৃতিক অবস্থান,

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

অঙ্গজ গঠন

3.3 অযৌন জনন

3.4 যৌন জনন

3.5 ফলদেহ (অ্যাসকোকার্প)

3.6 জীবন চক্র

3.7 শ্রেণিবিন্যাস

3.8 সারাংশ

3.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

3.10 উত্তরমালা

3.1 প্রস্তাবনা

আপনারা ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী এককগুলি থেকে জানতে পেরেছেন ছত্রাক দেহ মাইসীলিয়াম বিহীন অথবা মাইসীলিয়ামযুক্ত হতে পারে। মাইসীলিয়াম দেহ ব্যবধায়ক বা বিভেদপ্রাচীর বিহীন (সিনোসাইটিক, Coenocytic), অথবা বিভেদ-প্রাচীর যুক্ত হতে পারে। অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিতে ছত্রাক সাধারণত বিভেদ-প্রাচীর যুক্ত মাইসীলিয়াম বিশিষ্ট দেহ। আপনারা পূর্ববর্তী একক থেকে এও জানতে পেরেছেন যে ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণিতে যৌন জননে উৎপন্ন রেণু (স্পোর) জাইগোস্পোর (2n) অথবা উস্পোর (2n)। এছাড়া আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ঐ শ্রেণিতে ফলদেহ বা ফ্রুটবডি অথবা ফ্রাক্টিফিকেশান (fruit-body or fructification) উৎপাদনের কোন উল্লেখ নেই অর্থাৎ ঐ শ্রেণিতে সাধারণত ফলদেহ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিতে যৌন রেণু হল এক বিশেষ হ্যাপ্লয়েড অ্যাসকোরেণু (n) বা অ্যাসকোস্পোর (Ascospore) যা অ্যাসকাসের মধ্যেও গঠিত হয়। অ্যাসকাস হল একপ্রকার থলিবিশেষ (Saclike structure)। এইজন্য অ্যাসকোমাইসিটিসকে বলা হয় থলি ছত্রাক বা স্যাক ফাঙ্গাস (Sac fungus)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসমস্ত অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু সুনির্দিষ্ট ফলদেহের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এছাড়াও অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিটিতে রয়েছে ছত্রাকের অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় সবচেয়ে বেশি প্রজাতি অর্থাৎ এটি ছত্রাকের বৃহত্তম শ্রেণি। কাজেই বৈচিত্রপূর্ণ ও ছত্রাকের বৃহত্তম এই শ্রেণিটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা খুবই প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য :

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনি—

- অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক কেমন পরিবেশে জন্মায়, এদের অপকারী এবং উপকারী ভূমিকা কিরূপ ও সেইসঙ্গে এদের অঙ্গজ দেহের বৈচিত্র, এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেইমটি কিভাবে বংশবৃদ্ধি করে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- অ্যাসকাস এবং অ্যাসকেরেণু, যাদের সাহায্যে এই শ্রেণিটিকে সহজেই চেনা যায়, তাদের উৎপাদন পদ্ধতি-এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অ্যাসকোমইসিটিস-এর বিভিন্ন রকম ফলদেহ, যা এই শ্রেণিটির আর এক সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য, তাদের গঠন-এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শ্রেণিটির জীবনচক্রের বৈচিত্র্য এবং সেই সঙ্গে ফাইকোমাইসিটিস-এর তুলনায় এই শ্রেণিটিকে উন্নত ভাবার কারণ নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন।
- শ্রেণিটিকে কোন কোন উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তা করা হয়েছে তা সহজেই নির্ধারণ করতে পারবেন।

3.2 অবস্থান, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও অঙ্গজ গঠন

3.2.1 অবস্থান :

অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক কেউ বা জলবাসী আবার কেউবা স্থলবাসী। জলবাসী ছত্রাকেরা মিষ্টি জলে জন্মাতে পারে (যেমন *Massarina aquatica, ম্যাসারিনা অ্যাকুয়াটিকা*) অথবা সামুদ্রিক (*Phyllochorella oceanica*, ফাইলোকোরেলা ওসিয়ানিকা। জলবাসী হোক বা স্থলবাসী হোক উভয়ক্ষেত্রেই মৃতজীবী অথবা পরজীবী সদস্য দেখা যায়। মৃতজীবী ছত্রাক উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর দেহাবশেষ এবং পরজীবী ছত্রাক উদ্ভিদ ও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণীর এমনকি মানুষের দেহে জন্মায় ও রোগ সৃষ্টি করে। কোন কোন মৃতজীবী ছত্রাক মাটির নীচে জন্মায় ও বৃদ্ধি পায়, এদেরকে হাইপোজিয়ান (Hypogean) ছত্রাক বলে (যেমন - *Tuber melanosporum, টিউবার মেলানোস্পোরাম*), কেবলমাত্র প্রাণীর গোবর বা বিষ্ঠার (dung or excreta) উপর জন্মায় যে ছত্রাকগুলি তাদেরকে কপ্রোফাইলাস (Coprophilous) ছত্রাক বলে (যেমন - *Ascobolus, এ্যাসকোবোলাস*; *Peziza পিজাইজা* ইত্যাদি) । পরজীবী ছত্রাকগুলি সাধারণত অন্তঃপরজীবী (endoparasite) অর্থাৎ পোষকের কলাভ্যন্তরে বর্ধিত হয়, আবার কিছু ছত্রাক বহিঃপরজীবী (ectoparasite) অর্থাৎ পোষকের গাত্রতলে জন্মায় ও বৃদ্ধি পায় (উদাহরণ - *Erysiphe, এরিসাইফি*)।

3.2.2 অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

আলোচ্য শ্রেণিটির অপকারী ও উপকারী উভয় বৈশিষ্টাই আছে।

অপকারী বৈশিষ্ট্য :

(i) *Aspergillus (অ্যাসপারজিলাস), Penicillium (পেনিসিলিয়াম)*, ইত্যাদি ছত্রাক বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট করে এবং চামড়াজাত দ্রব্যের ক্ষতিসাধন করে। *Chaetomium (কিটোমিয়াম)* বস্ত্র দ্রব্যাদির সেলুলোজ তন্তু বিনষ্ট করে।

(ii) বিভিন্ন উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে এই শ্রেণির ছত্রাক যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। যেমন *Protomyces microsporus (প্রোটোমাইসিস ম্যাক্রোস্পোরাস)* ঘটিত ধনে গাছের কান্ডের আব (gall) রোগ, *Taphrina deformans (ট্যাফরিনা ডিফরম্যান্স)* ঘটিত পীচ পাতার কুঞ্চন রোগ (Leaf curl) ইত্যাদি।

(iii) অনেক সদস্য আবার প্রাণীর এমনকি মানুষের রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী যেমন *Aspergillus fumigatus (অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগ্যাটাস)* ফুসফুসে অ্যাসপারজিলোসিস (Aspergillosis) নামক রোগ সৃষ্টি করে, *Gymnouscus (জিমনোঅ্যাসকাস)* দাদ রোগ সৃষ্টি করে।

(iv) *Claviceps purpurea (ক্ল্যাভিসেপ্স পারপিউরিয়া)* নামক ছত্রাক রাই গাছে এরগট (ergot) নামক রোগ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ফুলের ডিম্বাশয়গুলিকে নষ্ট করে স্কেলেরোশিয়াম (Sclerotium) নামক হাইফা নির্মিত এক বিশেষ গঠন সৃষ্টি করে। এই স্কেলেরোশিয়াম রাই শস্যের সাথে মিশে থাকে। স্কেলেরোশিয়ামে থাকে বিভিন্ন প্রকার অ্যালকালয়েড (alkaloid)। গৃহপালিত পশু বা মানুষের খাদ্যের সাথে এই স্কেলেরোশিয়াম দেহে প্রবেশ করলে এরগোটিসম্ (Ergotism) নামক মারাত্মক রোগ হয়, যার ফলস্বরূপ গ্যাংগ্রীন (Gangrene) বা পচন ঘা, অঙ্গ জত্যঙ্গ খসে পরা ও পরিশেষে মৃত্যু পর্যন্ত্য ঘটতে পারে।

উপকারী বৈশিষ্ট্য ঃ

i) ঈস্টের বা *Saccharomyces (স্যাকারোমাইসিসের)* বিভিন্ন প্রজাতি অ্যালকোহল প্রস্তুতিতে ও পাঁউরুটি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়; চীজ (Cheese) উৎপাদনে পেনিসিলিয়াম গুরুত্বপূণও ভূমিকা পালন করে - যেমন *P. roqueforti (পেনিসিলিয়াম রকেফরটি)*, ও *P. camemberti (পেনিসিলিয়াম ক্যামেম্বারটি)* প্রজাতি দুটি।

ii) বিভিন্নপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিক যেমন পেনিসিলিন, (Penicillin) [*Penicillium notatum (পেনিসিলিয়াম নোটেটাম), Penicillium chrysogenum (পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম)* কর্তৃক সৃষ্ট। গ্রিসিওফালভিন (Griseofulvin), (*P. griseofulvum, পেনিসিলিয়াম গ্রিসিওফালভাম)* ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্গত সদস্যগুলি সৃষ্টি করে।

iii) এই শ্রেণির ছত্রাক সাইট্রিক অ্যাসিড ও গ্লুকোনিক অ্যাসিড (*অ্যাসপারজিলাস নিগার, Aspergillus niger*) কোজিক অ্যাসিড, প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করে। ঈস্ট চূর্ণ পুষ্টিকর ও মূল্যবান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

iv) কোকো বিনকে (coco bean) সুগন্ধময় করে তুলতে ইস্টের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।

v) বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক (enzyme) প্রস্তুতিতে এই শ্রেণির ছত্রাকের গুরুত্ব আছে। *Aspergillus oryzae (অ্যাসপারজিলাস ওরাইজি)* দ্বারা উৎপন্ন করা হয় আলফা অ্যামাইলেজ (α-amylase) ও প্রোটিএজ (Protease) উৎসেচক। ঈষ্ট দ্বারা উৎপন্ন করা হয় ইনভারটেজ (invertase) উৎসেচক।

(vi) কিছু *Morchella sp. (মরচেলা প্রজাতি)* এবং কিছু *Tuber sp. (টিউবার প্রজাতি)* উচ্চ প্রশংসিত খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ - *Morchella conica (মরচেলা কণিকা)* ও *M. esculenta (মরচেলা এসকুলেনটা)*, *Tuber aestivum (টিউবার এসটিভাম)* ইত্যাদি।

(vii) ক্ল্যাভিসেপস পারফিউরিয়ার স্কেলেরোশিয়ামে বিভিন্ন প্রকার গুরুত্ব পূর্ণ অ্যালকালয়েড (যেমন এরগোমেট্রিন, এরগোটিনিন, এরগোট্যামাইন ইত্যাদি) থাকায় ইহা হতে প্রস্তুত ঔষধ শিশু প্রসবের পর রক্তপাত বন্ধ করতে, মাথার যন্ত্রণা প্রশমিত করতে ব্যবহৃত হয়।

(viii) হাইড্রোকার্বন, ঝোলা গুড়, আখের ছিবড়ে ইত্যাদি থেকে সিঙ্গল - সেল প্রোটিন (Single-cell protein) উৎপাদনে *Saccharomyces fragilis (স্যাকারোমাইসিস ফ্র্যাজিলিস)*, অ্যাসপারজিলাস প্রজাতির ছত্রাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

3.2.3 অঙ্গজ গঠন :

অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক সাধারণত বিভেদ প্রাচীর বা ব্যবধায়ক (septa) সমন্বিত প্রচুর শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট মাইসীলিয়াম দেহ। এই দেহগুলি ইউকার্পিক। এককোশী দেহও দেখা যায়, যেমন—বিভিন্ন প্রকারের (yeasts) ঈষ্ট। এই এককোশী দেহগুলি হলোকার্পিক এবং এইগুলি হ্যাপ্লয়েড বা ডিপ্লয়েড হতে পারে। এককোশী দেহগুলি একে অপরের সাথে লেগে থেকে অনেক সময় মেকী (false) মাইসীলিয়াম বা সিউডোমাইসীলিয়াম (Pseudomycelium) গঠন করে (চিত্র 3.1a)। এই শ্রেণির ছত্রাকের কোশ এক নিউক্লিয়াস অথবা একাধিক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হতে পারে। বিভেদ প্রাচীর একটি মাত্র কেন্দ্রীয় রন্ধ্রযুক্ত (চিত্র 3.1b)। এই রন্ধ্রের মাধ্যমে সং লগ্ন দুটি কোশের প্রোটোপ্লাজমের যোগসূত্র বজায় থাকে এবং মাইটোকনড্রিয়া, নিউক্লিয়াস, রাইবোসোম ইত্যাদি চলাচল করতে পারে। কোশপ্রাচীর প্রধানত কাইটিন নির্মিত। এছাড়া অ্যামিনো শর্করা, প্রোটিন, ম্যানোজ (Mannose) এবং গ্লুকোজ থাকে। কখনও কখনও হাইফাগুলি স্তূপিকৃত হয়ে একধরনের ছত্রাক-কলা (fungal tissue) গঠন করে। ছত্রাকের এই দেহ-কলাকে প্লেকটেনকাইমা (Plectenchyma) বলে।

অনুশীলনী - 1

নিচের তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

1) অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক ________ বাসী অথবা ________ বাসী হতে পারে। তারা ________ জীবী বা ________ জীবী হয়।

2) পরজীবী ছত্রাক পোষকের কলাভ্যন্তরে বর্ধিত হলে তাদেরকে ________ ও গাত্রতলে বর্ধিত হলে তাদেরকে ________ বলে।

3) মরচেল্লা এসকুলেনটা ________ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

4) ক্ল্যাভিসেপস পারপিউরিয়ার স্কেলেরোশিয়ামে থাকে বিভিন্নপ্রকার ________ এবং তারা একদিকে যেমন ________ অপরদিকে তেমন ________।

5) অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক ________ বা ________ যুক্ত ________ দেহ হতে পারে। বিভেদ প্রাচীরের কেন্দ্রে ________ মাত্র ________ থাকে।

6) স্কেলেরোশিয়াম হল ________ এর একপ্রকার পরিবর্তিত রূপ।

(পর, স্থল, অন্তঃপরজীবী, মাইসীলিয়াম, একটি, খাদ্য, অপকারী, জল, মৃত, অ্যালকালয়েড, একসোশী, ছিদ্র, বহিঃপরজীবী, উপকারী, বিভেদপ্রাচীর, হাইফা)

3.3 অযৌন জনন :

এই শ্রেণির ছত্রাক ফাইকোমাইসিটিসের ন্যায় অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন — এই তিন প্রকার জনন পদ্ধতি প্রদর্শন করে। অঙ্গজ জনন মাইসীলিয়ামের খণ্ডাংশের মাধ্যমে সম্পন হয়। কিন্তু অযৌন ও যৌন জনন রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

অযৌন জননে বিভিন্ন প্রকার রেণু উৎপন্ন হয়; যেমন কনিডিওরেণু, ক্ল্যামাইডোরেণু, ওয়িডিওরেণু, ব্ল্যাস্টোরেণু (Blasto spore) ইত্যাদি।

3.3.1 কনিডিওরেণু (চিত্র 3.2) :

অযৌন জনন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কনিডিওরেণুর (conidiospore or conidium) মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কনিডিওরেণুগুলি সাধারণত কনিডিওফোরের (Conidiophore) অগ্রভাগে উৎপন্ন হয়। কনিডিওপোর একপ্রকার হাইফা যা অনুভূমিক হাইফা থেকে উৎপন্ন হয়ে খাড়াভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কনিডিওফোর শাখাবিহীন (*Erysiphe, এরিসাইফি*), বা শাখাযুক্ত (পেনিসিলিয়াম) হতে পারে। কনিডিওফোরের অগ্রভাগে কনিডিওরেণু এককভাবে থাকতে পারে, উদা- *Phyllactinia (ফ্যাইল্যাকটিনিয়া)*, অথবা দলবধ ও শৃঙ্খলিত ভাবে থাকতে পারে। কনিডিওরেণুর শৃঙ্খল প্রতিটি কনিডিওফোরে একটি হতে পারে, উদা- *Erysiphe (এরিসাইফি)*, অথবা একাধিক হতে পারে উদা - *Aspergillus (অ্যাসপারজিলাস)*। কনিডিওরেণুর শৃঙ্খলে কনিডিওরেণু নিম্নোমুখী বা বেসিপেটাল (Basipetal) হতে পারে অর্থাৎ সবচেয়ে বড় কনিডিওরেণু শৃঙ্খলের অগ্রভাগে ও সবচেয়ে ছোট রেণুটি শৃঙ্খলের গোড়ার দিকে থাকে (উদা-অ্যাসপারজিলাস) অথবা অগ্রোন্মুখী বা অ্যাক্রোপেটাল (Acropetal) হতে পারে অর্থাৎ সর্ববৃহৎ কনিডিওরেণু শৃঙ্খলের গোড়ায় ও সর্বকনিষ্ঠ শৃঙ্খলের অগ্রভাগে থাকে, উদা - *Hormodendrum (হরমোডেনড্রাম)*। কনিডিওরেণুর প্রাচীর সাধারণত পাতলা।

3.3.2 ক্লামাইডোরেণু (চিত্র 3.3) :

এগুলি বড়, পুরু প্রাচীর যুক্ত ও প্রচুর পরিমানে সঞ্চিত খাদ্য বস্তু সমন্বিত রেণু। প্রাচীর পুরু হওয়ার জন্য প্রতিকূল পরিবেশে (শুষ্ক ও উষ্ণ) দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে এই ক্লামাইডোরেণু (Chlamydospore)। হাইফার যে কোন কোশ এই রেণুতে পরিবর্তিত হতে পারে। উদা - *Taphrina (ট্যাফরিনা), Protomyces (প্রোটোমাইসিস)* ইত্যাদি।

3.3.3 ওয়িডিওরেণু (চিত্র 3.4) :

অ্যাসকোমাইসিটিসের কোন কোন সদস্যে প্রান্তীয় হাইফা অধিকতর বিভেদ প্রাচীর বিশিষ্ট হয়ে পড়ে ও বিভেদ প্রাচীর বরাবর কোশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও রেণু হিসাবে কাজ করে। এগুলিকে ওয়িডিওরেণু (Oidiospores or oidio) বা আর্থ্রোরেণু (Arthrospores) বলে। উদাহরণ - *Ascobolus (অ্যাসকোবোলাস)*।

3.3.4 ব্লাস্টোরেণু (চিত্র 3.5) :

ইস্ট কোরক উৎপাদনের মাধ্যমে তার অযৌন জনন সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে মাতৃকোশ থেকে একটি ফোলা অংশ বা কোরক সৃষ্টি হয়। কোরকের গোড়ার দিকটি সংকুচিত হয়ে কোরকটিকে মাতৃকোশ হতে বিচ্ছিন্ন করে। ঐ বিচ্ছিন্ন কোরকটি রেণু হিসাবে কাজ করে। একে ব্লাস্টোরেণু (blastospore) বা কোরকোদ্‌গম্‌-রেণু (budding spore) বলে। অনেক সময় ব্লাস্টোরেণু তৈরি হওয়ার পর মাতৃকোশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে নতুন কোরক উৎপন্ন করে এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে, ফলে মাইসীলিয়ামের মত দেখতে একটি গঠন সৃষ্টি হয়। একেই মেকী বা অপ্রকৃত মাইসীলিয়াম বা সিউডোমাইসীলিয়াম বলে। উদাহরণ ঃ *Saccharomyces cerevisiae (স্যাকারোমাইসিস সিরিভিসি)*।

3.3.5 অ্যালুরিওরেণু বা অ্যালুরিওস্পোর (চিত্র 3.6) :

হাইফার অগ্রভাগে অনেক সময় এককোশী, পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট গোলাকৃতি রেণু উৎপন্ন হয়, এগুলিকে অ্যালুরিওরেণু (aleuriouspores) বলে। কনিডিওরেণুর সঙ্গে এর পার্থক্য হল পুরু প্রাচীরের উপস্থিতি। উদা ঃ *Byssochlamys nivea (বাইসোক্ল্যামিস নিভিয়া)*।

3.4 যৌন জনন :

অ্যাসকোমাইসিটিস সহবাসী বা ভিন্নবাসী হতে পারে। ভিন্নবাসী সদস্যগুলি সাধারণত বাইপোলার (bipolar) অর্থাৎ 'A' ও 'a' অ্যালীলদ্বয় কর্তৃক ভিন্নবাসিতা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া কোন কোন ছত্রাকে গৌণ সহবাসিতা (1.6.3.1 অনুচ্ছেদে দেখুন) লক্ষ্য করা যায় যেমন *Neurospora tetrasperma (নিউরোস্পোরা টেট্রাস্পারমা)*। অনেক ক্ষেত্রে *Neurospora crassa (নিউরোস্পোরা ক্র্যাসায়)* শারীর বৃত্তীয়ভাবে ভিন্নবাসিতা দেখা যায়, অর্থাৎ যৌন জননে অংশগ্রহণকারী দুটি মাইসীলিয়ামের প্রত্যেকটিই স্ত্রী জননাঙ্গ ও পুং জননাঙ্গ গঠন করে, কিন্তু মাইসীলিয়ামদ্বয় স্ব বন্ধ্যা। কাজেই এক্ষেত্রে যৌন জনন সম্পন্ন করতে একটি মাইসীলিয়ামের স্ত্রী জননাঙ্গ ও অপর মাইসীলিয়ামে পং জননাঙ্গের প্রয়োজন।

অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির বেশিরভাগ সদস্যের যৌন জনন সাধারণভাবে ফাইকোমাইসিটিস অপেক্ষা দীর্ঘতর ও অনেক বেশি জটিল। এই শ্রেণিতে প্লাজমোগ্যামীর পরপরই সাধারণত ক্যারিওগ্যামী অনুষ্ঠিত হয় না প্লাজমোগ্যামীর দ্বারা দুটি সুসংগত বা কম্প্যাটিবল নিউক্লিয়াস পরস্পরের কাছাকাছি এলে তারা জোড়বধ হয় জোড়বধ নিউক্লিয়াস (যুগ্ম নিউক্লিয়াস) দুটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হতে থাকে, সৃষ্টি হয় ডাইক্যারিয়টিক বা দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট

হাইফা। অবশেষে ক্যারিওগ্যামী অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর মধ্যে একটা দীর্ঘ ডাই-ক্যারিওটিক দশার সৃষ্টি হয়। ডাই-ক্যারিয়টিক দশাটি পুষ্টির ব্যাপারে মনোক্যারিয়টিক বা অঙ্গজ মাইসীলিয়ামের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ক্যারিওগ্যামী প্রক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় ডাই-ক্যারিয়টিক হাইফা থেকে উৎপন্ন তরুন অ্যাসকাসের মধ্যে এবং এর ফলে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে মিয়োসিস্ ও পরে মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে অবশেষে সাধারণত আটটি (কখনও কখনও চারটি বা আরও কম অথবা অনেক বেশি সংখ্যায়) অ্যাসকোরেণু উৎপন্নে অংশগ্রহণ করে (3.4.2.3)। কাজেই বেশির ভাগ ফাইকোমাইসিটিসের ন্যায় এখানেও ডিপ্লয়েড দশা খুবই ক্ষণস্থায়ী।

3.4.1 প্লাজমোগ্যামী :

অ্যাসকোমাইটিসে প্লাজমোগ্যামী প্রক্রিয়াটি নানা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়। পদ্ধতিগুলি নিম্নে উল্লিখিত হল।

1) গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশন (Gametangial Copulation) (চিত্র 3.7) **:**

প্রক্রিয়াটি ফাইকোমাইসিটিসের অনুরূপ, অর্থাৎ দুটি গ্যামেট্যানেজিয়াম পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, মিলিত হয়ে একটি জাইগোট কোশ উৎপন্ন করে এবং জাইগোট কোশটিই অ্যাসকাসে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় প্লাজমোগ্যামীর পরপরই ক্যারিওগ্যামী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি অ্যাসকোমাইসিটিসের আদি সদস্য যেমন, *Dipodascus (ডাইপডঅ্যাসকাস), Saccharomyces* স্যাকারোমাইসিস্) ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

2) গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্ট (Gametangial Contact) (চিত্র 3.8 ও 3.9) **:**

ফাইকোমাইসিটিসের ন্যায় এক্ষেত্রেও পুং গ্যামেট্যানজিয়াম (অ্যানথেরিডিয়াম, antheridium) ও স্ত্রী গ্যামেট্যানজিয়াম (অ্যাসকোগোনিয়াম, ascogonium) মিলনে অংশগ্রহণ করেও মিলন পরবর্তী পর্যায়ে যথারীতি তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখে। গ্যামেট্যানজিয়াম দুটি এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হতে পারে যেমন *sphaerotheca humuli (স্ফিরোথিকা হিউমিউল)* অথবা বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হতে পারে যেমন, *Pyronema sp. (পাইপোনিমা)*।

অ্যাসকোগোনিয়াম ট্রাইকোগাইন (Trichogyne) নামক একটি বিশেষ সূত্রাকার বা নলাকার গঠনযুক্ত হতে পারে অথবা ট্রাইকোগাইন বিহীন হতে পারে। সেই অনুযায়ী গ্যামেট্যানজিয়াম দুটি (পুং ও স্ত্রী) মিলনে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়—

(i) গ্যামেট্যানজিয়াম দুটি স্পর্শস্থলে একটি ছিদ্র উৎপন্ন হয় যার ভিতর দিয়ে প্লাজমোগ্যামী সংগঠিত হয়। উদাহরণ— *Sphaerotheca humuli (স্ফিরোথিকা হিউমিউলি)* (চিত্র 3.8 a)।

(ii) পাইরোনিমার ক্ষেত্রে স্ত্রী গ্যামেট্যানজিয়ামে (অ্যাসকোগেনিয়ামে) একটি ট্রাইকোগাইন (নলাকার গ্রাহী অঙ্গ, receptive organ) উৎপন্ন হয় যার অগ্রভাগ অ্যানথেবির ডিয়ামকে স্পর্শ করে। পরবর্তী পর্যায়ে উভয়ের সাধারণ প্রাচীরে সৃষ্ট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্লাজমোগ্যামী অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ অ্যানথেরিডিয়ামের সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসগুলি ট্রাইকোগাইনের ভিতর দিয়ে অ্যাসকোগোনিয়ামে চলে আসে ও ডাইক্যারিওটিক দশার সৃষ্টি করে (চিত্র 3.8 b)।

8

(iii) *Penicillium verruculatum (পেনিসিলিয়াম ভারমিকিউলেটাম)* -এর ক্ষেত্রে অ্যানথেরিডিয়াম ও অ্যাসকোগোনিয়ামের স্পর্শস্থলে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হয় কিন্তু ঐ ছিদ্র দিয়ে অ্যানথেরিডিয়ামের সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস অ্যাসকোগোনিয়ামে প্রবেশ করে না, অর্থাৎ অ্যানথেরিডিয়ামটি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু উভয় গ্যামেট্যানজিয়ামের সাইটোপ্লাজম পরস্পরকে স্পর্শ করার পর অ্যাসকোগোনিয়ামের নিউক্লিয়াসগুলি জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হয়ে ডাইক্যারিওটিক দশার সৃষ্টি করে। একই গ্যামেট্যানজিয়ামের নিউক্লিয়াসগুলি কর্তৃক এইরূপ ডাইক্যারিওটিক দশার সৃষ্টিকে অটোগ্যামী বলা হয়। (চিত্র 3.9)। পরবর্তী পর্যায়ে নানান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণুর পরিস্ফুটন ঘটে।

3) স্প্যারমাটাইজেশন (Spermatization) :

অনেক উন্নততর অ্যাসকোমাইসিটিসের ক্ষেত্রে অ্যানথেরিডিয়াম উৎপন্ন হয় না। পরবর্তে একপ্রকার এককোষী অচর রেণু উৎপন্ন হয় যা স্পারমাটিয়াম (Spermatium) নামে পরিচিত। অনেক সময় কনিডিয়াম ও ওয়িডিও রেণুও স্পারমাটিয়াম হিসাবে কাজ করে। এই স্পারমাটিয়ামগুলি অ্যাসকোগোনিয়ামের ট্রাইকোগাইন অথবা যেখানে অ্যাসকোগোনিয়াম উৎপন্ন হয় না, সেইসব ক্ষেত্রে কোনো গ্রাহক হাইফার (receptive hypha) সংস্পর্শে এসে যথারীতি প্লাজমোগ্যামী ঘটায় অর্থাৎ স্পারমাটিয়ামের প্রোটোপ্লাজম অ্যাসকোগোনিয়াম বা গ্রাহক হাইফায় প্রবেশ করে ও ডাইক্যারিয়টিক দশার সৃষ্টি করে। স্পারমাটিয়াম দ্বারা এইপ্রকার প্লাজমোগ্যামীকে স্পারমাটাইজেশন বলে। উদা ঃ *Neurospora sitophylla (নিউরোস্পোরা সিটোফাইলা), Mycosphaerella tulipiferae (মাইকোস্ফিরেলা টুলিপিফেরি)* ইত্যাদি।

4) সোমাটোগ্যামী (Somatogamy) (চিত্র 3.11) **:**

কিছু উন্নত অ্যাসকোমাইসিটিসের ক্ষেত্রে কোন জননাঙ্গই সৃষ্টি হয় না। এদের অঙ্গজ হাইফোগুলি সরাসরি যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করে। তাই এই মিলনকে সোমাটোগ্যামী বা অঙ্গজমিলন বলে। উপযুক্ত দুটি হাইফার ('+' স্ট্রেন ও '—' স্ট্রেন) কোশ পরস্পরের সংস্পর্শে এলে ওদের স্পর্শস্থল বরাবর সাধারণ প্রাচীর বিলুপ্ত হয়ে প্লাজমোগ্যামী ঘটায় ও ডাইক্যারিয়টিক দশার সৃষ্টি করে। উদাহর- *Morchella (মরচেলা), Tuber (টিউবার)* ইত্যাদি।

3.4.2 অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপাদন :

প্লাজমোগ্যামীর পরবর্তী পর্যায়ে উৎপন্ন হয় অ্যাসকাস। অ্যাসকাসটি অ্যাসকাস মাতৃকোশ (প্রারম্ভিক অ্যাসকাস বা তরুণ অ্যাসকাসও বলা হয়) থেকে উৎপন্ন হয়। অ্যাসকাস মাতৃকোশ প্রথমে ডাইক্যারিওটিক অবস্থায় থাকে। এরপর ক্যারিওগ্যামী অনুষ্ঠিত হয়। ফলে ডিপ্লয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস প্রথমে মিয়োসিস ও পরে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার বিভাজিত হয়ে আটটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। ইতিমধ্যে অ্যাসকাস মাতৃকোশটি বর্ধিত হয়ে অ্যাসকাসে পরিণত হয়। এই আট নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট অ্যাসকাসের মধ্যে প্রতিটি নিউক্লিয়াস কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম সহযোগে একটি করে অ্যাসকোরেণু (ascospore) উৎপন্ন করে।

3.4.2.1 অ্যাসকাস উৎপাদন :

অ্যাসকাস উৎপাদন প্রক্রিয়া দুইভাবে ঘটতে পারে। একটি হল প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া ও অপরটি হল পরোক্ষ প্রক্রিয়া।

i) প্রত্যক্ষ অ্যাসকাস উৎপাদন প্রক্রিয়া (চিত্র 3.12) **:** এই প্রক্রিয়াটি অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির আদি পর্যায়ের সদস্যগুলির (*Schizososaccharomyces, সাইজোস্যাকারোমাইসিস*; ডাইপডঅ্যাসকাস ইত্যাদি) ক্ষেত্রে দেখা যায়।

এক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামীর প্রায় পরপরই ক্যারিওগ্যামী অনুষ্ঠিত হয় ও ডিপ্লয়েড জাইগোট গঠন করে। এই জাইগোটটি অ্যাসকাস মাতৃকোশ হিসাবে কাজ করে। নিউক্লিয়াসটি যথারীতি প্রথম পর্যায়ে মিয়োসিস ও পরে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে আটটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। ইতিমধ্যে অ্যাসকাস মাতৃকোশটি অ্যাসকাসে পরিণত হয় যার মধ্যে প্রতিটি নিউক্লিয়াস কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম সহযোগে অ্যাসকোরেণু গঠন করে। এক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামীর ফলে উৎপন্ন একক কোশটি (জাইগোট) সরাসরি অ্যাসকাস উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে।

ii) পরোক্ষ অ্যাসকাস উৎপাদন প্রক্রিয়া (চিত্র 3.13) **:** এক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামীর মাধ্যমে সৃষ্ট ডাইক্যারিয়টিক কোশ হতে উৎপন্ন হয় এক বিশেষ ধরনের হাইফা, যার নাম অ্যাসকোজিনাস হাইফা (Ascogenous hypha)। এই অ্যাসকোজিনাস হাইফার কোশ হতে সৃষ্টি হয় অ্যাসকাস। এই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন উচ্চতর অ্যাসকোমাইসিটিসে দেখা যায় যেমন *Pyronema (পাইরোনিমা), Ascobolus (অ্যাসকোবোলাস)* ইত্যাদি ছত্রাকে।

প্লাজমোগ্যামী প্রক্রিয়ায় অ্যানথিরিডিয়াম থেকে আগত পুং নিউক্লিয়াসগুলি অ্যাসকোগোনিয়ামের স্ত্রী নিউক্লিয়াসগুলির সাথে জোড় বাঁধতে থাকে ও ডাইক্যারিয়নের (Dikaryon) সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি আসকোগোনিয়ামের মধ্যে অনেকগুলি জোড়বদ্ধ নিউক্লিয়াস (যুগ্ম নিউক্লিয়াস) বা ডাইক্যারিয়নের সৃষ্টি হয়। এরপর অ্যাসকোগোনিয়ামের দেহ থেকে সৃষ্টি হয় একাধিক উদগত অংশ যার মধ্যে ডাইক্যারিয়নগুলি প্রবেশ করে। এই উদ্গত অংশগুলি ক্রমশ সূত্রবৎ লম্বা হতে থাকে ও অ্যাসকোজিনাস হাইফায় (ascogenous hypha) পরিণত হয়। অ্যাসকোজিনাস হাইফা প্রতমে বিভেদ প্রাচীরবিহীন হলেও পরবর্তীকালে তা বিভেদ প্রাচীর যুক্ত হয়। অন্যাসকোজিনাস হাইফার অগ্রপ্রান্তটি বেঁকে গিয়ে হুকের ন্যায় গঠন সৃষ্টি করে। একে ক্রোজিয়ার (crozier) বলে। [Wilson (1952) এর মতে অ্যাসকোজিনাস হাইফার প্রান্তীয় কোশটি (tip-cell) একটি নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট (Wilson, 1952) এবং বাকী কোশগুলি ডাইক্যারিয়টিক বা দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হয়। হাইফার অগ্রপ্রান্ত অবস্থিত যে কোনো একটি দ্বিনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোশ ক্রোজিনার উৎপন্ন করে।] এই ক্রোজিয়ারের মধ্যে নিউক্লিয়াস দুটি একই সাথে বিভাজিত হয়ে মোট চারটি অপত্য নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। এরপর দুটি বিভেদ প্রাচীর সৃষ্টি হয় ফলে হুক ও ক্রোজিয়ারের মধ্যে পরপর তিনটি কোশ উৎঘপন্ন হংয়। এই তিনটি কোশের মধ্যে প্রান্তীয় কোশটি ও তৃতীয় কোশটি (ভূমিকোশ, basal cell) এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এবং দ্বিতীয় কোশটি (উপপ্রান্তীয় কোশটি, penultimate cell) দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হয়। এই দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোশটিই অ্যাসকাস মাতৃকোশ হিসাবে কাজ করে। এই মাতৃকোশের মধ্যে যথারীতি প্রথমে ক্যারিওগ্যামী ও পরে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের মিয়োসিস ও মাইটোসি বিভাজন সংগঠিত হয়। অবশেষে মাতৃকোশটি থেকে আটটি অ্যাসকোরেণু বিশিষ্ট অ্যাসকাস উৎপন্ন হয়। ক্রোজিয়ারের প্রান্তীয় এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোশটি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা অনেক ক্ষেত্রে (উদাহরণ : *Pyronema confluens, পাইরোনিমা কনফ্লুয়েন্স*) এই কোশটি তৃতীয় কোশটির সাথে প্লাজমোগ্যামী গঠায় ও দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোশ উৎপন্ন করে। উৎপন্ন দ্বি-নিউক্লিয়াস কোশটি এর পর ক্রোজিয়ার উৎপন্ন করে পুনরায় একটি অ্যাসকাস উৎপন্ন করে। এইভাবে বারে বারে ক্রোজিয়ার উৎপন্ন হতে থাকে। ফলে অসংখ্য অ্যাসকাস উৎপন্ন হতে পারে। এ পর্যন্ত অ্যাসকাসের যে পরোক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হল অর্থাৎ অ্যাসকোজিনাস হাইফার কোশ হতে অ্যাসকাস উৎপাদন প্রক্রিয়া, তা কেবল অ্যানথেরিডিয়াম ও অ্যাসকোগোনিয়াম উৎপাদনকারী অ্যাসকোমাইসিটিসের সদস্যাগুলির মধ্যেই অর্থাৎ গ্যামেট্যানজিয়াল কনট্যাক্ট পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী ছত্রাকগুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, কারণ এটি স্পারমাটাইজেশন ও সোমাটোগ্যামী পদ্ধতি অবলম্বনকারী সদস্যাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, অর্থাৎ আপনাদের মনে রাখতে হবে প্লাজমোগ্যামীর ফলে যে ডাইক্যারিয়ন বা দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোশ উৎপন্ন হয় (তা অ্যাসকোগোনিয়ামে হোক বা অন্য কোন কোশেই হোক)

তা থেকে উৎপন্ন হয় অ্যাসকোজিনাস হাইফা। এই হাইফার অগ্রভাগে উৎপন্ন হয় ক্রোজিয়ার এবং ক্রোজিয়ারের দ্বিতীয় কোশ (ডাইক্যারিয়টিক) থেকে উৎপন্ন হয় অ্যাসকাস।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন *Geopyxis catinus (জিওপিক্সিস ক্যাটিনাস)* এর ক্ষেত্রে ক্রোজিয়ার উৎপন্ন হয় না, তবে অ্যাসকোজিনাস হাইফার অগ্রভাগে দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট উপপ্রান্তীয় কোশটি (দ্বিতীয় কোশ) উৎপন্ন হয় যা অ্যাসকাস মাতৃকোশ হিসাবে কাজ করে। প্লিকারিয়া সুকোসা (Plicaria succosa)-র ক্ষেত্রেও ক্রোজিয়ার উৎপন্ন হয় না। এক্ষেত্রে প্রান্তীয় দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট (ডাইক্যারিয়টিক) কোশটি সরাসরি অ্যাসকাস মাতৃকোশ হিসাবে কাজ করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাসকোজিনাস হাইফার যে কোন দ্বি-নিউক্লিয় কোশ আসকাস মাতৃকোশ হিসাবে কাজ করে থাকে।

3.4.2.2 অ্যাসকোরেণু উৎপাদন (চিত্র 3.14) :

আগেই বলা হয়েছে উৎপাদনশীল অ্যাসকাসের মধ্যে যে হ্যাপ্লয়েডরেণুগুলি উৎপন্ন হয় তার প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস কিছু পরিমান সাইটোপ্লাজম সহযোগে একটি করে এ্যাসকোরেণুতে পরিণত হয়। প্রতিটি অ্যাসকোরেণুকে ঘিরে একটি করে কোশ প্রাচীর উৎপন্ন হয়। এই কোশ প্রাচীরটি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় ঃ-

অ্যাসকাস মাতৃকোশ থেকে নিউক্লিয় বিভাজন ও কোশের আয়তন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যখন অ্যাসকাস উৎপন্ন হতে থাকে তখন মাতৃকোশের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট ভেসিকল (Vesicle) উৎপন্ন হতে থাকে। এই ভেসিকলগুলি একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে মাতৃকোশের প্লাজমা মেমব্রেণের কাছাকাছি একটি দ্বিপর্দা বিশিষ্ট গঠন সৃষ্টি করে, যাকে অ্যাসকোরেণু আবরক বা এনভ্যালোপ (envelope) বলে। অ্যাসকাসের মধ্যে আটটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়ে যখন সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে তখন ওই দ্বিপর্দা নিউক্লিয়াসগুলির অন্তবর্তীস্থানে খাঁজযুক্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে যায় ও পরিশেষে প্রতিটি নিউক্লিয়াস ও তৎসংলগ্ন সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি করে অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন করে। অ্যাসকাসের মধ্যে যে সাইটোপ্লাজম অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত হয় না তাকে এপিপ্লাজম (Epiplasm) বলে। এইভাবে প্রতিটি অ্যাসকোরেণুকে ঘিরে যে দ্বি-পর্দা বিশিষ্ট আবরক সৃষ্টি হয় সেই আবরকটির পর্দাদুটির অন্তবর্তীস্থানে কোশপ্রাচীরবস্তু সঞ্চিত হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট কোশপ্রাচীর উৎপন্ন করে। এইভাবে সুগঠিত অ্যাসকোরেণুর সৃষ্টি হয়।

3.4.2.3 অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণুর গঠন ও প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য :

অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির বিভিন্ন সদস্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার আসকাস দেখা যায়। এটি লম্বা, গোল, ডিম্বাকৃতি, নলাকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হয়। আবার আসকাস একটি অথবা দুটি কোশপ্রাচীর বিশিষ্ট হতে পারে। যে সমস্ত অ্যাসকাস একটি মাত্র কোশপ্রাচীর দ্বারা আবৃত, সেই সমস্ত অ্যাসকাসকে ইউনিটিউনিকেট (Unitunicate) অ্যাসকাস বলে (চিত্র 3.15)। (উদাহরণ - *Sordaria, সরড্যারিয়া*) পক্ষান্তরে যে সমস্ত অ্যাসকাস দুটি কোশপ্রাচীর বিশিষ্ট সেগুলিকে বাইটিউনিকেট (bitunicate) অ্যাসকাস বলে (চিত্র 3.15)। বাইটিউনিকেট অ্যাসকাসের বাহিরের প্রাচীরটিকে এক্টোঅ্যাসকাস (ectoascus) বা এক্টোটিউনিকা এবং ভিতরেরটিকে এন্ডোঅ্যাসকাস (endoascus) বা এন্ডোটিউনিকা (endotunica) বলে। উদাহরণ - *Pleospora (প্লিওস্পোরা)*।

অ্যাসকাস পরিণত হলে তার রেণু নিষ্ক্রান্ত হয়। রেণু নিষ্ক্রমণের জন্য কোন অ্যাসকাসের অগ্রভাগে উৎপন্ন হয় ছিদ্র (চিত্র 3.16 b); উদাহরণ- *Trichoglossum (ট্রাইকোগ্লোসাম)* অথবা কোন অ্যাসকাসের অগ্রভাগে থাকে

টুপির ন্যায় অপারকুলাম (Operculum) যা খুলে গেলে রেণুগুলি নিষ্ক্রান্ত হয়। (উদাহরণ- অ্যাসকোবোলাস) (চিত্র 3.16 a)। আবার কোন অ্যাসকাসের অগ্রভাগে চির বা স্লিট (slit) উৎপন্ন হয় এবং সেই পথে অ্যাসকোরেণু নির্গত হয় (উদাহরণ - *Ascozonus অ্যাসকোজোনাস*, চিত্র 3.16 c); কিছু সদস্য (অ্যাস্পারজিলাস) রয়েছে যাদের ক্ষেত্রে অ্যাসকাস গলে বিনষ্ট হলে তবে অ্যাসকোরেণু নির্গত হয়। যদিও বেশির ভাগ সদস্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি অ্যাসকাসে আটটি করে অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়, কিন্তু আটটির বেশি (চিত্র 3.18 b) বা আটটির কম অ্যাসকোরেণুও উৎপন্ন হতে পারে। প্রতিটি অ্যাসকাসে আটটির বেশি অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হওয়ার কারণ মিয়োসিসের পর একাধিকবার মাইটোসিস বিভাজন হওয়া। আবার আটটির কম রেণু উৎপন্ন হওয়ার কারণ, হয় সবকটি নিউক্লিয়াস রেণু উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় না অথবা ব্যবহৃত হলেও কিছু অ্যাসকোরেণু নিস্ফল অ্যাসকোরেণু হিসাবে পরিগণিত হয় ও বিনষ্ট হয়। টিউবার *(Tuber)* নামক ছত্রাকের ক্ষেত্রে প্রতিটি অ্যাসকাসে অ্যাসকোরেণুর সংখ্যা এক থেকে চারটি দেখা যায় (চিত্র 3.18 a); *Phyllactinia, (ফাইল্যাকটিনিয়ার)* ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়। *Rhyparobius (রাইপ্যারোবিয়াস)*-এর ক্ষেত্রে ষোলো অথবা বত্রিশটি এবং *Philocopra curvicolla,*-র *(ফিলোকোপরা কারভিকোলা)* ক্ষেত্রে প্রতিটি অ্যাসকাসে একশত আঠাশটি রেণু উৎপন্ন হয়।

অ্যাসকোরেণু বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে, যেমন ডিম্বাকৃতি, গোলাকৃতি, কিডনী আকৃতির (বিভিন্ন প্রজাতির *Fabospora* spp. *ফ্যাবোস্পোরা*), কাস্তের মত (sickle shaped) (*Endomycopsis selenospora, এনডোমাইকপ্সিস্ সেলেনোস্পোরা*), সূঁতের মত (*Nematospora* spp., *নিমাটোস্পোরা*) লম্বাটে সুত্রাকৃতি (*Claviceps purpurea, ক্ল্যাভিসেপ্স পারপিউরিয়া*) ইত্যাদি। অ্যাসকোরেণুর প্রাচীর মসৃণ বা অমসৃণ (উদাহরণ - নিরোস্পোরা) হতে পারে। সাধারণত অ্যাসকোরেণু বর্ণহীন বা বর্ণযুক্ত (যেমন, পার্পল বর্ণের *Ascobolus furfuraceus, এ্যাসকোবোলাস ফারফুরাসিয়াস্*), এককোষী ও একনিউক্লিয়াযুক্ত হয়, তবে ইহা দ্বিনিউক্লিয়াস বিশিষ্টও হতে পারে (*Neurospora tetrasperma, নিউরোস্পোরা টেট্রাস্পারমা*)। বহুকোশী অ্যাসকোরেণু দেখা যায় *Pleospord (প্লিওস্পোরা)* ইত্যাদি ছত্রাকে (চিত্র 3.17)।

3.5 ফলদেহ বা অ্যাসকোকার্প বা ফ্রাকটিফিকেশান (Fruitbody or Ascocarp or Fructification) :

কতিপয় আদি পর্যায়ের অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাকগুলিবাদে বাকী প্রায় সব ছত্রাকের ক্ষেত্রেই সুগঠিত ফলদেহ বা অ্যাসকোকার্প (ascocarp) উৎপন্ন হয়। প্রতিটি অ্যাসকোকার্পের মধ্যে থাকে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু, যৌন জননাঙ্গ এবং বন্ধ্যা হাইফা। বন্ধ্যা হাইফাগুলি অ্যাসকোকার্পের প্রাচীর গঠন করে। আবার কিছু বন্ধ্যা হাইফা (প্যারাফাইসিস, Paraphysis) অ্যাসকাসগুলির সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। এই অ্যাসকাস ও প্যারাফাইসিসগুলি একত্রে অ্যাসকোকার্পের মধ্যে গঠন করে হাইমিনিয়াম (Hymenium) বা উর্বরস্তর। এক্ষেত্রে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাসকোরেণু বহনকারী অ্যাসকাস থাকার জন্যই ঐ স্তরটিকে উর্বরস্তর বলা হচ্ছে কিন্তু, উর্বর স্তরটি সামগ্রিকভাবে উর্বর নয় কারণ সেখানে বন্ধ্যা হাইফাও (প্যারাফাইসিস) রয়েছে। অ্যাসকোকার্প পেরিডিয়াম (Peridium) নামক একপ্রকার বন্ধ্যা হাইফার সাধারণ প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত থাকে।

3.5.1 অ্যাসকোকার্প উৎপাদন (চিত্র 3.19) :

অ্যাসকোকার্প উৎপাদন শুরু হয় প্লাজমোগ্যামী সংগঠিত হওয়ার পর থেকেই। একদিকে যেমন অ্যাসকোজিনাস হাইফা উৎপাদন এবং তার থেকে অ্যাসকাস উৎপাদন হতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি অ্যাসকোগোনিয়াম উৎপাদনকারী হাইফাগুলি থেকে অসংখ্য শাখা প্রশাখাযুক্ত বন্ধ্যা হাইফা উৎপন্ন হতে থাকে। এই বন্ধ্যা হাইফাগুলির কিছু অ্যাসকাসগুলির দিকে অগ্রসর হয়ে প্যারাফাইসিস (paraphysis) গুলি গঠন করে। অন্যান্য বন্ধ্যা হাইফাগুলি অ্যাসকোগোনিয়াম, অ্যানথেরিডিয়াম, অ্যাসকোজিনাস হাইফা ও অ্যাসকোরেণুযুক্ত অ্যাসকাসকে ঘিরে ফেলতে থাকে এবং ফলস্বরূপ অ্যাসকোকার্প উৎপন্ন হয়। আসকোকার্পকে ঘিরে বন্ধ্যা হাইফাগুলি একে অপরকে জড়িয়ে যে স্তরটি (অ্যাসকোকার্পের প্রাচীর) তৈরি করে তাকে পেরিডিয়াম (Peridium) বলে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি লক্ষ্যণীয় তা হল (i) অ্যাসকোকার্পের মধ্যে যৌন জনন সম্পর্কিত উর্বর ডাইক্যারিয়টিক হাইফা হল কেবলমাত্র অ্যাসকোজিনাস হাইফা যা থেকে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়, (ii) অ্যাসকোকার্পের বাকী সমস্ত হাইফা হল অঙ্গজ হাইফা এবং তা বন্ধ্যা, (iii) অ্যাসকোকার্পের পুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ ও সরবরাহ করে অঙ্গা হাইফা।

3.5.2 অ্যাসকোকার্পের প্রকারভেদ (চিত্র 3.20) **(Types of Ascocarps) :**

অ্যাসকোমাইসিটিসে নানাপ্রকার ফলদেহ উৎপন্ন হতে লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে প্রধান তিন প্রকার হল (i) ক্লেইস্টোথেসিয়াম (Cleistothecium) (ii) অ্যাপোথেসিয়াম (Apothecium) ও (iii) পেরিথেসিয়াম (Perithecium)।

(i) **ক্লেইস্টোথেসিয়াম :** ফলদেহ গোলাকৃতি এবং এটি একটি বন্ধ (অর্থাৎ অস্টিওল নামক রন্ধ্র নেই) গঠন অর্থাৎ এর হাইমেনিয়াম কোনওভাবে বাহিরে উন্মুক্ত নয়। এইপ্রকার ফলদেহ *Erysiphe*, *(এরিসাইফি) পেনিসিলিয়াম, অ্যাসপারজিলাস* ইত্যাদি সদস্যে দেখা যায় (চিত্র 3.20a)। সাধারণতঃ ফলদেহ অ্যাপেনডেজ্‌বিহীন *(Erysiphe graminis, এরিসাইফিগ্রামিনিস্)* বা অ্যাপেনডেজ *(appendage)* যুক্ত হতে পারে (*E. pollygoni, এরিসাইফি পলিগনি*)।

(ii) **অ্যাপোথেসিয়াম :** পেয়ালাকৃতি গঠন এবং এর হাইমেনিয়াম স্তরটি সম্পূর্ণরূপে বাহিরে উন্মুক্ত। এইপ্রকার ফলদেহ *Ascobolus (অ্যাসকোবোলাস)*, *Peziza (পিজাইজা)* ইত্যাদি ছত্রাকে দেখা যায় (চিত্র 3.20 b)।

(iii) **পেরিথেসিয়াম :** এটি অনেকটা কলসের বা ফ্লাস্কের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং এটি একটি ছিদ্রের মাধ্যমে উন্মুক্ত। ছিদ্রটিকে অস্টিওল (Ostiole) বলে। পেরিথেসিয়ামের মধ্যে প্যারাফাইসিস ছাড়াও অষ্টিওলের নিকট পেরিফাইসিস (Periphysis) নামক বন্ধ্যা হাইফা থাকে। *Sordaria (সরড্যারিয়া)*, *Chaetomium (কিয়েমিয়াম)*, *Claviceps (ক্লাভিসেপস্)* ইত্যাদি ছত্রাকে পেরিথেসিয়াম দেখা যায় (চিত্র 3.20 c)।

3.6 জীবনচক্র :

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ফাইকোমাইসিটিসের অযৌন জীবনচক্রে উৎপাদিত রেণুগুলি প্রধানত স্পোরানজিওরেণু, অর্থাৎ রেণুস্থলীর মধ্যে এগুলি সৃষ্টি হয় এবং যৌনজীবনচক্রে ডাইক্যারিওটিক দশা অনুপস্থিত। কিন্তু অ্যাসকোমাইসিটিসের অযৌন জীবনচক্রে রেণুস্থলী সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত এবং এই জীবনচক্রটি বেশিরভাগ

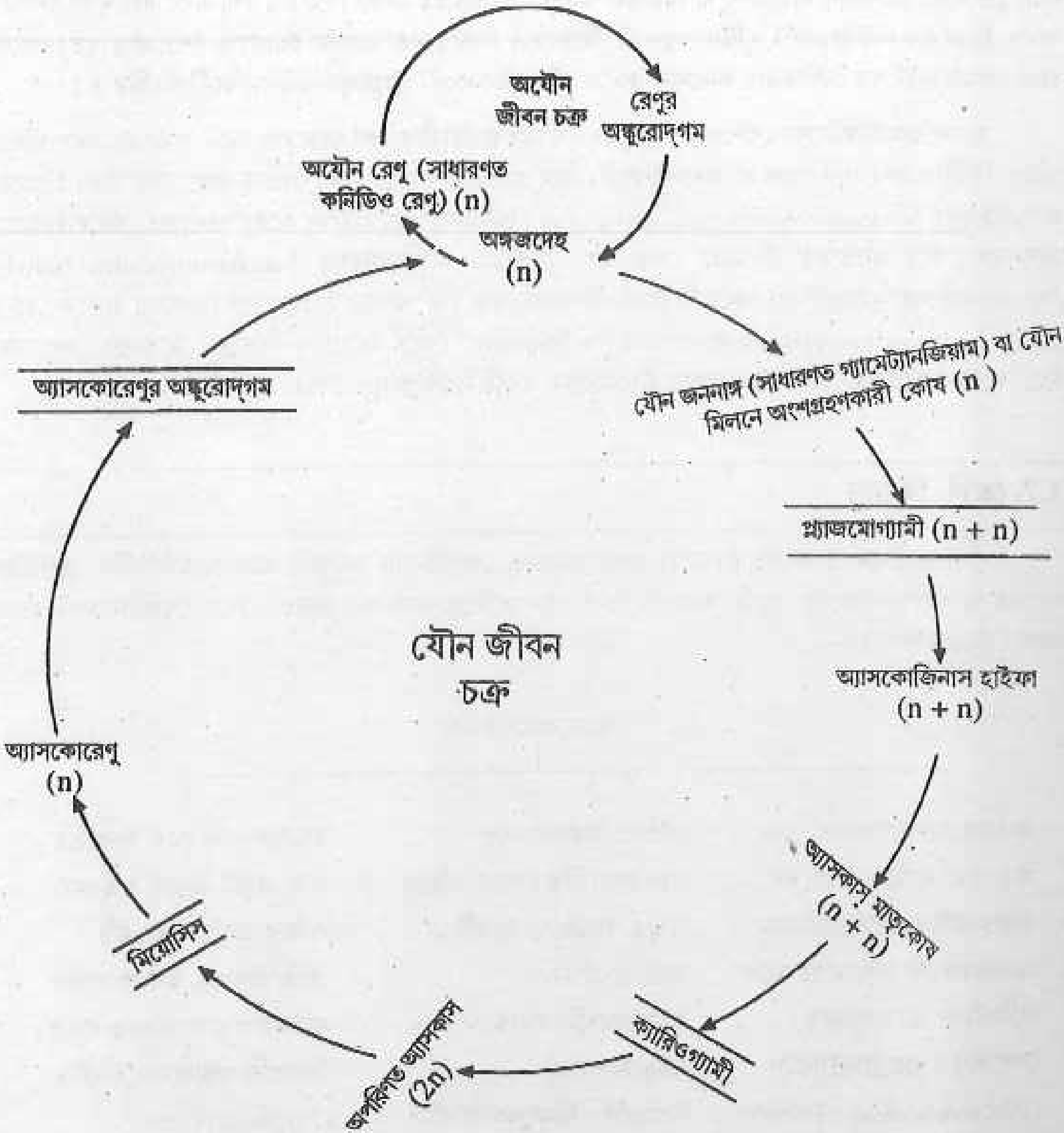

চিত্র 3.21 অ্যাসকোমাইসিটিসের সাধারণ জীবনচক্র

ক্যারিওগ্যামীর মধ্যে দীর্ঘ ডাইক্যারিয়টিক দশা দেখতে পাওয়া যায়। এদের অঙ্গজ হাইফা হ্যাপ্লয়েড, কাজেই এটির স্থায়িত্বও দীর্ঘ। অ্যাকসাক মাতৃকোশ বা প্রারম্ভিক অ্যাসকাসে সৃষ্টি হয় এদের ডিপ্লয়েড দশা এবং এটি খুবই ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি সৃষ্টির পরপরই মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড দশা প্রাপ্ত হয়। কাজেই অ্যাসকোমাইসিটিসের বেশিরভাগ সদস্যের ক্ষেত্রে যৌন জীবনচক্রটি হ্যাপ্লয়েড-ডাইক্যারিয়টিক (চিত্র 3.21)।

অ্যাসকোমাইসিটিসের বেশিরভাগ সদস্যে দীর্ঘ ডাইক্যারিয়টিক দশা থাকলেও আদি পর্যায়ের সদস্যগুলিতে ডাইক্যারিয়টিক দশা প্রায় থাকে না বললেই চলে। তবে এদের জীবনচক্রে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। হ্যাপ্লয়েড অঙ্গজদেহযুক্ত *Schizosaccharomyces octosporus (সাইজোস্যাকারোমাইসিস অক্টোস্পোরাসের)* ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড জীবনচক্র ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড জীবনচক্র দেখা যায়; ডিপ্লয়েড অঙ্গজদেহযুক্ত Saccharomycodes ludwigi *(স্যাকারোমাইকোডস লাডুইগির)* ক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড জীবনচক্র দেখা যায়; আবার হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড অঙ্গজ দেহযুক্ত *Saccharomyces cerevisiae (স্যাকারোমাইসিস সিরিভিসির)* ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড-ডিপ্লয়েড জীবনচক্র দেখা যায়। নিচে অ্যাসকোমাইসিটিসের বিভিন্ন প্রকার জীবনচক্রের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হল (চিত্র 3.22)।

3.7 শ্রেণি বিন্যাস

গুইন-ভাওগান ও বার্নেস (1927) প্রদত্ত ছত্রাকের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিটিকে ফলদেহ বা অ্যাসকোকার্পের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। নিচে শ্রেণিবিন্যাসটি ছকের সাহায্যে উল্লেখ করা হল—

অ্যাসকোমাইসিটিস

- ফলদেহ বা অ্যাসকোকার্প কোন ছিদ্র দ্বারা বাহিরে উন্মুক্ত নয়, অর্থাৎ এটি ক্লেইস্টোথেসিয়াম, অ্যাসকাসগুলি ফলদেহের মধ্যে অনিয়মিত ভাবে সজ্জিত। উপশ্রেণি - প্লেক্টোমাইসিটিস (Plectomycetes) (উদাহরণ - (*Penicillium পেনিসি-লিয়াম*), *Erysiphe (এরিসাইফি)*, *Exoascus (একসোঅ্যাসকাস)* ইত্যাদি।)
- পরিণত অ্যাসকোকার্প (ফলদেহ) বিস্তৃতভাবে বাহিরে উন্মুক্ত, অর্থাৎ ফলদেহটি অ্যাপোথেসিয়াম, অ্যাসকাসগুলি সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে উপশ্রেণি - ডিসকোমাইসিটিস (Discomycetes) (উদাহরণ -*Peziza (পিজাইজা)*, *Tuber (টিউবার)*, *Morchella (মরচেলা)*, ইত্যাদি।)
- অ্যাসকোকার্প ফ্লাস্ক আকৃতির এবং একটি ছিদ্রের সাহায্যে বাহিরে উন্মুক্ত অর্থা এটি পেরিথেসিয়াম, অ্যাসকাসগুলি সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে। উপশ্রেণি-পাইরিনোমাইসিটিস (Pyrenomycetes) উদাহরণ- *Claviceps (ক্লাভিসেপস্)*, *Daldinia (ডালডিনিয়া)*, *Phyllachora (ফাইলাকোরা)* ইত্যাদি।)

অনুশীলনী - 2

নিচের তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

1. বেশিরভাগ অ্যাসকোমাইসিটিস ________ মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন করে।
2. অ্যাসপারজিলাসে কনিডিওরেণুর ________ সজ্জা পদ্ধতি ও হরমোডেনড্রামে ________ সজ্জা পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়।
3. ইস্টের কোরককে ________ রেণু বলে। অ্যালুরিওরেণু একপ্রকার ________ প্রাচীরযুক্ত কনিডিওরেণু।
4. ভিন্নবাসী অ্যাসকোমাইসিটিস সাধারণত ________ হয়, নিউরোস্পোরা টেট্রাস্পারমা ________ সহবাসিতা ও নিউরোস্পোরা ক্রাসা ________ ভিন্নবাসিতা প্রদর্শন করে।
5. অ্যাসকোমাইসিটিসে সাধারণত প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামী, দীর্ঘ ________ দশা দ্বারা পৃথকীকৃত থাকে।
6. প্লাজমোগ্যামী ________, ________, ________ ও ________ পদ্ধতি দ্বারা সম্পন্ন হয়।
7. প্লাজমোগামীর পর অ্যাসকোগোরিয়াম থেকে যে হাইফাগুলি উৎপন্ন হয় সেগুলিকে ________ হাইফা বলে। অ্যাসকোজিনাস হাইফার অগ্রভাগে যে হুক এর মতন গঠন সৃষ্টি হয় তাকে ________ বলে।
8. অ্যাসকাস উৎপাদন দুভাবে ঘটতে পারে, একটি ________ ভাবে ও অপরটি ________ ভাবে।
9. প্রতিটি অ্যাসকাসে সাধারণত আটটি অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়, কিন্তু টিউবার *(Tuber)* প্রজাতিতে ________ অ্যাসকোরেণু ও রইপ্যারোবিয়াস *(Rhyparobius)* প্রজাতিতে ________ অথবা ________ টি অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়।
10. অ্যাসকোবোলাস *(Ascobolus)* এ ________ ফলদেহ, সরড্যারিয়াতে *(Sordaria)* ________ ও এরিসাইফিতে *(Erysiphe)* ________ ফলদেহ দেখা যায়।
11. অ্যাসকোমাইসিটিসে হ্যাপ্লয়েড - ডাইক্যারিয়টিক জীবনচক্র ছাড়া অন্যান্য জীবনচক্রগুলি হল ________, ________, ________ ।

ব্লাস্টোরেণু, অগ্রোন্মুখী, পুরু, ক্লোজিয়ার, অ্যাপোথেসিয়াম, ডাইক্যারিয়টিক, পেরিথেসিয়াম, গৌণ, নিম্নোন্মুখী, শারীরবৃত্তীয়ভাবে, হ্যাপ্লয়েড-ডিপ্লয়েড, গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্ট, পরোক্ষ, সোমাটোগ্যামী, বহিপোলার, কনিডিওরেণু, গ্যামেট্যানজিয়াল কপুলেশন, স্পারমাটাইজেশন, অ্যাসকোজিনাস, প্রত্যক্ষ, এক থেকে চার, ষোলো, বত্রিশ, ক্লেইস্টোথেসিয়াম, ডিপ্লয়েড, হ্যাপ্লয়েড)

3.8 সারাংশ

বর্তমান এককটি পড়ে এখন আপনারা এই শ্রেণিটির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পেরেছেন। আপনারা বলতে পারছেন

- অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক জল অথবা স্থলে পরজীবী অথবা মৃতজীবী হিসাবে বসবাস করতে পারে।

- অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির অঙ্গজ দেহ এককোশী (হ্যাপ্লয়েড বা ডিপ্লয়েড) বা মাইসিলিয়াম দেহ হতে পারে। মাইসিলিয়াম বিভেদ প্রাচীরযুক্ত। বিভেদ প্রাচীর একটি কেন্দ্রীয় ছিদ্র যুক্ত।
- এই শ্রেণির ছত্রাকগুলির কিছু উপকারী, কিছু অপকারী আবার কিছু উপকারী ও অপকারী উভয় ভূমিকাই পালন করে।
- অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এই তিন প্রকার পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করতে পারে। অযৌন জনন শুধুমাত্র অচলরেণুর (সাধারণত কনিডিওরেণু) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
- যৌন জননে সাধারণত প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর মধ্যে থাকে দীর্ঘ দ্বি-নিউক্লিয় দশা বা ডাইক্যারিয়টিক দশা।
- প্ল্যাজমোগ্যামী গ্যামেট্যানজিয়াল কপুলেশন, গ্যামেটানজিয়াল কন্ট্যাক্ট, স্পারমাটাইজেশন, ও সোমাটোগ্যামীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
- প্ল্যাজমোগ্যামীর ফলে দুটি পৃথক জননকোশের কম্প্যাটিব্ল নিউক্লিয়াসগুলি পরস্পরের কাছাকাছি এসে ডাইক্যারিয়টিক দশার সৃষ্টি করে।
- প্ল্যাজমোগ্যামীর পর ডাইক্যারিয়ন বহনকারী কোশ হতে সৃষ্টি হয় অ্যাসকোজিনাস হাইফা নামক ডাইক্যারিয়টিক হাইফা। ডাইক্যারিয়টিক হাইফা পুষ্টির ব্যাপারে অঙ্গজ হাইফার উপর নির্ভরশীল।
- অ্যাসকোজিনাস হাইফার অগ্রস্থ কোশটি উৎপন্ন করে ক্রোজিয়ার এবং ক্রোজিয়ারের উপপ্রান্তীয় ডাইক্যারিয়টিক কোশ অ্যাসকাস মাতৃকোশ হিসাবে কাজ করে।
- অ্যাসকাস মাতৃকোশে ক্যারিওগ্যামী এবং উৎপন্ন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের মিয়োসিস ও মাইটোসিস বিভাজন ঘটে। মাতৃকোশটি বড় হয়ে অ্যাসকাসে পরিণত হয় যার মধ্যে উৎপন্ন আটটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম সহযোগে আটটি অ্যাসকোরেণুতে পরিণত হয়।
- বেশিরভাগ অ্যাসকোমাইসিটিসে ফলদেহ ও অ্যাসকোকার্প উৎপন্ন হয়।
- ফলদেহ উৎপাদন যৌন জননের প্লাজমোগ্যামী পর্যায়ের পর শুরু হয়।
- ফলদেহ প্রধানতঃ তিন প্রকার — অ্যাপোথেসিয়াম, পেরিথেসিয়াম ও ক্লেইস্টোথেসিয়াম। প্রতিটি ফলদেহের মধ্যে থাকে হাইমোনিয়াম নামক উর্বর স্তর যার মধ্যে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু থাকে।
- অ্যাপোথেসিয়ামে হাইমেনিয়াম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। পেরিথেসিয়াম একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাহিরে উন্মুক্ত। কিন্তু কেইস্টোথেসিয়াম বদ্ধ গঠন। কেইস্টোথেসিয়ামের প্রাচীর বিনষ্ট হলে রেণু বাহিরে নির্গত হতে পারে। নিষ্ক্রান্ত অ্যাসকোরেণু নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।
- অ্যাসকোমাইসিটিসে সাধারণত হ্যাপ্লয়েড-ডাইক্যারিয়টিক জীবনচক্র দেখা যায়। এদের জীবনচক্রে চলরেণু সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত।
- অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিকে ফলদেহের ভিত্তিতে তিনটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

3.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. অ্যাসকোমাইসিটিসের অযৌন জনন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
2. অ্যাসকোমাইসিটিসের প্লাজমোগ্যামীর বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
3. অ্যাসকোজিনাস হাইফা কি? অ্যাসকোজিনাস হাইফা থেকে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
4. অ্যাসকোকার্প কি? অ্যাসকোমাইসিটিসে প্রধানত কয় প্রকার অ্যাসকোকার্প দেখা যায় এবং সেগুলি কি কি? অ্যাসকোকার্পগুলির গঠন চিত্র সহ উল্লেখ করুন।
5. অ্যাসকোমাইসিটিসের জীবনচক্র সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা তুলে ধরুন।

3.10 উত্তরমালা

অনুশীলনী-1

1. জল, স্থল, পর, মৃত
2. অন্তঃপরজীবী, বহিঃপরজীবী
3. খাদ্য
4. অ্যালকালয়েড, উপকারী, অপকারী
5. এককোশী, বিভেদপ্রাচীর, মাইসীলিয়াম, একটি, ছিদ্র
6. হাইফা

অনুশীলনী-2

1. কনিডিওরেণুর
2. নিম্নমুখী, অগ্রোন্মুখী
3. ব্লাস্টো, পুরু
4. বহিপোলার, গৌণ, শারীরবৃত্তীয়ভাবে
5. ডাইক্যারিয়টিক
6. গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশন, গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্ট, স্পারমটাইজেশন, সোমাটোগ্যামী
7. অ্যাসকোজিনাস, ক্রোজিয়ার
8. প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ
9. এক থেকে চারটি, যোলো, পত্রিশ
10. অ্যাপোথেসিয়াম, পেরিথেসিয়াম, ক্লেইস্টোথেসিয়াম
11. হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড, হ্যাপ্লয়েড-ডিপ্লয়েড

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. অনুচ্ছেদ 3.3 দেখুন।
2. অনুচ্ছেদ 3.4.1 দেখুন।
3. অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির উচ্চতর সদস্যদের ক্ষেত্রে প্লাজমোগামীর ফলে যে ডাইক্যারিয়ন বিশিষ্ট কোশ উৎপন্ন হয়, তা থেকে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ ধরনের অধিক ব্যাসযুক্ত হাইফা, যার ডাইক্যারিয়টিক কোশ হতে সৃষ্টি হয় অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু। এই প্রকার হাইফাকে অ্যাসকোজিনাস হাইফা বলে। পরবর্তী প্রশ্নগুলির জন্য—

   অনুচ্ছেদ 3.4.2.1 ii ও 3.4.2.2 দেখুন
4. অ্যাসকোকার্প হল অ্যাসকোমাইসিটিসের ফলদেহ যা বহুকোশীয় ও বিশেষ বিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট এবং এর মধ্যে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়। অ্যাসকোকার্প মূলতঃ বন্ধ্যা হাইফা ও উর্বর হাইফা দ্বারা গঠিত গঠন যা পুষ্টির ব্যাপারে অঙ্গজ হাইফার উপর নির্ভরশীল।

   বাকী প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ 3.5.2 দেখুন।
5. অনচ্ছেদ 3.6 দেখুন।

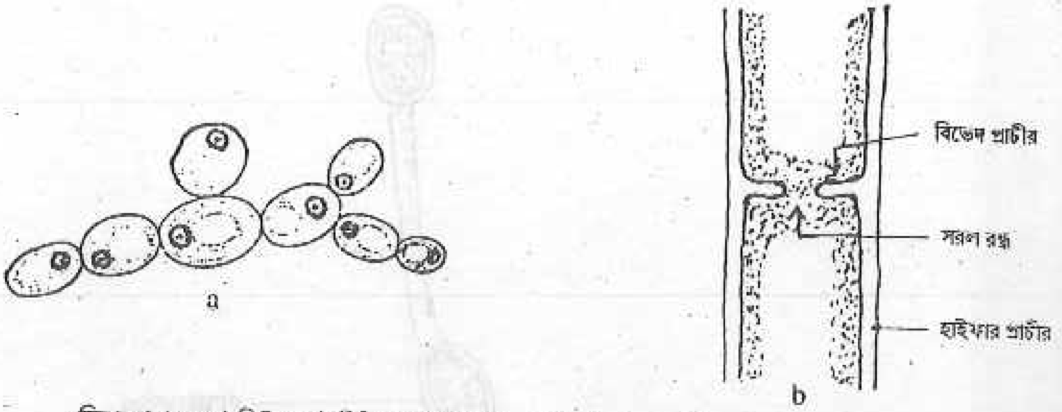

চিত্র নং 3.1 ঃ (a) সিউডোমাইসীলিয়াম (Pseudomycelium) (b) কেন্দ্রীয় সরল রন্ধ্রযুক্ত বিভেদ প্রাচীর।

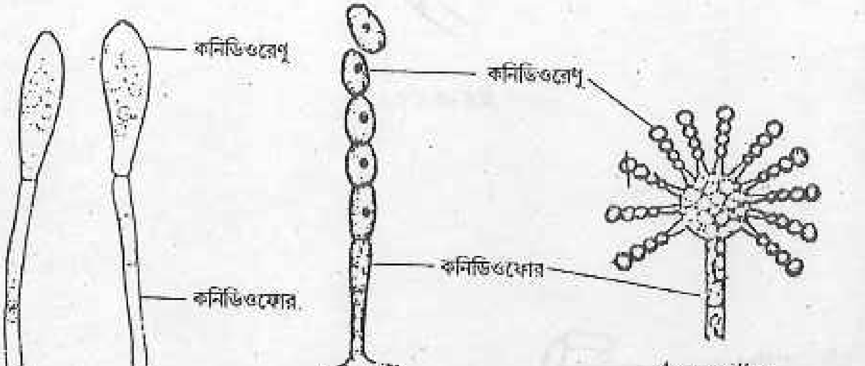

চিত্র নং 3.2 ঃ

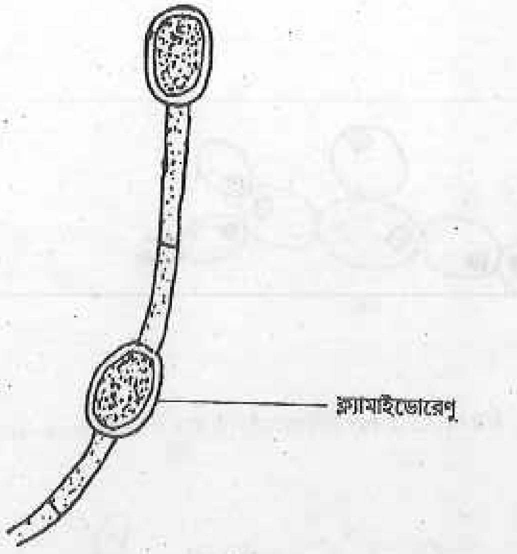

চিত্র নং 3.3 :

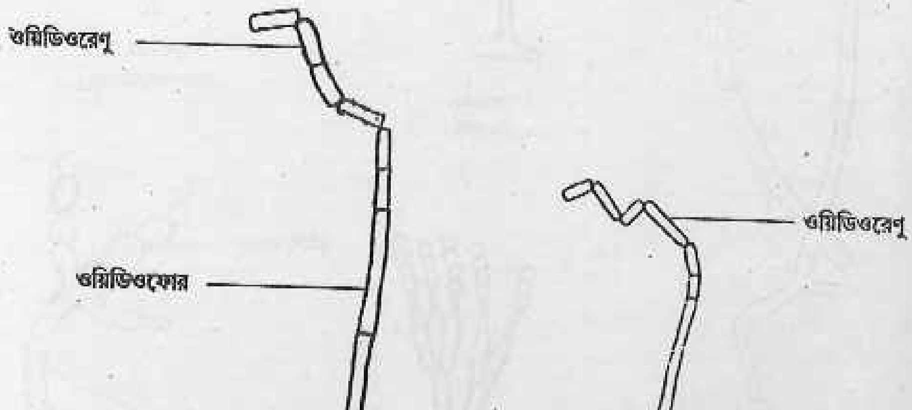

চিত্র নং 3.4 :

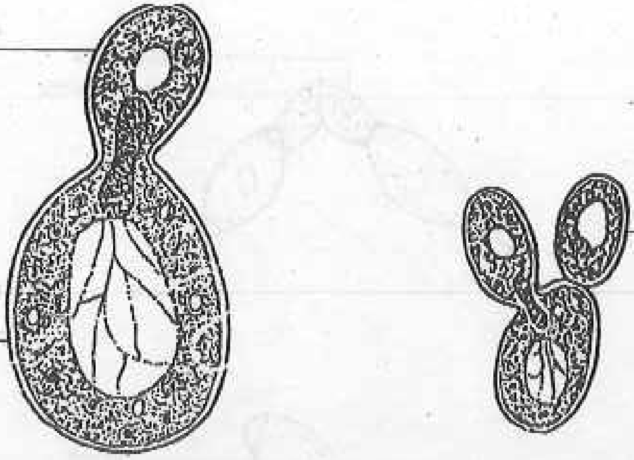

চিত্র নং 3.5

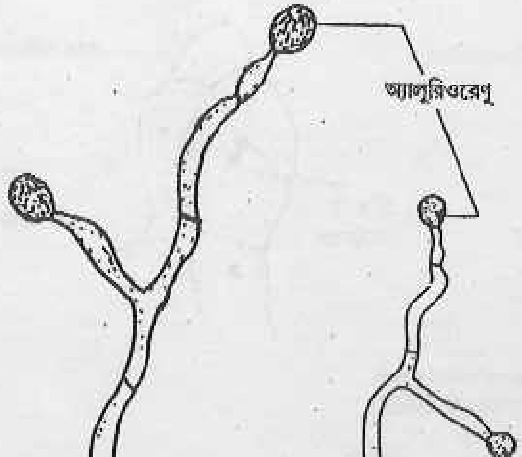

চিত্র নং 3.6

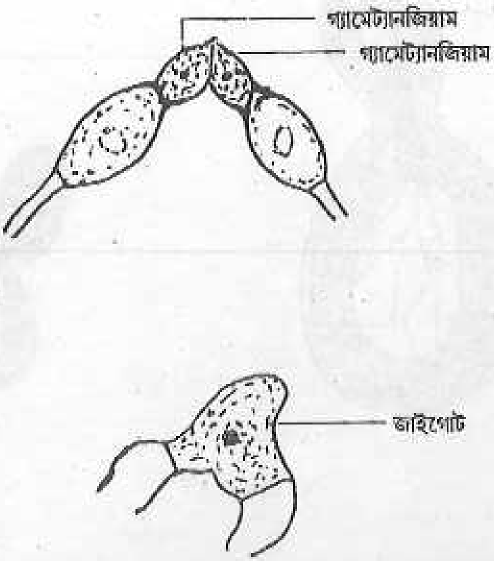

চিত্র নং 3.7 ঃ *Dipodascus (ডাইপড অ্যাসকাস)*, গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশন

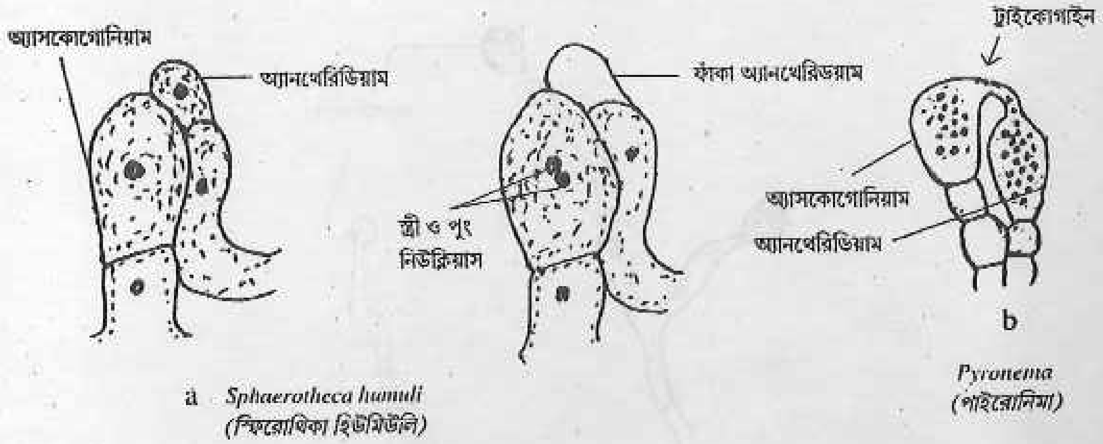

চিত্র নং 3.8 ঃ গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্ট

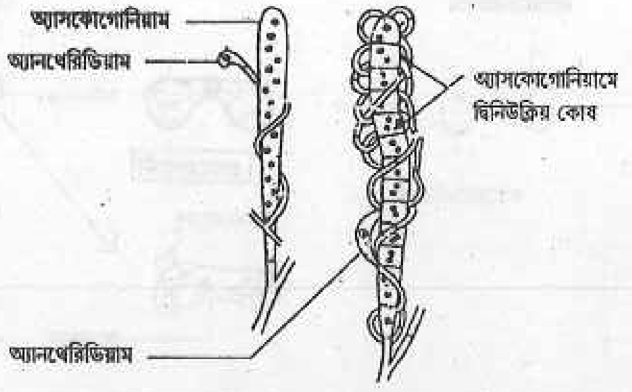

চিত্র নং 3.9 : গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্ট — *Penicillium vermiculatum (পেনিসিলিয়াম ভারমিকিউলেটামে)*

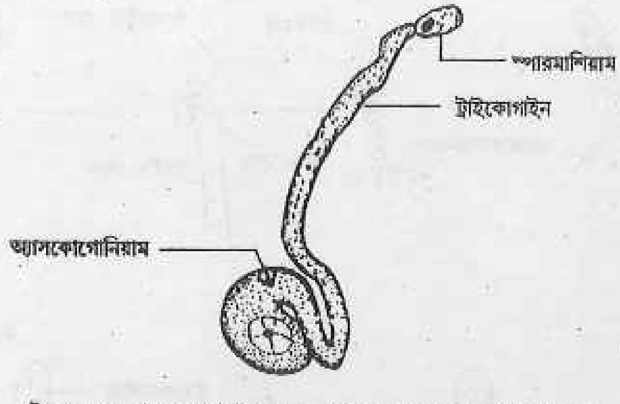

চিত্র নং 3.10 : স্পারমাটাইজেশন- *Mycosphaerella tulipiferae (মাইকোস্ফিরেলা টুলিপিফেরিতে)*

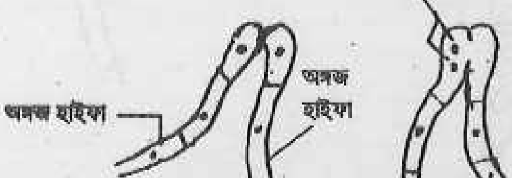

চিত্র নং 3.11 : সোমাটোগ্যামী

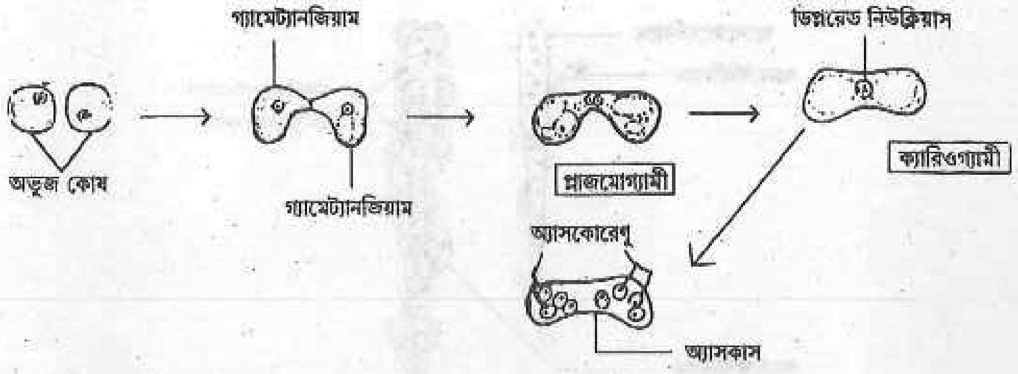

চিত্র নং 3.12 : প্রত্যক্ষ অ্যাসকাস উৎপাদন (সাইজোস্যাকারোমাইসিস)

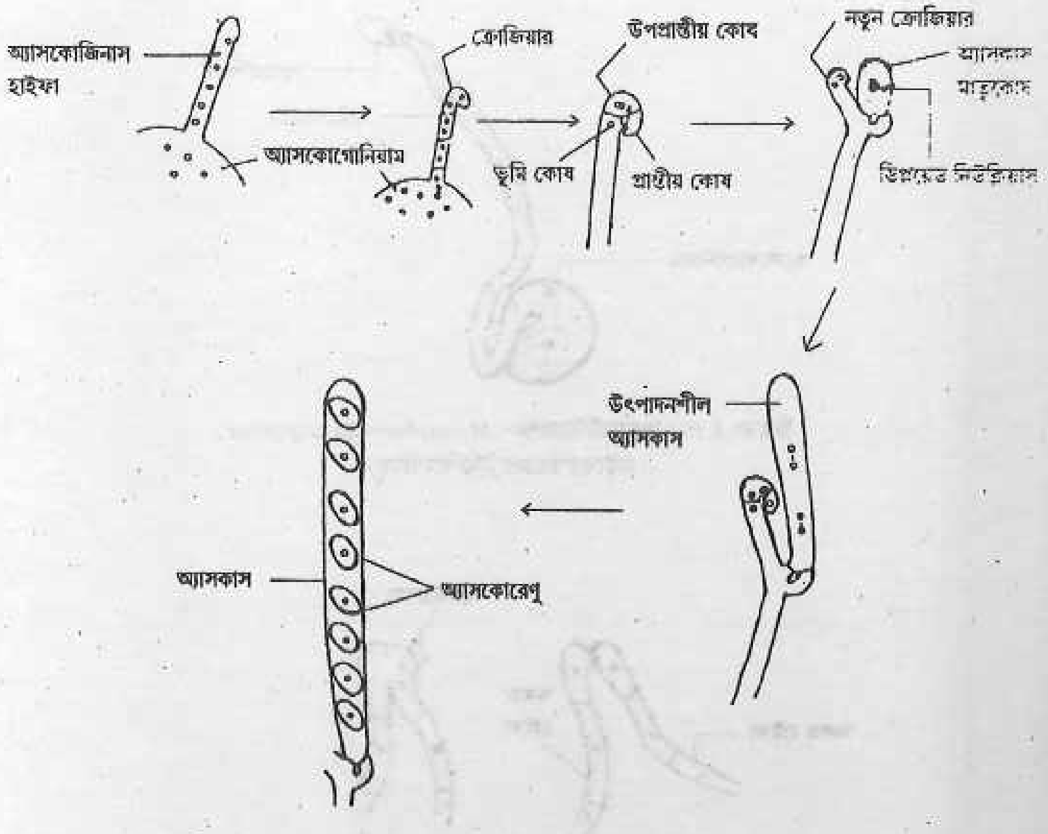

চিত্র নং 3.13 : পরোক্ষ অ্যাসকাস উৎপাদন

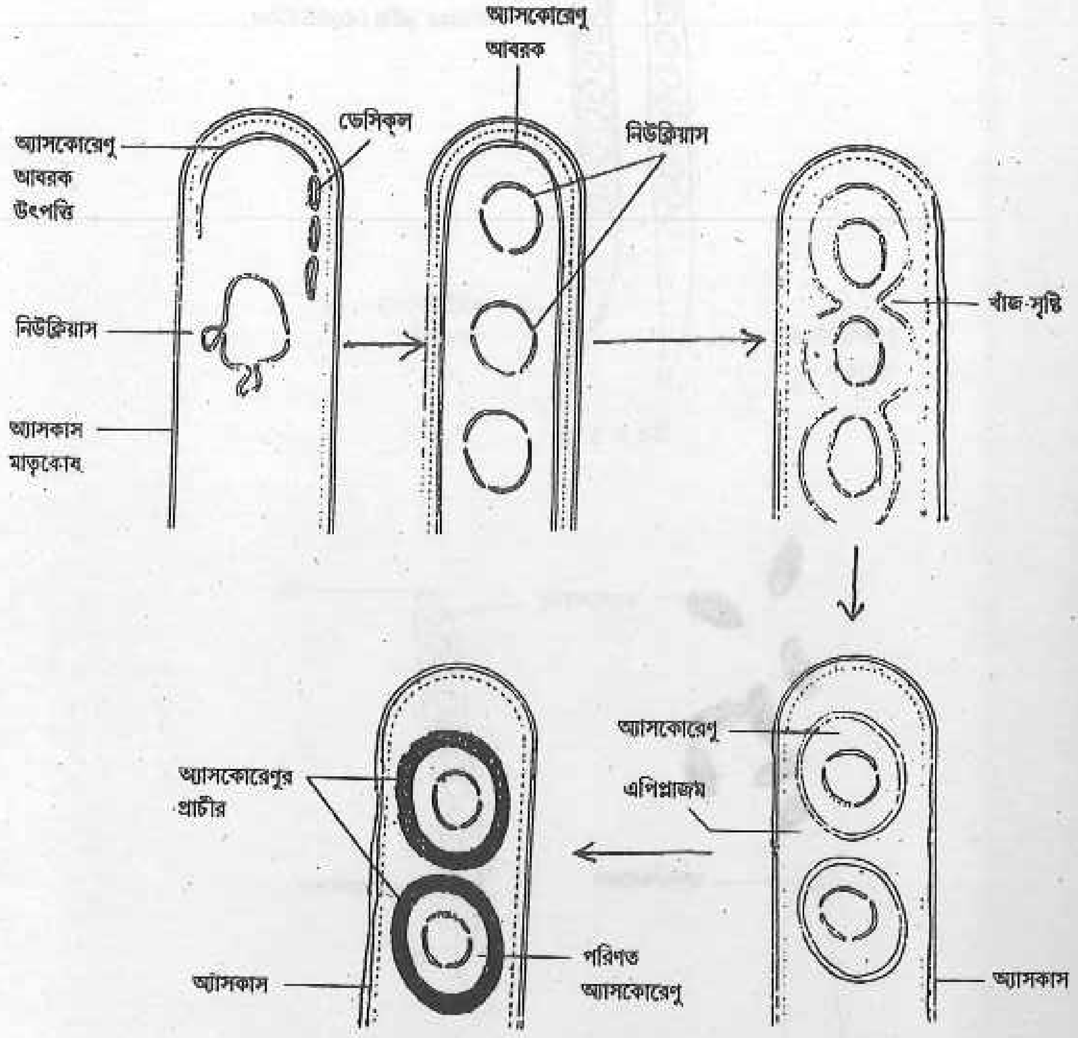

চিত্র নং 3.14 : অ্যাসকোরেণু উৎপাদন

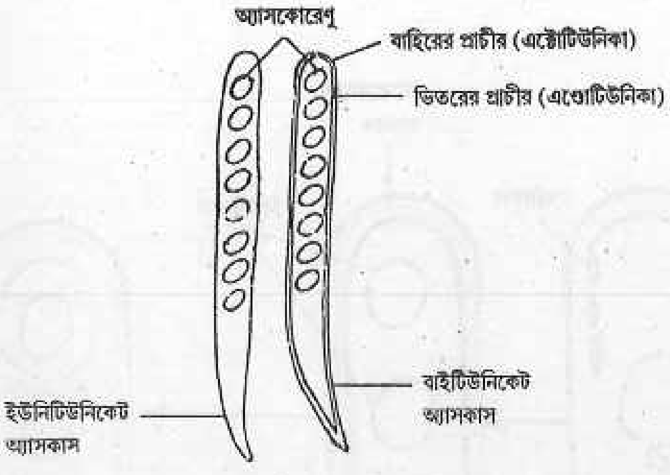

চিত্র নং 3.15

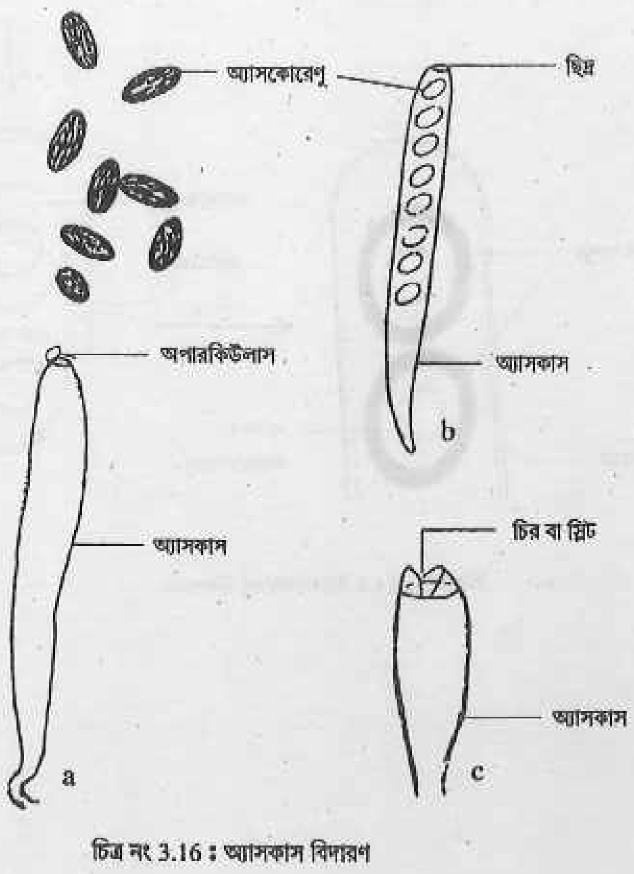

চিত্র নং 3.16 : অ্যাসকাস বিদারণ

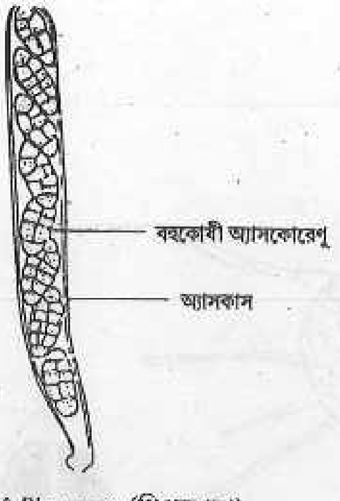

চিত্র নং 3.17 : *Pleospora (প্লিওস্পোরা)*

চিত্র নং 3.18

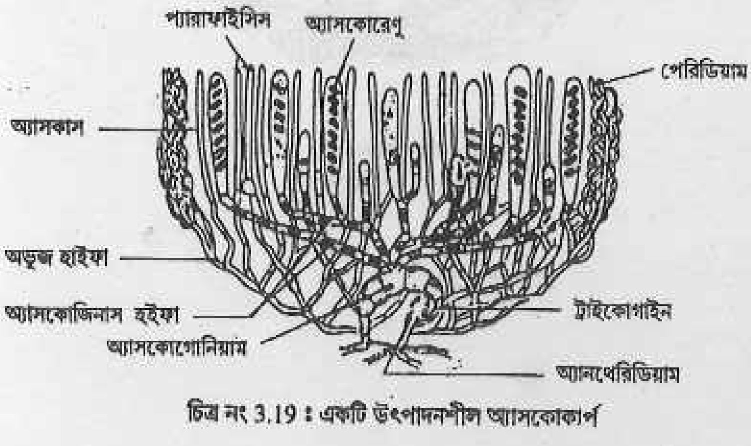

চিত্র নং 3.19 : একটি উৎপাদনশীল অ্যাসকোকার্প

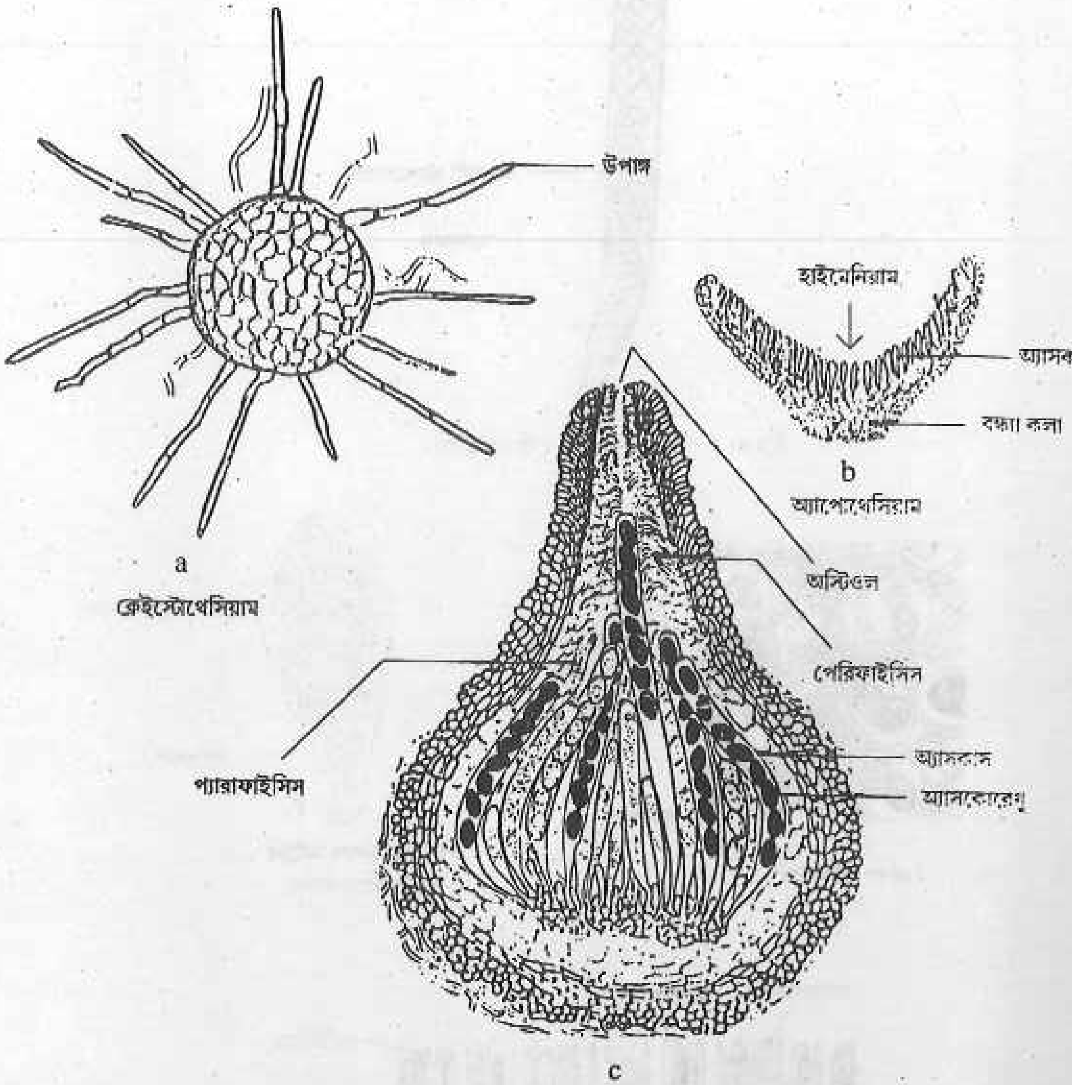

a
ক্লেইস্টোথেসিয়াম

b
অ্যাপোথেসিয়াম

c
পেরিথেসিয়াম
(Sordaria, সরড্যারিয়া)

চিত্র নং 3.20

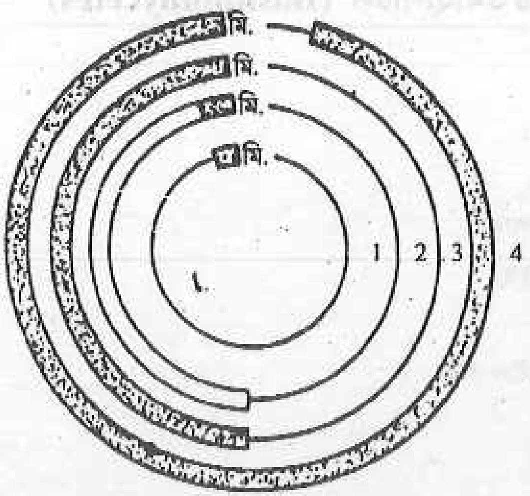

চিত্র নং 3.22 : অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণীর
বিভিন্নপ্রকার জীবন চক্রের সংক্ষিপ্ত রূপ।

মি	= মিয়োসিস	1.	হ্যাপ্লয়েড জীবন চক্র
▯	= ডিপ্লয়েড দশা	2.	হ্যাপ্লয়েড-ডাইক্যারিওটিক চক্র
□	= ডাইক্যারিয়টিক দশা	3.	হ্যাপ্লয়েড-ডিপ্লয়েড চক্র
I	= হ্যাপ্লয়েড দশা	4.	ডিপ্লয়েড চক্র

একক 4 □ বেসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes)

গঠন

4.1	প্রস্তাবনা
	উদ্দেশ্য
4.2	প্রকৃতিতে অবস্থান
	অর্থনৈতিক গুরুত্ব
	অঙ্গজ গঠন
4.3	অঙ্গজ ও অযৌন জনন
4.4	যৌন জনন
4.5	বেসিডিওকার্প
4.6	জীবনচক্র
4.7	শ্রেণিবিন্যাস
4.8	সারাংশ
4.9	সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
4.10	উত্তরমালা

4.1 প্রস্তাবনা

আপনারা পূর্ববর্তী এককটি (একক-3) থেকে জানতে পেরেছেন অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির মাইসীলিয়াম বিভেদ প্রাচীর বা ব্যাবধায়ক যুক্ত। এদের বিভেদ প্রাচীরের কেন্দ্রে রয়েছে একটি সরল রন্ধ্র। এদের ফলদেহ উৎপন্ন হয়। ফলদেহ অঙ্গজ হাইফা ও অ্যাসকোজিনাস হাইফা দিয়ে তৈরি। ফলদেহ পুষ্টির ব্যাপারে অঙ্গজ হাইফার উপর নির্ভরশীল। অ্যাসকোজিনাস হাইভা ডাইক্যারিওটিক এবং অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু (অন্তঃরেণু) উৎপন্ন করে। অ্যাসকাসগুলি ফলদেহের হাইমেনিয়াম স্তরে বিন্যস্ত থাকে। আপনারা একক - 1 থেকে এও জেনেছেন যে বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির মাইসীলিয়াম বিভেদ প্রাচীরযুক্ত। এদের বেসিডিয়াম (basidium) ও বেসিডিওরেণু (basidiospore) উৎপন্ন হয়। বেসিজিওরেণু বেসিডিয়ামের উপর সজ্জিত থাকে, তাই এগুলি বহিঃরেণু। এই শ্রেণির বৃহৎ এবং ছত্রাকের উচ্চতম সদস্যসমৃধ। বৃহদাকার ও নানান বৈশিষ্ট্যের ফলদেহ এই শ্রেণিটিকে এক আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। কয়েকটি বিশেষ আকৃতির ফলদেহসহ ছত্রাক যেমন, মাশরুম (mushroom), চোডস্টুল (toadstool), পাফ-বল (puff-ball), ষ্টিংক্‌হরণ্‌ (stink horn), ব্যাকেট-ছত্রাক (bcacket fungus), ভূমি-তারকা (earth-stars), পাখীর-বাসা ছত্রাক (bird's nest fungus), জেলী ছত্রাক (gelly fungus) এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিচারে ও অবস্থানের বৈচিত্রে এই শ্রেণিটির বিশেষত্ব অনস্বীকার্য। তাই এই শ্রেণিটি সম্পর্কে আপনাদের যথাযথ জানা খুবই দরকার।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির সদস্যদের পুষ্টিসংগ্রহের পদ্ধতি এবং তাদের অঙ্গজ গঠন বৈচিত্র্য, তাদের উপকারী ও অপকারী ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এই শ্রেণির সদস্যরা কিভাবে তাদের জনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- ফলদেহের গঠন বিচিত্র নির্ধারণ করতে পারবেন।
- জীবনচক্রের প্রকারভেদ নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন।
- শ্রেণিটিকে বর্ণনার সুবিধার জন্য কোন কোন উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

4.2.1 প্রকৃতিতে অবস্থান :

এই শ্রেণির সদস্যদের মধ্যে কিছু জলবাসী (*Nia vibrissa, নিয়া বিব্রিসা*) এবং অধিকাংশ স্থলবাসী এরা মৃতজীবী, পরজীবী অথবা মিথোজীবী। মৃতজীবী সদস্যগুলি পতা কাঠের গুড়ি, গোবর, জৈবপদার্থযুক্ত মাটি ইত্যাদিতে জন্মায়। পরজীবী সদস্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বাধ্যতামূলক পরজীবী-মরীচা বা রাস্ট (Rust) রোগ উৎপাদনকারী ও স্মার্ট (smut) রোগ উৎপাদনকারী ছত্রাক। এছাড়া কোন কোন সদর্স যেমন, *Armillaria mellea (আরমিল্যারিয়া মেলিয়া), Polyporus (পলিপোরাস)* ইত্যাদি বিভিন্ন কাষ্ঠল উদ্ভিদে পরজীবী হিসাবে বস-বাস করে, রোগ ঘটায় ও কাঠের ক্ষতি করে। আবার কতগুলি এই শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের মূলের সঙ্গে মাইকোরাইজা (mycorrhiza) গঠন করে (যেমন- *Russula (রুসুলা), Tricholoma (ট্রাইকোলোমা)* ইত্যাদি।

4.2.2 অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ বেসিজিওমাইসিটিস শ্রেণিটি একদিকে যেমন উপকারী অপরদিকে তেমনি অপকারী ভূমিকা পালন করে। মাইকোরহিজা হিসেবে অবস্থান করে বিভিন্ন উদ্ভিদের পুষ্টি (খনিজ লবণ) যোগান দেয়। বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির কোনো কোনো সদস্যের রয়েছে ওষধি গুন, যেমন *Calvatia gigantea (ক্যালভাসিয়া জাইগানসিয়া)* থেকে পাওয়া যায় ক্যালভাসিন (Calvacin) যা ক্যানসার প্রতিরোধক। এই শ্রেণির অনেক সদস্য বনাঞ্চলে মাটিতে পড়ে থাকা পাতা ও ডালপাতার বিয়োজন (Degradation) ঘটিয়ে মাটিতে উর্বর করে তোলে। অনেক মাশরুম রয়েছে যেগুলি ভক্ষণীয়। সারা পৃথিবীতে এই সমস্ত মাশরুম দ্বারা প্রস্তুতি খাদ্য উপাদেয় পদ হিসাবে বিবেচিতক। এ ব্যাপারে অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস *(Agaricus bisporus)* চাষের উপযুক্ত, সুস্বাদু ও সর্বাধিক ব্যবহৃত মূল্যবান (highly prized) মাশরুম। সারা পৃথিবীতে অর্থকরী ফসল হিসাবে ভক্ষণীয় মাশরুমের (edible mushrooms) চাষ ব্যাপকভাবে হচ্ছে যেমন, *Volvariella volvacea (ভলভারিয়েল্লা ভল্ভাসিয়া)* কয়েকটি প্রজাতির প্লুরোটাস *(Pleurotus spp.) Lentinus edodes (লেনটাইনাস ইডোডিস্)* ইত্যাদি। ভক্ষণীয় মাশরুম যেমন রয়েছে, বিষাক্ত মাশরুমও বেশ কয়েকটি আছে। তাদের কয়েকটির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন, *Amanita*

phalloides (*অ্যামানিটা ফ্যালয়ডিস্*), *Amanita pantherina* (*অ্যামানিটা প্যানথেরিনা*), (*Amanita verna, অ্যামানিটা ভারনা*), *Russula lividus* (*রুসুলা লিভিডাস*), *Lepiota morgani* (*লেপিওটা মরগ্যানি*) ইত্যাদি। কাজেই ভুলবশতঃ এই সমস্ত মাশরুম খেয়ে ফেললে এদের বিষের প্রভাবে মারাত্মক ক্ষতিসাধন এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

আবার রাস্ট ও স্মাট ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্ট রোগের ফলে সারা পৃথিবীতে দানা শস্যের (cereal grains) ফলনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হচ্ছে। এছাড়া অনেক বেসিডিওমাইসিটিস সদস্য রয়েছে যারা বিভিন্ন উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। *Coriolus versicolor* (*কোরিওলাস ভারসিকলর*), *Fomes annosus* (*ফোমিস অ্যানোসাস*) ইত্যাদি ছত্রাক কাঠের শ্বেত পচন (white rot) এবং *Lenzites* (*লেনজাইটিস*) ইত্যাদি ছত্রাক কাঠের বাদামী পচন ঘটিয়ে বিপুল ক্ষতি সাধন করে।

4.2.3 অঙ্গজ গঠন ঃ

অঙ্গজ দেহটি বিভেদপ্রাচীরযুক্ত মাইসীলিয়াম। বেসিডিওরেণু (জননরেণু) অঙ্কুরিত হয়ে এই মাইসীলিয়াম উৎপন্ন হয়, তাই একে প্রাথমিক (Primary) মাইসীলিয়াম বলে। বেসিডিওরেণু হতে যখন প্রথম উৎপন্ন হয় তখন এটি বহুনিক্লিয় (multinucleate) গঠনে থাকে, পরে বিভেদ প্রাচীর সৃষ্টি হয়ে এটিকে একক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট বহুকোশী মাইসীলিয়াম বা মনোক্যারিওটিক (Monokaryotic) মাইসীলিয়ামে পরিণত করে। এই হ্যাপ্লয়েড মাইসীলিয়াম শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, কোষপ্রাচীর কাইটিন-গ্লুকান দ্বারা গঠিত, কোনো কোনো প্রজাতিতে কাইটিন-মান্নানের (chitin-mannan) রাসায়নিক গঠন পাওয়া যায়। বিভেদ প্রাচীরে একটি বিশেষ প্রকারের রন্ধ্র বা ছিদ্র থাকে যার কিনারা বরাবর বিভেদ প্রাচীর ফুলে ওঠার ফলে পিপে আকৃতির একটি গঠন সৃষ্টি করে। এইরূপ বিশেষ রন্ধ্রযুক্ত বিভেদ প্রাচীরকে ডলিপোর ব্যবধায়ক (Dolipore septum) বলে (চিত্র 4.1)। এটি বেসিডিওমাইসিটিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং বেশিরভাগ বেসিডিওমাইসিটিসের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তবে রাষ্ট (Rust) ও স্মাট (Smut) ছত্রাকে এটি অনুপস্থিত (এদের ক্ষেত্রে সরল ছিদ্র যুক্ত বিভেদ প্রাচীর দেখা যায়)। ডলিছিদ্রের উপরে ও নীচে একটি করে ছিদ্রাল টুপি (এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাস দ্বারা সৃষ্ট) থাকে। এই টুপিকে প্যারেনথেসোম (Parenthesome) বলে।

প্রাথমিক বা অঙ্গজ মাইসীলিয়াম ছাড়াও বেসিডিওমাইসিটিসে আরও দু'প্রকার মাইসীলিয়াম দেখতে পাওয়া যায় এগুলি যথাক্রমে গৌণ বা সেকেন্ডারী মাইসীলিয়াম (Secondary Mycelium) ও টারশিয়ারী মাইসীলিয়াম (Tertiary mycelium)। এই মাইসীলিয়ামগুলি বেসিডিওমাইসিটিসের যৌন জননের প্লাজমোগামী ও ক্যারিওগ্যামীর অন্তবর্তী ডাইক্যারিও দশায় সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ এগুলি ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম এবং জনন সম্পর্কিত মাইসীলিয়াম। যৌন জননের সময় প্রাথমিক মাইসীলিয়াম থেকে উৎপন্ন হয় গৌণ মাইসীলিয়াম, এবং ফলদেহ উৎপাদনে যে সমস্ত গৌণ হাইফা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে একযোগে টারশিয়ারী মাইসীলিয়াম বলে। ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামও বিভেদপ্রাচীর যুক্ত ও অসংখ্য শাখা প্রশাখা যুক্ত। বিভেদপ্রাচীর ডলি ছিদ্র (dolipore) বিশিষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাইক্যারিটিক মাইসীলিয়ামের বিভেদপ্রাচীর অংশে একপ্রকার পার্শ্বীয় বহিঃ বৃদ্ধি দেখা যায়। এগুলিকে ক্ল্যাম্প (clamp) বলে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখলে মনে হবে ক্ল্যাম্পগুলি পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ডাইক্যারিওটিক কোশের মধ্যে যেন সেতু রচনা করেছে, তাই এগুলিকে ক্ল্যাম্প সংযোজক বা ক্ল্যাম্প ক্যানেকসন (Clamp connection) বলে।

অনেকে এই ক্ল্যাম্পকে অ্যাসকোমাইসিটিসের ক্রোজিয়ারের সাথে তুলনা করেছেন। এই ক্ল্যাম্প ক্যানেকসন সাধারণত উৎপন্ন হয় কোশের বিভাজনের সময়। কোশ-বিভাজন সাধারণত প্রান্তীয় কোশে ঘটে। ক্ল্যাম্প ক্যানেকসন উৎপাদন পদ্ধতি চিত্রে (4.2) উল্লেখ করা হল—

অনুশীলনী - 1

নিচের তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

a) বেসিডিওমাইসিটিসের বেশিরভাগ সদস্য ________ বাসী।

b) *Nia vibrissa (নিয়া ভিব্রিসা)* একটি ________ বাসী বেসিডিওমাইসিটিস।

c) বেসিডিওমাইসিটিসের পুষ্টি ________, ________ অথবা ________।

d) পৃথিবীতে খাদ্য হিসাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত মাশরুমটি হল ________ ।

e) কাঠের শ্বেত পচনের জন্য দায়ী একটি ছত্রাক ________ ও কাঠের বাদামী পচনের জন্য দায়ী ________ ।

f) বেসিডিওমাইসিটিসের অঙ্গজ দেহ ________ মাইসীলিয়াম, অন্যান্য মাইসীলিয়ামগুলি ________ ও ________।

g) বেশিরভাগ বেসিডিওমাইসিটিস সদস্যের বিভেদ প্রাচীরে (ব্যবধায়ক) ________ থাকে, ________ ও ________ ছত্রাকের বিভেদ-প্রাচীরে এটি অনুপস্থিত।

h) বেসিডিওমাইসিটিসের বিভেদ প্রাচীর সংলগ্ন অংশে পার্শ্বী বৃদ্ধিকে ________ বলা হয় এবং এটি ________ মাইসীলিয়ামে দেখা যায়।

i) ক্ল্যাম্প সংযোজক ________ সময় হাইফার ________ কোশে উৎপন্ন হয়।

(পরজীবিয়, লেনজাইটিস, কোরিওলাস ভারসিকলার, অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস, প্রাইমারী, ডলিছিদ্র, স্থল, জল, মৃতজীবিয়, টারসিয়ারী, ক্ল্যাম্প, মিথোজীবিয়, সেকেন্ডারী, রাষ্টি, ডাইক্যারিওটিক, প্রান্তীয়, কোশ বিভাজনের স্মাট।)

4.3 অঙ্গজ ও অযৌন জনন

বেসিডিওমাইসিটিস অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এই তিন প্রকার পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করতে পারে। অঙ্গজ জনন মাইসীলিয়ামের খণ্ডাংশ দ্বারা সম্পন্ন হয়, পদ্ধতিটিকে ফ্র্যাগমেনটেশন (fragmentation) বলা হয়। অযৌন জনন : ওয়িডিওরেণু, কনিডিওরেণু ক্ল্যামাইডোরেণু ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

ওরিডিওরেণু (চিত্র 4.3) : বেসিডিওমাইসিটিসের কিছু সদস্য ওয়িডিওরেণুর (oidiospore) মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন করে। এগুলি পাতলা প্রাচীরযুক্ত এককোশী রেণু। ওয়িডিওরেণু সাধারণত সুনির্দিষ্ট ওয়িডিওফোরের (oidiophore) অগ্রভাগে উৎপন্ন হয়। প্রাথমিক মাইসীলিয়াম থেকে উৎপন্ন ওয়িডিওরেণু এক নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং এগুলি সাধারণত যৌন জননে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম থেকে উৎপন্ন ওয়িডিওরেণু দ্বি-নিউক্লিয়াস (binucleate) বিশিষ্ট এবং এগুলি সাধারণত অযৌন জননে অংশগ্রহণ করে, অর্থাৎ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন

ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম গঠন করে। *Coprinus cinereus (কোপ্রাইনাস সিনেরিয়াস), Peniophora (পিনিওফোরা জাইগ্যানটিয়া)* ইত্যাদি সদস্যে ওয়িডিওরেণু উৎপন্ন হতে দেখা যায়।

কনিডিওরেণু ঃ কোনও কোনও বেসিডিওমাইসিটিস সদস্য কনিডিওরেণুর (conidium) মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন করে, উদাহরণ- *Heterobasidion annosum (হেটারোবেসিডিয়ন অ্যানোসাম)* (চিত্র 4.4 a)। এছাড়া *Puccinia (পাকসিনিয়া)* নামক রাস্ট ছত্রাক ইউরিডো রেণু (Uredo spore) তৈরি করে (চিত্র 4.4b)। উৎপত্তি ও কাজ অনুসারে এগুলিও একপ্রকার কনিডিওরেণু।

ক্ল্যামাইডোরেণু ঃ বেসিডিওমাইসিটিসে পুরু প্রাচীরযুক্ত ক্ল্যামাইডোরেণু (Chlamydospore) উৎপন্ন হতে দেখা যায়। প্রতিকূল পরিবেশে ছত্রাকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এই রেণু সাহায্য করে। *Nyctalis (নিক্ট্যালিস), Volvariella (ভলভ্যারিয়েল্লা)* ইত্যাদি ছত্রাকে ক্ল্যামাইডোরেণু দেখা যায়। ক্ল্যামাইডোরেণ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।

4.4 যৌন জনন :

বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির সদস্যগুলি শতকরা দশভাগ হোমোথ্যালিক (সহবাসী) ও নব্বইভাগ হেটারোথ্যালিক (ভিন্নবাসী) হেটারোথ্যালিক সদস্যগুলির বেশিরভাগ টেট্রাপোলার (tetrapolar) ও বাকী বাইপোলার (bipolar) উল্লেখ্য রাষ্ট ও স্মাট ছত্রাক বাইপোলার। বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিটি যৌন জননে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট প্রদর্শন করে। এগুলি হল— (i) গ্যামেট্যানজিয়াম সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত, (ii) দীর্ঘতম ডাইক্যারিওটিক দশা ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম কর্তৃক উপস্থাপিত, (iii) ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম পুষ্টির ব্যাপারে প্রাথমিক বা মোনোক্যারিওটিক বা অঙ্গজ মাইসীলিয়ামের উপর নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ এর নিজের পুষ্টি ধাত্র হতে নিজেই সংগ্রহ করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিটি অ্যাসকোমাইটিস অপেক্ষা নিজেকে অনেক উন্নত করে ফেলেছে।

বেসিডিওমাইসিটিসে যৌন জননে প্লাজমোগ্যামীর সাহায্যে দুটি সুসঙ্গত প্রকৃতির বা কম্প্যাটিব্‌ল্ (compatible) নিউক্লিয়াস পরস্পরের কাছাকাছি আসে, এরপর দীর্ঘতম ডাইক্যারিও দশা চলতে থাকে, অবশেষে ক্যারিওগামী ও মিয়োসিস অনুষ্ঠিত হয়ে বেসিডিওরেণু উৎপন্ন হয়।

4.4.1 প্ল্যাজমোগ্যামী :

প্লাজমোগ্যামী দুভাবে ঘটে (i) স্পারমাটাইজেশন ও (ii) সোমাটোগ্যামী। এই দুই ক্ষেত্রেই প্ল্যাজমোগ্যামীর ফলে প্রাথমিক বা মোনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম হতে ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামের সৃষ্টি হয়। এরূপ মোনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম হতে ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম সৃষ্টির ঘটনাকে ডাইক্যারিওটাইজেশন (dikariyotization) বলে।

(i) স্পারমাটাহজেশন (চিত্র 4.5) ঃ এক্ষেত্রে এককোশী ও এক নিউক্লিয়াস যুক্ত রেণু (স্পারমাটিয়াম) যখন একটি যৌন মিলনে সুসংগত প্রকৃতির (কমপ্যাটিব্‌ল) মনোক্যারিওটিক হাইফার সংস্পর্শে আসে তখন উভয়ের স্পর্শস্থল বরাবর প্রাচীর বিনষ্ট হয় ও প্লাসমোগ্যামী সংগঠিত য়ে ডাইক্যারিও দশার সৃষ্টি হয়। ওয়িডিওরেণু (সাধারণত মনোক্যারিওটিক ওয়িডিওরেণু) অনেক সময় স্পারমাটিয়াম হিসাবে কাজ করে এবং প্রাথমিক বা মনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামের সাথে স্পারমাটাইজেশন ঘটায়।

(ii) সোমাটোগ্যামী (চিত্র 4.6) : এক্ষেত্রে দুটি হাইফা সরাসরি প্লাজমোগ্যামীতে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী হাইফা দুটির উভয়েই মনোক্যারিওটিক অথবা একটি মনোক্যারিওটিক ও অপরটি ডাইক্যারিওটিক হতে পারে।

(a) দুটি মনোক্যারিওটিক হাইফার মধ্যে সোমাটোগ্যামী : এক্ষেত্রে কম্প্যাটিবল নিউক্লিয়াস বহনকারী দুটি মনোক্যারিওটিক হাইফার মধ্যে প্ল্যাজমোগ্যামী ঘটে। মনোক্যারিওটিক হাইফা দুটি পরস্পরের সংস্পর্শে এলে স্পর্শস্থল বরাবর হাইফা দুটির কোশ প্রাচীর বিনষ্ট হয় এবং একটি হাইফা কোশের নিউক্লিয়াস অপর হাইফার কোশে প্রবিষ্ট হয় ও দ্বি-নিউক্লিয় বা ডাইক্যারিওটিক কোশের সৃষ্টি হয়। এই ডাইক্যারিওটিক কোশ হতে একটি ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামের সৃষ্টি হতে পারে।

> বুলার ফেনোমেন
>
> এই ঘটনাটি বিজ্ঞানী A.H.R. Buller (1931) কোপ্রাইনাস সাইনেরিয়াস (*Coprinus cinereus*) নামক ছত্রাকে প্রথম আবিষ্কার করেন। তাই তাঁর নাম নামানুসারে এই ঘটনাকে বুলার ফেনোমেনন বলা হয়।

(b) একটি মনোক্যারিওটিক ও একটি ডাইক্যারিওটিক হাইফার মধ্যে সোমাটোগ্যামী : এক্ষেত্রে হাইফা দুটি পরস্পরকে স্পর্শ করলে এবং স্পর্শস্থল বরাবর প্রাচীর দ্রবীভূত হলে ডাইক্যারিওটিক হাইফার কোশের কম্প্যাটিবল নিউক্লিয়াস মনোক্যারিওটিক কোশে প্রবেশ করে। এইরূপে একটি ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম কর্তৃক একটি মনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামকে ডাইক্যারিওটিক করারূপ ঘটনাকে বুলার ফেনোমেনন (Buller Phenomenon) বলা হয়।

4.4.2 ক্যারিওগ্যামী :

প্লাজমোগ্যামীর ফলে যে ডাইক্যারিও দশার সৃষ্টি হয়, তা উৎপন্ন ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম বেশিরভাগ বেসিডিওমাইসিটিসের ক্ষেত্রে ফলদেহ বা বেসিডিওকার্প উৎপন্ন করে। এই বেসিডিওকার্পের একটি নির্দিষ্ট অংশে হাইমেনিয়াম (hymenium) বা উর্বর স্তর বিস্তৃত থাকে। হাইমেনিয়াম অঞ্চলে ডাইক্যারিওটিক হাইফা থেকে বেসিডিয়াম (basidium) উৎপন্ন হয়। তরুন বেসিডিয়ামের মধ্যে ক্যারিওগ্যামী ও মিয়োসিস সংগঠিত হয় এবং বেসিডিয়াম থেকে বেসিডিওরেণু (basidiospore) উৎপন্ন হয়।

4.4.2.1 বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণু উৎপাদন :

হাইমেনিয়াম অঞ্চলে ডাইক্যারিওটিক হাইফার প্রান্তীয় কোশ হতে বেসিডিয়াম উৎপন্ন হয় (চিত্র 4.7)। সাধারণত এই প্রান্তীয় কোশের ভূমি অংশে ক্ল্যাম্প কানেকশন দেখা যায়। বেসিডিয়াম উৎপাদনকারী প্রান্তীয় ডাইক্যারিওটিক কোশটি বৃদ্ধি পেয়ে তরুন বা অপরিনত বেসিডিয়ামে রূপান্তরিত হয়। এই অপরিনত বেসিডিয়ামকে বেসিডিওলও (Basidiole) বলা হয়। বেসিডিওলের মধ্যে দুটি কম্প্যাটিব্‌ল নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্যারিওগ্যামী ঘটে ও বেসিডিওলকে ডিপ্লয়েড কোশে পরিণত হয়। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি সৃষ্টির প্রায় পরপরই মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। ইতিমধ্যে বেসিডিওলটির মধ্যে অবস্থিত ছোট ছোট ভ্যাকুওলগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি ভ্যাকুওলে পরিণত হয়। এই ভ্যাকুওলটি দ্রুত বড় হতে থাকে এবং এর চাপে বেসিডিওলটি দ্রুত বড় হয়ে বেসিডিয়ামে পরিণত হয়। বেসিডিয়ামের অগ্রভাগে শিঙের ন্যায় চারটি সরু সরু উপবৃদ্ধি স্টেরিগমা (Sterigma) সৃষ্টি হয়। প্রতিটি স্টেরিগমার অগ্রভাগ ফুলে ওঠে যার মধ্যে বেসিডিয়াম থেকে একটি নিউক্লিয়াস ও কিছু সাইটোপ্লাজম

প্রবিশ্ট হয়ে একটি হ্যাপ্লয়েড বেসিডিওরেণু উৎপন্ন হয়। বেসিডিও রেণুর যে অংশ স্টেরিগমার সঙ্গে লেগে থাকে সেই অংশকে হাইলাম (Hilum) বলে। হাইলামের সন্নিকটে বেসিডিওরেণুর পাদদেশে একটি খুবই ছোট আকারের উপবৃদ্ধিকে হাইলার অ্যাপেনডিক্স (Hilar appendix) বলে (চিত্র 4.8)।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্ল্যাজমোগ্যামীর পরিপ্রেক্ষিতে উৎপন্ন ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম বেসিডিওকার্প উৎপাদন করে না (উদাহরণস্বরূপ রাস্ট ও স্মাট ছত্রাক) সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম পরিশেষে টেলিউটোরেণু (দ্বিনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট) বা ক্ল্যামাইডোরেণু উৎপন্ন করে। এই রেণুগুলির মধ্যে ক্যারিওগ্যামী সম্পন্ন হয়। টেলিউটোরেণু অঙ্কুরিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র নালীকাকৃতি প্রোমাইসিলীয়াম (promycellium) সৃষ্টি করে। অঙ্কুরিত হওয়ার সময় ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের মিয়োসিস সম্পন্ন হয় ও প্রোমাইসীলিয়ামে চারটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে। এরপর তিনটি বিভেদ প্রাচীর সৃষ্টি হয়ে প্রোমাইসীলিয়ামটিকে চার কোশির গঠনে পরিণত করে। এই চারটি হ্যাপ্লয়েড কোশ বিশিষ্ট প্রোমাইসীলিয়ামটি প্রকৃত ব্যাসিডিয়াম হিসেবে কাজ করে ও বেসিডিওরেণু উৎপাদন করে। এই প্রকার বেসিডিওরেণুকে সাধারণত স্পোরিডিয়াম (Sporidium) বলা হয় (চিত্র 4.9)।

4.4.2.2 বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণুর গঠন :

বেসিডিয়াম সাধারণত গদা আকৃতির (club shaped or clavate) গঠন (কখনও কখনও সরু, বেলনাকার অথবা প্রায় গোলাকার) ও চাররেণু বিশিষ্ট। প্রতিটি রেণু একটি করে স্টেরিগোমার অগ্রভাগে সৃষ্ট। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই রেণুর সংখ্যা চার এর বেশি বা কমও হতে পারে (চিত্র 4.10)। *Pistillaria maculaecola (পিস্টিল্যারিয়া ম্যাকিউলিকোলা)*-তে একটি রেণু; *Agaricus bisporus (অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস)* ইত্যাদিতে দুটি রেণু; অ্যাগারিকাস ক্যামপেসট্রিসে চারটি রেণু; *Cyathus (সায়াথাস), Exobasidium (এক্সোবেসিডিয়াম), Tilletia (টিলেশিয়া)* ইত্যাদিতে চার-এর বেশি বেসিডিওরণু উৎপন্ন হয়। বেসিডিয়াম বিভেদপ্রাচীর বা ব্যবধায়ক বিহীন (হলোবেসিডিয়াম, Holobasidium), যেমন অ্যাগারিকাস বা বিভেদপ্রাচীর বা ব্যবধায়ক যুক্ত (ফ্র্যাগমোবেসিডিয়াম, Phragmobasidium) হতে পারে (চিত্র 4.11)। বিভেদ প্রাচীর অনুপস্থ (উদাহরণ - *Auricularia (অরিকিউল্যারিয়া)* অথবা অনুদৈর্ঘ্য (উদাহরণ - *Exidia (এক্সিডিয়া)*, হতে পারে। ফ্ল্যাগমোবেসিডিয়ামের যে অংশটি প্রথম গঠিত হয় সেটিকে হাইপোবেসিডিয়াম (hypobasidium) ও যে অংশটি পরে উৎপন হয় তাকে এপিবেসিডিয়াম (epibasidium) বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্রাগমোবেসিডিয়াম খাঁজযুক্ত হয়ে টিউনিং ফর্ক (Tuning-fork) এর মত দেখতে হয়। উদাহরণ - *Calocera viscosa (ক্যালোসেরা ভিসকোসা)*। কাজেই ফ্র্যাগমোবেসিডিয়াম তিনপ্রকার - অনুপস্থ বিভেদ প্রাচীরযুক্ত, অনুদৈর্ঘ্য বিভেদপ্রাচীর যুক্ত ও খাঁজ যুক্ত (চিত্র 4.11 b-d)।

বেসিডিওরেণু সাধারণত এককোশী, এক নিউক্লিয়াস যুক্ত হ্যাপ্লয়েড গঠন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এটি দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্টও হতে পারে, উদাহরণ *Coprinus ephemerus (কোপ্রাইনাস এফিমিরাস)*। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বেসিডিওরেণু বিভেদ প্রাচীরযুক্ত হতে পারে (উদাহরণ ড্যাক্রিমাইসিস, *Dacrymyces*) (চিত্র 4.12)। বেসিডিওরেণু নানা আকৃতির হতে পারে, যেমন গোলাকৃতি, ডিম্বাকৃতি, লম্বাটে ইত্যাদি। বেসিডিওরেণু বর্ণহীন বা নানা বর্ণের হতে পারে। বেসিডিওরেণুর প্রাচীর মসৃণ বা নানা প্রকারে অলঙ্কৃত হতে পারে। বেসিডিওরেণু হতে পারে ব্যালিস্টোরেণু বা ব্যালিস্টোস্পোর (Ballistospore) অথবা স্ট্যাটিসমোরেণু বা স্ট্যাটিসমোস্পোর (Statismospore)। যে সমস্ত বেসিডিওরেণু স্টেরিগমার অগ্রভাগ থেকে প্রবলভাবে ও খাড়া উদগত থাকে এবং পরিণত অবস্থায়

স্টেরিগমা থেকে প্রবল বেগে ছিটকে* নিক্ষিপ্ত হয় তাদেরকে ব্যালিস্টোরেণু বলে (উদাহরণ অ্যাগারিকাস)। পক্ষান্তরে যে সমস্ত বেসিডিওরেণু স্টেরিগমাহীন বা স্টেরিগমা থেকে প্রবলভাবে উদগত নয় অর্থাৎ ঝুলে থাকে এবং পরিণত অবস্থায় ছিটকে নিক্ষিপ্ত হয় না তাদেরকে স্ট্যাটিসমোরেণু বলে। উদাহরণ - *Cyathus (সায়াথাস)*।

4.5 বেসিডিওকার্প (Basidiocarp)

আগেই বলা হয়েছে বেসিডিওমাইসিটিসে রাস্ট ও স্মাট ইত্যাদি ছত্রাক বাদে বাকী সকল সদস্যের ক্ষেত্রে ফলদেহ বা বেসিডিওকার্প উৎপন্ন হয়। এই ফলদেহ ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম দ্বারা গঠিত। ফলদেহের একটি নির্দিষ্ট অংশে হাইমেনিয়ামের পরিস্ফুরন হয়। হাইমেনিয়াম স্তরে বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণু ছাড়াও থাকে বন্ধ্যা হাইফা যাদের অগ্রভাগ কিছুটা স্ফীত, এই বন্ধ্যা হাইফা গঠনগুলিকে বলা হয় প্যারাফাইসিস (Paraphysis)। এই প্যারাফাইসিসগুলি ডাইক্যারিওটিক। প্যারাফাইসিস ছাড়াও অন্যান্য বন্ধ্যা হাইফীয় গঠন থাকতে পারে যেমন সিসটিডিয়াম (Cystidium), সিটা (Seta) ইত্যাদি। প্রসঙ্গত আপনারা নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন যে অ্যাসকোমাইসিটিসে প্যারাফাইসিসগুলি হ্যাপ্লয়েড অঙ্গজ হাইফা হতে উৎপন্ন ও সাধারণত মনোক্যারিওটিক।

বেসিডিওকার্প নানা প্রকার হতে পারে, তবে মূলতঃ এদেরকে দুভাগে ভাগ করে যেতে পারে — (i) ব্যক্ত হাইমেনিয়াম বিশিষ্ট বা জিমনোকার্পিক (Gymnocarpic) এবং (ii) গুপ্ত হাইমেনিয়াম বিশিষ্ট বা অ্যানজিওকার্পিক (Angiocarpic)

জিমনোকার্পিক বেসিডিওকার্পের হাইমেনিয়াম বাহিরে উন্মুক্ত থাকে। এই প্রকার বেসিডিওকার্প যেমন, মাশরুম (উদাহরণ - অ্যাগারিকাস), ব্র্যাকিট ছত্রাক (উদাহরণ - *Polyporus, পলিপোরাস*), জেলি ছত্রাক (উদাহরণ - *Auricularia, অরিকিউলারিয়া)* ইত্যাদিতে দেখা যায় (চিত্র 4.13)। জিমনোকার্পিক বেসিডিওকার্পগুলির গঠনগত নানা বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় যেমন মাশরুমের ক্ষেত্রে বেসিডিওকার্পে ঝিল্লী সদৃশ গিল দেখা যায় এবং এই গিলের তল বরাবর হাইমেনিয়াম বিস্তৃত থাকে। ব্যাকিট ছত্রাকে দেখা যায় অসংখ্য ছিদ্র এবং প্রতিটি ছিদ্রের মাধ্যমে একটি করে ছিদ্র নালিকা বাহিরে উন্মুক্ত হয়েছে। ছিদ্রনালিকার (Pore tube) দেওয়াল বরাবর হাইমেনিয়াম বিস্তৃত। জেলি ছত্রাকের ক্ষেত্রে বেসিডিওকার্পে জিলাটিন নির্মিত পদার্থ থাকার কারণে এটি জেলির ন্যায় অনুভূতি প্রদান করে। এক্ষেত্রে হাইমেনিয়াম বেসিডিওকার্পের উভয় তলে অথবা একটি তলে বিস্তৃত। জিমনোকার্পিক বেসিডিওকার্পের রেণুগুলি ব্যালিস্টোরেণু। অ্যানজিওকার্পিক ছত্রাকের ফলদেহ বদ্ধ অর্থাৎ এদের হাইমেনিয়াম ফলদেহের বাহিরে উন্মুক্ত নয়। এটি ফলদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত গহ্বরে উন্মুক্ত হয়। বেসিডিওরেণু বেসিডিয়াম থেকে এই গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলদেহের প্রাচীর পরবর্তী কালে ছিদ্রযুক্ত হলে বা শুকিয়ে বিনষ্ট হলে অথবা পতঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা বিনষ্ট হলে বেসিডিওরেণু বাহিরে বেরিয়ে আসে। বেসিডিওরেণুগুলি স্ট্যাটিসমোরেণু। এইপ্রকার বেসিডিওকার্প *Lycoperdon (লাইকোপার্ডন), Cyathus (সায়াথাস)* ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

* নিক্ষিপ্ত হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে বেসিডিওরেণু ও স্টেরিগমার সংযোগস্থলে একটি স্ফীতি দেখা যায় — এটিকে "বুলারের ফোঁটা" (Buller's drop) বা "জলবিন্দু" রূপে মনে করা হত। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়েছে যে, এই বিন্দুটি একটি পর্দা ঘেরা বেলুনের মত ফোলা স্টেরিগমার প্রাচীর বিশেষ। পরে এই স্ফীতির বিলুপ্তি ঘটে। কোনো কোনো রাস্ট ছত্রাকে) যেমন, *Cronartium ribicola-ক্রোনারটিয়াম রিবিকোলা* এই "জলবিন্দু" উৎপন্ন হয় না।

কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতানুসারে এই পর্দা ঘেরা স্ফীত অংশটিকে তরল পদার্থ (কর্ণার, ১৯৪৮ Corner, 1948; ওয়েলস্ ১৯৬৫ - Wells, 1965) বা গ্যাসীয় পদার্থ (ওলিভ্ ১৯৬৪, Olive, 1964) ভরা থাকে।

অ্যানজিওকার্পিক বেসিডিওকার্পের গঠনগত বৈচিত্র লক্ষণীয়, যেমন লাইকোপার্ডনের বেসিডিওকার্প অনেকটা লাট্টুর মত দেখতে (চিত্র 4.14 a) সায়াথাসের বেসিডিওকার্প ফানেল আকৃতির (চিত্র 4.14 b)। এছাড়া গোলাকৃতি, তারকাকৃতি ইত্যাদি নানাপ্রকারের হয়। এই বেসিডিওকার্পগুলি পেরিডিয়াম নামক প্রাচীর দ্বারা আবৃত থাকে। পেরিডিয়ামের অভ্যন্তরে উপস্থিত কলাকে বলা হয় গ্লেবা (Gleba)। এই গ্লেবার মধ্যে সৃষ্ট গহ্বরগুলিকে ঘিরে হাইমেনিয়াম স্তরের পরিস্ফুরন হয় (চিত্র 4.14 a)।

4.6 জীবনচক্র

বেসিজিওমাইসিটিসে অযৌন জীবন চক্র অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় কেবলমাত্র যৌন জীবন চক্রটিই এখানে আলোচনা করা হল।

যৌন জীবনচক্রে নাতিদীর্ঘ হ্যাপ্লয়েড দশা, অতি দীর্ঘ ডাই ক্যারিওটিক দশা এবং ক্ষণস্থায়ী ডিপ্লয়েড দশা বর্তমান। কাজেই এই শ্রেণিটি সাধারণতঃ হ্যাপ্লয়েড-ডাইক্যারিওটিক চক্র প্রদর্শন করে। প্রাথমিক মাইসীলিয়ামের স্পারমাটাইজেশন অথবা সোম্যাটোগ্যামী-র সাহায্যে ডাইক্যারিওটাইজেশন বা দ্বি-নিউক্লিয়করণ সংগঠিত হয়। এরপর ডাইক্যালিওটিক মাইসীলিয়ামের সৃষ্টি হয় যা থেকে ফলদেহ বা বেসিডিওকার্প (বেসিডিকার্প উৎপাদনকারী সদস্যদের ক্ষেত্রে) অথবা টেলিউটোরেণু (বেসিডিওকার্পহীন সদস্যদের ক্ষেত্রে) উৎপন্ন হয়। বেসিডিওকার্পের মধ্যে বেসিডিওল সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে ক্যারিওগ্যামী ও মিয়োসিস সংগঠিত হয় এবং বেসিডিওল বেসিডিয়ামে পরিণত হয়। বেসিডিয়াম থেকে উৎপন্ন বেসিডিওরেণু অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্গজ দেহ বা প্রাথমিক মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে। টেলিউমেটারেণু সৃষ্টি হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণু (প্রোরিডিয়াম) সৃষ্টি করে। এই স্পোরিডিয়াম অঙ্কুরিত হয়ে যথারীতি প্রাথমিক মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে। চিত্র নং 4.15-এ বেসিজিও মাইসিটিসের সাধারণ যৌন জীবনচক্র দেওয়া হল ঃ—

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেসিডিওমাইসিটিসের যৌন জীবনচক্র লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এই শ্রেণিতে বিশেষ যৌন জননাঙ্গ অনুপস্থিত। কাজেই ছত্রাকের বিবর্তনে চাক্ষুস যৌনতার অবলুপ্তির সর্বাধিক মাত্রায় পৌঁছতে পেরেছে এই শ্রেণিটি। আবার ডাইক্যারিওটিক দশার সর্বাধিক স্থিতি এই শ্রেণিটিকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় সর্বোচ্চ নির্ণয়ে. আর একটি 'পালক' যুগিয়েছে। শুধু তাই নয়, পুষ্টি সংগ্রহের ব্যাপারে ডাইক্যারিও দশার স্বনির্ভর হওয়া অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড অঙ্গজ হাইফার উপর নির্ভরশীল না হওয়া এবং বৃহদাকার ফলদেহ উৎপাদন করা ইত্যাদি সবদিক বিচার করলে দেখা যাবে এই শ্রেণিটি ছত্রাকের অন্যান্য শ্রেণি থেকে অনেক বেশি এগিয়ে অর্থাৎ এটিই ছত্রাকের সর্বোচ্চ শ্রেণি।

4.7 শ্রেণিবিন্যাস

গুইন ভাওগান ও বার্নেস (1927) প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী বেসিডিওমাইসিটিসকে তিনটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে বেসিডিওরেণুর সংখ্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ বেসিডিওরেণু নির্দিষ্ট সংখ্যক উৎপন্ন হয় নাকি প্রচুর সংখ্যক উৎপন্ন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেসিডিয়ামে ব্যবধায়ক বা বিভেদ প্রাচীরের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর। নিতে শ্রেণিবিন্যাসটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল।

বেসিডিওমাইসিটিস

- বেসিডিওরেণু অসংখ্য
  - উপশ্রেণি ঃ হেমিবেসিডিওমাইসিটিস (Hemibasidiomycetes) (উদাহরণ - *Ustilago*, *উস্টিলাগো* ইত্যাদি)
- বেসিডিওরেণু নির্দিষ্ট সংখ্যক
  - বেসিডিয়াম বিভেদপ্রাচীর যুক্ত
    - উপশ্রেণি ঃ প্রোটোবেসিডিওমাইসিটিস (Protobasidiomycetes) (উদাহরণ - *Puccinia*, *পাকসিনিয়া* ইত্যাদি)
  - বেসিডিয়াম বিভেদপ্রাচীর বিহীন
    - উপশ্রেণি ঃ অটোবেসিডিওমাইসিটিস (Autobasidiomycetes) (উদাহরণ - *Agaricus*, *অ্যাগারিকাস্* ইত্যাদি)

বেসিডিওমাইসিটিসের উপরোক্ত শ্রেণিবিন্যাসটি অপেক্ষা মার্টিন (Martin, 1951) প্রদত্ত বেসিডিওমাইসিটিসের শ্রেণিবিন্যাসটি সরল হাওয়ায় বেসিডিওমাইসিটিসের শ্রেণিবিন্যাস মার্টিন প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী করা যেতে পারে। নিচে বেসিডিওমাইসিটিসের সরলীকৃত শ্রেণিবিন্যাসটি ছকের সাহায্যে দেওয়া হল।

বেসিজিওমাইসিটিস

- বেসিডিয়াম বিভেদপ্রাচীরযুক্ত অথবা গভীরভাবে খাঁজ যুক্ত (অর্থাৎ বেসিডিয়াম-ফ্র্যাগমোবেসিডিয়াম) অথবা টেলিউটোরেণু অঙ্কুরিত হয়ে উৎপন্ন
  - উপশ্রেণি ঃ হেটারোবেসিডিওমাইসিটিস (Heterobasidiomycetes) (উদাহরণ - *Tremella*, *ট্রেমেলা*; *Ustilago*, *উস্টিলাগো* ইত্যাদি)
- বেসিডিয়াম বিভেদপ্রাচীর বিহীন (অর্থাৎ বেসিডিয়াম-হলোবেসিডিয়াম)
  - উপশ্রেণি ঃ হোমোবেসিডিওমাইসিটিস (Homobasidiomycetes) (উদাহরণ - *Agaricus*, *অ্যাগারিকাস্*; *Polyporus*, *পলিপোরাস* ইত্যাদি)

অনুশীলনী - 2

নিচের তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

a) বেসিডিওমাইসিটিস ________, ________, ________ ইত্যাদির মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন করতে পারে।

b) প্রাথমিক মাইসীলিয়াম থেকে উৎপন্ন ওডিসিওরেণু সাধারণত জননে ও ডাইক্যারিওটি মাইসীলিয়াম থেকে উৎপন্ন ওয়িডিওরেণু ________ জননে অংশগ্রহণ করে।

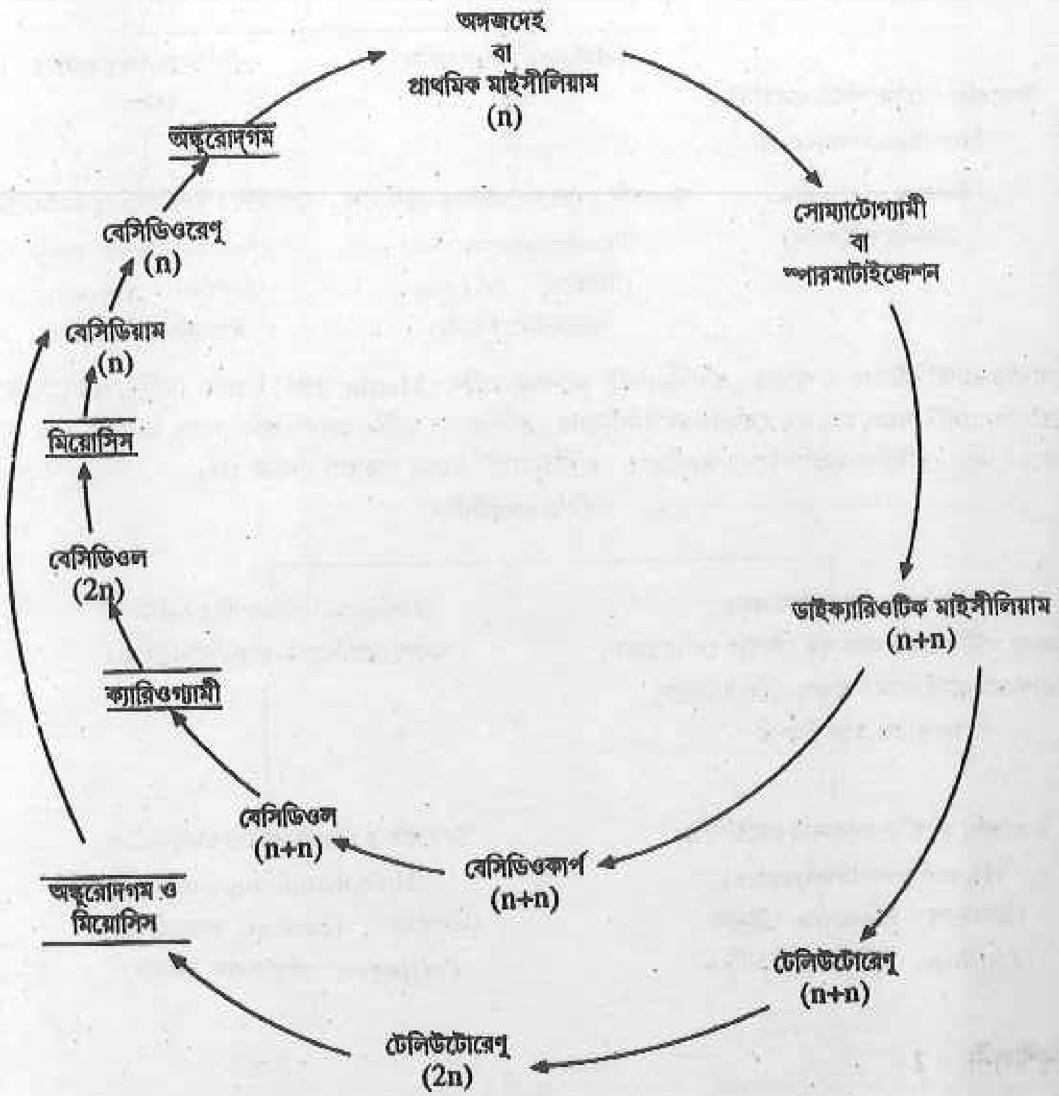

চিত্র 4.15 বেসিডোমাইসিটিসের সাধারণ যৌন জীবনচক্র

c) বেসিডিওমাইসিটিস ________ থ্যালিক বা ________ থ্যালিক হতে পারে, তবে বেশিরভাগ সদস্য ________।

d) প্ল্যাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর অন্তবর্তী পর্যায়ে উৎপন হয় ________ দশা এবং এটি ________ দ্বারা উপস্থাপিত।

e) প্ল্যাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর অন্তবর্তী পর্যায়ে উৎপন্ন হয় ________ দশা এবং এটি ________ দ্বারা উপস্থাপিত।

f) প্ল্যাজমোগ্যামী প্রক্রিয়াটি ________ ও ________ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

g) মোনোক্যারিওটিস দশা থেকে ডাইক্যারিওটিক দশা উৎপন্ন হওয়ার ঘটনাকে বলা হয় ________।

h) ক্যারিওগ্যামী রাস্ট ও স্মাট ছত্রাকে ________ তে এবং অন্যান্য বেসিডিওমাইসিটিসে ________ সংগঠিত হয়।

i) সাধারণত প্রতিটি বেসিডিয়াম হতে ________ বেসিডিওরেণু উৎপন্ন হয় কিন্তু *Pistillaria maculaecola (পিস্টিল্যারিয়া ম্যাকুলিকোলা)*-তে ________ বেসিডিওরেণু ও এক্সোবেসিডিয়ামে *(Exobasidium)* বেসিডিওরেণু উৎপন্ন হয়।

j) বিভেদপ্রাচীরবিহীন বেসিডিয়ামকে ________ ও বিভেদপ্রাচীরযুক্ত বেসিডিয়ামকে ________ বলে।

k) স্টেরিগমা হতে প্রবল ভাবে উদগত বেসিডিওরেণুকে ________ এবং প্রবলভাবে উদগত নয় এমন বেসিডিওরেণুকে ________ বলে।

l) বেসিডিওকার্প ________ বা ________ হতে পারে

m) বেসিডিওমাইসিটিসের জীবনচক্র ________ প্রকৃতির।

n) বেসিজিওমাইসিটিস শ্রেণিকে ________ উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলি যথাক্রমে ________ ও ________।

(অযৌন, যৌন, ডাইক্যারিও, ওয়িডিওরেণু, হোমো, ডাইক্যারিয়টিক মাইসীলিয়াম, কনিডিওরেণু, হেটারো, কম্প্যাটিব্ল্ হেটারোথ্যালিক, সোমাটোগ্যামী, চারটি, ক্ল্যামাইডোরেণু, ডাইক্যারিয়টাইজেশন, স্পারমাটাইজেশন, বেসিডিওল, টেলিউটোরেণু, একটি, জিমনোকার্পিক, চার এর বেশি, অ্যানজিওকার্পিক, হলোবেসিডিয়াম, স্ট্যাটিসমোরেণু, ফ্ল্যাগমোবেসিডিয়াম, ব্যালিস্টোরেণু, হেটারোবেসিডিওমাইসিটিস, হ্যাপ্লয়েড - ডাইক্যারিওটিক, দুটি, হোমোবেসিডিওমাইসিটিস)।

4.8 সারাংশ :

এই এককটি পড়ে এখন আপনারা বেসিডিওমাইসিটিসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই বলতে পারছেন। আপনারা বলতে পারছেন

- বেসিডিওমাইসিটিস জলবাসী বা স্থলবাসী হতে পারে। এরা মৃতজীবী, পরজীবী অথবা মিথোজীবী হিসেবে বসবাস করতে পারে।

- এরা অপকারী অথবা উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারে।
- অঙ্গজদেহ - প্রাথমিক মাইসীলিয়াম। এটি বিভেদপ্রাচীরযুক্ত। বিভেদপ্রাচীর বেশিরভাগ সদস্যে ডলিছিদ্র অথবা কিছু সদস্যে সরলছিদ্র বিশিষ্ট।
- অন্যান্য মাইসীলিয়াম — গৌণ ও টারসিয়ারী। এই দুই মাইসীলিয়াম প্ল্যাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর অন্তবর্তী পর্যায়ে সৃষ্ট এবং ডাইক্যারিওটিক।
- ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম সাধারণত ক্ল্যাম্প সংযোজন বা ক্ল্যাম্প কানেকশন প্রদর্শন করে।
- অযৌন জনন ওয়িডিওরেণু, ক্ল্যামাইডোরেণু, কনিডিওরেণু ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এখানে অযৌন জনন অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ।
- এই শ্রেণির সদস্যগুলি শতকরা দশভাগ সহবাসী (হোমোথ্যালিক) ও শতকরা নব্বইভাগ ভিন্নবাসী (হেটোরোথ্যালিক)। হেটোরোথ্যালিক প্রজাতিগুলি বাইপোলার অথবা টেট্রাপোলার হতে পারে।
- যৌন জননে কোন বিশেষ জননাঙ্গ সৃষ্টি হয় না।
- প্ল্যাজমোগ্যামী প্রক্রিয়াটি সোম্যাটোগ্যামী অথবা স্পারমাটাইজেশন দ্বারা ঘটে ও ডাইক্যারিওটিক দশার সৃষ্টি হয়। প্ল্যাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগদ্যামীর মধ্যে দীর্ঘতম ডাইক্যারিওটিক দশা বিদ্যমান। ডাইক্যারিওটিক দশা ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম দ্বারা উপস্থাপিত।
- যৌন জননে ক্যারিওগ্যামী ও মিয়োসিস, তরুণ বেসিডিয়াম (বেসিডিওল) বা টেলিউটোরেণুতে সংগঠিত হয়। বেসিডিওল পরিণত হয়ে বেসিডিয়াম অথবা টেলিউটোরেণু অঙ্কুরিত হয়ে বেসিডিয়াম উৎপন্ন করে। বেসিডিয়াম বিভেদপ্রাচীরবিহীন অথবা বিভেদপ্রাচীরযুক্ত হতে পারে।
- বেসিডিয়াম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চারটি বেসিডিওরেণু উৎপন্ন করে। বেসিডিওরেণু বহিঃরেণু।
- বেসিডিওরেণু অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্গজ মাইসীলিয়াম বা প্রাথমিক মাইসীলিয়াম বা মোনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে।
- ফলদেহ - বেসিডিওকার্প - এটি জিমনোকার্পিক অথবা অ্যানজিওকার্পিক হতে পারে।
- যৌনজীবনচক্র হ্যাপ্লয়েড - ডাইক্যারিওটিক প্রকৃতির।
- বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিকে দুটি উপশ্রেণিতে (মার্টিন, Martin, 1951) বিভক্ত করা হয়েছে, এগুলি যথাক্রমে হেটারোবেসিডিওমাইসিটিস ও হোমোবেসিডিওমাইসিটিস।

4.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. নিচের ডানদিকের তালিকার সঙ্গে বাম দিকের তালিকা সাজিয়ে লিখুন :

i) অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস	i) ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম
ii) বেসিডিওকার্প	ii) স্মাট ছত্রাক
iii) অরিকুলারিয়া	iii) ভক্ষনীয় মাশরুম

iv) অ্যামানিটা ফ্যালয়ডিস	iv) ফ্র্যাগমোবেসিডিয়াম
v) টেলিউটোরেণু	v) বিষাক্ত মাশরুম

2. ছত্রাকের যৌন জননে ডাইক্যারিওটিক দশা কি? বেসিডিওমাইসিটিস ছাড়া আর কোন শ্রেণিতে এটি দেখা যায়?

3. বেসিডিওমাইসিটিসে প্ল্যাজমোগ্যামী প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন।

4. বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণু উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

5. বেসিডিওকার্প কি? ইহা কয়প্রকার ও কি কি? বিভিন্ন প্রকার বেসিডিওকার্প চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

6. বেসিডিওমাইসিটিসের জীবন চক্রটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। এই শ্রেণিটিকে ছত্রাকের বিবর্তনে সর্বোচ্চ শ্রেণি হিসাবে গণ্য করার সপক্ষে আপনার সংক্ষিপ্ত মতামত দিন।

7. নিচের তালিকাবদ্ধ ছত্রাগুলিতে কিরূপ বেসিডিয়াম দেখা যায় তা ডান দিকে লিখুন—

ছত্রাক	বেসিডিয়াম
a) অ্যাগারিকাস	a)
b) অরিকিউল্যারিয়া	b)
c) এক্সিডিয়া	c)
d) ক্যালোসেরা	d)

4.10 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

a) স্থল

b) জল

c) পরজীবিয়, মৃতজীবিয় ও মিথোজীবিয়

d) অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস

e) কোরিওলাস ভারসিকলার, লেনজাইটিস

f) প্রাইমারী, সেকেন্ডারী, টারসিয়ারী

g) ডলিছিদ্র, রাষ্ট্র, স্মাট,

h) ক্ল্যাম্প, ডাইক্যারিওটিক

i) কোশ বিভাজনের, প্রান্তীয়

অনুশীলনী - 2

a) ওয়িডিওরেণু, কনিডিওরেণু, ক্ল্যামাইডোরেণু

b) যৌন, অযৌন

c) হোমো, হেটারো, হেটারোথ্যালিক

d) কম্প্যাটিব্‌ল

e) ডাইক্যারিও, ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম

f) স্পারমাটাইজেশন, সোমাটোগ্যামী

g) ডাইক্যারিওটাইজেশন

h) টেলিউটোরেণু, বিসিডিওল

i) চারটি, একটি, চার এর বেশি

j) হলোবেসিডিয়াম, ফ্র্যাগমোবেসিডিয়াম

k) ব্ল্যালিস্টোরেণু, স্ট্যাটিসমোরেণু

l) অ্যানজিওকার্পিক, জিমনোকার্পিক

m) হ্যাপ্লয়েড - ডাইক্যারিওটিক

n) দুটি, হেটারোবেসিডিওমাইসিটিস, হোমোবেসিডিওমাইসিটিস

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. (i) __________ (iii)

(ii) __________ (i)

(iii) __________ (iv)

(iv) __________ (v)

(v) __________ (ii)

2. ডাইক্যারিওটিক দশার অর্থ দ্বি-নিউক্লিয় দশা এবং এই দশা ছত্রাকের যৌন জননের সময় উৎপন্ন হয়। দুটি ভিন্ন প্রকৃতির (+ ও – স্ট্রেন) হ্যাপ্লয়েড কোশ যৌন জননের সময় মিলিত হয়। এই কোশগুলি হতে পারে দুটি গ্যামেট্যানজিয়া বা দুটি হাইফা ইত্যাদি। বেশিরভাগ ছত্রাকের ক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামীর পুর ক্যারিওগ্যামী বিলম্বিত হয়। ফলে প্লাজমোগ্যামীর পরিপ্রেক্ষিতে দুটি কোশের নিউক্লিয়াসদ্বয় কাছাকাছি এসে পাশাপাশি অবস্থান করে, কিন্তু মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস গঠন করে না। কাজেই প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর অন্তবর্তী দশা হল ডাইক্যারিওটিক দশা। এই ডাইক্যারিওটিক দশার স্থায়িত্ব হতে পারে সুদীর্ঘ এবং এই সময় ডাইক্যারিওটিক কোশের বারবার মাইটোসিস, বিভাজন ঘটতে পারে।

এই দশা বেসিডিওমাইসিটিস ছাড়া অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির সদস্যে দেখা যায়। অ্যাসকোমাইসিটিসের অধিকাংশ সদস্যে এই দশায় অ্যাসকোজিনাস হাইফা উৎপন্ন হয় এবং অধিকাংশ বেসিডিওমাইসিটিসে বেসিডিওকার্প উৎপন্ন হয়।

3. 4.4.1 অনুচ্ছেদ দেখুন।

4. 4.4.2.1 অনুচ্ছেদ দেখুন।

5. বেসিডিওমাইসিটিসের ফলদেহকে বেসিডিওকার্প বলে। পরবর্তী উত্তরগুলির জন্য অনুচ্ছেদ 4.5 দেখুন।

6. 4.6 অনুচ্ছেদ দেখুন।

7.

ছত্রাক	বেসিডিয়াম
a) *অ্যাগারিকাস*	a) হলোবেসিডিয়াম
b) *অরিকিউলারিয়া*	b) অনুপ্রস্থ বিভেদপ্রাচীরযুক্ত ফ্র্যাগমোবেসিডিয়াম
c) *এক্সিডিয়া*	c) অনদৈর্ঘ বিভেদপ্রচীরযুক্ত ফ্র্যাগমোবেসিডিয়াম
d) *ক্যালোসেরা*	d) টিউনিং ফর্ক আকৃতির ফ্র্যাগমোবেসিডিয়াম

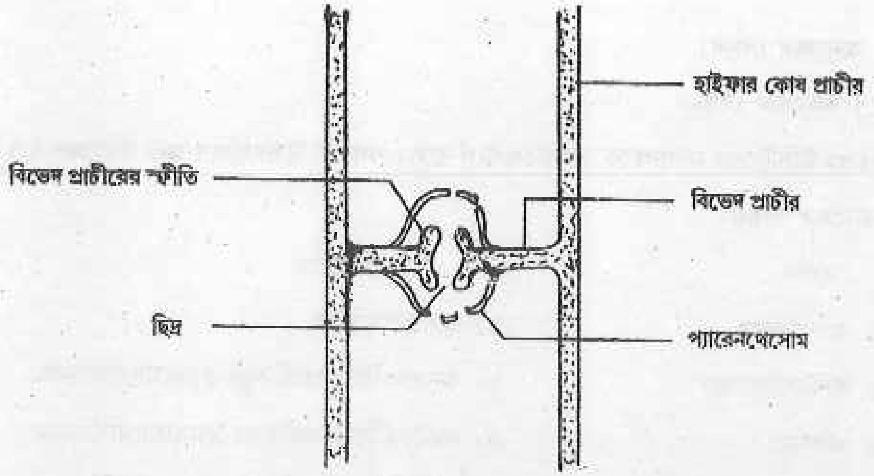

চিত্র নং 4.1 ঃ বেসিডিওমাইসিটিসের বিভেদ প্রাচীরে (ব্যবধায়ক) ডলিছিদ্র বা ডলিপোর (Dolipore)

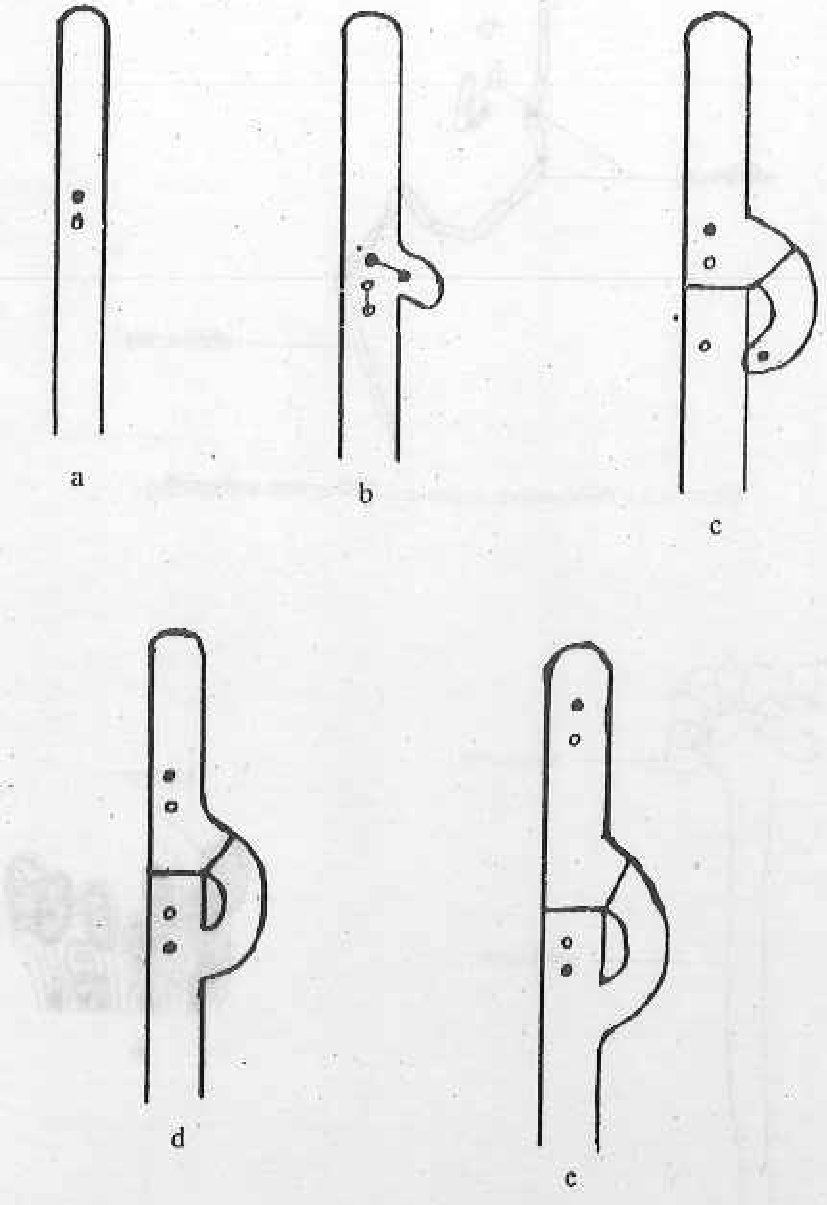

চিত্র নং 4.2 ঃ ক্ল্যাম্প উৎপাদন পদ্ধতি

(a) একটি ডাইক্যারিওটিক হাইফার প্রান্তীয় কোশ। (b) নিউক্লিয়াস দুটি একই সাথে বিভাজিত হচ্ছে ও একটি পার্শ্বীয় বহিঃবৃদ্ধি (ক্ল্যাম্প) উৎপন্ন হচ্ছে, যার মধ্যে একটি নিউক্লিয়াস প্রবেশ করছে। (c) দুটি বিভেদ প্রাচীর উৎপন্ন হয়ে একটি দ্বি-নিউক্লিয় প্রান্তীয় কোশ, একটি এক নিউক্লিয় উপপ্রান্তীয় কোশ ও এক নিউক্লিয় ক্ল্যাম্প সৃষ্টি করেছে। (d) উপপ্রান্তীয় কোশ ও ক্ল্যাম্প এর মধ্যে প্লাজমোগ্যামীর ফলে উপপ্রান্তীয় কোশ দ্বি-নিউক্লিয় বিশিষ্ট হয়েছে। (e) পরবর্তী পর্যায়ে প্রান্তীয় কোশের নিউক্লিয়াস দুটি অগ্রভাগের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

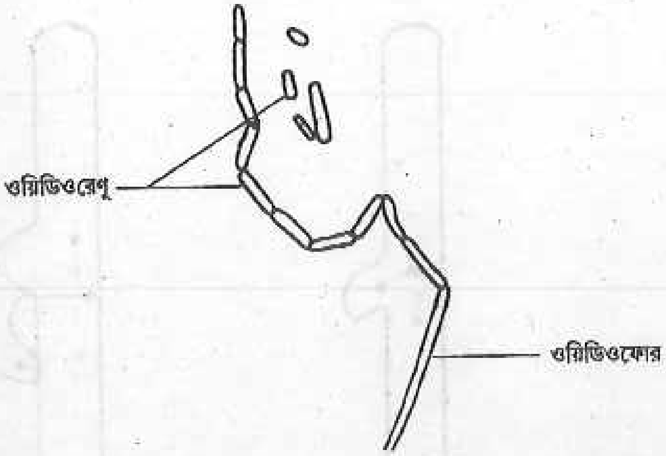

চিত্র নং 4.3 : *Peniophora gigantea* (পিনিওফোরা জাইগ্যানটিয়া)

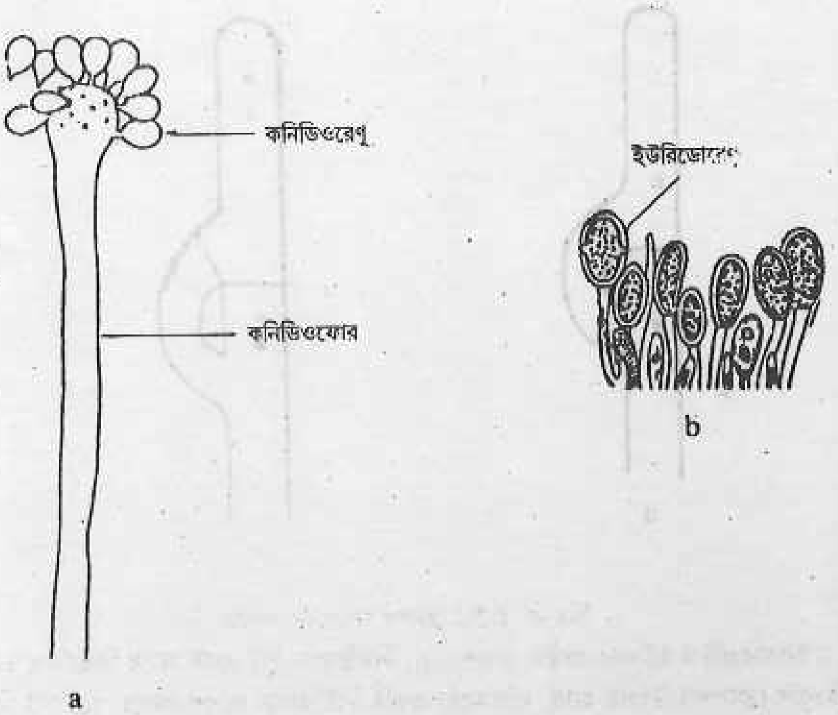

চিত্র নং 4.4 : (a) *Heterobasidion annosum* (হেটারোবেসিডিয়ন অ্যানোসাম)
(b) *Puccinia* (পাকসিনিয়া)

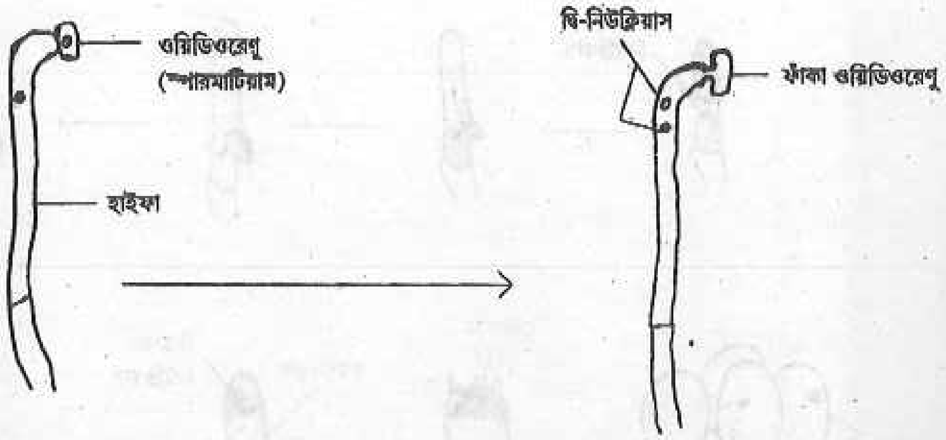

চিত্র নং 4.5 : স্পারমাটাইজেশন

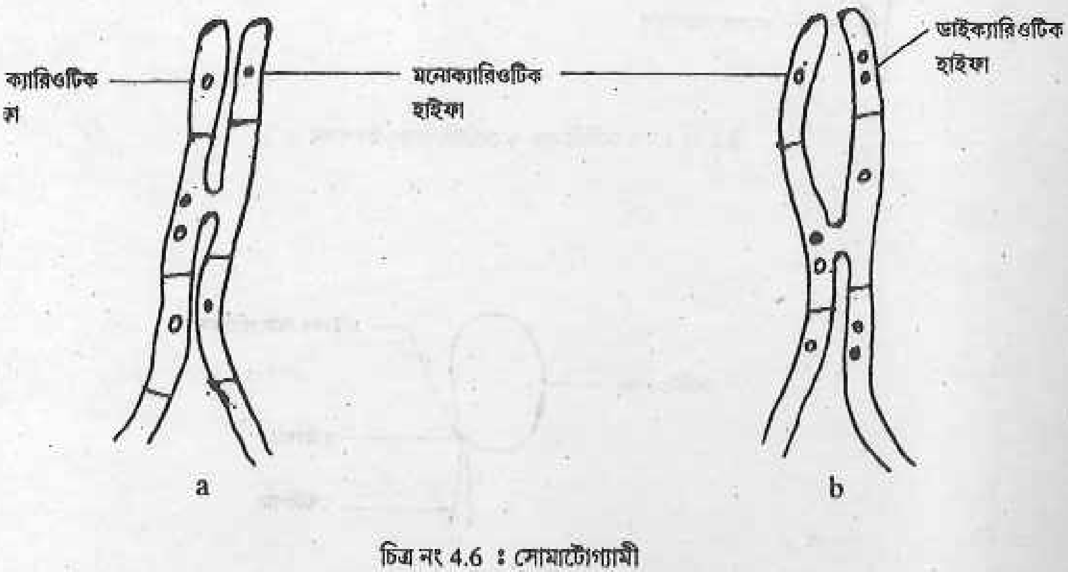

চিত্র নং 4.6 : সোমাটোগ্যামী

(a) দুটি মনোক্যারিওটিক হাইফার মধ্যে সোমাটোগ্যামী

(b) একটি মনোক্যারিওটিক ও একটি ডাইক্যারিওটিক হাইফার মধ্যে সোমাটোগ্যামী।

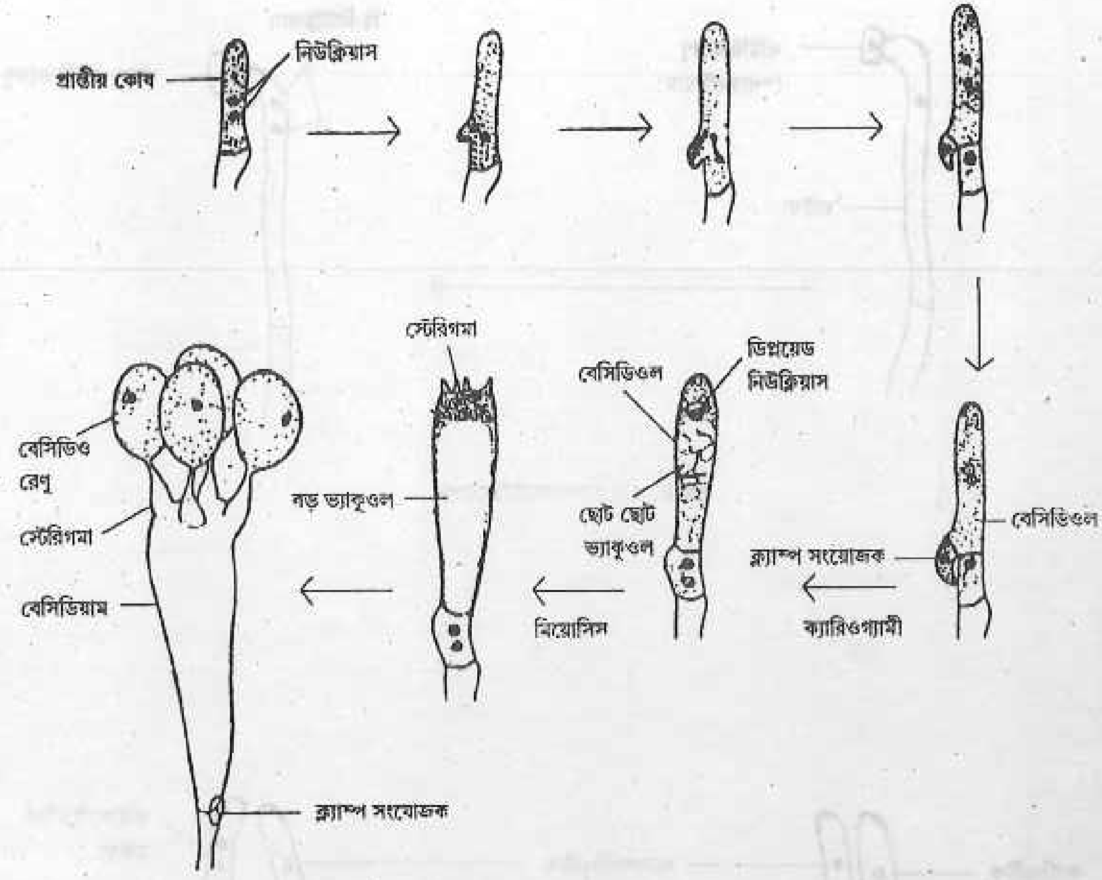

চিত্র নং 4.7 ঃ বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণু উৎপাদন

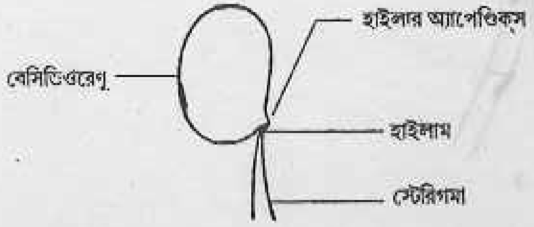

চিত্র নং 4.8 ঃ স্টেরিগমা ও বেসিডিওরেণু

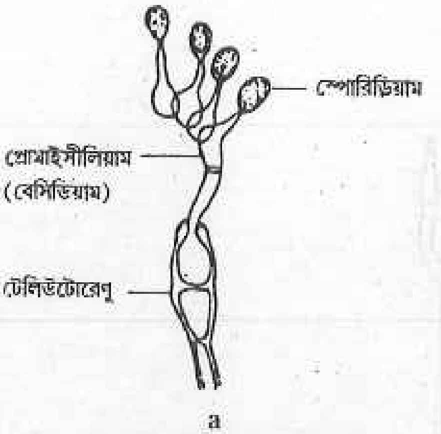

চিত্র নং 4.9 ঃ অঙ্কুরিত টেলিউটোরেণু
(*Puccinia*, পাকসিনিয়া)

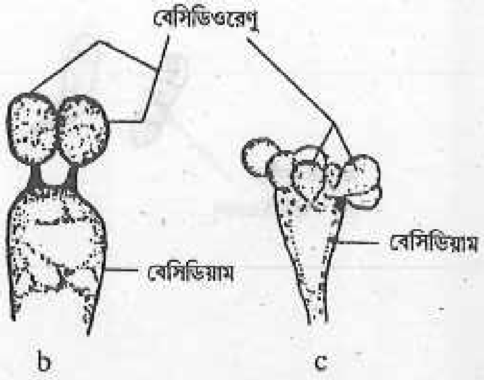

চিত্র নং 4.10 ঃ (a) *Agaricus bisporus* (অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস) (b) *Cyathus* (সায়াথাস)

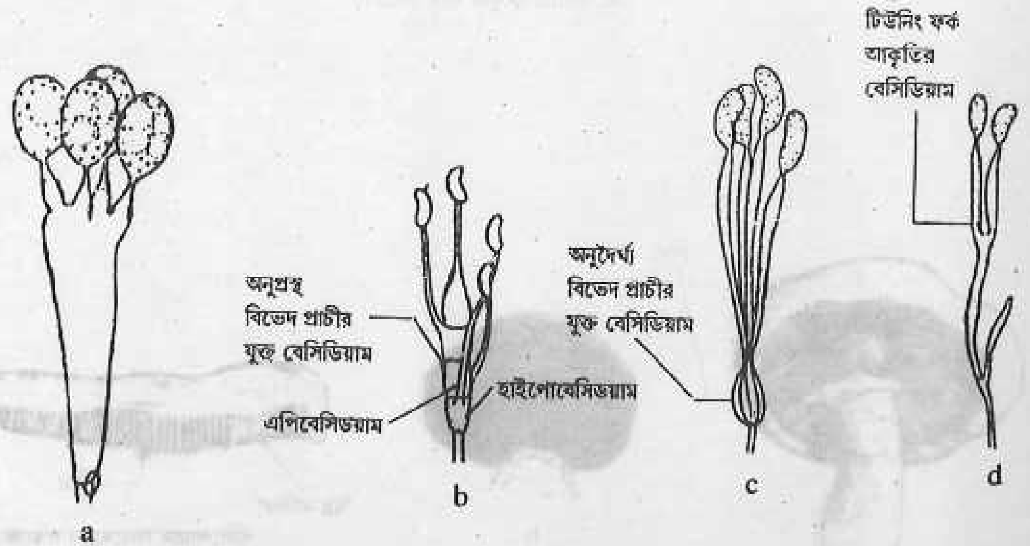

চিত্র নং 4.11 ঃ হলোবেসিডিয়াস (a) ও ফ্র্যাগমোবেসিডিয়াম (b-d)
(a) *Agaricus* (অ্যাগারিকাস) (b) *Auricularia* (অরিকিউল্যারিয়া)
(c) *Exidia* (এক্সিডিয়া) (d) *Calocera* (ক্যালোসেরা)

চিত্র নং 4.12 ঃ ড্যাক্রিমাইসিস। লক্ষ্যণীয় স্টেরিগমার সাথে যুক্ত অবস্থায় বেসিডিওরেণু বিভেদ প্রাচীর বিহীন কিন্তু বিচ্ছিন্ন বেসিডিওরেণু বিভেদপ্রাচীর যুক্ত হয়ে পড়ে।

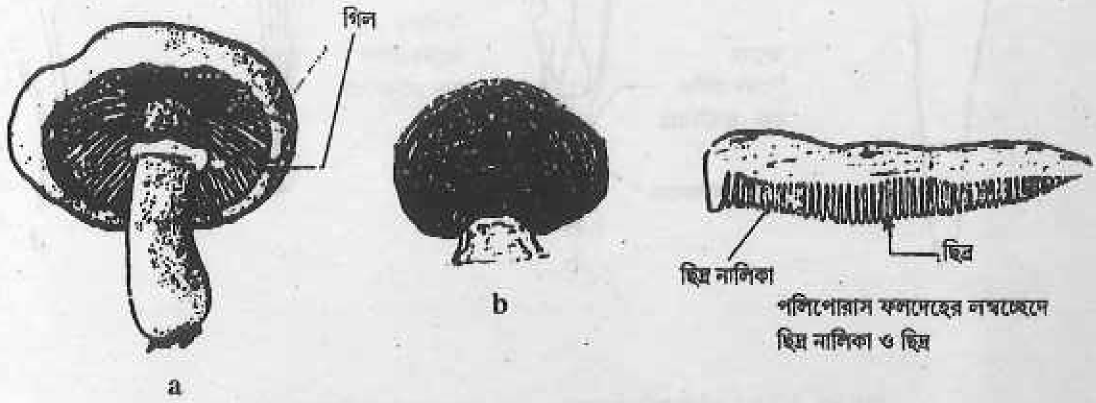

চিত্র নং 4.13 ঃ ফলদেহ বা বেসিডিও কার্প (জিমনোকার্পিক)
(a) *Agaricus* (অ্যাগারিকাস) (b) *Polyporus* (পলিপোরাস)

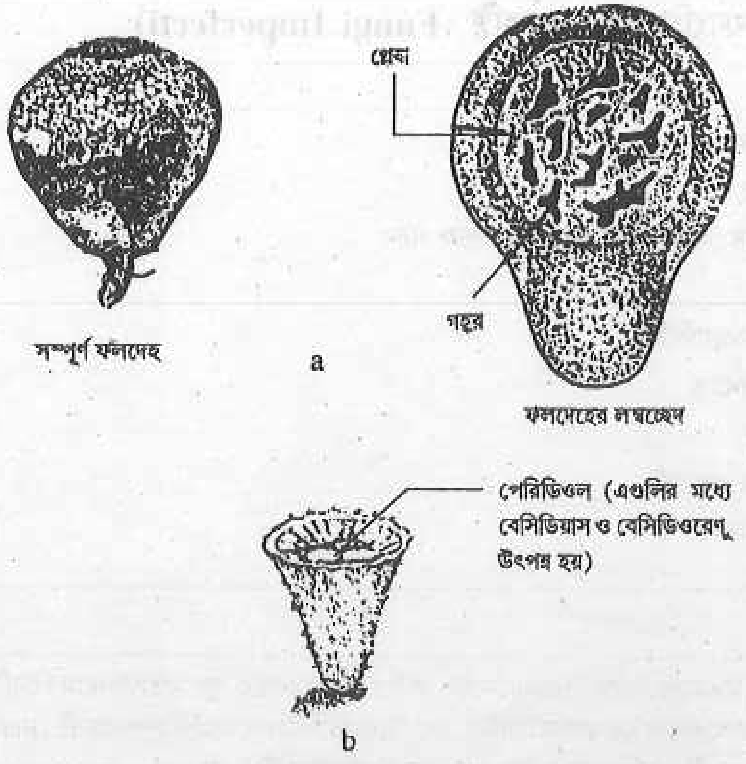

চিত্র নং 4.14 ঃ ফলদেহ বা বেসিডিও কার্প (অ্যানজিওকার্পিক)
(a) *Lycoperdon* (*লাইকোপার্ডন*) (b) *Cyathus* (*সায়াথাস*)

একক 5 ☐ ফাংগি ইমপারফেক্টি (Fungi Imperfecti)

গঠন

5.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

5.2 অবস্থান, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও অঙ্গজ গঠন

5.3 জনন

5.4 প্যারাসেক্সুয়ালিটি

5.5 শ্রেণিবিন্যাস

5.6 সারাংশ

5.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

5.8 উত্তরমালা

5.1 প্রস্তাবনা

আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন বিভেদ প্রাচীর বা ব্যাবধায়ক যুক্ত মাইসীলিয়াম তিনটি শ্রেণিতে দেখতে পাওয়া যায় এবং সেগুলি হল অ্যাসকোমাইসিটিস, বোমডিওমাইসিটিস ও ফাংগি ইম্পারফেক্টি (Fungi Imperfecti)। এই ফাংগি ইম্পারফেক্টি শ্রেণির আর এক নাম ডয়েটেরোমাইসেটিস (Deuteromycetes)। যৌন জননের বা পারফেক্ট স্টেজের (perfect stagte) (যেমন, ডাইগোস্পের, উস্পোর ইত্যাদির) অনুপস্থিতি বা এই দশাগুলির সম্পর্কে না জানার কারণে শ্রেণিটিকে ফাংগি ইমারফেক্টি বলা হয়। আবার ঐ একই কারণে অর্থাৎ যৌন জননের অভাবের জন্য এবং অসম্পূর্ণ ভাবে জানা জীবন-চক্র বিশিষ্ট ছত্রাকদের একত্রিত করে সংগঠিত এই শ্রেণিটিকে অসম্পূর্ণ (incomplete) বা কৃত্রিম শ্রেণি বা ফর্মক্লাস (Form class) হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়।

যদিও এই শ্রেণিটিতে যৌন জনন সাধারণত অনুপস্থিত, কিন্তু কখনও কখনও কোনো কোনো সদস্যে যৌন জনন পাওয়া যায় এবং তখন ঐ সদস্যকে সাধারণত নতুন নাম দিয়ে বিভেদ প্রাচীর যুক্ত মাইসীলিয়াম বিশিষ্ট পারফেক্ট শ্রেণি অর্থাৎ অ্যাসকোমাইসিটিস বা বেজিডিওমাইসিটিসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, অর্থাৎ যৌন জননে অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হলে অ্যাসকোমাইসিটিসে এবং বেসিডিওরেণু উৎপন্ন হলে বেসিডিওমাইসিটিসে শ্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে। যাই হোক, এমন যৌন জনন দেজখতে পাওয়ার ঘটনা কিছু সদস্যের ক্ষেত্রে ঘটলেও অধিকাংশ সদস্যে এখনও দেখা যায় যৌন জনন অনুপস্থিত। আমরা জানি যৌন জননের জন্যই প্রতিটি জীবে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় আর এই বৈচিত্র্যই জীবের বিবর্তনের ভিত্তি। কিন্তু যৌন জননের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই এই শ্রেণির সদস্যগুলিতে রয়েছে নানা বৈচিত্র, উদ্ভব হচ্ছে নিত্য নতুন স্ট্রেন (strain)। এর থেকে ধারণা করা স্বাভাবিক যে বৈচিত্র্য আনতে এই শ্রেণিটিতে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই রহস্যভরা এই শ্রেণিটি সম্পর্কে আপনাদের একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। এটাও জেনে রাখা দরকার এই শ্রেণিটি ছত্রাকের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম শ্রেণি হিসেবে গণ্য করা হয়।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ফাংগি ইম্পারফেক্টি শ্রেণির সদস্যগুলি কিরূপ পরিবেশে জন্মায় তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- এই শ্রেণির সদস্যগুলি আমাদের কি উপকার বা অপকার করে তা নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন।
- শ্রেণিটির অঙ্গজ গঠনের বৈচিত্র নির্ধারণ করতে পারবেন।
- শ্রেণিটির সদস্যগুলি কিভাবে তাদের বংশবৃদ্ধি করে ও কিভাবে তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য সংগঠিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

5.2 অবস্থান, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও অঙ্গজ গঠন

5.2.1 অবস্থান :

ফাংগি ইম্পারফেক্টি শ্রেণির বেশিরভাগ সদস্য স্থলবাসী, যদিও অনেকেই রয়েছে যারা জলবাসী (উদাহরণ - *Alatospora (অ্যালাটোস্পোরা)*; *Tricladium* (ট্রাইক্লেডিয়াম); ইত্যাদি)। এই শ্রেণির ছত্রাক মৃতজীবী অথবা পরজীবী হিসাবে জীবন ধারণ করতে পারে। মৃতজীবী ছত্রাক পচাপাতা, কাঠ, গোবর অথবা জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটিতে জন্মায়। পরজীবী ছত্রাগুলি উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর দেহে জন্মায় ও রোগ সৃষ্টি করে অর্থাৎ এরা প্যাথোজেনিক, (pathogenic)।

5.2.2 অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

এই শ্রেণির ছত্রাকগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট। কারণ অনেকেই যেমন উপকারী ভূমিকা পালন করে তেমনি প্রচুর ছত্রাক রয়েছে যারা উদ্ভিদ বা প্রাণী এমনকি মানুষের নানা প্রকার রোগের জন্য দায়ী।

উপকারী ভূমিকা :

(i) এই শ্রেণির ছত্রাক মৃতজীবী হিসাবে বিরাজ করায় উদ্ভিদ ও প্রাণীজ নানা জৈব পদার্থ পচনে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন পদার্থের রূপান্তর ঘটিয়ে উদ্ভিদের নিকট পুনঃ ব্যবহারযোগ্য করে তোলে অর্থাৎ পদার্থের রিসাইক্লে (Recycle) সাহায্য করে।

(ii) *Rhodotorula* (রডোটোরুলা) এবং *Pullularia (পুলুল্যারিয়া)* নামক ইষ্ট জাতীয় ছত্রাক বাতাসের নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে সক্ষম বলে মনে করা হয়।

(iii) এই শ্রেণির অনেক ছত্রাক রয়েছে যারা মাটিতে জন্মায় এবং হাইফা নির্মিত ফাঁদ পেতে নিমাটোড (Nematode) শিকার করে (উদাহরণ - *Dactylaria ড্যাকটাইলারিয়া*; *Monacrosporium, মোন্যাক্রোস্পোরিয়াম*) (চিত্র 5.1 a) আবার অনেকেই নিমাটোডের দেহে অন্তঃপরজীবী হিসাবে বসবাস করে এবং নিমাটোডকে মেরে ফেলে (উদাহরণ - *Harposporium, হারপোস্পোরিয়াম*) (চিত্র 5.1 b)। এই রকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছত্রাক যেমন, *Arthrobortrys oligospora (আরথ্রোবট্রিস অলিগোস্পোরা)* অথবা কতকগুলি প্রজাতির *Nematoctonus spp.*, *(নিমাটকটোনাস)* একধরনের বিষাক্ত পদার্থ নিমাটোটক্সিন সৃষ্টি করে যা নিমাটোডের দেহকে ধ্বংস করে (Kennedy

and Tapling, 1978)। এই ভাবে মাটিতে উদ্ভিদের রোগ উৎপাদনকারী নিমাটোডের সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে সাহায্য করে, অর্থাৎ জীবিয় পদ্ধতিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ বা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলে (Biological control) অংশগ্রহণ করে।

(iv) এই শ্রেণির অনেক ছত্রাক রয়েছে যাদের মধ্যে কেউবা (উদাহরণ - পেনিসিলিয়াম প্রজাতি) অ্যান্টিবায়োটিক, কেউ বা (উদাহরণ অ্যাসপারজিলাস প্রজাতি) জৈব অম্ল, উৎসেচক ইত্যাদি উৎপাদন করে। কাজেই এই সমস্ত ছত্রাকের বাণিজ্যিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য।

অপকারী ভূমিকা :

উদ্ভিদে রোগ উৎপাদন - *Helminthosporium oryzae* (হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজি) ধান গাছে বাদামী দাগ রোগ সৃষ্টি করে। *Alternaria solani (অলটারনেরিয়া সোল্যানি)* আলুতে অবিলম্বিত ধ্বসা বা আরলি ব্লাইট (Early blight) রোগ সৃষ্টি করে। *Fusarium oxysporum* (ফিউস্যারিয়াম অক্সিস্পোরাম) কলাগাছে পানামা নামক মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া আরও অনেক ছত্রাক রয়েছে যারা বিভিন্ন উদ্ভিদের নানা প্রকার রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

প্রাণী ও মানুষের রোগ উৎপাদন :

এই শ্রেণির বিচ্ছিন্ন ছত্রাক মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ত্বকে দাদ রোগ উৎপন্ন করে (উদাহরণ, *Trichophyton ট্রাইকোফাইটন*), *Mycrosporum (মাইক্রোস্পোরাম)* ইত্যাদি)। *Histoplasma (হিস্টোপ্লাজমা)* মানুষের দেহে হিস্টোপ্লাজমোসিস *(Histoplasmosis)* নামক মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। *Geotricum candidum (জিওট্রিকাম ক্যানডিডাম)* নামক ছত্রাক যেমন টম্যাটো, তরমুজ ইত্যাদি ফলে রোগ সৃষ্টি করে, তেমনি মানুষের দেহেও রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। *Candida albicans (ক্যানডিডা অ্যালবিক্যান্স)* নামক ছত্রাক হাত ও পায়ের নখে, শ্বাসযন্ত্রে, ত্বকে ক্যানডিডিয়াসিস *(Candidiasis)* নামক রোগ সৃষ্টি করে।

5.2.3 অঙ্গজ গঠন :

কিছু ইষ্ট জাতীয় এককোশী (*Rhodotorula, রডোটোরুলা*) সদস্য বাদে বাকি সব সদস্যের অঙ্গজ দেহ বিভেদ প্রচীর যুক্ত মাইসীলিয়াম। মাইসীলিয়াম প্রচুর শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট এবং প্রতিটি কোশ বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত। কোশপ্রাচির কাইটিন-গ্লুকোন দিয়ে গঠিত (বার্টনিকি-গারসিয়া 1968, Bartnicki Garcia, 1968)। বিভেদ প্রাচীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় সরল ছিদ্র বিশিষ্ট, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডলিপোর (Dolipore) ও বিভেদ প্রাচীর সংলগ্ন ক্ল্যাম্প সংযোজন (Clamp connection) দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় ফাংগি ইম্পারফেক্টরি বেশিরভাগ সদস্যের সাথে অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির মিল আছে।

অনুশীলনী - 1

নিচের তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

1) ফাংগি ইম্পারফেক্টির বেশিরভাগ সদস্য ________ বাসী, যদিও অনেকেই রয়েছে যারা ________। *Alatospora* (অ্যালাটোস্পোরা) একটি ________ বাসী ছত্রাক।

2) *Rhodotorula (রডোটোরুলা)* বাতাসের ________ স্থিতিকরণে সক্ষম বলে মনে করা হয়।

3) *Macrosporium (ম্যাক্রোস্পোরিয়াম)* ________ পেতে ________ শিকার করে এবং এইভাবে ____ ____ পদ্ধতিতে উদ্ভিদ ________ নিয়ন্ত্রণ করে।

4) *Fusarium oxisporum (ফিউস্যারিয়াম অক্সিস্পোরাম)* কলাগাছে ________ নামক মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে।

5) উদ্ভিদ ও মানুষ উভয়ের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী একটি ছত্রাক হল ________।

6) ফাংগি ইমপারফেক্টির বেশিরভাগ সদস্যের অঙ্গজ দেহ ________।

7) ফাংগি ইমপারফেক্টির বেশিরভাগ সদস্যের বিভেদ প্রাচীর একটি সরল ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়ার এই শ্রেণিটির সাথে ________ শ্রেণির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

8) ফাংগি ইমপারফেক্টরি অপর নাম ________।

(নাইট্রোজেন, জল জলবাসী, স্থল, পানামা, রোগ, নিমাটোড, ফাঁদ, জীবিয়, বিভেদ প্রাচীর যুক্ত মাইসীলিয়াম, জিওট্রিকাম ক্যানডিডাম, ডয়েটেরোমাইসিটিস, অ্যাসকোমাইসিটিস)

5.3 জনন

পূর্বেই বলা হয়েছে ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণিতে যৌন জনন অনুপস্থিত বা জানা যায়নি। কাজেই এরা অঙ্গা জ বা অযৌন পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে।

অঙ্গজ জনন সাধারণত মাইসীলিয়ামের খণ্ডীভবন বা ফ্র্যাগমেনটেশনের (Fragmentation) মাধ্যমে ঘটে। ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণিতে কিছু সদস্য রয়েছে যাদের কোনরূপ অযৌন রেণু (asexual spore) উৎপন্ন হয় না। কাজেই এই সমস্ত ছত্রাকের ক্ষেত্রে (উদাহরণ - *Rhizoctonia, রাইজোকটোনিয়া*) অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই শ্রেণিটি প্রধানত অযৌন প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে। অযৌন জনন প্রধানত কনিডি ও রেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কনিডিওরেণু ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে ক্ল্যামাইডোরেণু উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ক্ল্যামাইডোরেণু যথারীতি হাইফার (কোশের (প্রান্তীয় অথবা অন্তবর্তী) স্ফীতি, অধিক খাদ্য সঞ্চয় ও পুরু কোশপ্রাচীর উৎপাত্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় (উদাহরণ - *Fusarium, ফিউসেরিয়াম*) (চিত্র 5.2)।

এই শ্রেণিভুক্ত যে ছত্রাকগুলি মোটামুটি আলগাভাবে (loosing) ও পেঁজা তুলোর মত বিন্যাস্ত হাইফাগুলির উপর করনিডিওরেণু সৃষ্টি করে অনেকের মতে (Subramanian, 1971; Tubaki, 1981; Hawksworth, 1983) তাদেরকে হাইফোমাইসিটিস (Hyphomycetes) নামকরণ করা হয়েছে।

5.3.1 কনিডিওরেণু ও বিভিন্নপ্রকার অযৌন ফলদেহ :

কনিডিওরেণুগুলি (conidia) সাধারণত কনিডিওফোরের (Conidiophores) অগ্রভাগে জন্মায়। কনিডিওফোর সিথিলভাবে সজ্জিত অঙ্গজ ইহাফা হতে উৎপন্ন হতে পারে অথবা বিশেষ অযৌন ফলদেহে (fruitbody) উৎপন্ন হতে পারে। এই ফলদেহ সাধারণত চার প্রকার ঃ — (i) সিনেমা (Synnema), (ii) অ্যাসারভিউলাস (Acervulus), (iii) স্পোরোডোকিয়াম (Sporodochium), এবং (iv) পিকনিডিয়াম (Pycnidium)।

(i) সিনেমা ঃ এক্ষেত্রে ঘনসন্নিবেশিত কনিডিওফোরগুলির নিচের অংশ পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং উপরের অংশ মুক্ত ও শাখান্বিত। প্রতিটি শাখার অগ্রভাগে উৎপন্ন হয় কনিডিওরেণু। উদাহরণ - *Arthrobotryum (আরথ্রোবোট্রিয়াম)*, *Graphium (গ্র্যাফিয়াম)* (চিত্র 5.3)। এই ধরনের ফলদেহকে করিমিয়ানও (Coremium), বলা হয়।

(ii) অ্যাসারভিউলাস ঃ এক্ষেত্রে হাইফাগুলি একে অপরকে জড়িয়ে এবং পরিবর্তিত হয়ে একটি পিনকুশনের (pin-cushion) ন্যায় গঠন (স্ট্রোমা, Stroma) সৃষ্টি করে এবং ঐ কুশন হতে খর্বাকৃতি কনিডিওফোরগুলি উৎপন্ন হয়ে প্রায় সমান্তরাল ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রতিটি কনিডিওফোরের অগ্রভাগে উৎপন্ন হয় কনিডিওরেণু। সাধারণত এই অ্যাসারভিউলাসের কুশন অংশটি পোষক উদ্ভিদের ত্বকের নিচে সৃষ্টি হয়। উদাহরণ - কোলিটোট্রিকাম *(Colletotrichum)*। কোলিটোট্রিকামে অ্যাসারভিউলাসকে ঘিরে কালো শক্ত রোম বা সিটা (seta) দেখা যায় চিত্র (5.4)।

> **প্রান্তলিপি : কুশন** (cushion) : লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কুশনটি প্যারেনকাইমা (parenchyma) সদৃশ কলা দ্বারা গঠিত। হাইফাগুলি পরিবর্তিত হয়ে এই কলা গঠন করে। এই কলা অপ্রকৃত প্যারেনকাইমা বা সিউডোপ্যারেনকাইমা (Pseudoparenchyma) নামে পরিচিত।

(iii) স্পোরোডোকিয়াম ঃ এটি অ্যাসারভিউলাসের পরিবর্তিত রূপ, অর্থাৎ এক্ষেত্রে হাইফা নির্মিতে কুশন হতে উৎপন্ন কনিডিওফোরগুলি অধিক ঘনসন্নিবেশিত। কনিডিওফোরের অগ্রভাগ হতে যথারীতি কনিডিওরেণু উৎপন্ন হয়। ওয়েবস্টারের (Webster, 1980) মতে স্পোরোডোকিয়াম প্রকৃতপক্ষে সিনেমায় খর্বাকৃতি রূপ। উদাহরণ - *Fusarium (ফিউসেরিয়াম)* (চিত্র 5.5)।

(iv) পিকনিডিয়াম ঃ এগুলি ফ্লাস্কের ন্যায় অথবা গোলাকার, সাধারণত অস্টিওল (Ostiole) নামক ছিদ্রের মাধ্যমে বাহিরে উন্মুক্ত। এগুলি দেখতে পেরিথেসিয়ামের মত হলেও এদের ভিতরে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয় না। পিকনিডিয়ামের প্রাচীর পরিবর্তিত হাইফা (সিউডোপ্যারেনকাইমা) নির্মিত। পিকনিডিয়ামের প্রাচীরের ভিতরের দিক হতে সাধারণত কনিডিওফোর উৎপন্ন হয় ও কনিডিওফোরের অগ্রভাগ হতে কনিজিওরেণু উৎপন্ন হয়। কনিডিওফোর নানাপ্রকারের হতে পারে। এগুলি শাখাবিহীন খর্বাকৃতি হতে পারে (উদাহরণ - *Phyllosticta ফাইলোস্টিকটা*) অথবা লম্বা ও শাখান্বিত হতে পারে (উদাহরণ - *Dendrophoma, ডেনড্রোফোমা*)। পিকনিডিয়ামগুলি এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, সরল বা জটিল, সর্পিলাকার (labyrinthiform) প্রকৃতির বা কখনও কখনও ওষ্ঠাকৃতি (beaked) হয়। ফলদেহগুলি উদ্ভিদপোষক কলার গভীরে অথবা ত্বকের নীচে সৃষ্টি হয় (চিত্র 5.6)।

5.3.1.1 কনিডিওরেণুর গঠন :

কনিডিওরেণুগুলি গঠনগত ও বর্ণগত ভাবে বিভিন্ন প্রকার হয়। এগুলি এককোশী, দ্বিকোশী বা বহুকোশী হতে পারে। বহুকোশী কনিডিওরেণুর বিভেদপ্রাচীর আবার অনুপ্রস্থ হতে পারে অথবা অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য উভয়প্রকার হতে পারে। গঠনগত ভাবে বিভিন্ন কনিডিওরেণুগুলির নানা নামকরণ লক্ষ্য করা যায়, যেমন একই প্রজাতিতে ক্ষুদ্রকার এককোশী কনিডিওরেণু এবং বৃহদাকার বহুকোশী কনিডিওরেণু উৎপন্ন হলে ছোটটিকে মাইক্রোকনিডিয়াম (Microconidium) ও বড়টিকে ম্যাক্রোকনিডিয়াম (Macroconidium) বলে। উদাহরণ ফিউসেরিয়াম (চিত্র 5.7)। এককোশী কনিডিওরেণুকে অ্যামেরোস্পোর (amerospore), দ্বি-কোশী কনিডিওরেণুকে ডিডাইমোস্পোর

(Didymospore), বহুকোশী অনুপ্রস্থ প্রাচীরযুক্ত কনিডিওরেণুকে ফ্র্যাগমোস্পোর (Phragmospore), বহুকোশী-অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য প্রাচীরযুক্ত কনিডিওরেণুকে ডিকটিওস্পোর (Dictyospore) বলা হয়। এছাড়া রয়েছে তারকাকৃতি কনিডিওরেণু (স্ট্যাউরোস্পোর, Staurospore), কুণ্ডলীকৃত কনিডিওরেণু (হেলিকোস্পোর, Helicospore), ও সরু এবং দীর্ঘ সূত্রাকার বা কৃমিরমত (worm like) কনিডিওরেণু (স্কোলিকোস্পোর, Scolecospore) (চিত্র 5.8)। ফাংগি ইমপারফেক্টিতে আর্থ্রোরেণু এবং ব্লাস্টোরেণুও উৎপন্ন হয়। এগুলিকেও কনিডিওরেণুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে এগুলিকে যথাক্রমে আর্থ্রোকনিডিওরেণু বা আর্থ্রোকনিডিয়াম (Arthroconidium) ও ব্লাস্টোকনিডিওরেণু বা প্লাস্টোকনিডিয়াম (Blastoconidium) বলা হয়। পিক্‌নিডিয়ামের অভ্যন্তরে উৎপন্ন কনিডিওরেণুকে বলা হয় পিকনিডিওরেণু (Pycnidiospore) এবং যখন কনিডিওরেণু কনিডিওফোরের অগ্রস্থ (apical part) ছিদ্র থেকে উদ্ভূত হয় তখন পোরোরেণু (porospore) বলা হয়।

কনিডিওরেণু বর্ণহীন, কালো অথবা নানা উজ্জ্বল বর্ণের (যেমন-সবুজ, হলুদ, পিঙ্ক ইত্যাদি) হয়। এই বিভিন্ন প্রকার বর্ণ বিভিন্ন রঞ্জক কণিকার উপস্থিতির কারণে হয়। কালো বর্ণ সম্ভবত মেলানিন নামক কণিকার জন্য হয়।

5.3.1.2 কনিডিওরেণুর-উৎপাদন (চিত্র 5.9) :

কনিডিওরেণুর উৎপাদন পদ্ধতি দু'প্রকার - থওালিক (Thallic) ও ব্ল্যাস্টিক (Blastic)

(i) থ্যালিক : এক্ষেত্রে হাইফার যে কোশটি কনিডিওরেণু উৎপাদক হিসাবে কাজ করে সেই কোশের যে অংশ হতে কনিডিওরেণু উৎপন্ন হয় সেই অংশটি কোনরূপ স্ফীত না হয়ে বিভেদ প্রাচীর দ্বারা পৃথিলীকৃত হয়ে রেণুতে পরিণত হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে রেণু ও রেণু উৎপাদক কোশের ব্যাস একই প্রকার থাকে। আর্থ্রোকনিডিয়া এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়। উদাহরণ - *Geotrichum candidum (জিওট্রিকাম ক্যানডিডাম)*।

(ii) ব্ল্যাস্টিক : এক্ষেত্রে রেণু উৎপাদনকারী কোশটির যে অংশ হতে রেণু উৎপন্ন হয় সেই অংশটি ফুলে ওঠে ও বিভেদ প্রাচীর দ্বারা পৃথকীকৃত হয়ে রেণুতে পরিণত হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে রেণুর ব্যাস রেণু উৎপাদনকারী কোশ অপেক্ষা বেশি হয়। ব্লাস্টিক উৎপাদন আবার দুই প্রকার— হলোব্ল্যাস্টিক (Holoblastic) এবং এন্টারোব্ল্যাস্টিক (Enteroblastic)।

(a) হলো ব্ল্যাস্টিক : এক্ষেত্রে কনিডিওরেণু উৎপাদনকারী কোশের ভিতরের এবং বাহিরের উভয় প্রাচীর কনিডিওরেণুর প্রাচীর উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে, উদাহরণ - *Cladosporium (ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম)*।

(b) এন্টারো ব্ল্যাস্টিক : এক্ষেত্রে কনিডিওরেণু উৎপাদনকারী কোশের কেবলমাত্র ভিতরের প্রাচীর কনিডিওরেণুর প্রাচীর গঠনে অংশগ্রহণ করে অথবা কনিডিওরেণুর প্রাচীরটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে। যখন রেণুউৎপাদনকারী কোশের বাহিরের প্রাচীরে সৃষ্ট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ভিতরের প্রাচীরটি উৎগত হয়ে কনিডিওরেণু উৎপন্ন হয়, তখন সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে (ট্রেটিক বা পোরিক (Tretic or portic) উৎপাদন পদ্ধতি বলে (উদাহরণ - *Helminthosporium velutinum হেলমিনথোস্পোরিয়াম ভেলুটিনাম)*। আর একপ্রকার উৎপাদন পদ্ধতি হল ফিয়ালিডিক (Phialidic) উৎপাদন পদ্ধতি এক্ষেত্রে কনিডিওরেণু উৎপাদনকারী কোশটি হল ফিয়ালাইড (Phialidie) যা অনেকটা বোতলের মত দেখতে। এই ফিয়ালাইডের অগ্রভাগ ফেটে যায় ও সেই অংশ দিয়ে প্রোটোপ্লাজম উদগত হয়ে নতুন কনিডিওরেণুর

সৃষ্টি করে। এই কনিডিওরেণুর প্রাচীরটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ এটি ফিয়ালাইড প্রাচীরের প্রবর্ধিত অংশ নয়। (উদাহরণ *Aspergillus আ্যাসপারজিলাস, Penicillium পেনিসিলিয়াম*) ইত্যাদি।

5.4 প্যারাসেক্সুয়ালিটি (Parasexuality) :

যৌন জননে অপারগ ফাংগি ইমপারফেক্টি নানা পরিবেশে জন্মায় এবং পরিবেশের নানা পিরবর্তন সত্ত্বেও আজও এরা তাদের অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। এর মূল কারণ প্যারাসেক্সুয়ালিটি বা প্যারাসেক্সুয়াল চক্র (Parasexual cycle)। প্যারাসেক্সুয়ালিটি এক বিশেষ প্রক্রিয়া যাতে প্ল্যাজমোগ্যামী, ক্যারিওগামী, হ্যাপ্লয়েড করণ এবং সেই সাথে বৈশিষ্ট্যের পুনঃ সংযুক্তি বা রিকম্বিনেশনের (Rocombination) মত ঘটনাগুলি ঘটে, কিন্তু তা দেহের কোন সুনির্দিষ্ট স্থানে বা জীবন চক্রের কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ে ঘটে না। এক কথা যৌন জনন ব্যতিরেকে যৌন জননের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ পুনঃসংযুক্তির (রিকম্বিনেশনের) মাধ্যমে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি, তা ঘটে এই প্যারাসেক্সুয়ালিটিতে। প্যারাসেক্সুয়ালিটি প্রথম আবিষ্কার করেন পন্টেকরভো ও রোপার (Pontecorvo & Roper, 1952) *Aspergillas nidulans (অ্যাসপারজিলাস নিডুল্যান্স)* নামক ছত্রাকে, যেটির পারফেক্ট দশায় নাম Emericella nidulans *(এমেরিসেলা নিডুল্যান্স)* । পরবর্তীকালে অন্যান্য অনেক ছত্রাকে প্যারাসেক্সুয়ালিটি দেখা গেছে, যেমন, অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির - Cochliobolus sativus *(ককলিওবোলাস স্যাটিভাস)*, বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির - *Schizophyllum commune (সাইজোফাইলাম কমিউন)*, ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির - *Phytopthora, ফাইটোফথোরা* (Buddenhagen, 1958)। প্যারাসেক্সুয়ালিটি নিম্নলিখিত ধাপগুলির মাধ্যমে সংগঠিত হয়—

(i) **হেটারোক্যারিওসিস :** কোন ছত্রাকের জিনগতভাবে ভিন্ন দুটি হ্যাপ্লয়েড হাইফা পরস্পরকে জড়িয়ে থাকার ফলে এক সময় প্ল্যাজমোগ্যামী সংগঠিত হয় ও একটি হাইফার কোশ থেকে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস অপর হাইফার কোশে প্রবেশ করে। এরপর ঐ ভিন্ন প্রকৃতির প্রবিষ্ট নিউক্লিয়াস বিভাজিত হতে থাকে ও সমগ্র মাইসীলিয়ামে ছড়িয়ে পরে। এইভাবে একটি হেটারোক্যারিওটিক (নিউক্লিয়াসগুলি ভিন্নপ্রকার) মাইসীলিয়ামের সৃষ্টি হয়। এছাড়া মিউটেশনের (Mutation) ফলেও একটি হোমোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম হেটারোক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামে রূপান্তরিত হতে পারে। এইভাবে একটি হোমোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম হতে হেটারোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম উৎপাদন পদ্ধতিতে হেটারোক্যারিওসিস বলে (Heterokaryosis)।

> **প্রান্তলিপি :** দুটি সদৃশ হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের মিলনে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসকে হোমোজাইগাস (Homozygous) এবং দুটি বিসদৃশ নিউক্লিয়াসের মিলনে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসকে হেটারোজাইগাস ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বলে।

(ii) **ক্যারিওগ্যামী :** জিনগতভাবে ভিন্ন নিউক্লিয়াসগুলি পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে (ক্যারিওগ্যামী) হেটারোজাইগাস (heterozygous) ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং এই উৎপন্ন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসগুলি জনিতৃ বা প্যারেনট্যাল (Parental)e হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসগুলির সাথে বিভাজিত হয়ে সংখ্যা বাড়াতে থাকে।

(iii) **ডিপ্লয়েড কলোনী উৎপাদন :** উপরোক্ত হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হেটারোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম হতে হ্যাপ্লয়েড কনিডিওরেণুর ন্যায় ডিপ্লয়েড কনিডিওরেণুও উৎপন্ন হতে পারে। ডিপ্লয়েড কনিডিওরেণু অঙ্কুরিত হয়ে ডিপ্লয়েড মাইসীলিয়াম উৎপন্ন করতে পারে। এছাড়া হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সমন্বিত হেটারোক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামের যে সমস্ত হাইফলা অগ্রভাগের কোশটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট থাকে, সেই হাইফাগুলি দ্রুততর বৃদ্ধি পেয়েও ডিপ্লয়েড কলোনী তৈরি করতে পারে।

(iv) মাইটোটিক ক্রসিংওভার : ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সময় এক বিরল ঘটনা, মাইটোটিক ক্রসিং ওভার, ঘটে যায়। এই ক্রসিংওভারের ফলে দুটি সমসংস্থ বা হোমোলোগাস (Homologus) ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের আদানপ্রদান সংগঠিত হয়। (উদাহরণ - *Aspergillus nidulans, অ্যাসপারজিলাস নিডুল্যান্স*), *A. niger (অ্যাসপারজিলাস নিগার)*।

ডিপ্লয়েড নিউক্লিবয়াসগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির। তাই ডিপ্লয়েড মাইসীলিয়ামের মধ্যে হ্যাপ্লয়েডকরণ বা হ্যাপ্লডাইজেশন (Haploidization) প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। এটি অমিয়োসিস প্রক্রিয়ায় ঘটে। সম্ভবত ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের বারবার বিভাজনের সময় পর্যায়ক্রমে একটি একটি করে ক্রোমোজোম সংখ্যা কমতে থাকে, অর্থাৎ 2n-1, 2n-2 (অ্যানিউপ্লয়েড নিউক্লিয়াস, aneuploid nucleus) এই ভাবে কমতে থাকে এবং অবশেষে হ্যাপ্লয়েড (n) দশাপ্রাপ্ত হয়। অ্যাসপারজিলাস নিগার প্রজাতিতে 1000টির মধ্যে 1টি ক্ষেত্রে হ্যাপ্লডাইজেশনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে (পন্টেকরভো, Pontecorvo, 1958)

(v) হ্যাপ্লয়েড কলোনী উৎপাদন : হ্যাপ্লয়েডকরণের ফলে উক্ত মাইসীলিয়াম হতে প্যাপ্লয়েড কনিডিওরেণু উৎপন্ন হয় এবং ওই রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন হ্যাপ্লয়েড মাইসীলিয়ামের সৃষ্টি হয়। এই হ্যাপ্লয়েড মাইসীলিয়ামের কোন কোনটি নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে দেখা যায়।

প্যারাকেক্সুয়ালিটি প্রক্রিয়াটি নিচে ছকের সাহায্যে দেখান হল—

হেটারোক্যারিওসিস → ক্যারিওগ্যামী → হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হেটারোক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি

↓

ডিপ্লয়েডরেণু উৎপাদন → ডিপ্লয়েড কলোনী উৎপাদন → মাইটোটিক ক্রসিংওভার → হ্যাপ্লডাইজেশন

↓

হ্যাপ্লয়েডরেণু উৎপাদন (নতুন বৈশিষ্টসম্পন্ন)

↓

হ্যাপ্লয়েড কলোনী উৎপাদন (নতুন বৈশিষ্ট সম্পন্ন)

কাজেই প্যারাসেক্সুয়ালিটিতে যৌন জননের অনুরূপ প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামী ঘটনাদুটি ঘটছে, কিন্তু এই দুই প্রক্রিয়া কোন পূর্বনির্ধারিত কোশে অথবা সময়ে সংগঠিত হচ্ছে না। যৌন জননে সাধারণত ক্যারিওগ্যামীর পর মিওসিস ঘটে ও হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন হয়। মিওসিসের সময় ক্রসিংওভারের কারণে পুনঃ সংযুক্তি বা রিকম্বিনেশন ঘটে। প্যারাসেক্সুয়ালিটিতে মিওসিস প্রক্রিয়াটি অনুপস্থিত হওয়ার ক্যারিওগ্যামীর পর মাইটোসিস বিভাজন চলতে থাকে এবং মাইটোটিক ক্রসিংওভার ঘটে। ফলে, রিকম্বিনেশন ঘটায় কোন বাধা থাকে না। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েডকরণ ঘটনাটি সম্পূর্ণ অ্যামিয়োসিস প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয়।

5.4.1 প্যারাসেক্সুয়ালিটির গুরুত্ব :

(i) অযৌন জনন নির্ভর ছত্রাকে জিনের মানচিত্র (জিনেটিকাল ম্যাপ, () নির্ণয় সম্ভব হয়েছে প্যারাসেক্সুয়ালিটি থাকার কারণে।

(ii) ফাংগি ইমপারফেক্টরি যে সমস্ত ছত্রাক বিভিন্ন শিল্পে (যেমন-অ্যানটিবাওটিক, উৎসেচক উৎপাদন, জৈব অম্ল উৎপাদন ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়, তাদের উন্নতমানের স্ট্রেন উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে এই প্রক্রিয়াটি দ্বারা (যমন - বেনিসিলিন তৈরির জন্য উন্নত মানের পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম স্ট্রেন অথবা প্রোটিয়েজ উৎপাদনের জন্য উন্নতমানের অ্যাসপারজি লাস ওরাইজি স্ট্রেন)।

(iii) এই পধ্বতি প্রয়োগে ফাংগি ইমপারফেক্টির বিভিন্ন রোগ উৎপাদনকারী সদস্য নিত্য নতুন স্ট্রেন উৎপন্ন করে এবং নিজেদের টিকিয়ে রাখে।

5.5 শ্রেণিবিন্যাস

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সমস্ত ছত্রাকে যৌন জনন জানা যায়নি তাদেরকে ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যৌন জনন জানার পর দেখা গেছে, এই শ্রেণির কোন সদস্য অ্যাসকোমাইসিটিস আবার কোন সদস্য বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে, অর্থাৎ যৌন জনন জানা না থাকায় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণির সদস্যকে একই শ্রেণিতে ধরে রাখা হয়েছে। কাজেই এই শ্রেণিটি কৃত্রিম শ্রেণি এবং সদস্যগুলিকে সাময়িকবাবে গোষ্ঠিভুক্ত করতে এই শ্রেণিটির সৃষ্টি। এই শ্রেণিটিকে, বর্ণনার সুবিধার জন্য মার্টিন (Martin, 1961) প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে চারটি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণিবিন্যাস মূলত অযৌন রেণু (প্রধানত কনিডিওরেণু) উৎপাদনের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এর বর্গগুলি স্বাভাবিকভাবে কৃত্রিম, কারণ যেমন অনেক নিকট সম্পর্কীয় ছত্রাককে অযৌন রেণুর ভিত্তিতে গোষ্ঠিবদ্ধ করতে গিয়ে বিভিন্ন বর্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছে তেমনি অনেক দূর সম্পর্কের ছত্রাককে একই বর্গভুক্ত করা হয়েছে। আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে যখন একই ছত্রাকে একাধিক প্রকার কনিডিওরেণু উৎপন্ন হয়েছে। যাই হোক ফাংগি ইমপারফেক্টিতে যে চারটি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে তা ছকের সাহায্যে নিচে দেওয়া হল।

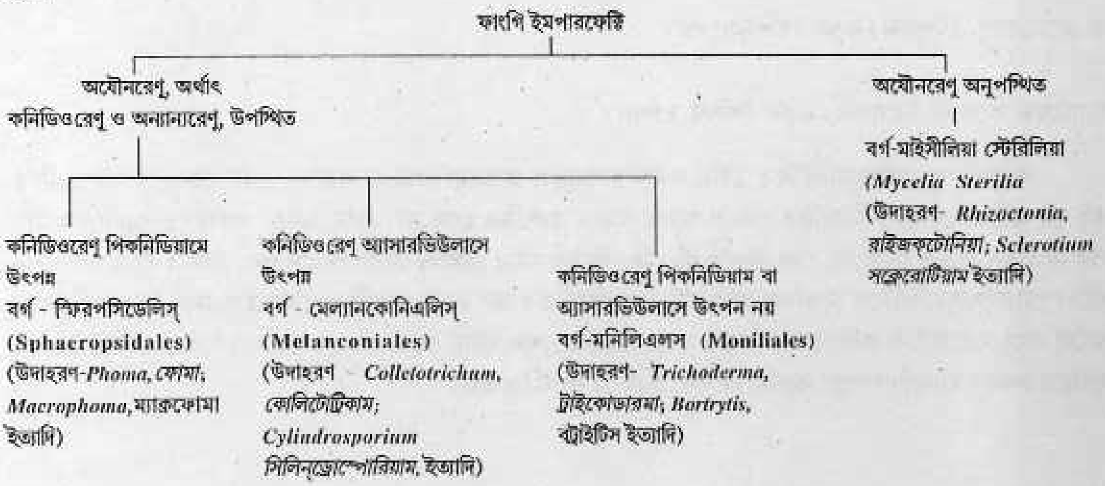

অনুশীলনী - 2

নিচের তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন-

1) ফাংগি ইম্পারফেক্টিতে যৌন জনন ________ বা ________।

2) ফাংগি ইম্পারফেক্টি ________ ও ________ পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে।

3) অযৌন জনন প্রধানত ________ রেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

4) অযৌন ফলদেহ ________ প্রকার এবং এগুলি হল ________, ________, ________ ও ________।

5) ফিউসেরিয়াম ছত্রাকে দু'প্রকার কনিডিওরেণু উৎপন্ন হয়। একপ্রকার হল ছোট এবং এককোশী, এটিকে ________ ও অপর প্রকার হল বড় এবং বহুকোশী, এটিকে ________ বলা হয়।

6) দ্বিকোশী কনিডিওরেণুকে ________ এবং কুণ্ডলীকৃত কনিডিওরেণুকে ________ বলা হয়।

7) কনিডিওরেণুর উৎপাদন পদ্ধতি দু'প্রকার এবং এগুলি হল ________ ও ________।

8) ফাংগি ইমপারফেক্টিতে যৌন জননের বিকল্প এক পদ্ধতি রয়েছে, এটির নাম হল ________। এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ________ যা মিয়োসিস প্রক্রিয়ার বিকল্প।

(অযৌন, অনুপস্থিত, অঙ্গজ, জানা যায়নি, চার, কনিডিও, সেনেমা, মাইক্রোকনিডিয়াম, অ্যাসারভিউলাস, ম্যাক্রোকনিডিয়াম, ডিডাইমোস্পোর, স্পোরোডোকিয়াম, হেলিকোস্পোর, পিকনিডিয়াম, মাইটোটিক ক্রসিং ওভার, থ্যালিক, প্যারাসেক্সুয়ালিটি, ব্লাস্টিক)

5.6 সারাংশ :

এই এককটি পড়ে আপনারা ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণিটির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পেরেছেন। আপনারা জানতে পেরেছেন :-

- ফাংগি ইমপারফেক্টি জলবাসী অথবা স্থলবাসী হতে পারে এবং মৃতজীবী অথবা পরজীবী হতে পারে।
- ফাংগি ইমপারফেক্টি উপকারী ও অপকারী, উভয় ভূমিকা পালন করতে পারে
- এই শ্রেণির কিছু সদস্য এককোশী হলেও অধিকাংশ সদস্য বিভেদ প্রাচীর যুক্ত মাইসীলিয়াম দেহ বিশিষ্ট। বিভেদ প্রাচীর বেশিরভাগ সদস্যে সরল ছিদ্রযুক্ত।
- জনন — অঙ্গজ ও অযৌন, অযৌন জনন প্রধানত কনিডিওরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কনিডিওরেণু নানাপ্রকার — এককোশী, দ্বিকোশী অথবা বহুকোশী। আকৃতিগত ও বর্ণগতভাবে কনিডিওরেণুর নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কনিডিওরেণুর উৎপাদন পদ্ধতি মূলত দুই প্রকার ঃ— থ্যালিক ও ব্লাস্টিক। ব্লাস্টিক উৎপাদন পদ্ধতি আবার দুই প্রকার ঃ— হলোব্লাস্টিক ও এন্টারোব্লাস্টিক।
- এই শ্রেণিতে যৌন জনন অনুপস্থিত হলেও সদস্যগুলিতে নানান নতুন বৈচিত্র্যের উদ্ভব ঘটে এবং তার কারণ প্যারাসেক্সুয়ালিটি নামনক যৌন জননের বিকল্প প্রক্রিয়ার উপস্থিতি। এই প্রক্রিয়াটিতে প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামী থাকলেও যৌন জননের ন্যায় মিয়োসিস প্রক্রিয়াটি অনুপস্থিত। পুনঃ সংযুক্তি বা রিকম্বিনেশন প্রক্রিয়াটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের মাইটোসি বিভাজনের সময় ঘটে।

- ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণিটিকে অযৌন রেণু (কনিডিওরেণু) উৎপন্ন হওয়ার ভিত্তিতে চারটি কৃত্রিম বর্গ বা ফর্ম অর্ডারে (Form order) বিভক্ত করা হয়েছে এবং এগুলি হল স্ফিরপসিডেলিস্, মেল্যানকোনিএলিস, মনিলিএলিস্ ও মাইসীলিয়া ষ্টেরিলিয়া।

5.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1) ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণিটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

2) অযৌন ফলদেহ কি? যৌন ফলদেহ থেকে এর প্রধান পার্থক্য কোথায়? ফাংগি ইমপারফেক্টিতে যে বিভিন্নপ্রকার অযৌন ফলদেহ উৎপন্ন হয় তার চিত্র সহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

3) কনিডিওরেণু উৎপাদন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

4) প্যারসেক্সুয়ালিটি কি? প্রক্রিয়া টি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

5) টীকা লিখুন —

   a) প্যারসেক্সুয়ালিটির গুরুত্ব

   b) সিনেমা ও স্পোরোডোকিয়াম

   c) আসারভিউলাস ও পিকনিডিয়াম

   d) কনিডিওরেণুর ব্ল্যাস্টিক উৎপাদন পদ্ধতি।

6) ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণিটিকে কেন কৃত্রিম শ্রেণি বা ফর্ম ক্লাস (Form class) বলা হয়? এই শ্রেণিটিকে কোন কোন বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে বৈশিষ্ট্য সহ ছকের সাহায্যে তা উল্লেখ করুন।

5.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

1) স্থল, জলবাসী, জল

2) নাইট্রোজেন

3) ফাঁদ, নিমাটোড, জীবিয় রোগ

4) পানামা

5) জিওট্রিকাম ক্যানডিডাম

6) বিভেদপ্রাচীর যুক্ত মাইসীলিয়াম

7) অ্যাসকোমাইসিটিস

8) ডয়েটেরোমাইসিটিস

অনুশীলনী - 2

1) অনুপস্থিত, জানা যায়নি

2) অঙ্গজ, অযৌন

3) কনিডিও

4) চার, সিনেমা, অ্যাসারভিউলাস, স্পোরোডোকিয়াম, পিকনিডিয়াম

5) মাইক্রোকনিডিয়াম, ম্যাক্রোকনিডিয়াম

6) ডিডাইমোস্পোর, হেলিকোস্পোর

7) থ্যালিক, ব্ল্যাস্টিক

8) প্যারাসেক্সুয়ালিটি, মাইটোটিক ক্রসিংওভার

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1) অনুচ্ছেদ 5.2.2 দেখুন।

2) অযৌন রেণু অনেক সময় হাইফা নির্মিত এক বিশেষ গঠনের মধ্যে বা উপরে উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার অযৌন জনন সম্পর্কিত বিশেষ গঠনকে অযৌন ফলদেহ বলে। ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণিতে কনিডিওরেণু অনেক সময় এই রকম ফলদেহে (যেমন সিনেমা, পিকনিডিয়াম ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়।

যৌন ফলদেহের সঙ্গে প্রধান পার্থক্য—

যৌন ফলদেহ সাধারণত অ্যাসকোমাইসিটিস ও বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিতে উৎপন্ন হয়। যৌন ফলদেহের সঙ্গে অযৌন ফলদেহের প্রধান পার্থক্য হল যৌন ফলদেহে যৌন রেণু (অ্যাসকোরেণু বা বেসিডিওরেণু) উৎপন্ন হয়, কিন্তু অযৌন ফলদেহে অযৌন রণু (কনিডিওরেণু) উৎপন্ন হয়।

অপরবর্তী প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ 5.3.1 দেখুন।

3) অনুচ্ছেদ 5.3.1.2 দেখুন।

4) অনুচ্ছেদ 5.4 দেখুন।

5) a) অনুচ্ছেদ 5.4.1 দেখুন।

b) অনুচ্ছেদ 5.3.1 (i) ও (iii) দেখুন।

c) অনুচ্ছেদ 5.3.1 (ii) ও (iv) দেখুন।

d) অনুচ্ছেদ 5.3.1.2 (ii) দেখুন।

6) অনুচ্ছেদ 5.5 দেখুন।

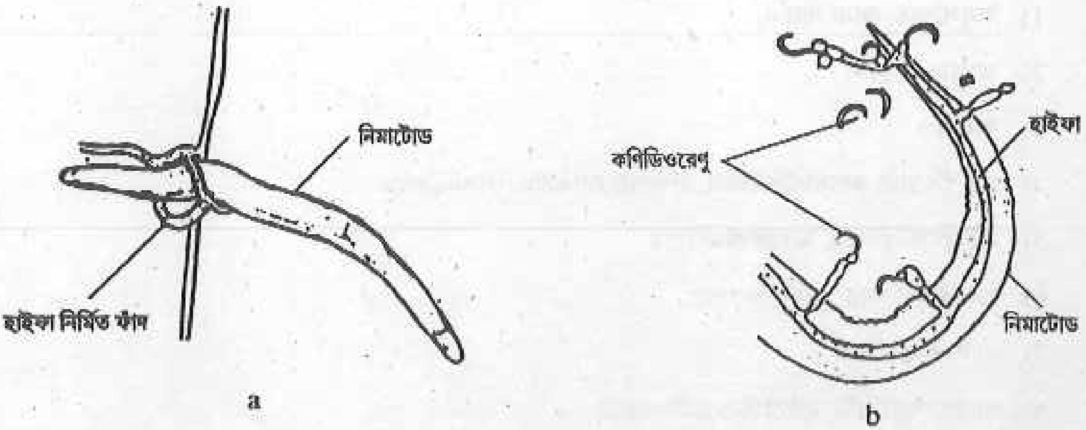

চিত্র নং 5.1 ঃ (a) ***Monacrosporium*** *(মোনাক্রোস্পোরিয়ামের)* হাইফা নির্মিত ফাঁদে আবদ্ধ নিমাটোড।
(b) ***Harposporium*** *(হারপোস্পোরিয়াম)* অন্তঃপরজীবী হিসাবে নিমাটোড দেহে অবস্থিত (নিমাটোড দেহ আংশিক অঙ্কিত)।

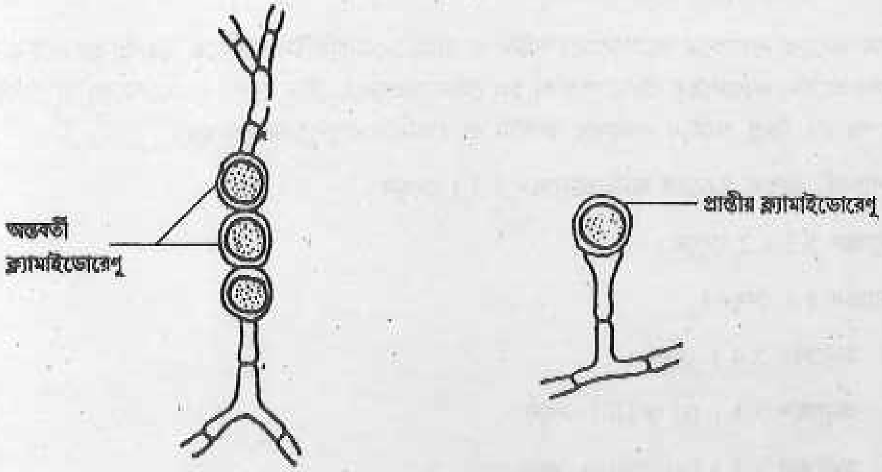

চিত্র নং 5.2 ঃ ক্ল্যামাইডোরেণু

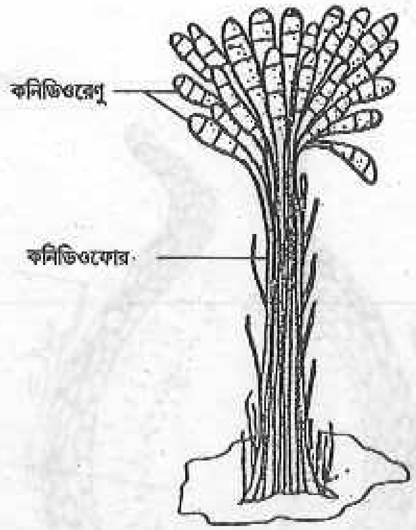

চিত্র নং 5.3 : সিনেমা (Synnema)

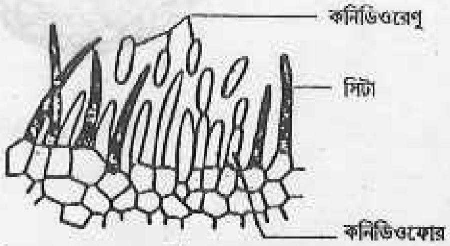

চিত্র নং 5.4 : অ্যাসারভিউলাস (Acervulus)

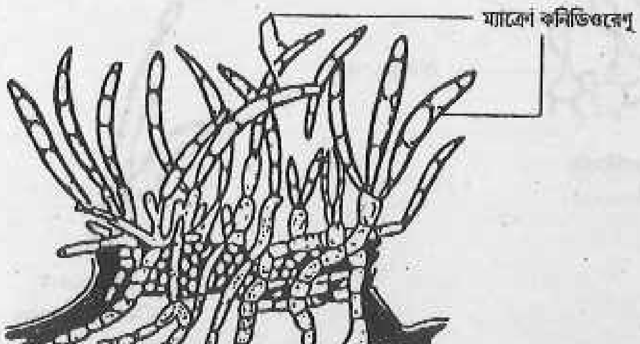

চিত্র নং 5.5 : স্পোরোডোকিয়াম (Sporodochium)

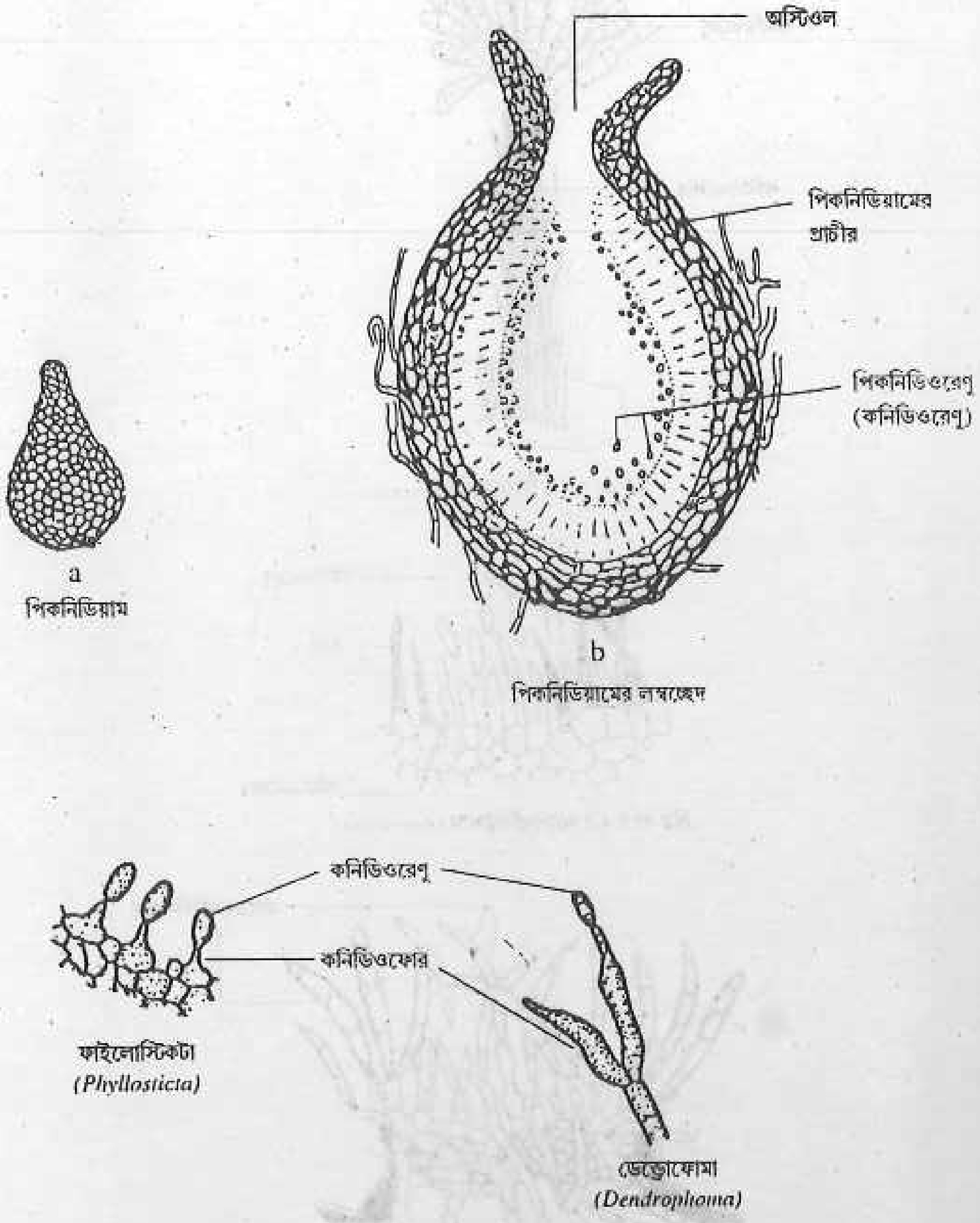

চিত্র নং 5.6 : পিকনিডিয়াম ও পিকনিডিয়াম মধ্যস্থ বিভিন্ন প্রকার কনিডিওফোর

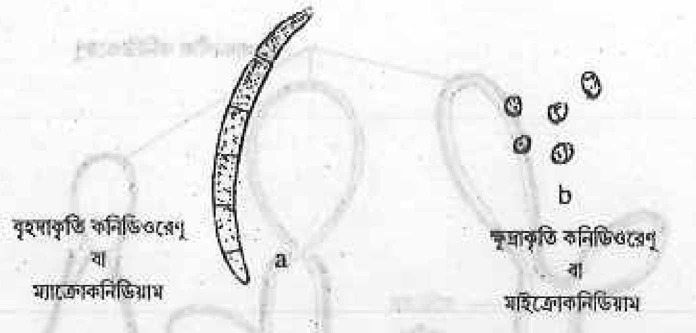

চিত্র নং 5.7 ঃ ফিউসেরিয়ামে উৎপন্ন ম্যাক্রোকনিডিয়াম ও মাইক্রোকনিডিয়াম

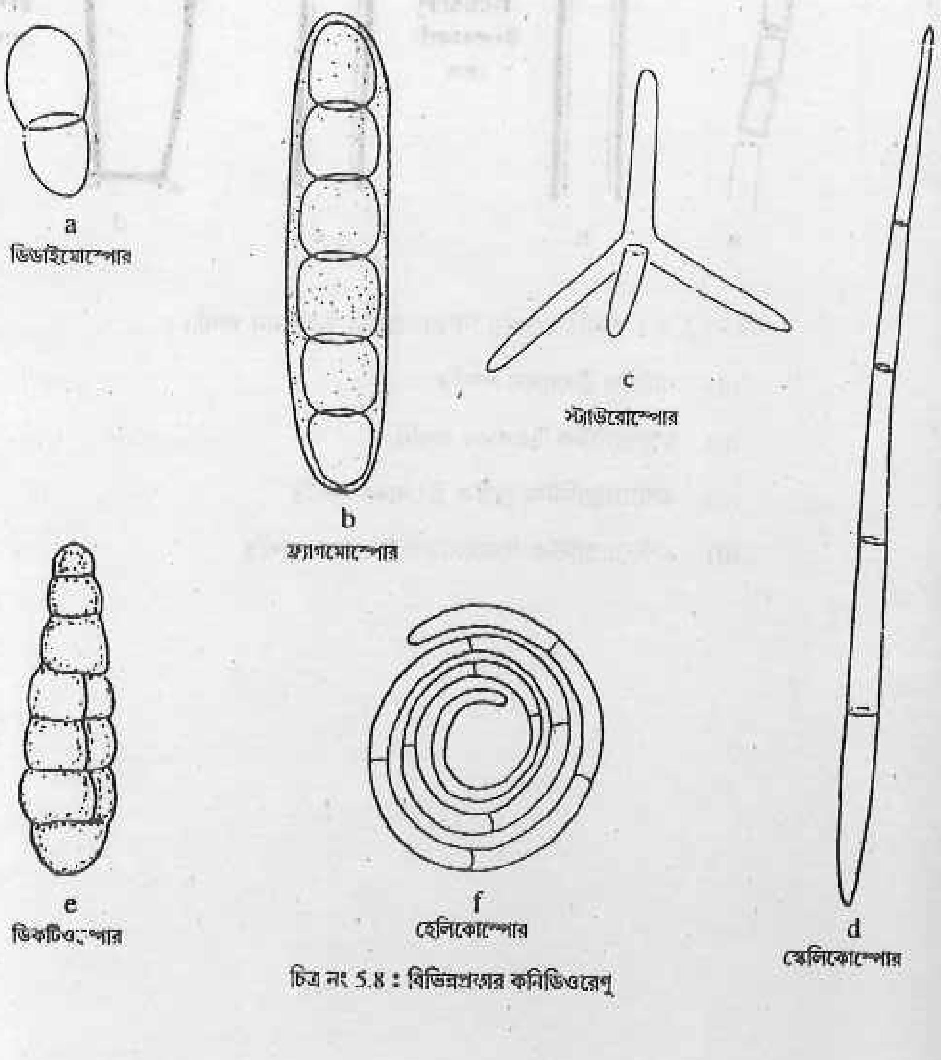

চিত্র নং 5.8 ঃ বিভিন্নপ্রকার কনিডিওরেণু

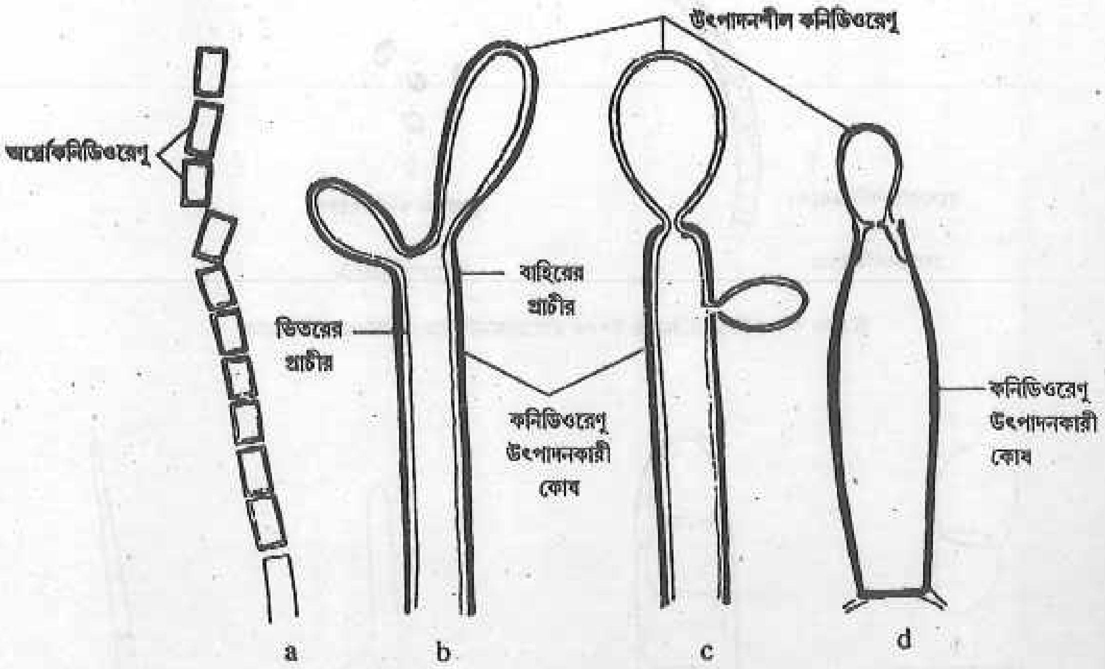

চিত্র নং 5.9 ঃ কনিডিওরেণুর বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন পদ্ধতি।

(a) থ্যালিক উৎপাদন পদ্ধতি

(b) হলোব্লাস্টিক উৎপাদন পদ্ধতি

(c) এন্টারোব্লাস্টিক ট্রেটিক উৎপাদন পদ্ধতি

(d) এন্টারোব্লাস্টিক ফিয়ালিডিক উৎপাদন পদ্ধতি

একক 6 ☐ রাইজোপাস (Rhizopus) ও পেনিসিলিয়ামের (Penicillium) জীবন বৃত্তান্ত

গঠন

6.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

6.2 রাইজোপাসের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান, প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, পরীক্ষাগারে সহজ উৎপাদন পদ্ধতি, অঙ্গজ গঠন

6.3 রাইজোপাসের জনন

6.4 রাইজোপাসের জীবনচক্র

6.5 পেনিসিলিয়ামের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান, প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, পরীক্ষাগারে সহজ উৎপাদন পদ্ধতি, অঙ্গজ গঠন

6.6 পেনিসিলিয়ামের জনন

6.7 পেনিসিলিয়ামের জীবনচক্র

6.8 সারাংশ

6.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

6.10 উত্তরমালা

6.1 প্রস্তাবনা

আপনারা পূর্ববর্তী এককগুলি পড়ে ছত্রাকের বিভিন্ন শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পেরেছেন। এখন প্রত্যেক শ্রেণির অন্ততঃ একটি করে প্রতিনিধি দসস্যের জীবন বৃত্তান্ত যদি পড়েন তাহলে ঐ সদস্যগুলি সম্পর্কে যেমন আপনার বিস্তারিত ভাবে জানা হবে তেমনি ঐ শ্রেণিগুলি সম্বন্ধেও আপনার ধারণা আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। কাজেই প্রত্যেক শ্রেণির একটি করে সদস্যের জীবন বৃত্তান্ত জানা খুবই প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ফাইকোমাইসিটিস ও অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণি দুটির দুই প্রতিনিধি সদস্য যথাক্রমে রাইজোপাস ও পেনিসিলিয়ামের শ্রেণিবিন্যাস গত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারবেন।
- ঐ দুই ছত্রাক কিভাবে তাদের পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং সেই সঙ্গে তারা কিরূপ উপকারী ও অপকারী ভূমিকা প্রদর্শন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরীক্ষাগারে তাদের পেতে কোন সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে তা নির্দেশ করতে পারবেন।

- তাদের অঙ্গজ দেহের গঠন বৈচিত্র, নির্ধারণ করতে পারবেন।
- রাইজোপাস ও পেনিসিলিয়াম কিভাবে থাদের বংশবৃদ্ধি করে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- উক্ত ছত্রাক দুটির জীবনচক্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।

6.2 রাইজোপাসের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান, প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, পরীক্ষাগারে সহজ উৎপাদন পদ্ধতি, অঙ্গজ গঠন

6.2.1 শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান :

শ্রেণি (Class)	:	ফাইকোমাইসিটিস (Phycomycetes)
বর্গ (Order)	:	মিউকোরোলিস (Mucorales)
গোত্র (Family)	:	মিউকোরেসী (Mucoraceae)
গন (Genus)	:	রাইজোপাস (*Rhizopus*)

6.2.2 প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

সাধারণত পচনশীল খাদ্য বস্তুতে ইহা জন্মায়। পাঁউরুটিতে সহজেই জন্মায় বলে একে ব্রেড মোল্ড (Bread Mould) বলে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন কালচার মিডিয়াতে (Culture Media) একে প্রায়ই দূষণকারী বা কন্টামিন্যান্ট (Contaminant) হিসাবে জন্মাতে দেখা যায়, তাই একে পরীক্ষাগারের আগাছাও বলা হয়। রাইজোপাসের বিভিন্ন প্রজাতি গোবর, জৈব পদার্থযুক্ত মাটি, পচাফল ও সবজি ইত্যাদিতেও জন্মাতে দেখা যায়। সাধারনভাবে রাইজোপাস মৃতজীবী হলেও কোন কোন প্রজাতি মিষ্টি আলু ও বিভিন্ন প্রকার ফলে পরজীবী হিসাবে জন্মায় এবং নরম পচন (soft rot) রোগ সৃষ্টি করে। মানুষ ও বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর ক্ষেত্রেও কোন কোন প্রজাতি পরজীবি হিসাবে জন্মায় এবং রোগ উৎপাদন করে। উদাহরণ - মানুষের "মিউকোরমাইকোসিস" রোগ (Mucormycosis in man)।

বিভিন্ন প্রজাতির এই ছত্রাকটির উপকারী ভূমিকাও আছে। যেমন, ফিউমারিক অ্যাসিড (Fumaric acid) কর্টিসোন (Cortisone) তৈরির সময় কোনো কোনো পদক্ষেপে রাইজোপাস স্টোলোনিফার *(R. stolonifer)* এর ব্যবহার; রাইজোপাস ওরাইজী *(R. oryzae)* থেকে কিছু পরিমান অ্যালকোহল পাওয়া যায়; কতকগুলি প্রজাতি ল্যাকটিক অ্যাসড উৎপাদনে সক্ষম; কোনো কোনো স্ট্রেন আবার ইন্দোনেশিয়ার একটি জনপ্রি সয়াবিনজাত খাদ্য "টেম্প" (Tempeh) প্রস্তুতকারক।

6.2.3 পরীক্ষাগারে সহজ উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

একখণ্ড পাঁউরুটি জলে ভিজিয়ে একটি পেট্রিডিসে 8 -10 ঘণ্টা উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে দিতে হবে। এর পর পেট্রিডিসের ঢাকনা অথবা কাঁচের বা চিনামাটির পাত্র দ্বারা পেট্রিডিসটি ঢেকে দিতে হবে। এই অবস্থায় 2-3 দিন ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিলে দেখা যাবে যে রাইজোপাসের সাদা মাইসিলিয়াম পাঁউরুটির টুকরোকে ঢেকে ফেলেছে। সাদা মাইসিলেয়ামের উপর কালো বিন্দু আকৃতির গঠনগুলি রেণুস্থলী বা স্পোরাঞ্জিয়াম (Spotrangium)। এক-টুকরো মাইসিলিয়াম নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে রাইজোপাসের গঠন সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

6.2.4 অঙ্গজ গঠন :

অঙ্গজ দেহ সিনোসাইটিক (Coenocytic) মাইসীলিয়াম অর্থাৎ বিভেদপ্রাচীর বিহীন বহুনিউক্লিয়াস যুক্ত মাইসীলিয়াম। মাইসীলিয়াম বহু শাখা প্রশাখা যুক্ত। মাইসীলিয়াম বিভেদপ্রাচীর বিহীন হলেও দুটি ক্ষেত্রে বিভেদ প্রাচীর উৎপন্ন হতে দেখা যায়। প্রবীন (Old) হাইফাট বিভেদ প্রাচীর উৎপন্ন হয় এবং জননাঙ্গের নিচে ব্যবধায়ক বা বিভেদ প্রাচীর উৎপন্ন হয়। বিভেদপ্রাচীর ছিদ্রবিহীন নিরেট।

রাইজোপাসের মাইসীলিয়ামে সাধারণত তিনপ্রকার হাইফা দেখা যায়। এগুলি হল ঃ (i) স্টোলন (Stolon) বা বক্র ধাবক (ii) রাইজয়েড (Rhizoid) এবং (iii) স্পোরাঞ্জিওফোর (Sporangiophore) বা রেণুস্থলীধর (চিত্র 6.1)

(i) **স্টোলন :** এই হাইফাগুলি শাখাবিহীন ভাবে ধাত্রের কিছুটা উপর দিয়ে অনুভীমিকভাবে বর্ধিত হয়ে নিচের দিকে ক্রমশঃ বেঁকে ধাত্র স্পর্শ করে। স্টোলনের যে অংশ ধাত্র স্পর্শ করে, সেই অংশের নিজের দিকে রাইজয়েড এবং উপরের দিকে স্পোরাঞ্জিওপোর উৎপন্ন হতে দেখা যায়।

(ii) **বাইজয়েড :** এই হাইফাগুলি গুচ্ছাকারে স্টোলনের নির্দিষ্ট অংশ হতে উৎপন্ন হয়ে ধাত্রের মধ্যে প্রোথিত হয়। হাইফাগুলি শাখাপ্রশাখা যুক্ত। এগুলি একদিকে যেমন ছত্রাকটিকে ধাত্রের সাথে আটকে রাখতে সাহাতয্য করে, অপরদিকে তেমনি ধাত্র হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে ছত্রাকটিকে সরবরাহ করে।

(iii) **স্পোরানজিও ফোর :** এই বায়বীয় হাইফাগুলি শাখাবিহীন এবং স্টোলনের নির্দিষ্ট অংশ হতে গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয়ে খাড়ডা ভাবে ধণ্ডায়মান। স্রোরানজিওফোরের অগ্রভাগে গোলাকৃতি স্পোরানজিয়াম উৎপন্ন হওয়ায় স্পোরানজিওফোরগুলিকে অনেকটা আলপিনের মত দেখতে হয়, তাই এই ছত্রাককে পিন মোল্ডও (pin mould) বলে।

রাইজোপাসের হাইফার প্রাচীন প্রধানত কাইটিন নির্মিত। কাউটিন ছাড়াও প্রাচীরে গ্যালাকটোজ, প্রোটিন লিপিড ইত্যাদি থাকে। হাইফা মধ্যস্থ দানাদার প্রোটোপ্লাজম বহুনিউক্লিয়াস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্যাকুওল যুক্ত। এছাড়া এতে রয়েছে রাইবোসোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম বা জালিকা, গল্গি যন্ত্র, মাইটোকনড্রিয়া, তৈল বিন্দু ও গ্লাইকোজেন। প্রবীনতর হাইফাট ক্ষুদ্র ভ্যাকুওলগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি বৃহদাকার কেন্দ্রীয় ভ্যাকুওল তৈরি করে।

6.3 রাইজোপাসের জনন

রাইজোপাস অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন - এই তিন প্রকার পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করতে সক্ষম।

6.3.1 অঙ্গজ জনন : এক্ষেত্রে কোনরূপ রেণু উৎপন্ন হয় না। মাইসীলিয়াম খণ্ডীকৃত হলে, মাইসীলিয়ামের খণ্ডাংশ থেকে নতুন মাইসীলিয়াম উৎপন্ন হয়।

6.3.2 অযৌন জনন : এই প্রক্রিয়াটি স্পোরানজিয়াম বা রেণুস্থলীতে উৎপন্ন অচলরেণু বা অ্যাপ্লানোস্পোরের (Aplanospore) এবং কখনও বা সেই সঙ্গে ক্ল্যামাইডোরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

6.3.2.1 স্পোরানজিয়ামে উৎপন্ন অচলরেণুর (aplanospore) মাধ্যমে অযৌন জনন (চিত্র 6.1 ও 6.2) **:** রাইজোপাসকে কোন ধাত্রে দুই থেকে তিন দিন বৃদ্ধি হতে দিলে স্পোরানজিওফোর উৎপন্ন হয়। স্পোরানজিওফোরের অগ্রভাগ ফুলে স্পোরানজিয়াম উৎপন্ন হয়। স্পোরানজিয়ামের মধ্যে একটি গম্বুজাকৃতি বিভেদপ্রাচীর সৃষ্টি হয়ে স্পোরানজিয়ামের কেন্দ্রীয় অংশকে বাকী অংশ হতে পৃথক করে। স্পোরানজিয়ামের মধ্যে সৃষ্টি এই গম্বুজাকৃতি অংশকে কলুমেলা (columella) বলে। কলুমেলা মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম স্পোরানজিওফোরার প্রোটোপ্লাজমের সাথে অখণ্ডতা বজায় রাখে। স্পোরানজিয়ামের মধ্যে, স্পোরানজিয়ামের প্রাচীর ও কলুমেলার প্রাচীরের অন্তবর্তী অংশে অবস্থিত বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট প্রোটোপ্লাজম ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হতে থাকে। প্রতিটি প্রোটোপ্লাজমীয় খণ্ডকে ঘিরে কোশপ্রাচীর সৃষ্টি হয়ে এগুলিকে রেণুতে পরিণত করে (চিত্র 6.2 a)। রাইজোপাসের এই রেণুগুলি সাধারণত বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হয় (চিত্র 6.2 c)। পরিণত অবস্থায় স্পোরানজিয়ামগুলি কালো রঙের হয়ে ওঠে (চিত্র 6.1)। সাধারণত শুষ্ক পরিবেশে স্পোরানজিয়াম মধ্যস্থ কলুমেলা চুপসে গিয়ে অনেকটা ছাতার মত দেখতে হয় (চিত্র 6.2 b) ও সেইসঙ্গে স্পোরানজিয়াম শুকিয়ে গিয়ে ফেটে যায় ও রেণু নির্গত করে। নিষ্ক্রান্ত হ্যাপ্লয়েড অচলরেণুগুলি ও স্পোরানজিওরেণুগুলি অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন হ্যাপ্লয়েড মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে।

6.3.2.2 ক্ল্যামাইডোরেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন : রাইজোপাস কখনও কখনও ক্ল্যামাইডোরেণুর মাধ্যমেও অযৌন জনন সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে প্রবীন হাইফায় বিভেদ প্রাচীর তৈরি হতে থাকলে কোন কোন কোশ পুরুপ্রাচীরযুক্ত ও সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত সঞ্চিত খাদ্যবস্তু সমন্বিত হয়ে ক্ল্যামাইডোরেণু গঠন করে। এই বহুনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট ক্ল্যামাইডোরেণুগুলি প্রতিকূল পরিবেশে ছত্রাকটিকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। অনুকূল পরিবেশ পেলে ক্ল্যামাইডোরেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।

6.3.3 যৌন জনন (চিত্র 6.3) **:** রাইজোপাস গ্যামেট্যানজিয়াল কপিউলেশন প্রক্রিয়ায় যৌন জনন সম্পন্ন করে। যৌন জননে অংশগ্রহণকারী গ্যামেট্যানজিয়ামদ্বয় একই মাইসীলিয়াম থেকে উৎপন্ন হতে পারে (সহবাসী বা হোমোথ্যালিক প্রজাতির ক্ষেত্রে, যেমন *Rhizopus sexualis, রাইজোপাস সেক্সুয়ালিস*) অথবা দুটি ভিন্ন মাইসীলিয়াম থেকে উৎপন্ন হতে পারে (ভিন্নবাসী বা হেটারোথ্যালিক প্রজাতির ক্ষেত্রে, যেমন *Rhizopus stolonifer, রাইজোপাস স্টোলোনিফার*)।

রাইজোপাস স্টোলোনিফারের একটি '+' মাইসীলিয়াম ও একটি '–' মাইসীলিয়াম সাধারণতঃ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উভয়ে লম্বা হাইফা উৎপন্ন করে পরস্পরের দিকে পাঠাতে শুরু করে। এই বিশেষ লম্বা হাইফাকে জাইগোফোর (zygophore) বলা হয় (চিত্র 6.3 a)

জাইগোফোর দুটি পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়ে যখন একে অপরকে স্পর্শ করে, তখন ঐ স্পর্শস্থল বরাবর উভয় জাইগোফোর হতে একটি করে খর্ব শাখা উৎপন্ন হয়। এই খর্বশাখাকে প্রোগ্যামেট্যানজিয়াম বলে (চিত্র 6.3 b, c)। প্রোগ্যামেট্যানজিয়াম দুটির অগ্রভাগ একে অপরকে স্পর্শ করে থাকে। প্রোগ্যামেটানজিয়াম দুটি বড় হয়ে প্রত্যেকে নিজের মধ্যে একটি করে বিভেদ প্রাচীর সৃষ্টি করে, ফলে প্রত্যেক প্রোগ্যামেট্যানজিয়ামের অগ্রভাগে যে কোশ সৃষ্টি হয় তাকে গ্যামেট্যানজিয়াম এবং পশ্চাৎদিকে প্রোগ্যামেট্যানজিয়ামের বাকী অংশকে সাসপেনসর (suspensor) বলে (চিত্র 6.3 d)। গ্যামেট্যানজিয়ামের প্রোটোপ্লাজম কম ভ্যাকুওল সমন্বিত ও সাসপেনশরের প্রোটোপ্লাজম অধিক ভ্যাকুওল সমন্বিত হয়। গ্যামেট্যানজিয়াম সৃষ্টি হওয়ার পর এর নিউক্লিয়াসগুলি মাইটোসিস বা সমবিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

অবশেষে গ্যামেট্যানজিয়াম দুটির সংযোগস্থল বরাবর সাধারণ প্রচীরটি বিলুপ্ত হয় ফলে প্লাজমোগ্যামী সংগঠিত হয় (চিত্র 6.3 e)। এই প্লাজমোগ্যামীর সাথে সাথেই উভয় গ্যামেট্যানজিয়ামের নিউক্লিয়াসগুলির ('+' ও '–') মধ্যে ক্যারিওগ্যামী সংগঠিত হয়। যে নিউক্লিয়াসগুলি মিলনে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তারা অবশেষে বিনষ্ট হয়ে যায়। যৌন মিলনে অংশগ্রহণকারী গ্যামেট্যানজিয়াম দুটি সদৃশ হওয়ায় তাদের মিলনকে আইসোগ্যামী এবং উৎপাদিত জাইগোটকে জাইগোস্পোর বলে। উৎপাদিত জাইগোস্পোরকে ঘিরে একটি পুরু ও কালো বর্ণের অমসৃণ প্রাচীর সৃষ্টি হয়। নতুন প্রাচীরটি প্রাথমিক বা আদি প্রচীরের ঠিক নিচে উৎপন্ন হয়। এই নতুন পুরু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গঠনকে বলা হয় জাইগোস্পোরানজিয়াম (Zygosporangium) (Alexopoulos and Mims, 1979) (চিত্র 6.3 f)

জাইগোফোর উৎপাদন থেকে শুরু করে গ্যামেট্যানজিয়াম উৎপাদন ও গ্যামেট্যানজিয়াম দুটি মিলন পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটি হরমোন বা উদ্বোধন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জাইগোফোর উৎপাদন প্রক্রিয়াকে টেলিমরফোটিক (Telemorphotic) বিক্রিয়া বলা হয় এবং এটি উভয় স্ট্রেন কর্তৃক নিঃসৃত ট্রাইস্পোরিক অ্যাসিড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জাইগোফোর দুটি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অগ্রসর হওয়াকে জাইগোট্রপিক (zygotropic) বিক্রিয়া বলে। জাইগোফোর দুটির ('+' ও '–') পরস্পরকে স্পর্শ করার পর প্রোগ্যামেট্যানজিয়াম ও গ্যামেট্যানজিয়াম উৎপাদন এবং গ্যামেট্যানজিয়াম দুটির মিলন থিগমোট্রপিক (Thigmotropic) বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এই জাইগোস্পোরানজিয়ামের মধ্যে থাকে অনেকগুলি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট একটি জাইগোস্পোর (Zygospore)। এই জাইগোস্পোরটি বিশ্রাম দশা অতিক্রান্ত হলে অঙ্কুরিত হয় ও জার্মস্পোরানজিয়াম সৃষ্টি কর তার মধ্যে জার্ম রেণু উৎপন্ন করে (চিত্র 6.3 g)।

জাইগোস্পোরের অঙ্কুরোদ্গমের সময় হলে জাইগোস্পোর মধ্যস্থ একটি ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস ছাড়া বাকী সমস্ত ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয় বলে মনে করা হয়। উক্ত ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি এর পর মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। মিয়োসিস বিভাজনের ফলে উৎপন্ন চারটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে হয়তো বা তিনটি নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয় ও একটি সক্রিয় থাকে অথবা একাধিক নিউক্লিয়াস সক্রিয় থাকে। প্রথমোক্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একটি জার্মস্পোরানজিয়ামে উৎপন্ন সমস্ত রেণু হয় '+' অথবা '–' হবে। দ্বিতীয়োক্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একটি জার্মস্পোরানজিয়ামে উৎপাদিত রেণুগুলি '+' ও '–' উভয় রেণুর মিশ্রণ হবে।

জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে একটি অঙ্কুর নালিকা গঠন করে। এই অঙ্কুর নালিকাকে প্রোমাইসীলিয়ামও (Promycelium) বলে। প্রোমাইসীলিয়াম উৎপাদনের সময়েই ঘটে মিয়োসিস বিভাজন। মিয়োসিস বিভাজনের পর চলতে থাকে মাইটোসিস। প্রোমাইসীলিয়ামের অগ্রভাগে সৃষ্টি হয় একটি কলুমেলাযুক্ত স্পোরানজিয়াম, যাকে জার্মস্পোরানজিয়াম (Germsporagium) বলা হয়। এখন প্রোমাইসীলিয়ামটিকে বলা যেতে পারে স্পোরানজিওফোর। জার্মস্পোরানজিয়ামের মধ্যে যে অসংখ্য হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে, তার প্রত্যেকটি কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম সহযোগে একটি করে জার্মরেণু বা জার্মস্পোর (Germspore) উৎপন্ন করে। পরিণত স্পোরানজিয়াম বিদীর্ণ হলে জার্মরেণুগুলি (চিত্র 6.3 h) অযৌন জননে উৎপন্ন রেণুগুলির ন্যায় বাহিরে নির্গত হয় ও অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।

6.4 জীবনচক্র :

রাইজোপাস জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড দশাটি প্রকট। ডিপ্লয়েড দশা কেবলমাত্র জাইগোট দ্বারা উপস্থাপিত। তাই এরূপ জীবনচক্রকে হ্যাপ্লয়েড জীবনচক্র বা হ্যাপ্লনটিক জীবনচক্র বলা হয়।

রাইজোপাস স্টোলোনিফারের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক অঙ্গজ দেহ ('+' ও '–') পৃথকভাবে তাদের অযৌন জননচক্র প্রদর্শন করে। যৌন জীবনচক্রে ঐ দুই অঙ্গজ দেহ থেকে উৎপন্ন হয় ডাইগোফোর। জাইগোফোর দুটি থেকে সদৃশ গ্যামেট্যানজিয়াম উৎপন্ন হয়ে যৌন মিলন সম্পন্ন করে ও জাইগোস্পোর উৎপন্ন করে। ডিপ্লয়েড জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে সৃষ্টি করে জার্মস্পোরানজিয়াম ও হ্যাপ্লয়েড জার্ম রেণু। জাইগোস্পোরের অঙ্কুরোদগমের সময় ঘটে মিয়োসিস। জার্মরেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন হ্যাপ্লয়েড দেহ উৎপন্ন করে। রাইজোপাস স্টোলেনিফারের শব্দভিত্তিক জীবনচক্র (চিত্র 6.4 i)-এ দেওয়া হল।

অনুশীলনী - 1

নিচের তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

1) রাইজোপাস সাধারণত ________ খাদ্যবস্তুতে জন্মায়।

2) রাইজোপাসের অপর একটি নাম ________ বাসী।

3) রাইজোপাসের অঙ্গজ দেহ ________ মাইসীলিয়াম।

4) রাইজোপাসের অঙ্গজ দেহে তিনপ্রকার হাইফা দেখা যায়, এগুলি হল ________, ________ ও ________।

5) রাইজোপাস ________, ________ ও ________ পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে।

6) রাইজোপাসে অযৌন জনন ________ ও ________ রেণুর মাধ্যমে ঘটে।

7) রাইজোপাসে যৌন জনন প্রক্রিয়ায় দুটি ________ এর মিলনে জাইগোস্পোর উৎপন্ন হয়। জাইগোস্পোর একটি পুরু প্রাচীর দ্বারা আবৃত হয়ে ________ গঠন করে।

8) রাইজোপারে যৌন জননে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড রেণুকে ________ ও হ্যাপ্লয়েড রেণুকে ________ বলে।

(গ্যামেট্যানজিয়াম, জার্মস্পোর, জাইগোস্পোরানজিয়াম, অচলরেণু, অযৌন, ক্ল্যামাইডোরেণু, যৌন, ব্রেডমোল্ড, রাইজয়েড, সিনোসাইটিক, স্টোলন, স্পোরানজিওফোর পচনশীল, জাইগোস্পোর, অঙ্গজ)

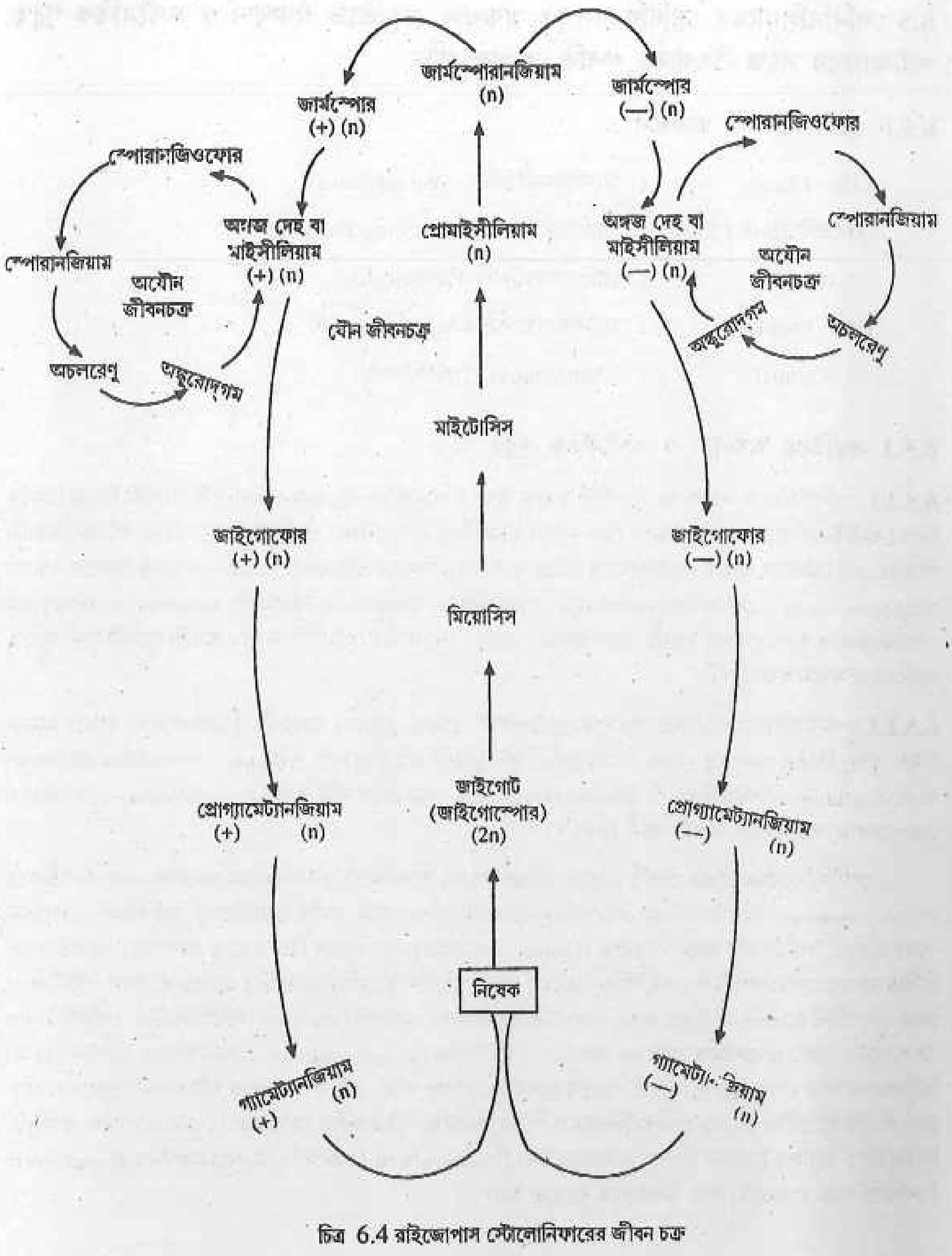

চিত্র 6.4 রাইজোপাস স্টোলোনিফারের জীবন চক্র

6.5 পেনিসিলিয়ামের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান, প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, পরীক্ষাগারে সহজ উৎপাদন পদ্ধতি, অঙ্গজ গঠন

6.5.1 শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান :

শ্রেণি (Class)	ঃ	অ্যাসকোমাইসিটিস (Ascomycetes)
উপশ্রেণি (Sub Class)	ঃ	প্লেকটোমাইসিটিস (Plectomycetes)
বর্গ (Order)	ঃ	প্লেক্টঅ্যাসকালিস (Plectascales)
গোত্র (Family)	ঃ	অ্যাসপারজিলেসী (Aspergillaceae)
গন (Genus)	ঃ	(*Penicillium*) (*পেনিসিলিয়াম*)

6.5.2 প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

6.5.2.1 পেনিসিলিয়াম সাধারণত মৃতজীবী ছত্রাক হিসাবে পচনশীল বস্তু, যেমন চীজ, রুটি, জেলি, ভিজে চামড়া, ভিজে কাঠ ইত্যাদিতে জন্মায়। এছাড়া জৈব পদার্থ যুক্তমাটিতে এরা জন্মায়। পরজীবী হিসাবে লেবু, আপেল ইত্যাদি ফলেও পেনিসিলিয়াম জন্মায়। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন কালচার মিডিয়ামে এটি একটি সাধারণ দূষণকারী হিসাবে জন্মায়। *Staphylococcus (স্ট্যাফাইলোকক্কাস)* নাম ব্যাকটেরিয়ার কালচার মিডিয়ামে *P. notatum (পেনিসিলিয়াম নোটেটামের)* এইরূপ দূষণের ফলেই আলেক্সনডার ফ্লেমিং 1928 খ্রিঃ পেনিসিলিন নাম অ্যান্টিবায়োটিকের অস্তিত্ব আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন।

6.5.2.2 পেনিসিলিয়ামের বিভিন্ন অপকারী ও উপকারী ভূমিকা রয়েছে। অপকারী ভূমিকার মধ্যে রয়েছে চামড়া বিনষ্ট করা; বিভিন্ন খাদ্য বস্তু যেমন জ্যাম, জেলি, রুটি ইত্যাদি নষ্ট করা। *P. italicum (পেনিসিলিয়াম ইটালিকাম)* ও *P. digitatum (পেনিসিলিয়াম ডিজিটাটাম)* লেবুতে নরম পচন রোগ সৃষ্টি করে। *P. expansum (পেনিসিলিয়াম এক্সপ্যানসাম)* আমেপলে বাদামী পচন রোগ ঘটায়।

পেনিসিলিয়ামের বিভিন্ন প্রজাতি মানুষের বিভিন্ন উপকার সাধন করে। পেনিসিলিয়াম নোটেটাম এবং পরবর্তীকালে *P. chrysogenum (পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম)* পেনিসিলিন নাম অ্যান্টিবায়োটিকের বাণিজ্যিক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। পেনিসিলিন গ্রাম পজিটিভ (Gram +) ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে কার্যকরী। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকার সেমিসিন্থেটিক পেনিসিলিন (যেমন অ্যাম্পিসিলিন ইত্যাদি) উৎপাদিত হয়েছে যা গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ (Gram –) উভয় প্রকার ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেই কার্যকরী। এই সমস্ত সেমিসিন্থেটিক পেনিসিলিনের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক প্রয়োজন প্রাকৃতিক পেনিসিলিন। *P. griseofulvum (পেনিসিলিয়াম গ্রিসিওফালভাম)* গ্রিসিওফালভিন নামক ছত্রাক বিরোধী অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন করে। এই ঔষধ ছত্রাক ঘটিত নানা রোগে ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়াও পেনিসিলিয়ামের বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্নপ্রকার জৈব অম্ল (যেমন গ্লুকোনিক অ্যাসিড, ফিউম্যারিক অ্যাসিড ইত্যাদি) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। *P. camemberti (পেনিসিলিয়াম ক্যামেমবার্টি)* ও *P. roqueforti (পেনিসিলিয়াম রকফোর্টি)* চীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

6.5.3 পরীক্ষাগারে সহজ উৎপাদন পদ্ধতি :

একটি জলে ভিজিয়ে নেওয়া কমলা লেবু অথবা একখণ্ড চীজ নিয়ে একটি পেয়ালাকৃতি বা ঐ ধরনের পাত্র দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। পাত্রের ভিতরের দেওয়ালে এক টুকরো ভিজে ব্লটিং পেপার লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর সমগ্র সেটটি একটি ইনকিউবেটারে 28-30°C উষ্ণতায় অথবা ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে। 4-5 দিনের মধ্যে নীলাভ সবুজ পেনিসিলিয়াম-এর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাবে।

6.5.4 অঙ্গজ গঠন :

অঙ্গজ দেহ সাধারণত বর্ণহীন এবং বিভেদপ্রাচীর যুক্ত শাখান্বিত মাইসীলিয়াম। বিভেদ প্রাচীরের কেন্দ্রে একটি সরল রন্ধ্র বিদ্যমান। পেনিসিলিয়ামের এই অঙ্গজ দেহে তিনপ্রকার হাইফা দেখা যায়। কিছু হাইফা অনুকূল অভিকর্ষী এবং এগুলি ধাত্রের মধ্যে প্রোথিত হয়ে পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং দেহকে ধাত্রের সাথে আটকে রাখতেও সাহায্য করে। কিছু হাইফা আবার তির্যক অভিকর্ষী। এগুলি ধাত্র বরাবর অনুভূমিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এগুলি থেকে কনিডিওফোর নামক প্রতিকূল অভিকর্ষী বায়বীয় হাইফা উৎপন্ন হয়। হাইফার কোশগুলিতে একটি, দুটি অথবা দুয়ের অধিক নিউক্লিয়াস থাকতে পারে। হাইফার কোশের সাইটোপ্লাজমে একটি আদর্শ নিউক্লিয়াস যুক্ত কোশের অনুরূপ কোশ অঙ্গানু যেমন মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোম (80 S) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাস ইত্যাদি বিদ্যমান।

6.6 পেনিসিলিয়ামের জনন :

পেনিসিলিয়াম অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এই তিনপ্রকার পদ্ধতি জনন সম্পন্ন করতে পারে।

6.6.1 অঙ্গজ জনন :

অঙ্গজ জনন মাইসীলিয়ামের খণ্ডীভবন বা ফ্র্যাগমেন্টেশন (Fragmentation) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় এবং প্রতিটি খণ্ড থেকে নতুন মাইসীলিয়াম গঠিত হয়।

6.6.2 অযৌন জনন :

পেনিসিলিয়ামের অযৌন জনন কনিডিওরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কনিডিওরেণুগুলি কনিডিওফোরের অগ্রভাগে অবস্থিত স্টেরিগমা বা ফিয়ালাইড নামক বোতলাকৃতি (bottle shaped) গঠনের অগ্রভাগ থেকে সৃষ্টি হয় ও শৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকে। কনিডিওরেণুগুলি নিম্নোন্মুখ পদ্ধতিতে সজ্জিত থাকে, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় কনিডিও রেণুটি শৃঙ্খলের উপরের দিকে এবং সর্বাপেক্ষা ছোট কনিডিওরেণুটি নিচের দিকে থাকে। রেণুগুলি একে অপরের সাথে সংযোজক বা ক্যানেকটিভ (Connective) দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। পেনিসিলিয়ামের কনিডিওফোর প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন কোন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে (উদাহরণ - *P. spinulosum, পেনিসিলিয়াম স্পাইনুলোসাম*) কনিডিওফোরগুলি হয় শাখাবিহীন সরল প্রকৃতির অর্থাৎ এক্ষেত্রে কনিডিওফোরের অগ্রভাগে সরাসরি এক গোছা স্টেরিগমা উৎপন্ন হয় এবং প্রপতিটি স্টেরিগমা থেকে যথারীতি কনিডিওরেণুর শৃঙ্খল সৃষ্টি হয় (চিত্র 6.5 a)। আবার কোন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে কনিডিওফোর শাখান্বিত হয়ে কিছুটা জটিল গঠন সৃষ্টি করে (উদাহরণ *P. expansum, পেনিসিলিয়াম এক্সপ্যানসাম*)। এক্ষেত্রে স্টেরিগমা উৎপন্ন হয় যে শাখায় তাকে বলে মেটুলা (Metula) আবার মেটুলা উৎপন্ন হয় যে শাখায় তাকে বলে র‍্যামাস (Ramus) (চিত্র 6.5 b)। কোন কোন

প্রজাতির ক্ষেত্রে আবার একাধিক কনিডিওফোর একসাথে গুচ্ছাকারে এক বিশেষ গঠন সৃষ্টি করে, একে বলে কোরিমিয়াম (Coremium) (চিত্র 6.5 c), (উদাহরণ - *P. claviforme, পেনিসিলিয়াম ক্ল্যাভিফরমি*)।

কনিডিওফোর এবং তাঁর শাখাপ্রশাখা ও কনিডিওরেণু মিলে ঝাঁটার মত বা ছবি আঁকার তুলির মত বা পেনিসিলাস (Penicillus) গঠন সৃষ্টি করে বলে এই ছত্রাকের নাম পেনিসিলিয়াম হয়েছে।

কনিডিওরেণু সাধারণত গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি হয়। রেণুগুলি সাধারণত এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট রেণুও উৎপন্ন হয়। রেণুর প্রাচীর মসৃণ বা কর্কশ (rough) হতে পারে। কনিডিওরেণু নীল, সবুজ, হলুদ, পিঙ্ক ইত্যাদি নানা বর্ণের হয়। কনিডিওরেণুর বর্ণ অনুযায়ী পেনিসিলিয়ামের কলোনীর বর্ণের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। পেনিসিলিয়ামের যে প্রজাতিগুলিকে আমরা সাধারণ বেশি দেখতে পাই, তাদের কলোনীগুলির ভর্ণ নীল বা সবুজ। তাই পেনিসিলিয়ামকে অনেক সময় ব্লুমোল্ড (Blue Mould, নীল ছত্রাক) বা গ্রীন মোল্ড (Green Mould, সবুজ ছত্রাক) নামেও ডাকা হয়। পরিণত কনিডিওরেণু সংযোজক অংশে শৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয় ও নতুন মাইসীলিয়াম উৎপন্ন করে।

6.6.3 যৌন জনন :

পেনিসিলিয়ামে বেশিরভাগ প্রজাতির যৌন জনন এখনও জানা যায়নি। তাই ঐ প্রজাতিগুলি এখনও ফাংগি ইমপারফেক্টির সদস্য হিসাবেই থেকে গেছে। পেনিসিলিয়ামের যে কটি প্রজাতির ক্ষেত্রে যৌন জনন জানা সম্ভব হয়েছে তাদের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন গণ বা পারফেক্ট জেনাস চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পারফেক্ট জেনাসগুলি হল *Talaromyces (ট্যালারোমাইসিস), Eupenicillium (ইউপেনিসিলিয়াম)* ও *Carpenteles (কারপেনটেলস্)*। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোন কোন ছত্রাকবিদের (রেপার ও ফেনেল, 1965, Raper & Fennell, 1965) মতে পেনিসিলিয়াম এই গণীয় নামক ইমপারফেক্ট ও পারফেক্ট উভয় দশাতেই ব্যবহার করা উচিত।

পেনিসিলিয়ামের যে কয়টি প্রজাতির ক্ষেত্রে যৌন জনন পাওয়া গেছে তাদের বেশিরভাগই হোমোথ্যালিক বা সহবাসী। *P. leuteum (পেনিসিলিয়াম লিউটিয়াম)*-কে যদিও হেটারোথ্যালিক হিসাবে ডারক্স (Derx, 1925) চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তা সন্দেহের অবকাশ রাখে।

ড্যানগিয়ার্ড (Dangeard, 1907) (*Talaromyces vermiculatus ট্যালারোমাইসিস ভারমিকিউলেটাস*) (*P/ vermiculatm, পেনিসিলিয়াম ভারমিকিউলেটাম*)-এর যৌন জনন প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর বর্ণনায় পাওয়া যায়, *পেনিসিলিয়াম ভারমিকিউলেটামের* মাইসীলিয়াম এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোশ দ্বারা গঠিত। হাইফার অগ্রভাগে অবস্থিত এইরূপ একটি কোশ হতে অ্যাসকোগোনিয়াম নামক স্ত্রী জননাঙ্গ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অ্যাসকোগোনিয়াম ক্রমশঃ লম্বা হতে থাকে ও উহার নিউক্লিয়াস বিভাজিত হতে থাকে যতক্ষণ না সর্বোচ্চ 64টি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। একই হাইফার অন্য কোশ হতে অথবা একই মাইসীলিয়ামের বিভিন্ন হাইফা হতে অ্যানথেরিডিয়াম বা পুংজননাঙ্গ উৎপাদনকারী শাখা উৎপন্ন হয় এবং তা অ্যাসকোগোনিয়ামকে পেঁচিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে (চিত্র 6.6 a)। পরিশেষে ঐ পুংশাখার অগ্রভাগ ফুলে ওঠে এবং একটি বিভেদপ্রাচীরের সহায়তায় একটি এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট অ্যানথেরিডিয়াম উৎপন্ন হয়। ঐ অ্যানথেরিডিয়ামের অগ্রপ্রান্তটি অ্যাসকোগোনিয়ামের প্রাচীর স্পর্শ করে। স্পর্শস্থল বরাবর উভয়ের প্রাচীর বিনষ্ট হয় এবং উভয়ের সাইটোপ্লাজম পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করে অর্থাৎ প্লাজমোগ্যামী সংগঠিত হয়। কিন্তু অ্যানথেরিডিয়াম হতে নিউক্লিয়াস অ্যাসকোগোনিয়ামে প্রবেশ করে না। এরপর প্লাজমোগ্যামীর প্রভাবে অ্যাসকোগোনিয়ামের মধ্যে নিউক্লিয়াসগুলি জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হয় এবং বিভেদ প্রাচীর উৎপন্ন হয়ে

অ্যাসকোগোনিয়ামের মধ্যে দ্বিনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট অনেকগুলি কোশ উৎপন্ন হয়। একই গ্যামেট্যানজিয়ামের নিউক্লিয়াসগুলি কর্তৃক এইরূপ দ্বিনিউক্লিয় বা ডাইক্যারিও দশার সৃষ্টিকে অটোগ্যামী বলা হয় (চিত্র 6.6 b)। এই ডাইক্যারিও কোশ বা দ্বিনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোশগুলি হতে সৃষ্টি হয় অ্যাসকোজিনাস হাইফা, যার প্রতিটি কোশ দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। ইতিমধ্যে অ্যানথেরিডিয়াম, অ্যাসকোগোনিয়াম ও অ্যাসকোজিনাস হাইফাগুলিকে অনেকগুলি বন্ধ্যা হাইফা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ও একযোগে গঠন করে ক্লেইস্টোথেসিয়াম নামক ফলদেহ (চিত্র 6.6 c)। এই ফলদেহের মধ্যে অ্যাসকোজিনাস হাইফার কোশ হতে উৎপন্ন হয় অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু বা অ্যাসকোস্পোর (চিত্র 6.6 d)। যদিও অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপাদন পদ্ধতি সঠিকবাবে জানা যায়নি, তবে মনে করা হয় অ্যাসকোজিনাস হাইফার যে কোশ হতে (সম্ভবতঃ অগ্রভাগের কোশ হতে) অ্যাসকাস উৎপন্ন হয় তার দুটি নিউক্লিয়াস, স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং ঐ কোশটি অ্যাসকাস মাতৃকোশে পরিণত হয়। অ্যাসকাস মাতৃকোশের নিউক্লিয়াসটি প্রথমে মিয়োসিস ও পরে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে মোট আটটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। উৎপন্ন প্রতিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস কিছু পরিমান সাইটোপ্লাজম সহযোগে একটি করে অ্যাসকোরেণুতে পরিণত হয় এবং মাতৃকোশটি অ্যাসকাসে পরিণত হয়। একটি পরিণত অ্যাসকাস গোলাকৃতি বা ন্যাসপাতি আকৃতির হয় এবং উহার ভিতর আটটি অ্যাসকোরেণু থাকে। অবশেষে অ্যাসকাসের প্রাচীর বিলুপ্ত হয় ও ক্লেইস্টোথেসিয়ামের মধ্যে অ্যাসকোরেণু নির্গত হয়। ক্লেইস্থৈথেসিয়ামের প্রাচীর বিনষ্ট হলে অ্যাসকোরেণু বাহিরে বেরিয়ে আসে ও অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।

6.7 পেনিসিলিয়ামের জীবনচক্র (চিত্র 6.7) :

পেনিসিলিয়ামের অযৌন জীবনচক্র কনিডিওরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কনিডিওফোরের অগ্রভাগে স্টেরিগমা হতে সৃষ্ট কনিডিওরেণু পরিণত হলে রেণুশৃঙ্খল হতে বিচ্ছিন্ন হয় ও অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।

পেনিসিলিয়ামের যৌন জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড অঙ্গজ দেহে সৃষ্টি হয় অ্যানথেরিডিয়াম ও অ্যাসকোগোনিয়াম। এই দুই জননাঙ্গের মধ্যে প্লাজমোগ্যামী সম্পন্ন হয়। প্ল্যাজমোগ্যামী প্রক্রিয়াটি গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। ট্যালারোমাইসিস ভারমিকিউলেটাসের (পেনিসিলিয়াম ভারকিমিউলেটাম) যে যৌন জীবনচক্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, এর অ্যানথেরিডিয়ামটি প্লাজমোগ্যামীর পর নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করায় অ্যাসকোগোনিয়াম মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসগুলি জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হয়ে ডাইক্যারিওদশার সৃষ্টি করে। এরপর অ্যাসকোগোনিয়ামের মধ্যে বিভেদ প্রাচীর সৃষ্টি হয়ে দ্বিনিউক্লিয় কোশ সৃষ্টি হয়, অ্যাসকোজিনাস হাইফার উৎপত্তি ঘটতে থাকে ও ডাইক্যারিও দশা চলতে থাকে। এক সময়ে আসকোজিনাস হাইফার সম্ভবতঃ অগ্রভাগের কোশ হতে ক্রোজিয়ার উৎপাদনের মধ্য দিয়ে অ্যাসকাস মাতৃকোশ সৃষ্টি হয়। অ্যাসকাস মাতৃকোশে প্রথমে ক্যারিওগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর পর পরই ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের মিয়োসিস অনুষ্ঠিত হয়। মিয়োসিসের পর ঘটে মাইটোসিস, ফলে অ্যাসকাস মাতৃকোশ থেকে যে অ্যাসকাস উৎপন্ন হয় তারমধ্যে আটটি আসকোরেণু সৃষ্টি হয়। এই অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু সৃষ্টি হয় ক্লেইস্টোথেসিয়াম নামক ফলদেহে। এই ফলদেহটি হ্যাপ্লয়েড অঙ্গজ হাইফা, ডাইক্যারিওটি অ্যাসকোজিনাস হাইফা ও পরবর্তী পর্যায়ে হ্যাপ্লয়েড অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু দ্বারা গঠিত। অ্যাসকোরেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন হ্যাপ্লয়েড মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে। কাজেই ট্যালারোমাইসিসের যৌন জীবনচক্রে দেখা যায় অঙ্গজ দেহ, জননাঙ্গ ও অ্যাসকোরেণু হ্যাপ্লয়েড; ডিপ্লয়েড দশাটি খুবই সংক্ষিপ্ত; প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর মধ্যে ডাইক্যারিও দশাটি সুদীর্ঘ। কাজেই এর যৌন জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডাইক্যারিও দশা প্রপকট হওয়ায় এই জীবন চক্রটি হ্যাপ্লয়েড ডাইক্যারিওটিক।

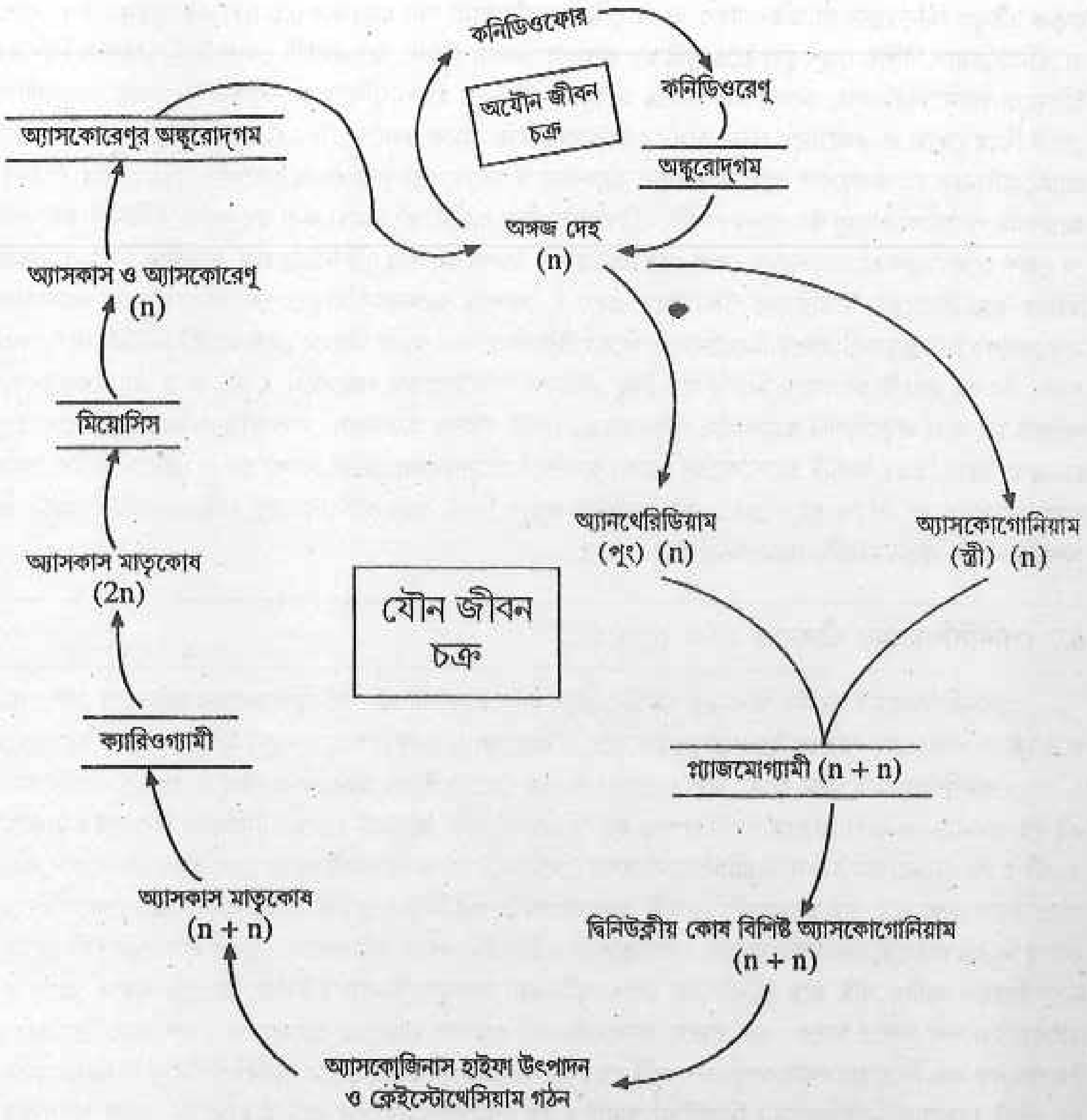

চিত্র 6.7 ঃ *ট্যালারোমাইসিস ভারমিকিউলেটাসরে* শব্দভিত্তিক জীবনচক্র

অনুশীলনী - 2

নিচের তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন :-

1) পেনিসিলিয়াম ________ শ্রেণির ছত্রাক (যখন এর পারফেক্ট স্টেজ পাওয়া যায়) কিন্তু পারফেক্ট স্টেজ না পাওয়া গেলে এটিকে ________ শ্রেণিতে অনর্ভুক্ত করা হয়।

2) যৌন জনন পাওয়ার পর পেনিসিলিয়াম ভারমিকিউলেটারের নাম দেওয়া হয়েছে ________।

3) পেনিসিলিয়ামের অঙ্গজ দেহ ________।

4) পেনিসিলিয়ামের অযৌন জননে উৎপন্ন রেণু ________।

5) ট্যালারোমাইসিস ভারমিকিউলেটাসের যৌন জননে অ্যানথেরিডিয়াম ও অ্যাসকোগোনিয়ামের মধ্যে ________ ঘটে কিন্তু ________ ঘটে না। ডাইক্যারিও দশার সৃষ্টি হয় ________ নিউক্লিয়াসগুলি পরস্পর জোড়বদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে এবং এই ঘটনাকে ________ বলা হয়।

6) পেনিসিলিয়ামের ফলদেহ ________।

7) পেনিসিলিন একপ্রকার ________ বিরোধী অ্যান্টিবায়োটিক এবং বর্তমানে ইহার বাণিজ্যিক উৎপাদনে ________ প্রজাতি ব্যবহৃত হয়।

8) চীজ উৎপাদনে ________ এবং ________ ছত্রাক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

9) পেনিসিলিয়ামের যৌন জননে উৎপন্ন রেণু ________ এবং তা ________ এর মধ্যে সৃষ্টি হয়।

10) পেনিসিলিয়ামের যৌন জীবনচক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ক্ষণস্থায়ী ডিপ্লয়েড দশা ছাড়াও আর একটি দশা পাওয়া যায় এবং তা হল ________।

(ডাইক্যারিওদশা, কনিডিওরেণু, ফাংগি ইম্পারফেক্টি, অ্যাসকোমাইসিটিস, বিভেদ প্রাচীরযুক্ত মাইসীলিয়াম, ট্যালারোমাইসিস ভারমিকিউলেটাস, অটোগ্যামী, ক্যারিওগ্যামী, প্লাজমোগ্যামী, অ্যাসকোগোনিয়ামের, গ্র্যাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া, ক্লেইস্টোথেসিয়াম, পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাস, অ্যাসকোরেণু, পেনিসিলিয়াম রকফোর্টি, অ্যাসকাস, পেনিসিলিয়াম ক্যামেমবার্টি)

6.8 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনারা প্রথমে রাইজোপাস ও পরে পেনিসিলিয়ামের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। আপনারা জেনেছেন।

- রাইজোপাস ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির এক সদস্য; সাধারণত মৃতজীবী, কখনওবা রোগ উৎপাদনকারী পরজীবী; দেহ-শাখান্বিত সিনোসাইটিক মাইসীলিয়াম; জনন-অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন; অঙ্গজ জনন খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়; অযৌন জনন ক্ল্যামাইডোরেণু ও স্পোরানজিয়ামে উৎপন্ন অচলরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, স্পোরানজিয়াম

কলুমেলা যুক্ত; যৌন জনন - গ্যামেট্যানজিয়াল কলুলেশন প্রক্রিয়ায় ঘটে, গ্যামেট্যানজিয়াম দুটি সদৃশ, প্লাজমোগ্যামীর প্রায় পর পরই ক্যারিওগ্যামী ঘটে, উৎপন্ন জাইগোটটি একটি জাইগোস্পোর, জাইগোস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে জার্মস্পোরানজিয়াম উৎপন্ন করে, অঙ্কুরোদ্গমের সময় মিয়োসিস বিভাজন ঘটে, জার্মস্পোরানজিয়ামে জার্ম রেণু উৎপন্ন হয়, জার্ম রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে; যৌন জীবনচক্র হ্যাপ্লনটিক বা হ্যাপ্লয়েড চক্র।

- পেনিসিলিয়াম পারফেক্ট স্টেজে অ্যাসকোমাইসিটিসের সদস্য; সাধারণত মৃতজীবী, কখনও বা পরজীবী উপকারী ও অপকারী উভয় ভূমিকা পালন করে, দেহ শাখান্বিত বিভেদ প্রাচীর যুক্ত মাইসীলিয়াম, বিভেদপ্রাচীর একটি কেন্দ্রীয় সরল ছিদ্রযুক্ত; জনন-অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন; অঙ্গজ জনন-খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়, অযৌন জনন এককোশী, গোলাকার কনিডিওরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, কনিডিওরেণু কনিডিওফোরের অগ্রভাগে অবস্থিত ফিয়ালাইড বা স্টেরিগমা থেকে উৎপন্ন হয়ে রেণু শৃঙ্খল সৃষ্টি করে; কনিডিওফোর, তার শাখাপ্রশাখা ও কনিডিওরেণু মিলে সামগ্রিকভাবে পেনিসিলাস বা ঝাঁটার ন্যায় গঠন সৃষ্টি করে; যৌন জনন - কয়েকটি প্রজাতিতে পাওয়া গেছে, অ্যানথেরিডিয়াম ও অ্যাসকোগোনিয়াম উৎপন্ন হয়, প্লাজমোগ্যামী গ্যামেট্যানজিয়াল কন্ট্যাক্ট পদ্ধতিতে ঘটে, প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর অন্তবর্তী ডাইকারিও দশা দীর্ঘস্থায়ী, ডাইক্যারিওদশায় অ্যাসকোজিনাস হাইফা উৎপন্ন হয়, অ্যাসকোজিনাস হাইফা থেকে অ্যাসকাস সৃষ্টি হয়, অ্যাসকাসের মধ্যে অ্যাসকোরেণু নামক হ্যাপ্লয়েড যৌন রেণু উৎপন্ন হয়, ফলদেহ ক্লেস্টোথেসিয়াম; জীবনচক্র হ্যাপ্লয়েড - ডাইক্যারিওটিক।

6.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(i) রাইজোপাস স্টোলেনিফারের যৌন জননে কয়প্রকার বিক্রিয়া দেখা যায়? এগুলি কি কি? প্রপতিটি বিক্রিয়ায় কি ঘটে?

(ii) রাইজোপাস স্টোলোনিফারের যৌন জননে অংশউগ্রহণকারী মাইসীলিয়াম দুটির একটিকে '+' ও অপরটিকে '–' চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয় কেন?

(iii) রাইজোপাসকে কিভাবে পরীক্ষাগারে সহজে উৎপাদন করা যায়?

(iv) পেনিসিলিয়ামের যৌন জনন না পেলে তাকে কোন শ্রেণির ছত্রাক বলা হবে?

(v) পরীক্ষাগারে কিভাবে সহজে পেনিসিলিয়াম উৎপাদন করা যেতে পারে?

2) নিচের তালিকাবদ্ধ ছত্রাক দুটির মাইসীলিয়ামের গঠন, অযৌন রেণু ও যৌন রেণুর নাম ও কোথায় উৎপন্ন হয় উল্লেখ করুন

ছত্রাক	মাইসীলিয়াম	অযৌন রেণু		যৌন রেণু	
		নাম	কোথায় উৎপন্ন হয়	নাম	কোথায় উৎপন্ন হয়
রাউজোপাস					
পেনিসিলিয়াম					

3) *রাইজোপাসের* অযৌন জনন ও যৌন জনন চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

4) *পেনিসিলিয়ামের* অযৌন ও যৌন জনন চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

5) *রাইজোপাসের* জীবন চক্রটি বর্ণনা করুন।

6) *ট্যালারোমাইসিস* ভারমিকিউলেটাসের জীবন চক্র বর্ণনা করুন।

7) *পেনিসিলিয়ামের* শ্রেণিবিনাসগত অবস্থান, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও অঙ্গজ গঠন বর্ণনা করুন।

8) *রাইজোপাসের* শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান, প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং অঙ্গজ গঠন বর্ণ করুন।

6.10 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

1) পচনশীল।
2) ব্রেডমোল্ড।
3) সিনোসাইটিক।
4) স্টোলন, রাইজয়েড, স্পোরানজিওফোর।
5) অঙ্গজ, অযৌন, যৌন।
6) অচলরেণু, ক্ল্যামাইডোরেণু।
7) গ্যামেট্যানজিয়াম, জাইগোস্পোরানজিয়াম।
8) জাইগোস্পোর, জার্মস্পোর।

অনুশীলনী - 2

1) অ্যাসকোমাইসিটিস, ফাংগি ইমপারফেক্টি।
2) ট্যালারোমাইসিস ভারমিকিউলেটাস।
3) বিভেদ প্রাচীর যুক্ত মাইসীলিয়াম।
4) কনিডিওরেণু।
5) প্লাজমোগ্যামী, ক্যারিওগ্যামী, অ্যাসকোগোনিয়ামের, অটোগ্যামী।
6) ক্লেইস্টোথেসিয়াম।
7) গ্র্যাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া, পেনিসিলিয়াম ক্যামেমবার্টি।
8) পেনিসিলিয়াম রকফোর্টি, পেনিসিলিয়াম ক্যামেমবার্টি।
9) অ্যাসকোরেণু, অ্যাসকাস
10) ডাইক্যারিও দশা

উত্তরমালা

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. (i) অনুচ্ছেদ 6.3.3-এর প্রান্তলিপি দেখুন।

   (ii) রাইজোপাস স্টোলোনিফারের যৌন জননে অংশগ্রহণকারী মাইসীলিয়াম দুটি ও তাদের দ্বারা উৎপন্ন গ্যামেট্যানজিয়ামগুলি সদৃশ হওয়ায় কোনটি স্ত্রী বা কোনটি পুরুষ তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। অথচ মাইসীলিয়াম দুটি একে অপরের কম্প্যাটিবল্। তাই বর্ণনার সুবিধার জন্য ঐ দুই মাইসীলিয়ামের একটিকে '+' যৌনরূপ (স্ট্রেন) ও অপরটিকে '–' যৌনরূপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

   (iii) অনুচ্ছেদ 6.2.3 দেখুন।

   (iv) পেনিসিলিয়ামের যৌন জনন না পেলে তাকে ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণির ছত্রাক বলা হবে।

   (v) অনুচ্ছেদ 6.5.3 দেখুন।

2.

ছত্রাক	মাইসীলিয়াম	অযৌন রেণু		যৌন রেণু	
		নাম	কোথায় উৎপন্ন হয়	নাম	কোথায় উৎপন্ন হয়
রাইজোপাস	সিনোসাইটিক মাইসীলিয়াম	(i) অচলরেণু বা স্পোর্যানজিওরেণু (ii) ক্ল্যামাইডোরেণু	স্পোর্যাঞ্জিয়াম-এর মধ্যে। এটি অন্তঃরেণু। হাইফার অগ্রভাগে অথবা অন্তর্বর্তী অংশে	(i) জাইগোস্পোর (ডিপ্লয়েড যৌনরেণু) (ii) জার্মস্পোর (হ্যাপ্লয়েড যৌনরেণু)	(i) জাইগোস্পোরাঞ্জিয়াম (ii) জার্মস্পোরাঞ্জিয়াম
পেনিসিলিয়াম	বিভেদ প্রাচীর যুক্ত মাইসীলিয়াম	কনিডিওরেণু	স্টেরিগমার অগ্রভাগে। এটি একপ্রকার বহিঃরেণু	অ্যাসকোরেণু	অ্যাসকাসের মধ্যে

3. অনুচ্ছেদ 6.3.2 ও 6.3.3 দেখুন।

4. অনুচ্ছেদ 6.6.2 ও 6.6.3 দেখুন।

5. অনুচ্ছেদ 6.4 দেখুন।

6. অনুচ্ছেদ 6.7 দেখুন।

7. অনুচ্ছেদ 6.5.1, 6.5.2.2 ও 6.5.4 দেখুন।

8. অনুচ্ছেদ 6.2.1, 6.2.2 ও 6.2.4 দেখুন।

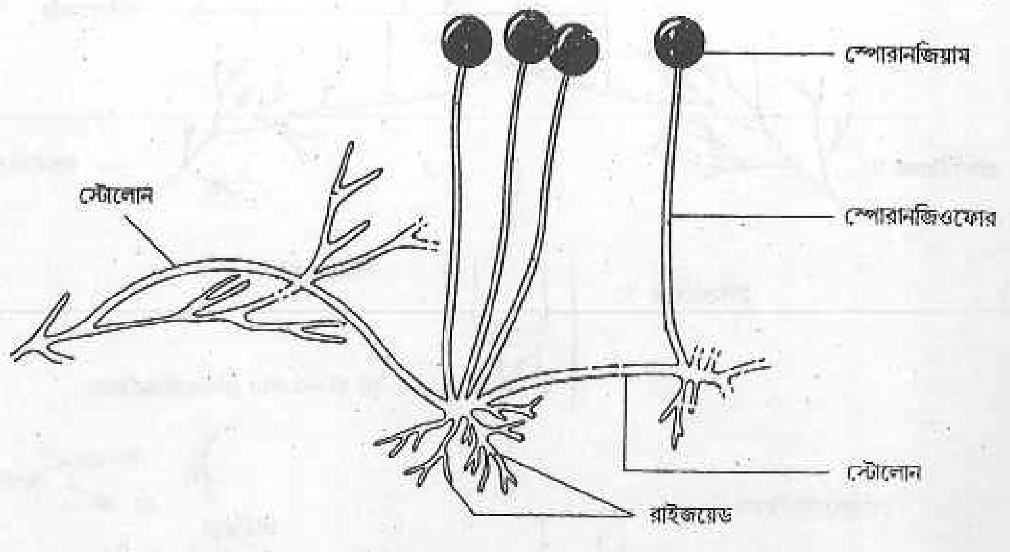

চিত্র নং 6.1 : *Rhizopus* (রাইজোপাসের) মাইসীলিয়াম।

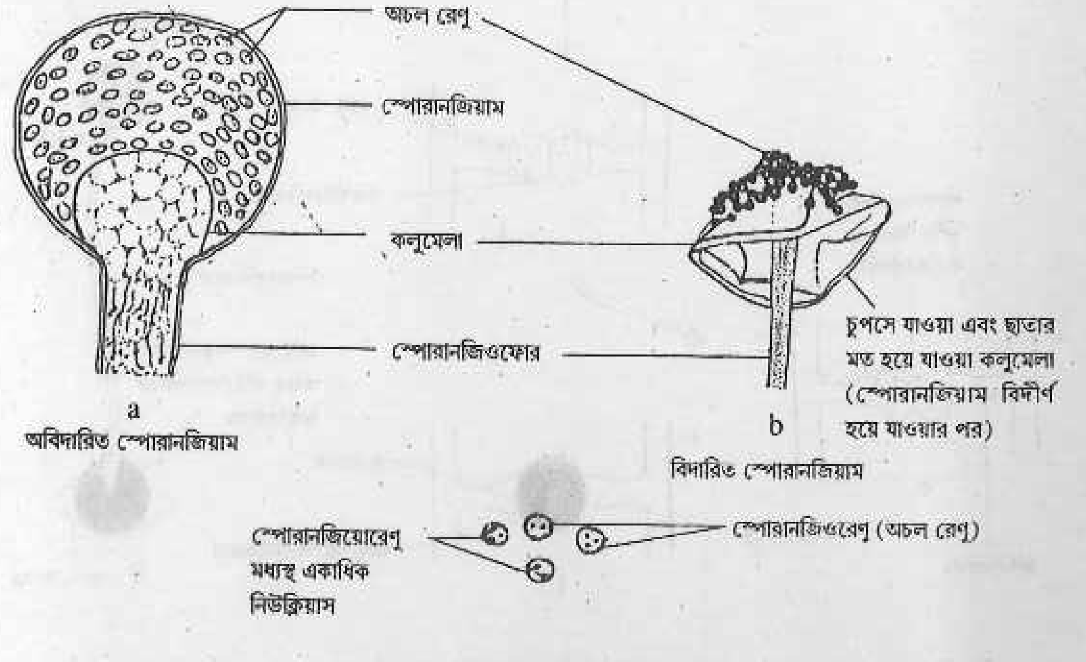

চিত্র নং 6.2 : *Rhizopus* (রাইজোপাসের) অযৌন জননে স্পোরানজিয়ামে উৎপন্ন অচলরেণু।

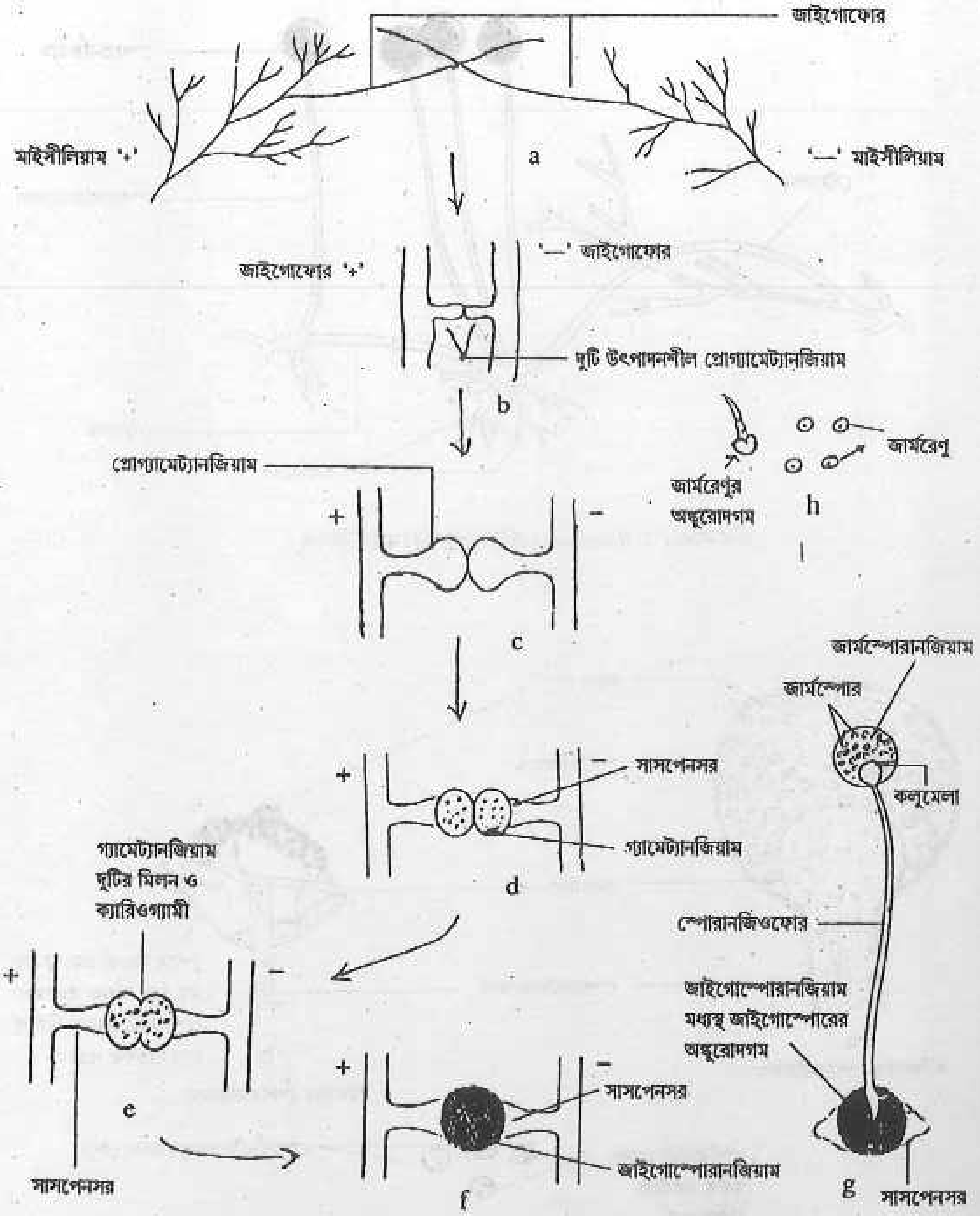

চিত্র নং 6.3 : ***Rhizopus stolonifer*** *(রাইজোপাস স্টোলোনিফারে) যৌন জননের ধাপ গুলি রেখাঙ্কিত* চিত্র সহযোগে দেখান হয়েছে।

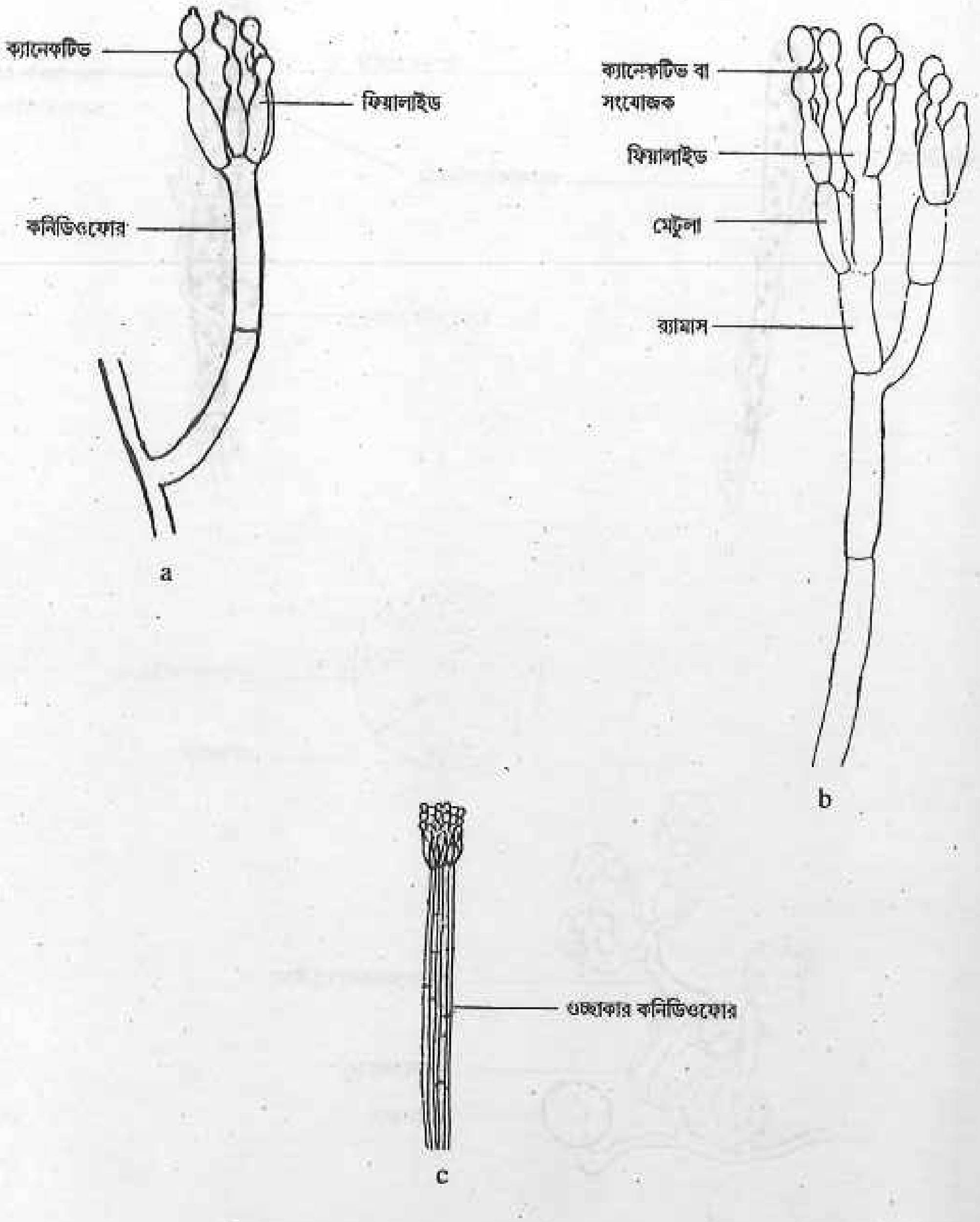

চিত্র নং 6.5 ঃ কনিডিওফোরের বিভিন্নপ্রকার গঠন।

(a) *Penicillium spinulosum (পেনিসিলিয়াম স্পাইনুলোসাম)*

(b) *Penicillium expansum (পেনিসিলিয়াম এক্সপ্যানসাম)*

(c) কোরিমিয়াম (সিনেমা) গঠন

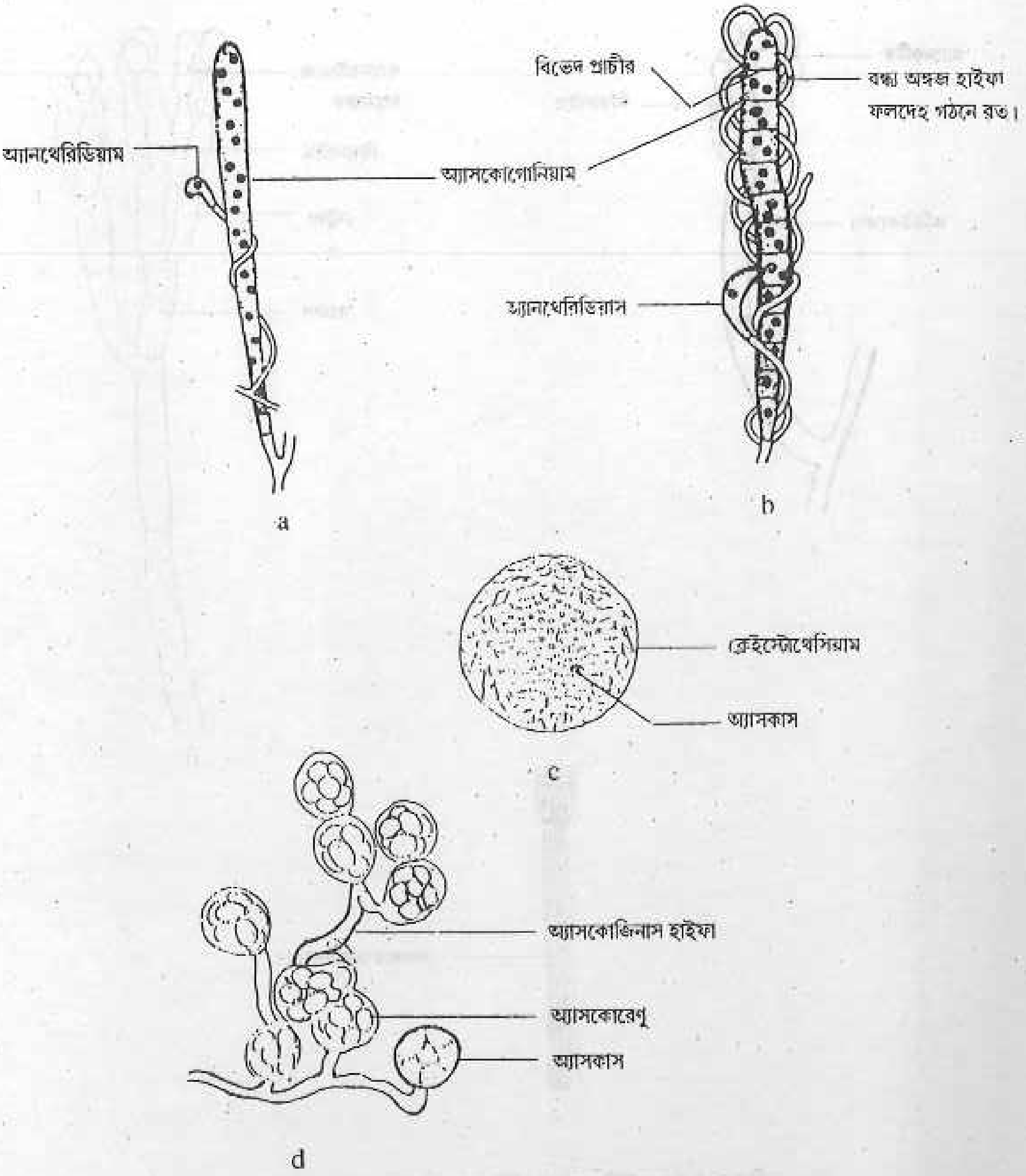

চিত্র নং 6.6 : *Talaromyces vermiculatus (Penicillium vermiculatum)*, ট্যালারোমাইসিস ভারমিকিউলেটাস (*পেনিসিলিয়াম ভারমিকিউলেটাম*) -এ যৌন জননের বিভিন্ন পর্যায়।

একক 7 □ অ্যাগারিকাস (Agaricus) ও হেলমিনথোস্পোরিয়ামের (Helminthosporium) জীবন বৃত্তান্ত

গঠন

7.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
7.2 অ্যাগারিকাসের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান, প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, অঙ্গজ গঠন
7.3 অ্যাগারিকাসের জনন
7.4 অ্যাগারিকাসের জীবনচক্র
7.5 হেলমিনথোস্পোরিয়ামের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান, প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, অঙ্গজ গঠন
7.6 হেলমিনথোস্পোরিয়ামের জনন
7.7 হেলমিনথোস্পোরিয়ামের জীবনচক্র
7.8 সারাংশ
7.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
7.10 উত্তরমালা

7.1 প্রস্তাবনা :

আপনারা একক ছয় থেকে রাইজোপাস ও পেনিসিলিয়ামের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে জেনেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন যে রাইজোপাস হল ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির সদস্য। এই ছত্রাকটির অঙ্গজদেহ সিনোসাইটিক মাইসীলিয়াম ও এটি রাইজয়েড, স্টোলন এবং স্পোরানজিওফোর নামক হাইফা দ্বারা গঠিত; এটির অযৌন জনন প্রধানত স্পোরানজিয়ামে উৎপন্ন একপ্রকার অচলরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়; এটির যৌন জননে উৎপন হয় জাইগোস্পোর (ডিপ্লয়েড রেণু) ও জার্মস্পোর (হ্যাপ্লয়েড রেণু) এবং জীবন চক্রটি হ্যাপ্লয়েড জীবনচক্র। ঠিক একইরকমভাবে আপনারা নিশ্চয়ই পেনিসিলিয়ামের ক্ষেত্রেও মনে রেখেছেন যে এটি আসকোমাইসিটিস শ্রেণির সদস্য। এই ছত্রাকটির অঙ্গজ দেহ বিভেদ প্রাচীরযুক্ত মাইসীলিয়াম ও এটি ধাত্রে প্রোথিত হাইফা, অনুভূমিক হাইফা এবং কনিডিওফোর নামক হাইফা দ্বারা গঠিত। ছত্রাকটির অযৌন জনন সম্পন্ন হয় কনিডিওরেণুর মাধ্যমে, যৌন জনন অ্যাসকাসে উৎপন্ন অ্যাসকোরেণুর (হ্যাপ্লয়েড) মাধ্যমে এবং জীবনচক্রটি হ্যাপ্লয়েড-ডাইক্যারিওটিক ধরনের। ফাইকোমাইসিটিস ও অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির এই দুই সদস্য সম্পর্কে জানার পর এখন স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের জানা প্রয়োজন ছত্রাকের বাকী দুটি শ্রেণির (বেসিডিওমাইসিটিস ও ফাংগি ইমপারফেক্টি) প্রত্যেকটিরক অন্তত একটি করে সদস্যের জীবন বৃত্তান্ত।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- বেসিডিওমাইসিটিস ও ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণিদুটির দুই প্রতিনিধি সদস্য যথাক্রমে অ্যাগারিকাস ও হেলমিনথোস্পোরিয়ামের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান নির্দেশ করতে পারবেন।
- ঐ দুই ছত্রাক কিরকম পরিবেশে জন্মায় ও কিভাবে তাদের পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং সেই সঙ্গে তারা কিরূপ উপকারী ও অপকারী ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তাদের অঙ্গজ দেহের গঠন বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ছত্রাক দুটি কিভাবে তাদের বংশবৃদ্ধি করে তা বুঝিয়ে দাতে পারবেন।
- তাদের জীবন চক্রের বিশেষত্ব কিরূপ এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

7.2 অ্যাগারিকাসের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান, প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, অঙ্গজ গঠন :

7.2.1 শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান :

শ্রেণি	:	বেসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes)
উপশ্রেণি	:	অটোবেসিডিওমাইসিটিস (Autobasidiomycetes)
বর্গ	:	হাইমেনোমাইসীট্যালিস (Hymenomycetales)
গোত্র	:	অ্যাগারিকেসী (Agaricaceae)
গন	:	*Agaricus (অ্যাগারিকাস)*

7.2.2 প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

অ্যাগারিকাস মৃতজীবী। এর বিভিন্ন প্রজাতি জৈবসারযুক্ত মাটি, পচা কাঠ, চারণভূমি ইত্যাদিতে জন্মায়। বর্ষাকালে এদের ফলদেহ প্রচুর পরিণাণে জন্মাতে দেখা যায়। মাঠে এদের ফলদেহগুলি সাধারণত বৃত্তাকারে জন্মায় এবং এই বৃত্তকে ফেয়ারি রিং (Fairy ring) বলে। প্রাচীনকালে ধারণা ছিল পরীরা এসে এই বৃত্তে নাচ করে। আর তার থেকেই এ ধরনের নামকরণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ফেয়ারি রিং উৎপাদনে *Agaricus (অ্যাগারিকাস)* ছাড়াও *Marasmius (ম্যারাসমিয়াস)* এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

অ্যাগারিকাসের অনেকগুলি প্রজাতি ভক্ষণীয় মাশরুম হিসাবে বিবেচিত, যেমন *A. campestris (অ্যাগারিকাস ক্যাম্পেসট্রিস) A. bisporus (অ্যাগারিকাস বাইস্পোরার), A. rodmani (অ্যাগারিকাস রডম্যানি)* ইত্যাদি। অবার অ্যাগারিকাসের এমন প্রজাতিও রয়েছে যা বিষাক্ত, যেমন *A. xanthodermus (অ্যাগারিকাস জ্যান্থোডারমাস)* একটি বিষাক্ত মাশরুম।

7.2.3 অঙ্গজ গঠন :

অ্যাগারিকাসের অঙ্গজ দেহ বিভেদ প্রাচীরযুক্ত ও শাখান্বিত প্রাথমিক মাইসীলিয়াম যা সাধারণত বেসিডিওরেণু অঙ্কুরিত হয়ে সৃষ্টি হয়। বিভেদ প্রাচীর ডলিছিদ্র বা ডলিপোর (Dolipore) যুক্ত। ডলিছিদ্র এক বিশেষ প্রকার ছিদ্র এবং এটি বিভেদ প্রাচীরের কেন্দ্রে অবস্থিত। এক্ষেত্রে ছিদ্রটিকে ঘিরে বিভেদ প্রাচীর ফুলে গিয়ে পিপের মত গঠন সৃষ্টি করে (চিত্র 4.1)। ঢলি ছিদ্র উপরে ও নিচে ছিদ্রাল টুপির সাহায্যে ঢাকা থাকে, একে প্যারেনথেসোম বা পোরক্যাপ (Pore cap) বলে।

প্রাথমিক মাইসীলিয়াম ছাড়াও অ্যাগারিকাসে আরও দু'প্রকার মাইসীলিয়াম দেখতে পাওয়া যায়, এরা হল গৌণ মাইসীলিয়াম এবং টারসিয়ারী মাইসীলিয়াম। এগুলি যৌন জনন পর্যায়ভুক্ত মাইসীলিয়াম। একটি '+' ও একটি '–' প্রাথমিক মাইসীলিয়ামের (মোনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম) মধ্যে প্লাজমোগ্যামীর ফলে সৃষ্টি হয় ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম। এটি গৌণ মাইসীলিয়াম হতে কিছু হাইফা ফলদেহ গঠনে অংশগ্রহণ করে। এই ফলদেহ গঠনকারী হাইফাগুলি একযোগে গঠন করে টারসিয়ারী মাইসীলিয়াম। ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম যথারীতি বিভেদপ্রাচীর যুক্ত ও শাখান্বিত। বিভেদ প্রাচীর ডলিছিদ্রজ সমন্বিত। গৌণমাইসীলিয়ামের হাইফাগুলি একে অপরকে পেঁচিয়ে সৃষ্টি করে রজ্জুসদৃশ গঠন। একে রাইজোমরফ (Rhizomorph) বলে। গৌণ মাইসীলিয়াম এই রাইজোমরফের সাহায্যে মাটিতে বা ধাত্রে বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে।

7.3 অ্যাগারিকাসের জনন :

অ্যাগারিকাস অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এই তিনপ্রকার পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করতে পারে।

7.3.1 অঙ্গজ জনন : অ্যাগারিকাসের মাইসীলিয়ামের খণ্ডাংশ হতে নতুন মাইসীলিয়াম সৃষ্টি হতে পারে। অ্যাগারিকাসের রাইজোমরফ যেমন অ্যাগারিকাসকে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে তেমনি এটি নতুন মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে অঙ্গজ জননে অংশগ্রহণ করে।

7.3.2 অযৌন জনন : অ্যাগারিকাসের কিছু প্রজাতি ক্ল্যামাইডোরেণু ও ওয়িডিওরেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন করে। ক্ল্যামাইডোরেণু হাইফায় প্রান্তীয় বা অন্তবর্তী অবস্থানে সৃষ্টি হয়। এগুলি পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট ও পর্যাপ্ত সঞ্চিত খাদ্য বস্তু যুক্ত। অনুকূল পরিবেশে ক্ল্যামাইডোরেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে। অ্যাগারিকাসে ওয়িডিওরেণু উৎপাদন কদাচিৎ দেখা যায়। ওয়িডিওরেণু ওয়িডিওফোর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম উৎপাদন করতে পারে।

7.3.3 যৌন জনন : অ্যাগারিকাসে যৌন জননে কোন জননাঙ্গ উৎপন্ন হয় না। দুটি হাইফা যৌন মিলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে (সোমাটোগ্যামী) অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে হাইফা ও ওয়িডিওরেণু যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করে (স্পারমাটাইজেশন)। অ্যাগারিকাসের বেশিরভাগ প্রজাতি হেটারোথ্যালিক হওয়ায় যৌন জননে একটি '+' ও একটি '–' স্ট্রেন সম্পন্ন প্রাথমিক বা মোনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামের প্রয়োজন (চিত্র 7.1 e)।

যৌন মিলনে অংশগ্রহণকারী দুটি মাইসীলিয়ামের (+ ও –) দুটি কোশ যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন স্পর্শস্থল বরাবর সাধারণ কোশ প্রাচীর দ্রবীভূত হয়ে যায় ও প্লাজমোগ্যামী সংগঠিত হয়। প্লাজমোগ্যামীর ফলে দুটি

কোষের দুটি নিউক্লিয়াস জোড় বাঁধে ও দ্বি-নিউক্লীয় বা ডাইক্যারিও দশার সৃষ্টি হয়। এইভাবে সৃষ্ট ডাইক্যারিওটিক কোশ বারে বারে বিভাজিত (মাইটোসিস) হয়ে প্রথমে ডাইক্যারিওটিক হাইফা ও পরে তা থেকে শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয়ে ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম উৎপন্ন করে (চিত্র 7.1 f)। ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়ামের হাইফাগুলি ধাত্রের মধ্যে বর্ধিত হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ও ঘনসন্নিবেশিত হয়ে রজ্জু সদৃশ মূলের ন্যায় রাইজোরফ (rhizomorph) তৈরি করে (চিত্র 7.1 g)। এই রাইজোমরফ থেকে সাদা ফুসকুরির ন্যায় অথবা বলা যেতে পারে মাইসীলিয়াম দিয়ে তৈরি গিট (mycelial knots) তৈরি হয়ে উপরের দিকে বর্দিত হতে থাকে ও ডিম্বাকৃতি কুঁড়ি বা বাট্‌ন (Button) তৈরি করে (চিত্র 7.1 h)। এই কুঁড়ি বা বাট্‌ন ক্রমশঃ বড় হয়ে পরিণত ফলদেহ উৎপন্ন করে (চিত্র 7.1 a)। এইজন্য এই জাতীয় মাশরুম 'Button mushroom' নামেও পরিচিত।

আ্যাগারিকাসের পরিণত ফলদেহ ছাতার ন্যায় দেখতে। এটি ব্যাঙের ছাতা হিসাবে সমধিক পরিচিত। ব্যাঙের ছাতায় থাকে একটি বৃন্ত বা স্টাইপ (Stipe) এবং টুপির ন্যায় পিসিয়াস (Pileus)। স্টাইপের সাহায্যে ফলদেহটি রাইজোমরফের সাথে যুক্ত থাকে। স্টাইপের উপরিভাগে একটি বলয় বা অ্যানুলাস থাকে। স্টাইপটি সাধারণত মাংসল, লালাভ সাদা বর্ণের ও এর কেন্দ্রীয় অংশটি ফাঁপা হয়। পিলিয়াসের উপরের তল সাধারণত সাদা বা ঘি-রঙের হয়। পিলিয়াসের তলদেশে প্রচুর সংখ্যক পাতলা ঝিল্লী সদৃশ গঠন ঝুলতে দেখা যায়, এগুলিকে গিল (gill অথবা lamellae) বলে। গিলগুলি প্রথমের দিকে সাধারণত পিঙ্ক বর্ণের হলেও পরিণত অবস্থায় গাঢ় বাদামী বর্ণের হয়। প্রতিটি গিলের উন্মুক্ত তল উর্বল অর্থাৎ বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণু উৎপাদনকারী হাইমেনিয়াম স্তরযুক্ত।

> অ্যানুলাস : অপরিণত ফলদেহে যখন পিলিয়াসটি গোটান অবস্থায় থাকে তখন গিলগুলি একটি পাতলা পর্দা বা ভেল (veil) দ্বারা সুরক্ষিত্রত থাকে। এই পর্দাটি লিপিয়াসের কিনারা থেকে স্টাইপ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ফলদেহটি পরিণত হতে থাকলে পিলিয়াসটি খুলতে থাকে, অবশেষে পর্দাটি ছিড়ে যায় ও স্টাইপের উপর এর অবশিষ্ট অংশ একটি বৃত্তাকার গঠন হিসাবে থেকে যায়, যা অ্যানুলাস নামে পরিচিত।

গিলের একটি লম্বচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে গিলটি তিনটি অংশে বিভক্ত, এগুলি যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ট্রামা *(Trama)*, অবহাইমেনিয়াম বা সাবহাইমেনিয়াম (Subhymenium) ও হাইমেনিয়াম (Hymenium) (চিত্র 7.1 c)। গিলের কেন্দ্রীয় অংশে অবস্থিত ট্রামার হাইফাগুলি লম্বালম্বিভাবে বিনাস্ত। ট্রামার বাহিরে পরবর্তী অংশ সাবহাইমেনিয়াম, অর্থাৎ এটি হাইমেনিয়াম ও ট্রামার অন্তবর্তী অংশ। এই অংশের হাইফাগুলি প্রায় অনুভূমিকভাবে বিনাস্ত। হাইমেনিয়াম অংশটি গিলের সর্বাপেক্ষা বাহিরের অংশ। এই অংশে অপরিণত বেসিডিয়াম (বেসিডিওল, Basidiole), পরিণত বেসিডিয়াম ও প্যারাফাইসিস নামক বন্ধ্যা গঠন অবস্থিত। হাইমেনিয়ামেরক এই গঠনগুলির সবই হাইফার প্রান্তীয় কোশ হতে সৃষ্ট। পরিণত বেসিডিয়ামের অগ্রভাগে থাকে স্টেরিগমা। যার সংখ্যা প্রজাতি ভেদে দুই অথবা চারটি হতে পারে। প্রতিটি স্টেরিগমার অগ্রভাগে থাকে একটি করে বেসিডিওরেণু।

অ্যাগারিকাসের যৌন জননে ক্যারিওগ্যামী প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় উৎপাদনশীল বেসিডিয়াম বা বেসিডিওলে। বেসিডিওলের মধ্যে দুটি কম্প্যাটিবল নিউক্লিয়াসের মিলনে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটি মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। ইতিমধ্যে বেসিডিওলটি বেসিডিয়ামে পরিণত হয়। *A. campestris (অ্যাগারিকাস ক্যাম্পেসট্রিসে)* উৎপাদিত চারটি নিউক্লিয়াসের প্রতিটি নিউক্লিয়াস কিছু পরিমান সাইটোপ্লাজম সহ স্টেরিগমার অগ্রভাগে সৃষ্ট বেসিডিওরেণুতে প্রবেশ করে। এইভাবে উৎপন চারটি বেসিডিওরেণুর মধ্যে দুটি '+' স্ট্রেন ও দুটি '–' স্ট্রেন বিশিষ্ট হয় (চিত্র 7.1 c)।

প্রতিটি পরিণত বেসিডিওরেণু স্টেরিগমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ে ও অনুকুল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম ('+' অথবা '–') গঠন করে (চিত্র 7.1 d, e)।

7.4 জীবনচক্র (চিত্র 7.2) :

অ্যাগারিকাসের অযৌন জীবন চক্র ক্ল্যামাইডোরেণু অথবা ওয়িডিওরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

অ্যাগারিকাসের বেশিরভাগ প্রজাতি হেটারোথ্যালিক। কাজেই এই সমস্ত সদস্যের ক্ষেত্রে যৌন জীবন চক্রে দুটি হ্যাপ্লয়েড মনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম (+ ও –) অংশগ্রহণ করে। ঐ মাইসীলিয়ামের দুটি কোশের মধ্যে প্লাজমোগ্যামী সংগঠিত হলে ডাইক্যারিও দশার সূচনা হয়। এরপর সুদীর্ঘ সময় ধরে ডাইক্যারিও দশা চলতে থাকে প্লাজমোগ্যামীর ফলে উৎপন্ন ডাইক্যারিওটিক কোশ হতে ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম উৎপন্ন হয়। ঐ ডাইক্যারিওটি মাইসীলিয়াম এরপর ফলদেহ বা বেসিডিওকার্প সৃষ্টি করে। ঐ ফলদেহের নির্দিষ্ট অংশে অর্থাৎ গিলে অবস্থিত হাইমেনিয়ামের বেসিডিওল কোশে ক্যারিওগ্যামী সম্পন্ন হয়। ক্যারিওগ্যামীর ফলে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস প্রায় সাথে সাথেই মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে হাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে।

ইতিমধ্যে বেসিডিওলটি বেসিডিয়ামে এবং উৎপন্ন হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বেসিডিয়ামের অগ্রভাগে সৃষ্ট স্টেরিগমার শীর্ষে বেসিডিওরেণু সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। উৎপাদিত প্রতিটি বেসিডিও রেণু অঙ্কুরিত হয়ে ('+' অথবা '–') হ্যাপ্লয়েড মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হোমোথ্যালিক প্রজাতির ক্ষেত্রে একই মাইসীলিয়ামের দুটি হাইফার মধ্যে সোমাটোগ্যামী ঘটে এবং পরিশেষে ফলদেহ হতে যে বেসিডিওরেণু সৃষ্টি হয় তা অঙ্কুরিত হয়ে পুনরায় হোমোথ্যালিক মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে। কাজেই অ্যাগারিকাসের যৌন জীবনচক্রে দীর্ঘ হ্যাপ্লয়েড দশা, দীর্ঘতম ডাইক্যারিও দশা ও অতি সংক্ষিপ্ত ডিপ্লয়েড দশা বিদ্যমান। অতএব বলা যায় অ্যাগারিকাসের যৌন জীবন চক্র হ্যাপ্লয়েড-ডাইক্যারিওটিক প্রকৃতির।

অনুশীলনী - 1

প্রদত্ত তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

1) অ্যাগারিকাস (*Agaricus*) ________ শ্রেণির ছত্রাক।

2) অ্যাগারিকাসের একটি ভক্ষণীয় প্রজাতি হল ________ এবং একটি বিযাক্ত প্রজাতি হল ________।

3) অ্যাগারিকাসের অযৌন জননে দু'প্রকার রেণু উৎপাদিত হতে পারে, এগুলি হল ________ ও ________।

4) অ্যাকারিকাসের যৌন জনন রেণু হল ________।

5) অ্যাগারিকাসের জীবনচক্রে তিনটি পর্যায় দশা হল ________, ________ ও ________। একুলির মধ্যে ________ দশা হল খুবই দীর্ঘস্থায়ী এবং ________ দশা খুবই ক্ষণস্থায়ী।

6) অ্যাগারিকাসের যৌন জননে প্লাজমোগ্যামী অনুষ্ঠিত হয় ________ অথবা ________ পদ্ধতিতে।

7) অ্যাগারিকাসের ফলদেহের প্রধান দুটি অংশ হল ________ ও ________। স্টাইপের উপরের অংশে যে বলয়াকার গঠন দেখতে পাওয়া যায় তাকে ________ বলে। হাইমেনিয়াম স্তরটি ঝিল্লী সদৃশ গঠন, ________ উপর বিস্তৃত থাকে।

8) গিলের লম্বচ্ছেদ করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে তিনটি অংশ সুস্পষ্ট হয়, এই তিনটি অংশ হল কেন্দ্রীয় ________, সর্বাপেক্ষা বাহিরে ________ এবং এই দজুই অংশের মাঝে অবস্থিত________।

9) অ্যাগারিকাসের জীবন চক্র ________ প্রকৃতির।

(হ্যাপ্লয়েড ডাইক্যারিওটিক, বেসিডিওমাইসিটিস, ট্রামা, অ্যাগারিকাস ক্যাম্পেসট্রিস, হাইমেনিয়াম, সাবহাইমেনিয়াম, অ্যাগারিকাস জ্যাম্থোডারমাস, স্টাইপ, ক্ল্যামইডোরেণু, পিলিয়াস, ওয়িডিওরেণু, গিল, অ্যানুলাস, বেসিডিওরেণু, স্পারমাটাইজেশন, ডিপ্লয়েড, হ্যাপ্লয়েড, ডাইক্যারিওটিক, সোমাটোগ্যামী, ডিপ্লয়েড, ডাইক্যারিওটিক)

7.5 হেলমিনথোস্পোরিয়ামের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান, প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, অঙ্গজ গঠন

7.5.1 হেলমিনথোস্পোরিয়ামের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান :

ফর্ম ক্লাস (Form Class) বা কৃত্রিম শ্রেণি	:	ফাংগি ইমপারফেক্টি (Fungi imperfecti)
ফর্ম অর্ডার (Form Order) বা কৃত্রিম বর্গ	:	মনিলিএলিস (Moniliales)
ফর্ম ফ্যামিলি (Form Family) বা কৃত্রিম গোত্র	:	ডিমাটিএসী (Dematiaceae)
ফর্ম জিনাস (Form Genus) বা কৃত্রিম গণ	:	*Helminthosporium* (*হেলমিনথোস্পোরিয়াম*)

7.5.2 প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

হেলমিনথোস্পোরিয়াম সাধারণত পরজীবী হিসাবে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে দেখতে পাওয়া যায়। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা ও গ্লিউম (Glume) বা পৌষ্পিক পত্রে এই ছত্রাক রোগ-উৎপাদক হিসাবে বিরাজ করে। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়াও আপেল ও ন্যাসপাতিতেও অনেক সময় এদের পাওয়া যায়। আবার জৈবসার যুক্ত মাটিতেও এরা মৃতজীবী হিসাবে থাকতে পারে।

হেলমিনথোস্পোরিয়াম মূলতঃ উদ্ভিদের রোগ উৎপাদনকারী ছত্রাক হিসাবে পরিচিত। ইহা বিভিন্ন প্রকার ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে, যেমন ধানে বাদামী দাগ রোগ, গমে বিটপ তন্ত্র ও মূলের পতন এবং পাতায় দাগ, বর্লিতে ভিক্টোরিয়া ধ্বসা (Victoria blight) রোগ, আখে চক্ষুদাগ ও বাদামী ডোরা দাগ ইত্যাদি। এছাড়া আপেলে কালো বসন্ত বা ব্ল্যাকপক্স (Black pox) ও ন্যাসপাতিতে ব্লিস্টার ক্যাঙ্কার (Blister canker) রোগ সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, 1942 সালের বাংলার মন্বন্তরের কারণ মহামারী আকারে ধানের বাদামী দাগ রোগ।

7.5.3 অভৃজ গঠন :

অঙ্গজ দেহ বিভেদপ্রাচীরযুক্ত শাখান্বিত মাইসীলিয়াম। বিভেদ প্রাচীর একটি কেন্দ্রীয় সরল ছিদ্র বিশিষ্ট (চিত্র 3.1 b)। মাইসীলিয়ামের বর্ণ বাদামী। পোষাক কলার মধ্যে হাইফাগুলি আন্তঃকোশীয় ও অন্তঃকোশীয়ভাবে বর্ধিত হয়। কোন কোন হাইফা পত্ররন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে বাহিরে বেরিয়ে আসে এবং বায়বীয় হাইফা হিসাবে বর্ধিত হয়ে

কনিডিওফোরে পরিণত হয়। কনিডিওফোর শাখাবিহীন বা ভূমি অংশে শাখান্বিত। পোষকের যে অংশে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই অংশে ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় মাইসীলিয়ামের বহিঃবৃদ্ধি দেখা যায় এবং ঐ অংশকে প্রায় ঢেকে ফেলে এবং কনিডিওফোর উৎপন্ন করে।

7.6 হেলমিন্‌থোস্পোরিয়ামের জনন :

হেলমিন্থোস্পোরিয়াম অঙ্গজ ও অযৌন পদ্ধতিতে জনন সম্পূর্ণ করে।

7.6.1 অঙ্গজ জনন :

অঙ্গজ জনন সাধারণত খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে, অর্থাৎ মাইসীলিয়ামের কোন অংশ ছিঁড়ে গেলে সেই খণ্ডিত অংশ থেকে নতুন মাইসীলিয়াম সৃষ্টি হয়।

7.6.2 অযৌন জনন :

অযৌন জনন কনিডিওরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কনিডিওরেণু কনিডিওফোরের অগ্রভাগ হতে ট্রেটিক পদ্ধতিতে (5.3.1.2 অনুচ্ছেদ দেখুন) উৎপন্ন হয়। কনিডিওরেণু উৎপন্ন করার পর কনিডিওফোরের পুনরায় পার্শ্বীয় বৃদ্ধি সংগঠিত হয় ও অগ্রভাগে নতুন কনিডিওরেণু সৃষ্টি হয়। এই পার্শ্বীয় বৃদ্ধি কনিডিওফোর ও কনিডিয়ামের সংযোগস্থলে ঘটে। কনিডিওফোরের এই পার্শ্বীয় বৃদ্ধির ফলে অগ্রভাগে উৎপন্ন কনিডিওরেণুটি পার্শ্বীয় অবস্থানে রূপান্তরিত হয় (চিত্র 7.3)। প্রতিটি কনিডিওরেণু বহুকোশী, অনুপ্রস্থ বিভেদপ্রাচীরযুক্ত, লম্বা, কিছুটা বাঁকা এবং দুই প্রান্তের দিকে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে গেছে। সরুপ্রান্তদ্বয় গোলাকার। কনিডিওরেণু গাঢ় বাদামী বর্ণের এবং মসৃণ প্রাচীরযুক্ত। পরিণত কনিডিওরেণু কনিডিওফোর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনাক্রান্ত পোষকের সংস্পর্শে আসে ও অঙ্কুরিত হয়ে ঐ পোষককে সংক্রমন ঘটায়। কনিডিওরেণুর অঙ্কুরোদ্‌গম সাধারণতঃ দুই প্রান্তীয় কোশ হতে ঘটে (চিত্র 7.3)। কনিডিওরেণু বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় কনিডিওফোরের উপর একটি দাস বা স্কার (scar) রেখে যায়। ঐ দাগের সংখ্যা থেকে একটি কনিডিফোর কতগুলি কনিডিওরেণু উৎপাদন করেছে তা সহজেই বলা যায় (চিত্র 7.3)।

7.6.3 প্রসঙ্গত :

উল্লেখ করা যায় *হেলমিন্‌থোস্পোরিয়ামের* অযৌন জননাঙ্গের গঠন ও অঙ্কুরোদগমের তারতম্য লক্ষ করা যায় এবং এই কারণে বর্তমানে হেলমিন্‌থোস্পোরিয়ামের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন *Bipolaris (বাইপোলারিস), Drechslera (ড্রেকসলেরা), Exserohilum (এক্সসারোহাইলাম) হেলমিন্‌থোস্পোরিয়ামের* অনেক সদস্যের পারফেক্ট স্টেজ বা যৌন জনন পাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং তাদের যথারীতি নতুন নামও দেওয়া হয়েছে। যেমন বাইপোলারিস-এর পারফেক্ট স্টেজ *Cochliobolus (ককলিওবোলাস), Pyrenophora, ড্রেকসলেরার পাইরেনোফোরা* এবং এক্সসারোহাইলাম-এর সেটোস্ফিরিয়া *(Setosphaeria)* এই পারফেক্ট স্টেজগুলি অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এবং এদের ফলদেহ পেরিথেসিয়াম। ফলদেহের মধ্যে আসকাসগুলি নলাকৃতি ও অ্যাসকোরেণু সূত্রাকার এবং বহুকোশী।

7.7 জীবনচক্র (চিত্র 7.4) :

হেলমিন্থোস্পোরিয়াম ফাংগি ইমপারফেক্টির সদস্য হিসাবে কেবলমাত্র অযৌন জীবনচক্র প্রদর্শন করে। কনিডিওফোর হতে উৎপন্ন কনিডিওরেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসীলিয়াম গঠন করে।

চিত্র 7.4 *Helminthosporium (হেলমিন্থোস্পোরিয়ামের)* অযৌন জীবনচক্র

অনুশীলনী - 2

নিচে প্রদত্ত তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

1) হেলমিন্থোস্পোরিয়াম ________ শ্রেণির ছত্রাক।

2) হেলমিন্থোস্পোরিয়ামের অঙ্গজ দেহ ________ মাইসীলিয়াম।

3) হেলমিন্থোস্পোরিয়াম ________ ও ________ প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করে এবং ________ জনন সাধারণত দেখা যায় না বা অনুপস্থিত।

4) অযৌন জননে উৎপাদিত রেণু ________ যা ________ কোশীও ________ যুক্ত।

5) হেলমিন্থোস্পোরিয়াম (বাইপোলারিস)-এর পারফেক্ট স্টেজের নাম ________ এবং হেলমিন্থোস্পোরিয়াম (ড্রেক্সলেরা)-এর পারফেক্ট স্টেজের নাম ________।

6) হেলমিন্থোস্পোরিয়ামের পারফেক্ট স্টেজ ________ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, ফলদেহ ________ এবং অ্যাসকোরেণুগুলি ________ ও ________।

(অ্যাসকোমাইসিটিস, ফাংগি ইমপারফেক্টি, পেরিথেসিয়াম, বিভেদ প্রাচীর যুক্ত, সূত্রাকার, বহুকোশী, বহু, অঙ্গজ কনিডিওরেণু, অযৌন, অনুপ্রস্থবিভেদ প্রাচীর, যৌন, পাইরেনোফোরা, ককলিওবোলাস)

7.8 সারাংশ :

এই এককটি পড়ে আপনারা অ্যাগারিকাস ও হেলমিন্থোস্পোরিয়ামের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। আপনারা জেনেছেন।

- অ্যাগারিকাস বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক। এরা মৃতজীবী। অঙ্গজ দেহ বিভেদপ্রাচীর যুক্ত ও শাখান্বিত

প্রাথমিক মাইসীলিয়াম। প্রাথমিক মাইসীলিয়াম মনোক্যারিওটিক (এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট), বিভেদ প্রাচীর ডলিপোর যুক্ত। জনন - অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এই তিন প্রকার প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে পারে। অঙ্গজ জনন খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় এবং অযৌন জনন ক্ল্যামাইডোরেণু ও ওয়িডিওরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যৌন জনন সোমাটোগ্যামী অথবা স্পারমাটাইজেশন প্রক্রিয়ায় ঘটে। প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর মধ্যে ডাইক্যারিওটিক দশা খুবই দীর্ঘ। ডাইক্যারিওটিক দশায় গৌণ ও টারসিয়ারী মাইসীলিয়াম সৃষ্টি হয়। ফলদেহ বা বেসিডিওকার্প টারসিয়ারী মাইসীলিয়াম দ্বারা সৃষ্ট। ফলদেহ স্টাইপ ও পিলিয়াসে বিভেদিত। স্টাইপের উপরের অংশে থাকে বলয়াকার গঠন বা অ্যানুলাস। পিলিয়াসের নিচের তলে থাকে গিল। গিল ট্রামা, সাবহাইমেনিয়াম ও হাইমেনিয়াম অংশে বিভেদিত। হাইমেনিয়াম অংশে বেসিডিয়াম ও বেসিডিও রেণু উৎপন্ন হয়। ক্যারিওগ্যামী ও মিয়োসিস উৎপাদনশীল বেসিডিয়ামের মধ্যে ঘটে। জীবন চক্র হ্যাপ্লয়েড-ডাইক্যারিওটিক প্রকৃতির।

- হেলমিন্থোস্পোরিয়াম ফাংগি ইমপারফেক্টি শ্রেণির ছত্রাক। এরা সাধারণভাবে পরজীবী, তবে মৃতজীবী হিসাবেও থাকতে পারে। এরা মূলতঃ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে রোগ উৎপাদনকারী হিসাবে পরিচিত। অঙ্গজ দেহ বিভেদ প্রাচীর যুক্ত শাখান্বিত মাইসীলিয়াম এবং বর্ণ বাদামী। বিভেদ প্রাচীর কেন্দ্রীয় সরল ছিদ্রযুক্ত। জনন সাধারণতঃ অঙ্গজ ও অযৌন এই দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। অঙ্গজ জনন খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে পারে। অযৌন জনন বহুকোশী কালচে বাদামী বর্ণের কনিডিওরেণুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যে সমস্ত প্রজাতিতে পারফেক্ট স্টেড (যৌন জনন) পাওয়া গেছে তাদের অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

7.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

   a) অ্যাগারিকাসের বেসিডিওরেণু অঙ্কুরিত হয়ে কোন মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে?

   b) অ্যাগারিকাসের যৌন জননে প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর অন্তবর্তী পর্যায়ে কোন কোন মাইসীলিয়াম সৃষ্টি হয়?

   c) অ্যাগারিকাসের জীবন চক্রে কোথায় মিয়োসিস বিভাজন সংগঠিত হয়?

   d) হেলমিন্থোস্পোরিয়ামের কনিডিওরেণু যে হাইফায় সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে? ঐ হাইফা থেকে উৎপাদিত একাধিক কনিডিওরেণু খসে পড়ার পর ঐ হাইফা দেখে (অনুবীক্ষণ যন্ত্রে) কতগুলি কনিডিওরেণু উৎপাদিত হয়েছে তা কি বলা সম্ভব? যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তাহলে কি করে সম্ভব বলুন?

   e) অ্যাগারিকাস ও হেলমিন্থোস্পোরিয়ামের বিভেদ প্রাচীরে পার্থক্য কোথায়?

   f) অ্যানুলাস কি?

2. a) অ্যাগারিকাস ও হেলমিন্থোস্পোরিয়ামের শ্রেণি বিন্যাসগত অবস্থান উল্লেখ করুন।

   b) অ্যাগারিকাস ও পেনিসিলিয়ামের প্রকৃতিতে অবস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

c) অ্যাগারিকাসের অঙ্গজ গঠন বর্ণনা করুন।

d) হেলমিন্‌থোস্পোরিয়ামের অযৌন জনন বর্ণনা করুন।

3. অ্যাগারিকাসের যৌন জীবন চক্রটি বর্ণনা করুন।
4. অ্যাগারিকাসের যৌন জনন বর্ণনা করুন।
5. অ্যাগারিকাসের বেসিডিওকার্প বা ফলদেহের ঐ ছত্রাকের জীবনচক্রে ভূমিকা কি?

6.10 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

a) বেসিডিওমাইসিটিস
b) অ্যাগারিকাস ক্যাম্পেসট্রিস, অ্যাগারিকাস জ্যান্থোডারমাস
c) ক্ল্যামাইডোরেণু, ওয়িডিওরেণু
d) বেসিডিওরেণু
e) হ্যাপ্লয়েড, ডাইক্যারিওটিক, ডিপ্লয়েড, ডাইক্যারিওটিক, ডিপ্লয়েড
f) সোমাটোগ্যামী, স্পারমাটাইজেশন
g) স্টাইপ, পিলিয়াস, অ্যানুলাস, গিল
h) ট্র্যামা, হাইমেনিয়াম, সাবহাইমেনিয়াম
i) হ্যাপ্লয়েড - ডাইক্যারিওটিক

অনুশীলনী - 2

a) ফাংগি ইমপারফেক্টি
b) বিভেদপ্রাচীর যুক্ত
c) অঙ্গজ, অযৌন, যৌন
d) কনিডিওরেণু, বহু, অনুপ্রস্থ বিভেদপ্রাচীর
e) ককলিওবোলাস, পাইরেনোফোরা
f) অ্যাসকোমাইসিটিস, পেরিথেসিয়াম, সূত্রাকার, বহুকোশী

উত্তরমালা

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. a) অ্যাগারিকাসের বেসিডিওরেণু অঙ্কুরিত হয়ে প্রাথমিক মাইসীলিয়াম সৃষ্টি করে। কোশগুলি সাধারণত এক নিউক্লিয়াস যুক্ত হওয়ায় এই মাইসীলিয়াম মনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম নামেও পরিচিত।

   b) অ্যাগারিকাসের যৌন জননে প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর অন্তবর্তী পর্যায়ে সৃষ্টি হয় গৌন মাইসীলিয়াম ও টারসিয়ারী মাইসীলিয়াম।

   c) অ্যাগারিকাসের জীবনচক্রে বেসিডিওল বা উৎপাদনশীল বেসিডিয়ামের মধ্যে মিয়োসিস সংগঠিত হয়।

   d) হেলমিন্‌থোস্পোরিয়ামের কনিডিওরেণু যে হাইফায় সৃষ্টি হয় তাকে কনিডিওফোর বলে। ঐ কনিডিওফোর হতে কনিডিওরেণুগুলি খসে পড়ার পর ঐ কনিডিওফোর অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখে বলা সম্ভব ওতে কতগুলি কনিডিওরেণু উৎপন্ন হয়েছিল। কারণ কনিডিওরেণু খসে পড়ার সময় কনিডিওফোরের উপর একটি সুনির্দিষ্ট দাস বা স্কার (Scar) রেখে যায়। ঐ দাগগুলিকে গুণে উৎপাদিত কনিডিওরেণুর সংখ্যা বলা সম্ভব হয়।

   e) অ্যাগারিকাসের বিভেদ প্রাচীরে ডলিছিদ্র বা ডলিপোর নামক বিশেষ একপ্রকার ছিদ্র থাকে। কিন্তু হেলমিনথোস্পোরিয়ামের বিভেদ প্রাচীরে সরল ছিদ্র থাকে।

   f) অনুচ্ছেদ 7.3.3 -এর প্রান্তলিপি দেখুন।

2. a) অনুচ্ছেদ 7.2.1 ও 7.5.1 দেখুন।

   b) অনুচ্ছেদ 7.2.2 ও 7.5.2 দেখুন।

   c) অনুচ্ছেদ 7.2.3 দেখুন।

   d) অনুচ্ছেদ 7.6.2 দেখুন।

3. অনুচ্ছেদ 7.4 দেখুন।

4. অনুচ্ছেদ 7.3.3 দেখুন।

5. অ্যাগারিকাসের বেসিডিওকার্প বা ফলদেহ যা মাটি বা ধাত্রের উপর দেখতে পাওয়া যায় তা সাধারণত ঐ ছত্রাকটির একটি যৌন জনন সম্পর্কিত গঠন। এই বেসিডিওকার্পের দুটি অংশ, দণ্ডাকার অ্যানুলাসযুক্ত স্টাইপ ও স্টাইপের অগ্রভাগে চওড়া পিলিয়াস যার তলার দিকে লালচে বাদামী বর্ণের গিল উপস্থিত। সমগ্র গঠনটি দেখতে ছাতার ন্যায় হওয়ায় এটি ব্যাঙের ছাতা নামেও পরিচিত।

অ্যাগারিকাসের হেটোরোথ্যালিক প্রজাতির ক্ষেত্রে দু'প্রকার বেসিডিওরেণু ('+' ও স্ট্রেন '–') অঙ্কুরিত হয়ে যে দু'প্রকার প্রাথমিক বা মনোক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম গঠন করে, তাদের প্লাজমোগ্যামীর ফলে অথবা একটি প্রাথমিক মাইসীলিয়াম ও একটি ভিন্ন স্ট্রেনের ওয়িডিওরেণুর প্লাজমোগ্যামীর ফলে দ্বিনিউক্লিয় বা ডাইক্যারিওটিক কোশের সৃষ্টি হয়। এই ডাইক্যারিওটিক কোশ হতে উৎপন্ন ডাইক্যারিওটিক মাইসীলিয়াম হতে বেসিডিওকার্প বা ফলদেহের সৃষ্টি হয়। অ্যাগারিকাসের এই বেসিডিওকার্প উৎপাদন তার যৌন জননের প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর

অন্তবর্তী পর্যায়ে ঘটে। বেসিডিওকার্পের তলার দিকে যে ঝিল্লী সদৃশ গিলগুলি ঝুলতে থাকে তা হাইমেনিয়াম নামক স্তর দ্বারা আবৃত থাকে। এই হাইমেনিয়াম স্তরে হাইফার অগ্রভাগের কোশ হতে প্রথমে তরুন বেসিডিয়াম বা বেসিডিওল ও পরে তা থেকে পরিণত বেসিডিয়াম সৃষ্টি হয়। বেসিডিওলের মধ্যে উপস্থিত দুটি নিউক্লিয়াসের ক্যারিওগ্যামীর ফলে যে ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় তা মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি নিউক্লিয় উৎপন্ন করে। ইতিমধ্যে বেসিডিওলটি বড় হয়ে বেসিডিয়ামে পরিণত হয় ও বেসিডিয়ামের অগ্রভাগ হতে উৎপন্ন স্টেরিগমার (চারটি) অগ্রভাগ থেকে বেসিডিওরেণু সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বেসিডিওরেণুর মধ্যে একটি করে নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে। প্রতিটি বেসিডিয়াম থেকে এইভাবে উৎপন্ন চারটি বেসিডিওরেণুর অর্ধেক '+' ও অর্ধেক '–' স্ট্রেন বিশিষ্ট হয়। এই বেসিডিও রেণুগুলি পরিশেষে স্টেরিগমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও অঙ্কুরিত হয়ে নতুন প্রাথমিক মাইসীলিয়াম গঠন করে, যা যৌন জননে অংশগ্রহণ করে নতুন বেসিডিওকার্প গঠনে সাহায্য করে। এইভাবে বেসিডিওকার্প হেটারোথ্যালিক অ্যাগারিকাসের জীবনচক্রে প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামীর মধ্যে সেতু রচনা করে এবং ক্যারিওগ্যামী ও মিয়োসিসের মাধ্যমে বেসিডিওরেণু উৎপন্ন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অ্যাগারিকাসের হেমোথ্যালিক প্রজাতির ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতিটি বেসিডিয়াম হতে দুটি বেসিডিওরেণু উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন বেসিডিওরেণু দ্বিনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট ও হেটারোক্যারিওটিক হয়। উক্ত রেণু অঙ্কুরিত হলে সরাসরি ডাইক্যারিওটি মাইসীলিয়াম সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে বেসিডিওকার্প উৎপন্ন হয়। বেসিডিওকার্পের হাইমেনিয়াম স্তরে যথারীতি ক্যারিওগ্যামী ও মিয়োসিসের মাধ্যমে দ্বিনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট বেসিডিওরেণুর সৃষ্টি হয়। কাজেই হোমোথ্যালিক অ্যাগারিকাসের ক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামী প্রক্রিয়াটি অনুপস্থিত হলেও বেসিডিওকার্প ক্যারিওগ্যামী ও মিয়োসিসের মাধ্যমে বেসিডিওরেণু উৎপাদন করে হেটারোথ্যালিক প্রজাতির ন্যায় জীবনচক্রে তার গুরুত্ব প্রায় একই রকমভাবে তুলে ধরেছে।

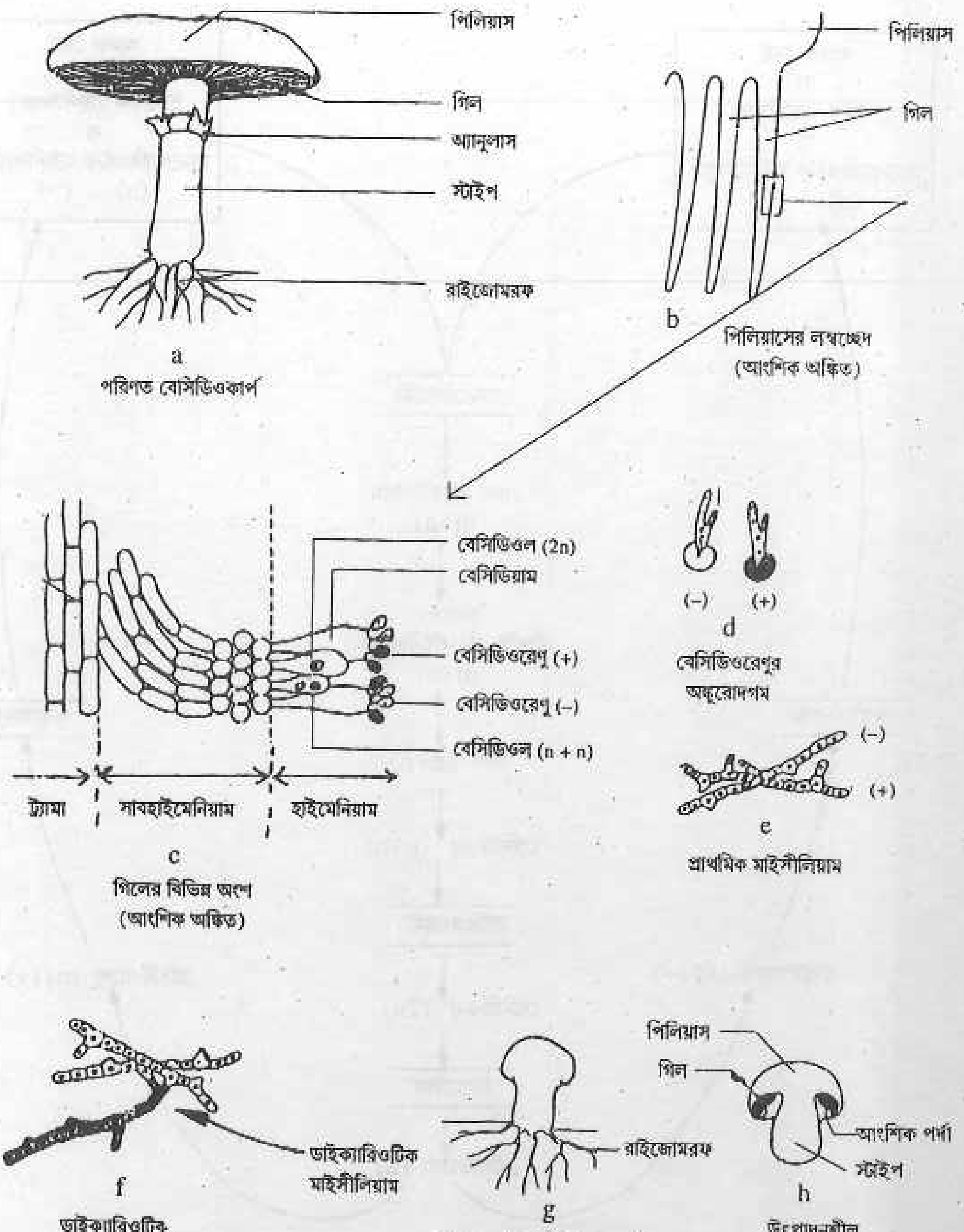

চিত্র নং 7.1 : *Agaricus* (অ্যাগারিকাসের) বেসিডিওকার্প ও উহার উৎপাদন।

১০

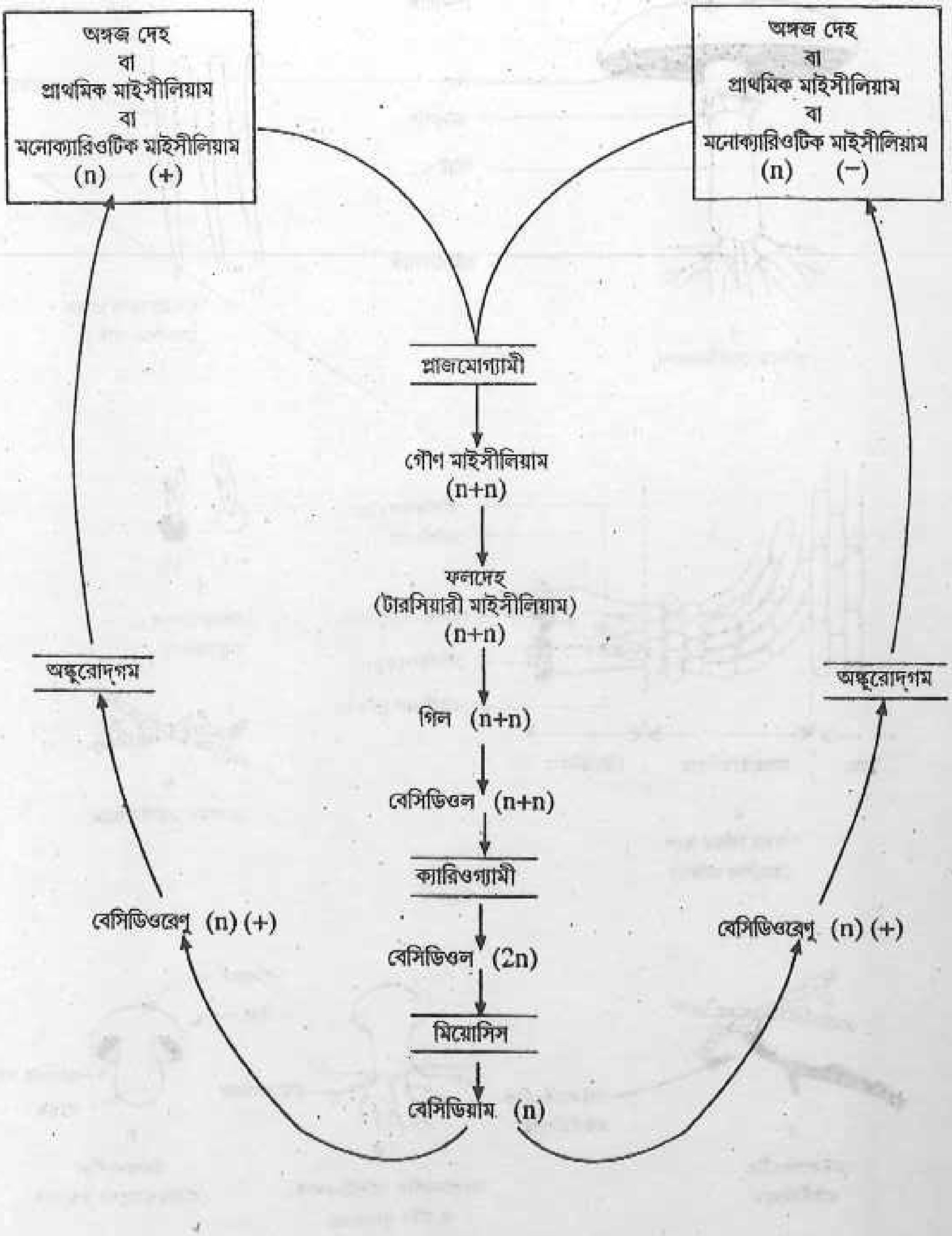

চিত্র নং 7.2 ঃ অ্যাগারিকাসের যৌন জীবনচক্র

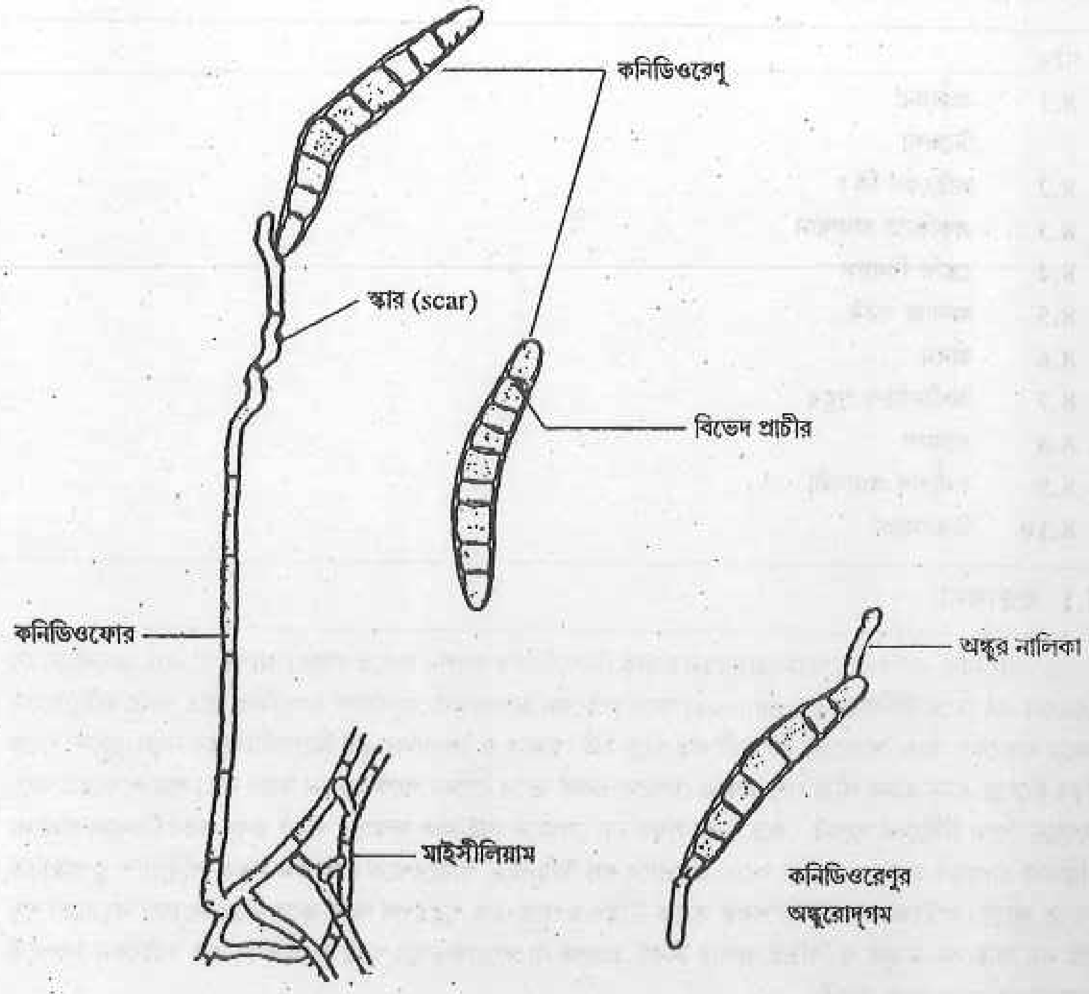

চিত্র নং 7.3 ঃ Helmonthosporium (হেলমিন্থোস্পোরিয়াম)

একক 8 ❒ লাইকেন

গঠন

8.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

8.2 লাইকেন কি?

8.3 প্রকৃতিতে অবস্থান

8.4 শ্রেণি বিন্যাস

8.5 অঙ্গজ গঠন

8.6 জনন

8.7 অর্থনৈতিক গুরুত্ব

8.8 সারাংশ

8.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

8.10 উত্তরমালা

8.1 প্রস্তাবনা

আপনারা একক-1 থেকে জেনেছেন ছত্রাক মিথোজীবিত্ব প্রদর্শন করতে পারে। আপনারা এও জেনেছেন যে ছত্রাকের এই মিথোজীবিত্বের (Symbiosis) ফলে লাইকেন অথবা মাইকোরহিজা উৎপাদিত হতে পারে লাইকেলের ক্ষেত্রে ছত্রাকের সাথে শৈবালের মিথোজীবত্বি গড়ে ঠাই। ছত্রাক ও শৈবালের এই মিথোজীবিত্বের ফলে তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এমন এমন পরিবেশে জন্মান যেখানে একক ভাবে তাদের পক্ষে জন্মান সম্ভব নয়। শুষ্ক পাথরের গায়ে যেখানে কোন উদ্ভিদের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয় সেখানে লাইকেল জন্মাতে পারে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য উদ্ভিদকে সেখানে জন্মাতে সাহায্য করে। এইভাবে শুষ্ক উদ্ভিদহীন পরিবেশকে লাইকেন সবুজ পরিবেশে রূপান্তরিত করতে পারে। লাইকেনের এই বিশেযত্ব তাকে উদ্ভিদ জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয় লাইকেন মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই লাইকেন সম্পর্কে আপনাদের জানা খুবই জরুরী।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- লাইকেনের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন এবং কিরকম পরিবেশে লাইকেন জন্মায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লাইকেনের গঠন বৈচিত্র ও লাইকেনকে কিভাবে শ্রেণি বিভক্ত করা যায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- লাইকেন কেমন করে তাদের বংশবৃদ্ধি করে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- লাইকেন আমাদের কি কি উপকার বা অপকার সাধন করে তা নির্দেশ করতে পারবেন।

8.2 লাইকেন কি?

লাইকেন হল মাইকোবায়োন্ট (Mycobiont) ও ফোটোবায়োন্ট (Photobiont) এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা এক সহাবস্থান বা মিথোজীবিত্ব (Symbiosis)। মাইকোবায়োন্ট বলতে বুঝায় ছত্রাক যা প্রধানত অ্যাসকোমাইসিটিস এবং কিছু ক্ষেত্রে বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত। এখানে ফটোবায়োন্ট অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষকারী সহযোগী হল শৈবাল, যা প্রধানত নীলাভ সবুজ শৈবাল বা সিয়ানোফাইসী (Cyanophyceae) শ্রেণিভুক্ত শৈবাল ও কিছুক্ষেত্রে সবুজ শৈবাল বা ক্লোরোফাইসী শ্রেণিভুক্ত শৈবাল। কাজেই উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল লাইকেন হল ছত্রাক ও শৈবালের মধ্যে গড়ে ওঠা মিথোজীবিত্ব। এই মিথোজীবিত্বে শৈবাল ছত্রাককে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন জৈব খাদ্য সরবরাহ করে এবং ছত্রাক জলশোষণ ও খনিজ লবণ শোষণ করে সম্ভবতঃ শৈবালকে সরবরাহ করে ও সেই সঙ্গে জল সংরক্ষণ করে প্রতিকূল পরিবেশে লাইকেনকে বেঁচে থাকতে ও বর্ধিত হতে সাহায্য করে।

8.3 প্রকৃতিতে অবস্থান :

লাইকেন বিভিন্ন পরিবেশে জন্মাতে পারে। কোন কোন লাইকেন এমন পরিবেশে জন্মাতে পারে যেখানে অন্য কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। নিচে বিভিন্ন পরিবেশে জন্মানো লাইকেনের একটা তালিকা দেওয়া হল ঃ—

(i) কর্টিকোলাস (Corticolous) লাইকেন ঃ- এরা বৃক্ষের ছালের (Bark) উপর জন্মায়, উদাহরণ - *Usnea (উসনিয়া), Graphis (গ্রাফিস)* ইত্যাদি।

(ii) লিগনিকোলাস (Lignicolous) লাইকেন ঃ- এরা সরাসরি কাঠের উপর জন্মায়, উদাহরণ - *Chaenotheca (কিনোথিকা)* ইত্যাদি।

(iii) স্যাক্সিকোলাস (Saxicolous) লাইকেন ঃ- এরা পাথরের গায়ে জন্মায়, উদাহরণ - *Porina (পোরিনা)* ইত্যাদি।

(iv) টেরিকোলাস (Terricolous) লাইকেন ঃ- এরা মাটির উপর জন্মায়, উদাহরণ - *Collema tenax (কোলিমা টেন্যাক্স)*।

(v) মেরিন (Marine) লাইকেন ঃ- এরা সমুদ্রে পাথরের গায়ে জন্মায়, উদাহরণ - *Caloplaca marina* (ক্যালোপ্লাকা মেরিনা) ইত্যাদি।

(vi) ফ্রেশওয়াটার (Freshwater) লাইকেন ঃ- এরা নদীর জলে অর্থাৎ মিঠা জলে অবস্থিত পাথরের গায়ে জন্মায়, উদাহরণ - *Epheba lanata (এফিবা ল্যানাটা)* ইত্যাদি।

এছাড়া দেওয়াল, অ্যাসবেসটস, গ্লাসফাইবার (Glass firbre), চামড়া ইত্যাদি নানা জায়গায় লাইকেন জন্মাতে পারে। কোন কোন লাইকেন মেরু অঞ্চলে বরফের উপর জন্মায়, যেমন *Cladonia rangifera (ক্ল্যাডোনিয়া র‍্যাঞ্জিফেরা)*।

8.4 শ্রেণিবিন্যাস :

লাইকেনের শ্রেণিবিন্যাস তার ছত্রাক উপাদানের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ লাইকেন থ্যালাসের দুই উপাদান ছত্রাক ও শৈবালের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে ছত্রাককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

মার্টিন (Martin, 1951) প্রদত্ত ছত্রাকের শ্রেণিবিন্যাসে লাইকেনকে ফাংগি ইমপারফেক্টির ন্যায় ছত্রাকের একটি ফর্মক্লাস (Form Class) হিসাবে দেখানো হয়েছে। মিলার (Miller, 1984) লাইকেনকে ছত্রাকের ইউমাইকোফাইটা (Eumycophyta) বিভাগের একটি উপবিভাগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এটিকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করছেন।

লাইকেন

ছত্রাকীয় উপাদান অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপাদন করে ↓ শ্রেণি-অ্যাসকোলাইকেন (Ascolichen)	ছত্রাকীয় উপাদান বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণু উৎপন্ন করে ↓ শ্রেণি - বেসিডিওলাইকেন (Basidiolichen)

অ্যালিক্সোপোলাস ও মিম্স্ (Alexopoulos & Mims, 1979) লাইকেনকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল যথাক্রমে (i) বেসিডিওলাএকন, (ii) ডয়েটেরোলাইকেন (deuterolichen)-এরা কোন যৌন রেণু উৎপাদন করে না, ও (iii) অ্যাসকোলাইকেন।

8.5 অঙ্গজ গঠন

8.5.1 লাইকেন দেহের সাধারণ গঠন :

লাইকেনের অঙ্গজ দেহ হল থ্যালাস এবং এটি মাইকোবায়োন্ট ও ফোটোবায়োন্ট-এর সমন্বয়ে গঠিত। লাইকেমেনর এই থ্যালাস বিভিন্ন বর্ণের, আকার ও আকৃতির হয়। হক্সওয়ার্থ এবং হিল (Hawksworth and Hill, 1984) অঙ্গজ গঠনের ভিত্তিতে লাইকেনকে নিম্নলিখিত পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ-

(i) লেপরোজ **(Leprose) লাইকেন ঃ-** এটি লাইকেনের সর্বাপেক্ষা সরল গঠন। এই লাইকেন ধাত্রের বা সাব্‌সট্রাটামের (Substratum) উপর শিথিল ভাবে বর্ধিত হয়ে অনেকটা পাউডার সদৃশ গঠন প্রদর্শন করে। এক্ষেত্রে ছত্রাকের হাইফা শৈবালের একক কোশ অথবা ক্ষুদ্রাকার কোশগুচ্ছকে ঘিরে অবস্থান করে, কিন্তু কোন বিশেষ স্তরে বিন্যস্ত হয়ে শৈবালকে ঘিরে কোন সুগঠিত আবরক সৃষ্টি করে না। উদাহরণ - *Lepraria incana (লেপরারিয়া ইনকানা)* (চিত্র ৪.1)।

(ii) ক্রাসটোজ (Crustose) লাইকেন ঃ- এক্ষেত্রে চ্যাপ্টা ও পাতলা লাইকেন দেহ ধাত্রের সাথে দৃঢ় ভাবে আটকে থাকে ও বর্ধিত হয়। এই থ্যালাস দেহের উপরিতল সাধারণত মসৃণ, কখনও কখনও চিড় ফাট দেখতে পাওয়া যায় (চিত্র 8.2 a)। আভ্যন্তরীণ গঠনে দেখা যায় একটি হাইফা নির্মীত বহিঃস্তর বা কর্টেক্স (Cortex) অঞ্চল ও একটি মেডুলা (Medulla) অঞ্চল এবং এই দুই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে শৈবাল অঞ্চল (Algar zone)। শৈবাল অঞ্চলে ছত্রাকের হাইফা এবং শৈবাল ওতোপ্রোতভাবে মিশে থাকে। মেডুলা হতে কিছু হাইফা ধাত্রের মধ্যে প্রোথিত হয়ে লাইকেন দেহকে ধাত্রের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। এই হাইফাগুলিকে বলা হয় রাইজয়েড (চিত্র 8.2 b)। উদাহরণ *Graphis (গ্রাফিস), Buellia (বুয়েলিয়া)* ইত্যাদি।

(iii) ফোলিওজ (Foliose) লাইকেন ঃ- এক্ষেত্রে চ্যাপ্টা ও খাঁজযুক্ত থ্যালাস দেহ অনেকটা পাতার মত গঠন প্রদর্শন করে। এটি শাখান্বিত ও ধাত্রের সাথে রাইজয়েড সদৃশ গঠনের (রাইজাইন, Rhizine) সাহায্যে আটকে থাকে। এই থ্যালাস দেহ অনেকটা ব্রায়োফাইটার (Bryophyta) শুকিয়ে যাওয়া লিভার ওয়ার্টের (Liverwort) থ্যালাসকে মনে করিয়ে দেয় (চিত্র 8.3 a)।

ফোলিওজ লাইকেনের আভ্যন্তরীন গঠনে দেখা যায় উপরের দিকে রয়েছে হাইফা নির্মীত উপরস্থ বহিঃস্তর বা কর্টেক্স। উপরস্থ বহিঃস্তরের নিচে রয়েছে শৈবাল অঞ্চল। শৈবাল অঞ্চলের নিচে হাইফা নির্মীত মেডুলা এবং মেডুলার নিচে হাইফা নির্মীত নিম্নস্থ বহিঃস্তর রয়েছে। নিম্নস্থ বহিঃস্তর হতে রাইজাইন উৎপন্ন হয়ে ধাত্রে প্রোথিত হয় (চিত্র 8.3 c)। উদাহরণ *Parmelia* (পারমেলিয়া)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যদিও বেশিরভাগ ফোলিওজ লাইকেনের আভ্যন্তরীণ গঠনে সুনির্দিষ্ট শৈবাল অঞ্চল দেখা যায়, কিন্তু কিছু ফোলিওজ লাইকেন আছে যাদের ক্ষেত্রে শৈবাল প্রায় সমগ্র থ্যালাস জুড়ে বিস্তৃত থাকে, অর্থাৎ এদের সুনির্দিষ্ট শৈবাল অঞ্চল অনুপস্থিত। এরূপ গঠনকে হোমোআয়োমেরাস (Homoiomerous) গঠন বলে (চিত্র 8.3 b), উদাহরণ - *Collema* (কোলমে)। পক্ষান্তরে সুনির্দিষ্ট শৈবাল অঞ্চল যুক্ত থ্যালাস গঠনকে হেটারোমেরাস (Heteromerous গঠন বলে (চিত্র 8.3 c)।

(iv) ফোলিওজ (Fruticose) লাইকেন ঃ- এই প্রকার লাইকেনের ক্ষেত্রে থ্যালাস দেহ সাধারণত প্রচুর শাখা প্রশাখাযুক্ত হয় এবং ধাত্রের উপর খাড়াভাবে দণ্ডায়মান (*Cladonia, ক্ল্যাডোনিয়া*) (চিত্র 8.4 b)। অথবা ধাত্র হতে ঝুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে (*Usnea উসনিয়া*) (চিত্র 8.4 a)। থ্যালাস দেহ একটি নির্দিষ্ট ভূমি অংশের (হাইফা নির্মিত) মাধ্যমে ধাত্রের সাথে যুক্ত থাকে। আভ্যন্তরীণ গঠন হেটারোমেরাস, তবে থ্যালাস দেহ খাড়া অথবা ঝুলন্ত হওয়ার যান্ত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন এবং তা পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট হাইফা নির্মিত কর্টেক্স অথবা স্থিতিস্থাপক মেডুলা কর্তৃক প্রদত্ত হয়।

(v) ফোলিওজ (Filamentous) লাইকেন ঃ- পূর্ববর্তী লাইকেনগুলির ক্ষেত্রে থ্যালাস গঠনে ছত্রাকের ভূমিকা ছিল প্রকট কিন্তু ফিলামেন্টাস লাইকেনের ক্ষেত্রে থ্যালাস গঠনে ছত্রাক অপেক্ষা শৈবালের ভূমিকা প্রকট। এক্ষেত্রে শৈবালের ফিলামেন্ট সুগঠিত এবং ছত্রাকের স্বল্প সংখ্যক হাইফা দ্বারা আবৃত থাকে। উদাহরণ - *Racodium (র‍্যাকোডিয়াম), Ephebe (একেবি)* ইত্যাদি।

8.5.2 লাইকেন দেহের বিশেষ গঠন ঃ

লাইকেন থওালাসে অনেক ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ গঠনের উদ্ভব হয়। এরূপ কয়েকটি গঠনের উল্লেখ নিচে করা হল ঃ-

(i) **শ্বাসছিদ্র ঃ** কোন কোন লাইকেনের, বিশেষতঃ ফেলিওজ লাইকেনের উপরস্থ ঘন সন্নিবেতি বহিঃস্তর বা কর্টেক্সের মধ্যে যত্র-তত্র কিছু অঞ্চল গড়ে ওঠে যেখানে হাইফাগুলি শিথিল ভাবে সজ্জিত থাকে। এই অঞ্চলগুলিকে শ্বাসছিদ্র বা ব্রিদিং পোর (Breathing pore) বলে, কারণ এগুলির মাধ্যমে থ্যালাসদেহে বাতাস চলাচল করে।

(ii) **সাইফেলা (Cyphella) (চিত্র 8.5) ঃ** কোন কোন ফোলিওজ লাইকেনের (স্টিক্টা, *Sticta*) নিম্নস্থ বহিঃস্তরে একপ্রকার শ্বাসছিদ্র দেখা যায়, এগুলিকে সাইফেলা বলে। এই শ্বাসছিদ্রগুলি নিম্নস্থ বহিঃস্তরে পেয়ালাসদৃশ গোলাকৃতি অবতলাকার খাঁজ হিসাবে বিদ্যমান। এই খাঁজের মধ্যে মেডুলা বা মজ্জা অংশ হতে বর্ধিত হাইফাগুলির অগ্রভাগ থেকে শৃঙ্খলিত গোলাকৃতি রেণু সদৃশ কোশের উদ্ভব হয়। এই কোশগুলির জন্য মনে হয় পেয়ালার মধ্যে সাদা পাউডার রয়েছে। সাইফেলার ক্ষেত্রে যেমন গোলাকার কোশ নির্মিত সুনির্দিষ্ট কিনারা দেখা যায় তেমনি কিছু লাইকেন রয়েছে (*Bryoria, ব্রায়োরিয়া; Pseudocyphellaria, সিউডোসাইফেলিরিয়া*) যেখানে কোন সুনির্দিষ্ট কিনারা উৎপন্ন হয় না। এইরূপ কিনারা বিহীন সাইফেলা সদৃশ গঠনকে Pseudocyphella *(সিউডোসাইফেলা)* বলে।

(iii) **সেফালোডিয়াম (Cephalodium) (চিত্র 8.6) ঃ** কোন কোন লাইকেন দেহে (*Solorina crocea, সোলোরিনা ক্রোসিয়া*) আবের ন্যায় ফোলা গঠন দেখা যায়। এই গঠনগুলি ছত্রাকের হাইফা ও নীলাভ সবুজ শৈবালের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু মূল লাইকেন দেহের শৈবাল হল সবুজ শৈবাল। কাজেই এক্ষেত্রে দু'প্রকার শৈবালের সাথে এক প্রকার ছত্রাকের মিথোজীবিত্ব গড়ে উঠেছে। এই ধরেনর লাইকেনকে ডাইফাইকোফাইলাস (Diphycophilous) লাইকেন বলে।

(iv) **ইসিডিয়াম (Isidium) (চিত্র 8.7) ঃ** এটি লাইকেন থ্যালাসের উপরিতলে একপ্রকার বহিঃবৃদ্ধি আকারে গঠিত হয়। প্রতিটি ইসিডিয়ামকে ঘিরে থাকে থ্যালাসের বহিঃস্তর বা কর্টেক্স এবং ভিতরে থাকে শৈবাল। এই শৈবাল অংশ থ্যালাসদেহের শৈবাল অঞ্চলের সাথে যুক্ত অর্থাৎ ইসিডিয়াম এবং থ্যালাস দেহের শৈবাল একই প্রকার ইসিডিয়াম যেমন একদিকে সালোকসংশ্লেষকারী অঞ্চলের আয়তন বর্ধিত করে তেমনি আবার থ্যালাস দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অঙ্গজ জননে অংশগ্রহণ করে। উদাহরণ - *Parmelia conspersa (পারমেলিয়া কনসপারসা)*।

(v) **সোরেডিয়াম (Soredium) (চিত্র 8.8) ঃ** এটিও লাইকেন দেহের উপরিতল হতে একপ্রকার বহিঃবৃদ্ধি, তবে এটি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং কর্টেক্স বা বহিঃস্তর সোরেডিয়ামকে ঘিরে অনুপস্থিত। সোরেডিয়ামে স্বল্পসংখ্যক শৈবাল কোশকে ঘিরে কিছু সংখ্যক হাইফা বিদ্যমান। সোরেডিয়ামের শৈবাল ও মূল থ্যালাসের শৈবাল একই প্রকার। এর কাজ ইসিডিয়ামের অনুরূপ। উদাহরণ - *Ramalina (র‍্যামালিনা), Parmelia (পারমেলিয়া)* ইত্যাদি সোরেডিয়াম থ্যালাসের সমগ্র উপরিতল ব্যাপিয়া সৃষ্টি হতে পারে এবং দেখতে অনেকটা পাউডারের মত লাগে অথবা থ্যালাসের উপরিতলে কোন কোন স্থানে গুচ্ছাকারে সৃষ্টি করে পুস্টুল (Pustule) বা সোরাসের ন্যায় গঠন উৎপন্ন করে। সোরেডিয়াম দ্বারা এইরূপ পুস্টুলের ন্যায় গঠনকে সোরালিয়াম (Soralium) বলে।

অনুশীলনী - **1**

নিচে প্রদত্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ থেকে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

a) লাইকেন হল ________ ও ________ এর মধ্যে গড়ে ওয়া মিথোজীবিত্ব।

b) মাইকোবায়োন্ট বলতে বুঝায় ________ যা প্রধানত ________ অথবা ________ শ্রেণিভুক্ত। লাইকেনে ফটোবায়োন্ট হল ________ যা প্রধানত ________ অথবা ________।

c) শৈবাল ছত্রাককে ________ সরবরাহ করে, ছত্রাক শৈবালকে ________ ও ________ সরবরাহ করে।

d) পাথরের গায়ে যে সমস্ত লাইকেন জন্মায় তাদেরকে ________ লাইকেন, কিন্তু মাটির উপর যে সমস্ত লাইকেন জন্মায় তাদেরকে ________ লাইকেন বলে।

e) *Caloplaca marina (ক্যালোপ্লাকা মেরিনা)* হল ________ লাইকেন।

f) লাইকেনকে অঙ্গজ গঠনের ভিত্তিতে পাঁচভাগে ভাগ করা যায় এগুলি হল ________, ________, ________, ________ ও ________।

g) লাইকেনের অঙ্গজ দেহে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ গঠন দেখতে পাওয়া যায় এগুলি হল ________, ________, ________, ________ ও ________।

(জৈবখাদ্য, মাইকোবায়োন্ট, জল, খনিজ লবণ, ফটোবায়োন্ট, ছত্রাক, বেসিডিওমাইসিটিস, শৈবাল, অ্যাসকোমাইসিটিস, নীলাভ-সবুজ শৈবাল, স্যাক্সিকোলাস, সবুজ-শৈবাল, টেরিকোলাস, লেপরোজ, মেরিন, শ্বাসছিদ্র, ক্রাসটোজ, সাইফেলা, ফোলিওজ, সেফালোডিয়াম, ফ্রুটিকোজ, ইসিডিয়াম, সোরেডিয়াম, ফিলামেন্টাস।)

8.6 জনন :

লাইকেনে অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন - এই তিনপ্রকার জনন দেখা যায়।

8.6.1 অঙ্গজ জনন : এটি সাধারণত খণ্ডীভবন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এছাড়া ইসিডিয়াম ও সোরেডিয়ামের মাধ্যমেও অঙ্গজ জনন সম্পন্ন হতে পারে।

খণ্ডীভবন : অনেক ফোলিওজ লাইকেন এবং বিশেষতঃ ফ্রুটিকোজ লাইকেনের ক্ষেত্রে থ্যালাস দেহ খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড হতে নতুন থ্যালাস দেহ গঠিত হয়। উদাহরণ - *Bryoria capillaris (ব্রায়োরিয়া ক্যাপিল্যারিস)*।

ইসিডিয়াম (চিত্র 8.7) : ইসিডিয়াম উৎপাদনকারী লাইকেন যেমন পারমেলিয়া, ব্রায়োরিয়া ইত্যাদি ইসিডিয়ামের মাধ্যমে তাদের অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে উৎপন্ন ইসিডিয়াম থ্যালাস দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুকূল পরিবেশে নতুন থ্যালাস গঠন করে।

সোরেডিয়াম (চিত্র 8.8) : সোরেডিয়াম উৎপাদনকারী লাইকেন (যেমন পারমেলিয়া ইত্যাদি) সোরেডিয়ামের মাধ্যমে অঙ্গজ জনন ঘটাতে পারে। ইসিডিয়ামের ন্যায় সোরেডিয়াম থ্যালাস দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুকূল পরিবেশে নতুন থ্যালাস গঠন করে। অঙ্গজ জননের আলোচিত সাধারণ পদ্ধতিগুলি ছাড়াও কিছু কিছু লাইকেন কদাচিৎ অন্যান্য গঠন যেমন ফাইলিডিয়াম (Phyllidium), ব্লাস্টিডিয়াম (Blastidium), সাইজিডিয়াম (Schizidium), গোনিওসিস্ট (Goniocyst) ও হরমোসিস্ট (Hormocyst)-এর মাধ্যমে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করতে পারে।

8.6.2 অযৌন জনন ঃ অযৌন জনন প্রধানত কনিডিওরেণুর (কদাচিৎ ওয়িডিওরেণু) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই কনিডিওরেণু বা ওয়িডিওরেণু উৎপাদন লাইকেনের ছত্রাকীয় উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছত্রাকীয় উপাদান কর্তৃক উৎপাদিত অযৌন রেণু অঙ্কুরিত হয়ে যে হাইফা উৎপন্ন করে তা যথাযথ শৈবালের সংস্পর্শে এলে নতুন লাইকেন দেহ গঠিত হয়।

কনিডিয়াম সাধারণত পিকনিডিয়ামের মধ্যে উৎপন্ন হওয়ায় এই কনিডিওরেণুকে পিকনিডিওরেণুও বলা হয়। পিকনিডিয়াম হল হাইফা নির্মিত একপ্রকার ফ্লাস্ক আকৃতির গঠন। এটি অস্টিওল নামক ছিদ্র দ্বারা উন্মুক্ত। এই পিকনিডিয়ামের ভিতরের প্রাচীর হতে উৎপন্ন কনিডিওফোর হতে কনিডিওরেণু (পিকনিডিওরেণু) সৃষ্টি হয় (চিত্র 8.9)। কনিডিওরেণু ডিম্বাকৃতি (চিত্র 8.9), সূত্রাকৃতি (চিত্র 8.10 a)। কাস্তে আকৃতি (চিত্র 8.10 b) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। সাধারণত অ্যাসকোলাইকেন ও প্রধান ডয়েটেরোলাইকেন কনিডিওরেণু উৎপাদিনের মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন করে। উদাহরণ - *Roccella (রোসেলা), Cladonia (ক্ল্যাডোনিয়া), Physcia* (ফিসসিয়া) ইত্যাদি।

কোন কোন লাইকেনের ক্ষেত্রে ছত্রাকীয় উপাদানের হাইফা হতে ওয়িডিওরেণু উৎপন হয়। এক্ষেত্রে হাইফা অধিকতর বিভেদ প্রাচীর বিশিষ্ট হয় ও বিভেদ প্রাচীর বরাবর কোশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও রেণু (ওয়িডিওরেণু) হিসাবে কাজ করে।

8.6.3 যৌন জনন ঃ লাইকেনের শৈবাল উপাদান লাইকেন দেহে যৌন জনন প্রদর্শন করে না। কিন্তু ছত্রাক উপাদান অ্যাসকোলাইকেনের ক্ষেত্রে অ্যাসকোরেণু ও বেসিডিওলাইকেনের ক্ষেত্রে বেসিডিওরেণু উৎপাদনের মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন করে।

8.6.3.1 অ্যাসকোলাইকেনে যৌন জনন ঃ এক্ষেত্রে স্ত্রী জননাঙ্গ বা অ্যাসকোগোনিয়াম (Ascogonium) এবং পুং জননাঙ্গ বা স্পারমাগোনিয়াম (Spermagonium) উৎপন্ন হয়। অ্যাসকোগোনিয়াম কুণ্ডলাকৃতি ও বহুকোশী এবং এর অগ্রভাগে একটি খাড়া ও বহুকোশী ট্রাইকোগাইন (Trichogyne) বর্তমান। ট্রাইকোগাইনের অগ্রপ্রান্তের কোশটি থ্যালাসের উপরস্থ বহিঃস্তর বা কর্টেক্স ভেদ করে বাহিরে উদ্‌গত থাকে। কিন্তু কুণ্ডলীকৃত অ্যাসকোগোনিয়াম সাধারণত থ্যালাসের মেডুলা অথবা মেডুলা সন্নিকটস্থ শৈবাল অংশে আবদ্ধ থাকে (চিত্র 8.11)।

স্পারমাগোনিয়াম দেখতে পিকনিডিয়ামের অনুরূপ (চিত্র 8.12)। এর থেকে পিকনিওরেণুর ন্যায় উৎপাদিত এককোশী অচর রেণু যা যৌন জননে অংশগ্রহণ করে তাকে স্পারমাসিয়াম (Spermatium) বলে। স্পারমাগোনিয়াম যখন ট্রাইকোগাইনের বাহিরে উদ্‌গত আঠালো অংশের সংস্পর্শে আসে তখন উভয়ের সাধারণ প্রাচীর বিলুপ্ত হয় এবং স্পারমাসিয়ামের সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস ট্রাইকোগাইনের অগ্রস্থ কোশে প্রবেশ করে। এরপর সম্ভবতঃ ট্রাইকোগাইনের অনুপ্রস্থ প্রাচীরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরল ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে নিউক্লিয়াস অবশেষে অ্যাসকোগোনিয়ামে প্রবেশ করে ও দ্বি-নিউক্লিয় বা ডাইক্যারিওটিক দশার সৃষ্টি করে। ট্রাইকোগাইন ইতিমধ্যে শুকিয়ে বিনষ্ট হতে শুরু করে এবং কুণ্ডলাকৃতি অ্যাসকোগোনিয়াম হতে একাধিক অ্যাসকোজিনাস হাইফা সৃষ্টি হয়। অ্যাসকোজিনাস হাইফার অগ্রভাগের কোশ হতে অথবা ক্রোজিয়ার উৎপন্ন হলে অগ্রভাগ হতে দ্বিতীয় ডাইক্যারিওটিক কোশ হতে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়। এই অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু ফলদেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অ্যাসকোলাইকেনে ফলদেহ বা অ্যাসকোকার্প (Ascocarp) দু'ধরনের হতে পারে। এগুলি হল অ্যাপোথেসিয়াম (Apothecium) ও পেরিথেসিয়াম (Perithecium)।

অ্যাপোথেসিয়াম দেখতে পেয়ালাকৃতি (চিত্র 8.13) এবং হাইমেনিয়াম বিস্তৃতভাবে উন্মুক্ত। হাইমেনিয়াম

অ্যাসকাস ও প্যারাফাইসিস (বন্ধ্যা হাইফা নির্মিত) দ্বারা গঠিত। *Physcia (ফিসসিয়া), Graphis (গ্রাফিস)* ইত্যাদি লাইকেনে অ্যাপোথেসিয়াম সৃষ্টি হয়। পেরিথেসিয়াম দেখতে ফ্লাস্ক আকৃতির এবং এটি একটি অস্টিওল নামক ছিদ্রের মাধ্যমে উন্মুক্ত। পেরিথেসিয়ামের ভিতরের দেওয়াল বরাবর অ্যাসকাস ও প্যারাফাইসিস সজ্জিত থাকে। পেরিথেসিয়ামের মধ্যে প্যারাফাইসিস ছাড়াও উপরের দিকের দেওয়ালে অস্টিওলের নিকট বন্ধ্যা হাইফা নির্মিত পেরিফাইসিস থাকে। *Pyrenula (পাইরেনুলা)* ইত্যাদি লাইকেনে পেরিথেসিয়াম উৎপন্ন হয়।

অ্যাককোকার্পের মধ্যে উপস্থিত অ্যাসকাসে আটটি করে অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়। অ্যাসকোরেণু এককোশী অথবা বহুকোশী হতে পারে। অ্যাসকোরেণুর আকার, আকৃতি ও বর্ণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। অ্যাসকোরেণু অ্যাসকাস হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয় ও উৎপন্ন হাইফা প্রয়োজনীয় শৈবালের সংস্পর্শে এলে একযোগে লাইকেন থ্যালাস গঠন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আসকোরেণু হতে উৎপন্ন হাইফা যদি উপযুক্ত শৈবালের সংস্পর্শে আসতে না পারে তাহলে অচিরেই তা সাধারণত বিনষ্ট হয়।

8.6.3.2 বেসিডিওলাইকেনে যৌন জনন ঃ যে বেসিডিওলাইকেনগুলি এ পর্যন্ত সনাক্ত করা হয়েছে তাদের যৌন জনন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে মনে করা হয় যে এসব ক্ষেত্রে বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণু উৎপাদন পদ্ধতি লাইকেন উৎপাদনে অংশগ্রহণ না করা বেসিডিওমাইসিটিসের অনুরূপ। বেসিডিওলাইকেন উৎপাদনকারী ছত্রাকীয় উপাদান প্রধানত থিলিফোরেসি শ্রেণির সদস্য। *Cora pavonia (কোরা প্যাভোনিয়া)* একটি বেসিডিওলাইকেন। এর থ্যালাস দেহ নীলাভ-সবুজ শৈবাল ও থিলিফোরেসি শ্রেণির ছত্রাক দ্বারা গঠিত এবং থ্যালাস দেহের তলদেশে উপস্থিত হাইমেনিয়ামে বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণু উৎপন হয় (চিত্র 8.14, a, b)

8.7 অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ

অনেক ক্ষেত্রে লাইকেনের সৌন্দর্য্য যেমন আমাদের আকর্ষণ করে তেমনি লাইকেনকে আমরা নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করি। লাইকেনের রয়েছে নানা উপকারী ও অপকারী ভূমিকা। এই সমস্ত উপকারী ও অপকারী ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হল।

8.7.1 উপকারী ভূমিকা ঃ

(i) মাটি উৎপাদনে লাইকেন ঃ ক্রাসটোজ লাইকেন পাথরের গায়ে জন্মালে এদের থ্যালাস কর্তৃক নিঃসৃত জৈব অম্লের প্রবাবে পাথর ক্ষয়ে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির কনিকায় পরিণত হয়। এই নতুন মাটির সাথে লাইকেনের মৃত থ্যালাসের জৈব উপাদান একযোগে সৃষ্টি করে উর্বর মাটি যার উপর অন্যান্য উদ্ভিদ যেমন প্রথমে মস জন্মায় ও পরে উন্নততর উদ্ভিদ এমনকি গুপ্তবীজী উদ্ভিদও জন্মাতে পারে। এইভাবে লাইকেনের প্রভাবে উদ্ভিদহীন পাথরের গাত্র ভরে ওঠে নতুন নতুন উদ্ভিদে।

(ii) খাদ্য হিসাবে লাইকেন ঃ বিভিন্ন লাইকেন পশুখাদ্য হিসাবে পরিচিত, যেমন *Cladonia rangiferina (ক্ল্যাডোনিয়া র‍্যাঙ্গিফেরিনা)* তুন্দ্রা অঞ্চলে বলগাহরিণ ও গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া *Alectoria (অ্যালেকটোরিয়া), Cetraria (সেট্রারিয়া)* ইত্যাদি লাইকেনের প্রজাতিও বিভিন্ন পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Cetraria islandica (*সেট্রারিয়া আইল্যান্ডিকা*) যেমন পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তেমনি মানুষের খাদ্য হিসাবেও এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া আরও লাইকেন রয়েছে যা পশু ও মানুষের খাদ্য হিসাবে বিবেচিত।

(iii) **ঔষধ হিসাবে লাইকেন ঃ** লাইকেনের অনেক প্রজাতির যথেষ্ট ভেষজ গুণ লক্ষ্য করা যায়। উসনিক অ্যাসড (Usnic acid) *Usnea* (*উসনিয়া*), *Cladonia* (*ক্ল্যাডোনিয়া*) ইত্যাদি লাইকেন হতে পাওয়া যায় এবং এটি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে কার্যকরী। পারমেলিয়া স্যাক্সটিলিস এপিলেপ্সি নামক রোগ নিরাময়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ক্ল্যাডোনিয়া, সেট্রারিয়া ইত্যাদি লাইকেনের প্রজাতি জ্বর কমাতে কার্যকরী। *Roccella montagnei* (*রোসেলা মোট্যাগনি*) হতে প্রাপ্ত এরিথ্রিন (Erythrin) অ্যানজাইনা (Angina) নামক হৃদরোগে বিশেষ কার্যকরী। বিভিন্ন লাইকেন হতে প্রাপ্ত প্রোটোলাইচেসটেরিনিক অ্যাসড (Protolichesterinic acid) ক্যানসার প্রতিরোধী ঔষধ প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়।

(iv) **সুগন্ধী দ্রব্য উৎপাদনে লাইকেন ঃ** *Pseudevernia furfuracea* (*সিউডেভারনিয়া ফারফিউরেসিয়া*) এবং *Evernia prunastri* (*এভারনিয়া প্রুন্যাসট্রি*) নামক লইকেন সুগন্ধী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। ধুপ, সাবান, সেন্ট ইত্যাদি উৎপাদনে লইকেনের ব্যবহার সুবিদিত। লাইকেন যেমন সুগন্ধী দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে তেমনি সুগন্ধী দ্রব্য শোষণেও যথেষ্ট পারদর্শী। এই কারণে সুগন্ধী দ্রব্য উৎপাদনের কারখানায় অনেকক্ষেত্রে সুগন্ধী দ্রব্য শোষক লইকেন ব্যবহার ক'রে উক্ত সুগন্ধী দ্রব্য পুনরুৎপাদন বা রিসাইক্‌ল (recycle) করা হয়।

(v) **রং উৎপাদনে লাইকেন ঃ** বিভিন্ন প্রকার লাইকেনে থাকে বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ। তাই বিভিন্ন প্রকার রঙ উৎপাদনে লাইকেনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। *Ochrolechia* (*অক্রোলেচিয়া*) নামক লইকেনের প্রজাতি লাল ও বেগুনি রঙ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। লিটমাস পেপার (Litmus paper), যা পরীক্ষাগারে অম্ল-ক্ষার নির্ণায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা প্রস্তুত করতে *Roccella montagnei* (*রোসেলা মোনট্যাগনি*) এবং *Lasallia* (*ল্যাসালিয়া পুস্টুলাটা*) নামক লাইকেন ব্যবহার করা হয়। রং উৎপাদনে রোসেলার ব্যবহার থিওফ্রাসটাসের (Theophrastus) সময় থেকে চলে আসছে। এই লাইকেন থেকে (*Roccella tinctoria, রোসেলা টিংকটোরিয়া*) উৎপন্ন হয় অরচিল (Orchil) যা পরিশোধক করে অরসিন (Orcein) নামক রঞ্জক পদার্থ উৎপাদন করা হয়।

(vi) **চামড়া ট্যান করতে, বিয়ার ও মদ প্রস্তুতিতে লাইকেন ঃ** *Cetraria* (*সেট্রারিয়া*) ও *Lobaria* (*লোবারিয়া*) প্রজদাতির লইকেন চামড়া ট্যান করতে ব্যবহৃত হয়। বোলারিয়া প্রজাতি বিয়ার উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়। ক্ল্যাডোনিয়া, উসনিয়া ও *Ramalina* (*র‍্যামালিনা*) প্রজাতির লাইকেন মদ উৎপাদনে বাবহৃত হয়।

৪.7.2 অপকারী ভূমিকা :

(i) *Amphiloma* (*ক্ল্যাডোনিয়া এবং অ্যাম্ফিলোমা*) পরজীবী হিসাবে মসের দেহে প্রবেশ করে ও মসকে বিনষ্ট করে।

(ii) অনেক সময় লাইকেন পুরানো বাড়ির জানালার কাঁচের উপর জন্মায় ও কাঁচের চকচকে ভাব নষ্ট করে।

(iii) *Letharia vulpina* (*লেথারিয়া ভাল্‌পিনাতে*) ভাল্‌পিনিক অ্যাসিড (Vulpinic acid) থাকায় ঐ লাইকেন খুবই বিষাক্ত।

অনুশীলনী - 2

নিচে প্রদত্ত তালিকা থেকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

a) লাইকেনে অঙ্গজ জনন ________ অথবা ________ অথবা ________ এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

b) অযৌন জনন প্রধানত ________ মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই রেণু উৎপাদন লাইকেনের ________ উপাদানে সীমাবদ্ধ।

c) লাইকেনের যৌন জননে ________ অথবা ________ উৎপন্ন হয়। এই রেণুগুলির উৎপাদন লাইকেনের ________ উপাদানে ঘটে।

d) অ্যাসকোলাইকেনে ________ ও ________ ফলদেহ দেখা যায়। বেসিডিওলাইকেন উৎপাদন করে ছত্রাকীয় উপাদান প্রধানত ________ শ্রেণির সদস্য।

e) উসনিয়া হতে প্রাপ্ত ________ ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে কার্যকরী।

f) লিটমাস পেপার প্রস্তুত করতে ________ নামক লাইকেন ব্যবহার করা হয়।

g) ________ একটি বিষাক্ত লাইকেন।

(লেথারিয়া ভালপিনা, সোরেডিয়াম, কনিডিওরেণু, ইসিডিয়াম, ছত্রাকীয়, খণ্ডীভবন, ছত্রাক, অ্যাপোথেসি, বেসিডিওরেণু, পেরিথেসিয়াম, অ্যাসকোরেণু, থিলিফোরেসি, রোসেলা মনট্যাগনি, উসনিক অ্যাসিড)

8.8 সারাংশ ঃ

এই এককটি পড়ে আপনারা জানতে পেরেছেন—

- লাইকেন হল ছত্রাক ও শৈবালের মধ্যে গড়ে ওঠা এক মিথোজীবিত্ব।
- লাইকেন বিভিন্ন পরিবেশে জন্মাতে পারে, এমনকি শুষ্ক পাথরের গায়ে যেখানে কোন উদ্ভিদ জন্মায় সেখানেও লাইকেন জন্মাতে পারে।
- লাইকেন দেহ হল থ্যালাস, এর শৈবাল উপাদান সাধারণত নীলাভ-সবুজ শৈবাল অথবা কোন কোন সবুজ-শৈবাল। ছত্রাক উপাদান সাধারণত অ্যাসকোমাইসিটিস অথবা বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত
- লাইকেনকে মূলত তার ছত্রাক উপাদানের ভিত্তিতে দুটি কৃত্রিম শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় এবং এগুলি অ্যাসকোলাইকেন ও বেসিডিওলাইকেন তবে কেউ কেউ লাইকেনকে তিনটি শ্রেণিতে (অ্যাসকোলাই বেসিডিওলইকেন ও ডয়েটেরোলাইকেন) বিভক্ত করেছেন।
- লাইকেন থ্যালাসের অঙ্গজ গঠনে নানান বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এবং সেই অনুযায়ী লাইকেন থ্যালাসে সাধারণভাবে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল লেপরোজ, ক্রাসটোজ, ফোলিওজ, ফ্রুটিকো ফিলামেন্টাস।

- অনেক লাইকেন থ্যালাসে আবার কিছু বিশেষ গঠন দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হল শ্বাস ছিদ্র, সাইফেলা, সেফালোডিয়াম, ইসিডিয়াম ও সোরেডিয়াম।
- লাইকেন অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এই তিনপ্রকার জনন পদ্ধতি দেখা যায়।
- অঙ্গজ জননে লাইকেনের শৈবাল ও ছত্রাক উভয় উপাদান সরাসরি অংশগ্রহণ করে।
- অযৌন জননে রেণু উৎপাদন ছত্রাক উপাদানে সীমাবদ্ধ এবং ছত্রাক কর্তৃক উৎপাদিত রেণুগুলি হল কনিডিওরেণু অথবা ওয়িডিওরেণু। উক্ত অযৌনরেণু অঙ্কুরিত হয়ে উপযুক্ত শৈবালের সংস্পর্শে এলে লাইকেন থ্যালাস গঠিত হয়।
- যৌন জননে রেণু উৎপাদন ছত্রাক উপাদানে সীমাবদ্ধ। উৎপাদিত যৌন রেণু অ্যাসকোরেণু অথবা বেসিডিওরেণু। উক্ত রেণু অঙ্কুরিত হয়ে উপযুক্ত শৈবালের সংস্পর্শে এলে লাইকেন থ্যালাস গঠিত হয়।
- লাইকেনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা উপকারী ও অপকারী উভয় ভূমিকাই প্রদর্শন করতে পারে।

8.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

a) লাইকেন কি? শ্রেণি পর্যায় পর্যন্ত লাইকেনের শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ করুন।

b) লাইকেন কিরূপ পরিবেশে জন্মায় তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিন।

c) অঙ্গজ গঠনের ভিত্তিতে লাইকেনকে কয়ভাগে ভাগ করা হয় ও কি কি? প্রত্যেক বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

d) লাইকেনের দেহে কি কি বিশেষ গঠন দেখা যায়? এদের সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

e) লাইকেনের অঙ্গজ জনন বর্ণনা করুন।

f) লাইকেনের অযৌন জনন বর্ণনা করুন।

g) অ্যাসকোলাইকেনের যৌন জনন বর্ণনা করুন।

h) লাইকেনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

8.10 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

a) মাইকোবায়োন্ট, ফটোবায়োন্ট

b) ছত্রাক, অ্যাসকোমাইসিটিস, বেসিডিওমাইসিটিস, শৈবাল, নীলাভ-সবুজ শৈবাল, সবুজ শৈবাল।

c) জৈব খাদ্য, জল, খনিজ লবণ।

d) স্যাক্সিকোলাস, টেরিকোলাস

e) মেরিন

f) লেপরোজ, ক্রাসটোজ, ফোলিওজ, ক্রুটিকোজ, ফিলামেন্টাস।

g) শ্বাসছিদ্র, সাইফেলা, সেফালোডিয়াম, ইসিডিয়াম, সোরেডিয়াম।

অনুশীলনী - 2

a) খণ্ডীভবন, ইসিডিয়াম, সোরেডিয়াম

b) কনিডিওরেণু, ছত্রাকীয়

c) অ্যাসকোরেণু, বেসিডিওরেণু, ছত্রাক

d) অ্যাপোথেসিয়াম, পেরিথেসিয়াম, থিলিফোরেসি

e) উসনিক অ্যাসিড

f) *রোসেলা মনট্যাগনি*

g) *লেথারিয়া ভালপিনা*

উত্তরমালা

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

a) লাইকেন হল মাইকোবায়োন্ট ও ফটোবায়োন্টের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা এক সহাবস্থান বা মিথোজীবিত্ব। লাইকেন দেহ থ্যালাস, এর মাইকোবায়োন্ট উপাদান সাধারণত অ্যাসকোমাইসিটিস অথবা বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত এবং ফটোবায়োন্ট উপাদান সাধারণত নীলাভ-সবুজ শৈবাল (সিয়ানোফাইসী শ্রেণি) অথবা সবুজ শৈবাল (ক্লোরোফাইসী শ্রেণি)।
পরবর্তী প্রশ্নের জন্য অনুচ্ছেদ 8.4 দেখুন।

b) অনুচ্ছেদ 8.3 দেখুন।

c) অনুচ্ছেদ 8.5.1 দেখুন।

d) অনুচ্ছেদ 8.5.2 দেখুন।

e) অনুচ্ছেদ 8.6.1 দেখুন।

f) অনুচ্ছেদ 8.6.2 দেখুন।

g) অনুচ্ছেদ 8.3.3.1 দেখুন।

h) অনুচ্ছেদ 8.7 দেখুন।

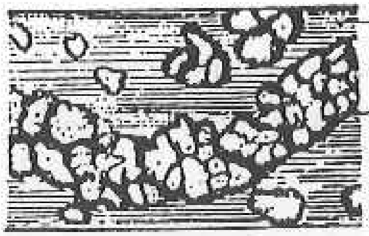

চিত্র নং 8.1 ঃ লেপরোজ (Leprose) লাইকেন থ্যালাস (*Lepraria incana*, লেপরারিয়া ইনকানা)

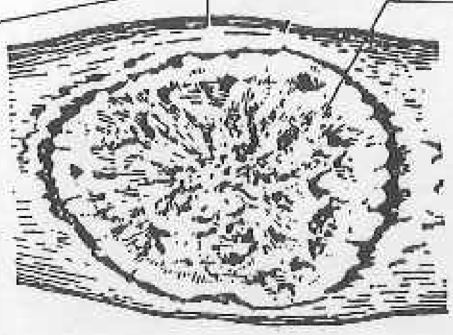

চিত্র নং 8.2 a ঃ ক্রাসটোজ (Crustose) লাইকেন থ্যালাস

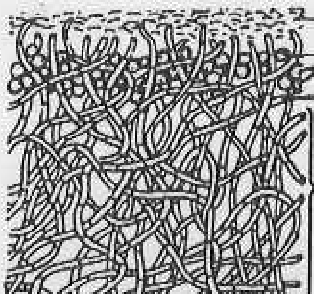

চিত্র নং 8.2 b ঃ ক্রাসটোজ লাইকেনের আভ্যন্তরীন গঠন।

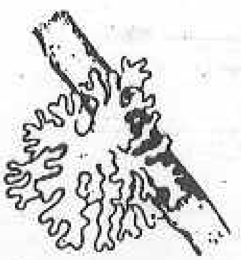

চিত্র নং 8.3 a **:** ফোলিওজ লাইকেন থ্যালাস
(*Parmelia*, পারমেলিয়া)

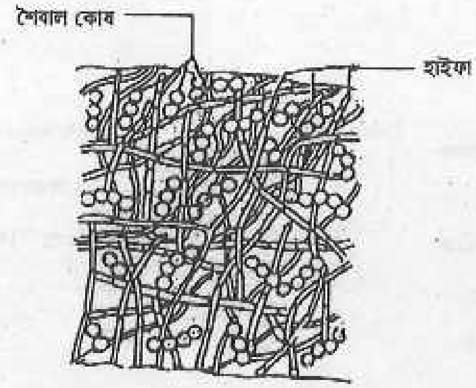

চিত্র নং 8.3 b **:** ফোলিওজ লাইকেন
(*Homoiomerous*, হোমোআয়োমেরাস)

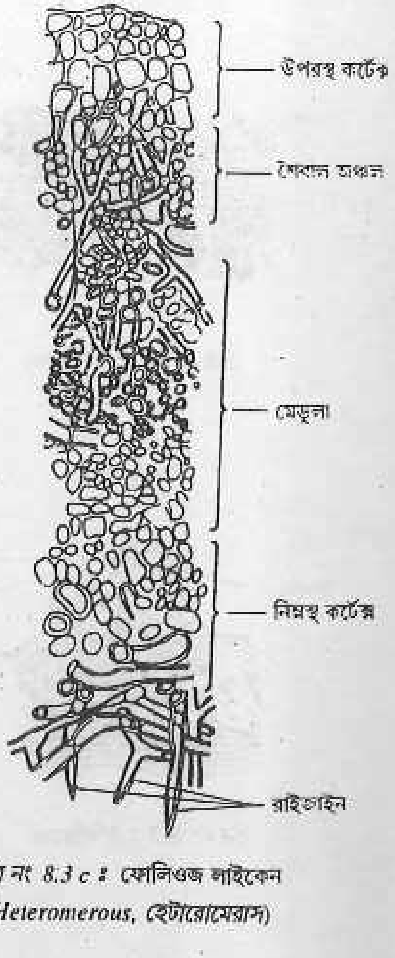

চিত্র নং 8.3 c **:** ফোলিওজ লাইকেন
(*Heteromerous*, হেটারোমেরাস)

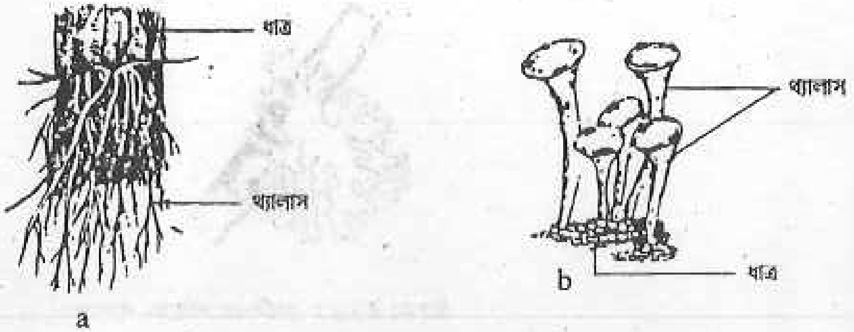

চিত্র নং ৪.৪ ঃ ফ্রুটিকোজ লাইকেন থ্যালাস
(a) *Usnea (উসনিয়া)* (b) *Cladonia (ক্ল্যাডোনিয়া)*

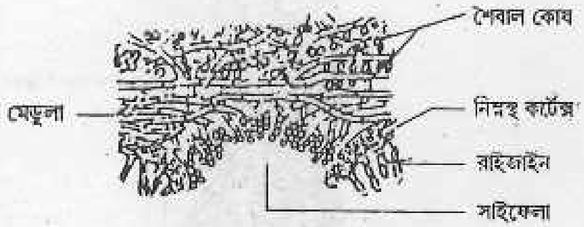

চিত্র নং ৪.৫ ঃ সাইফেলা

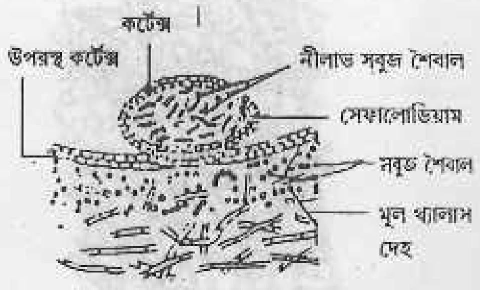

চিত্র নং ৪.৬ ঃ সেফালোডিয়াম

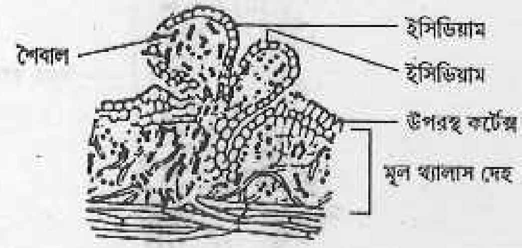

চিত্র নং ৪.৭ ঃ ইসিডিয়াম

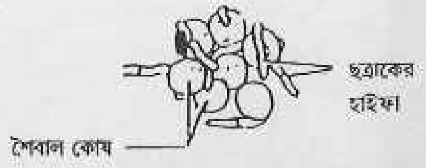

চিত্র নং ৪.৮ ঃ সোরেডিয়াম

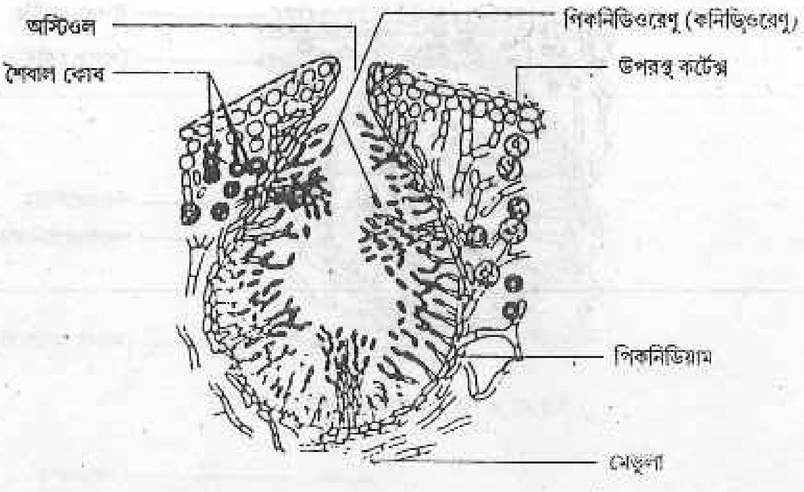

চিত্র নং 8.9 : পিকনিডিয়াম (লম্বচ্ছেদ)

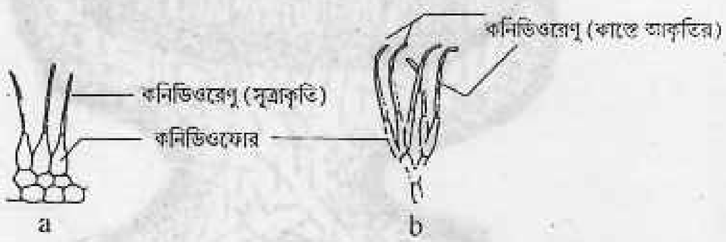

চিত্র নং 8.10 : বিভিন্ন প্রকার কনিডিওরেণু
(a) সূত্রাকৃতি কনিডিওরেণু (b) কাস্তে আকৃতির কনিডিওরেণু

চিত্র নং 8.11 : কুণ্ডলীকৃত অ্যাসকোগোনিয়াম ও বাহিরে উদগত ট্রাইকোগাইন

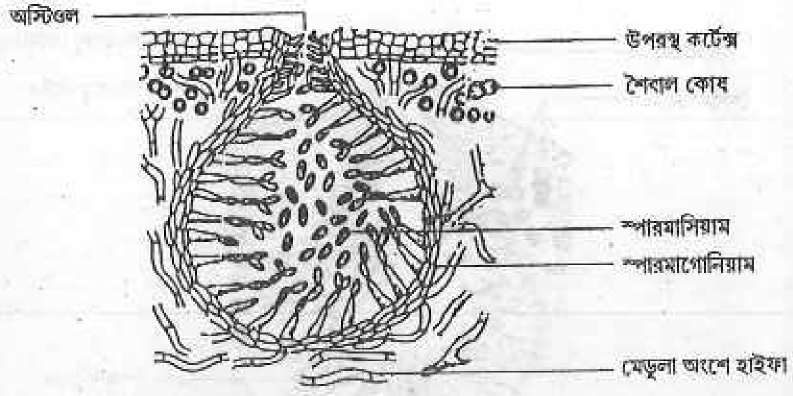

চিত্র নং 4.12 : স্পারমাগোনিয়াম

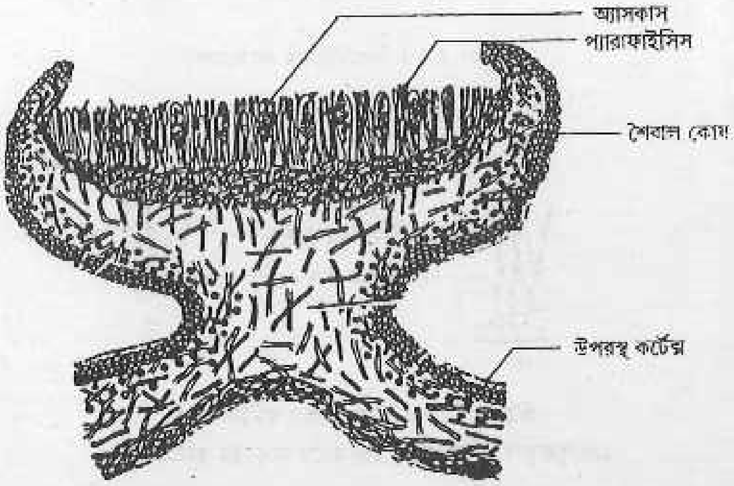

চিত্র নং 4.13 : অ্যাপোথেসিয়াম (লম্ব ছেদ)

চিত্র নং 4.14 : Cora pavonia (কোরা প্যাভোনিয়া) (a) থ্যালাস (b) বেসিডিয়াম + বেসিডিওরেণু

একক 9 ❑ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক পারিভাষিক শব্দ ও তাদের সংজ্ঞা

গঠন

9.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

9.2 উদ্ভিদের ব্যাধি

9.2.1 উদ্ভিদ-ব্যাধির শ্রেণিবিভাগ

9.3 প্যাথোজেন ও প্যাথোজেনিসিটি

9.3.1 প্যাথোজেনেসিস

9.4 পোষক

9.5 রোগসৃষ্টিকারী জীব ও রোগসৃষ্টিকারী উপাদানসমষ্টি

9.6 বীজায়ন ও রোগবীজ

9.6.1 প্রাথমিক ও গৌণ রোগবীজ

9.6.2 প্রাথমিক ও গৌণ সংক্রমণ

9.7 অনুপ্রবেশ

9.8 সংক্রমণ

9.8.1 দৃশ্য ও দৃশ্যাতীত সংক্রমণ

9.8.1 স্থানিক ও স্থানাতীত সংক্রমণ

9.9 রোগলক্ষণ

9.10 প্রতিরোধ

9.11 পরজীবি ও পরজীবিতা

9.12 মৃতজীবি ও মৃতজীবিতা

9.13 মিথোজীবিতা

9.14 প্যাথোজেনের প্রতিকূলতা অতিক্রমকারী দশা

9.15 রোগচক্র

9.15.1 একচক্রী ও বহুচক্রী প্যাথোজেন

9.16 রবার্ট ককের মৌলিক নীতি

9.17 সারাংশ

9.18 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

9.19 উত্তরমালা

9.1 প্রস্তাবনা

যে কোন প্রাণীর মতই একটি উদ্ভিদকে তখনই সুস্থ বলা যায় যখন তার শারীরবৃত্তীয় ও অঙ্গসংস্থানিক সাম্যাবস্থার কোন ব্যাঘাত ঘটছে না এবং সেই কারণেই উদ্ভিদটির বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। একটু ঘুরিয়ে বললে এটাও বলা যায় যে, একটি উদ্ভিদের সমস্ত অংশ যখন স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে অক্ষম, অর্থাৎ যখন তার বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের স্বাভাবিক পদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তখনই উদ্ভিদটিকে আমরা রোগগ্রস্ত বা অসুস্থ বলতে পারি। এই অসুস্থতার কারণ নানাবিধ হতে পারে। যে কোন জীবিত পদার্থ যা উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটায় তা সে ক্ষুদ্রতম ভাইরাস থেকে শুরু করে উন্নততম মানুষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, তাকে আমরা উদ্ভিদের রোগের কারণ রূপে চিহ্নিত করতে পারি। আবার যখন মাটিতে অজৈব লবণের বাহুল্য বা অভাবজনিত কারণে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা জনন ব্যাহত হয় তখন সেই পরিস্থিতিটিকেও আমরা অসুস্থতার জন্য দায়ী করতে পারি। আমরা এই পর্যায়ে উদ্ভিদ রোগবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে রোগের কারণ, অবস্থা, বাহ্যিক প্রকাশ বা প্রতিরোধের যে সম্যক পরিচয় পেতে চলেছি তা আপনাদের প্রকৃতিতে বা শস্যক্ষেত্রে সহজেই একটি রোগগ্রস্ত উদ্ভিদকে চিনতে এবং তার রোগের উৎসটি চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ পর্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে আপনি রোগ নির্মূল করার নিদান দিতে পারবেন বলেও আশা করতে পারেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার আগামী পঞ্চাশ বছরও বজায় থাকবে তাহলে লোকসংখ্যা দেড় শত কোটির অধিক দাঁড়াবে 2050 সালের আগেই। সেক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ শস্যক্ষেত্রে অধিক শস্য ফলানো যেমন লক্ষ্য হওয়া উচিত তেমনই উৎপাদিত শস্যের হানি রোধ করাও আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। শুধু খাদ্যশস্য নয়, পশুখাদ্য, তন্তুজাতীয় বস্তুর উৎপাদন, কাগজ, ওষধি ইত্যাদি, তৈলবীজ, চা বা কফির মত পানীয় ইত্যাদি সব কিছুর বাড়তি চাহিদা মেটাতে ফসলকে সংক্রমণের হাত থেকে অথবা অপুষ্টিজনিত ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করাই এই বিষয়টির লক্ষ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ (terms) এবং তাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ব্যাধি বিশেষতঃ উদ্ভিদের ব্যাধি কাকে বলে অর্থাৎ কোন উদ্ভিদকে আমরা বলব ব্যাধিগ্রস্ত তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- রোগের কারণগুলি নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।
- সংক্রমণকারী জীব, সংক্রামিত উদ্ভিদ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর জটিলতাগুলির বাহ্যিক প্রকাশ কিভাবে হয়ে থাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংক্রমণকারী জীবের সংক্রামক অংশ বা পরিমান বলতে কি বোঝায় তা বিশদ করতে পারবেন।
- পরজীবিতা ও মিথোজীবিতা কাকে বলে এবং এদের রূপভেদগুলি কি কি তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- আক্রমণ করার পদ্ধতি ও রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদের অনাক্রমণতা বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- রবার্ট ককের প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

9.2 উদ্ভিদের রোগ বা ব্যাধি বলব কাকে ?

একটি উদ্ভিদ তখনই সুস্থ যখন সেটি স্বাভাবিকভাবে তার সব শারীরবৃত্তীয় এবং বিপাকীয় কার্যগুলি সমাধা করতে পারছে। উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কাজ বলতে আমরা সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন, পুষ্টি, জনন ইত্যাদির কথাই বলছি। এখন এটা তো যে কেউই বুঝতে পারেন বা জানেন যে এদের কোনটিরই একটা নির্দিষ্ট হার বা মাত্রা সমস্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ সব উদ্ভিদ সমহারে শ্বসন চালায় না, সমহারে বাড়ে না এইরকম আর কি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, কোন একটি উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কাজগুলির হার ও পরিমাপ সেই উদ্ভিদটির জন্য অনন্য এবং সেই হার জীনগতভাবে পূর্ব নির্ধারিত। যদি কোন সংক্রামক বস্তুর উপস্থিতির দরুণ অথবা কোন পরিবেশগত কারণে এই জীবন নির্ধারিত শারীরবৃত্তীয় সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয় তখনই আমরা উদ্ভিদটিকে রোগগ্রস্ত বলতে পারি। শারীরবৃত্তীয় অবস্থার এই পরিবর্তন সূচিত হয় প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশের দুর্বল দশা বা বিনাসের দ্বারা। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক মাটিতে বসবাসকারী জীবাণুর প্রভাবে অথবা মাটিতে কোন মৌলের অভাবজনিত কারণে উদ্ভিদের প্রথম আক্রান্ত অংশটি যদি হয় মূল তবে প্রথম যে শারীরবৃত্তীয় কাজটি ব্যাহত হবে তা হল জল ও লবণ শোষণ। এরপর ক্রমান্বয়ে যে ঘটনাগুলি ঘটবে (চিত্র নং 9.1) তা হল ঃ

a) জল পরিবহন বা রসের উৎস্রোত (ascent of sap) ব্যাহত হবে।

b) উদ্ভিদের পাতায় জল ও খনিজের অভাব দেখা দেবে।

c) পাতায় সংক্রমণ ঘটবে এবং সালোকসংশ্লেষ বাধাপ্রাপ্ত হবে।

d) উদ্ভিদের বাকী অংশে খাদ্যবস্তুর অভাব ঘটবে।

e) পাতা বা সমগ্র বিটপ অংশ নেতিয়ে পড়বে।

f) সমগ্র উদ্ভিদদেহে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে।

g) শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদটির মৃত্যু ঘটবে।

তবে এরও ব্যতিক্রম আছে। কিছু কিছু সংক্রমণের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের আক্রান্ত অংশে আবার কোষ বিভাজনের হার বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্যা কিন্তু একই রকম, পুষ্টিদানকারী পদার্থগুলি যেহেতু এই অঞ্চলেই অধিকতর মাত্রায় সঞ্চালিত হয়, সেহেতু উদ্ভিদের বাকী অংশ আনুপাতিক হারে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ফলে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

সুতরাং উদ্ভিদের ব্যাধি বলতে আমরা নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটির উল্লেখ করতে পারি ঃ

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, ব্যাধি বা রোগ হল সংক্রামক বস্তুর প্রভাবে বা পরিবেশগত কারণে উদ্ভিদটির শারীরবৃত্তীয় বা গঠনগত অস্বাভাবিকতা, যার বহিঃপ্রকাশ সেই উদ্ভিদের দেহে কোন সুনির্দিষ্ট রোগ লক্ষণের প্রস্ফুরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

9.2.1 উদ্ভিদ ব্যাধির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Plant Diseases) ঃ

উদ্ভিদের ব্যাধি বা রোগের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি হতে পারে একাধিক। রোগলক্ষণের উপর ভিত্তি করে (যেমন পচন, মরিচা রোগ, ধ্বসারোগ, পীতরোগ ইত্যাদি), আক্রান্ত অংশের উপর ভিত্তি করে (যেমন কাণ্ড, পাতা মূল বা ফলের রোগ) অথবা উদ্ভিদের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে (যেমন শস্য উৎপাদনকারীর রোগ, সবজি উৎপাদনকারীর রোগ, ওষধি উৎপাদনকারীর রোগ) এই শ্রেণিবিভাগ করা যায়। তবে *শ্রেণিবিভাগের সবচাইতে সহজ ও গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে হল রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু বা উপাদানটির প্রকৃতি*। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভিদের রোগের আমরা নিম্নলিখিত শ্রেণিবিভাজনটি করতে পারি ঃ

1. সংক্রামক বা জীবজ রোগ
   - ছত্রাকজাত রোগ
   - ব্যাকটেরিয়াজাত রোগ
   - উচ্চতর পরজীবিজাত রোগ
   - ভাইরাসজাত রোগ
   - পতঙ্গজাত রোগ
   - আদ্যপ্রাণী ও নিমাটোডজাত রোগ

2. অসংক্রামক বা অজীবজ রোগ
   - অতিমাত্রায় কম বা বেশি তাপমাত্রাজনিত রোগ
   - মাটিতে জলের স্বল্পতা বা আধিক্যজনিত রোগ
   - আলোর তীব্রতা হ্রাস বা বৃদ্ধিজনিত রোগ
   - অক্সিজেনের অভাবজনিত রোগ
   - বায়ুদূষণজনিত রোগ
   - পরিপোষকের (Nutrients) অভাবজাত রোগ
   - খনিজবস্তুর বিষক্রিয়াজনিত রোগ
   - মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের প্রভাবে সৃষ্ট রোগ
   - কীটনাশকের বিষক্রিয়াজনিত রোগ
   - ত্রুটিপূর্ণ চাষ পদ্ধতির দরুণ সৃষ্টি রোগ

এ পর্যন্ত আলোচিত তথ্যগুলি যদি আপনার বিষয়টিকে বোঝবার পক্ষে সহায়ক মনে হয়ে থাকে তাহলে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি সহজেই দিতে পারবেন।

অনুশীলনী - 1

i) শ্বসনক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট হার ''ক' উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অসুস্থ অবস্থার পরিচায় কিন্তু ''খ'' উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা নয়। এর কারণ কি বলে আপনার ধারণা?

ii) কোন একটি সবুজ উদ্ভিদের পাতাগুলি অকালেই ধরে পড়লে ক্রমান্বয়ে কি পরিবর্তন সমূল সূচিত হবে দেখিয়ে দিন।

iii) কোন উদ্ভিদে একটি বিশেষ ছত্রাকের আক্রমণে মূলের বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হারে ঘটতে থাকলে আমরা সেই অবস্থাকে কি রোগগ্রস্ত অবস্থা বলতে পারি ? যুক্তি দিয়ে দেখান।

iv) উদ্ভিদের কোন উৎসজাত রোগ মহামারীর আকার নিতে পারে বলে আপনার ধারণা ? ধারণাটি স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

9.3 প্যাথোজেন ও প্যাথোজেনিসিটি (Pathogen and Pathogenicity) :

রোগ উৎপাদনকারী সজীব পদার্থকে বলে প্যাথোজেন বা রোজজীবাণু। জীবাণুঘটিত রোগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হল আক্রান্ত উদ্ভিদের উপরিতলে বা কলাভ্যন্তরে জীবাণুর সুনিশ্চিত উপস্থিতি। আক্রান্ত উদ্ভিদের দেহে বৃদ্ধি পাবার ও বংশবৃদ্ধি ঘটানোর সক্ষমতা প্যাথোজেনের বা রোগজীবাণুর ধর্ম, এবং শুধু তাই নয়; আক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে সুস্থ নীরোগ উদ্ভিদের দেহে বিস্তার লাভ করার ক্ষমতাও প্যাথোজেনকে তার অনন্যতা প্রদান করেছে প্যাথোজেনের সংক্রমণ ক্ষমতাকে বলা হয় প্যাথোজেনেসিটি (Pathogenicity)। অধিকাংশ উদ্ভিদরোগের ক্ষেত্রেই

এটা দেখা যায় যে, আক্রান্ত উদ্ভিদের ক্ষতি আপাতদৃষ্টিতেই এত বেশি যে কেবলমাত্র সংক্রামকের পরজীবিতা তার জন্য দায়ী হতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে সংক্রামক কর্তৃক *পরিপোষক* (nutrients) আহরণ ছাড়াও সেটি দ্বারা *বিষাক্ত পদার্থের* (toxin) নিঃসরণ অথবা সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় *পোষক* (host) দেহ থেকে বিজাতীয় পদার্থের নিঃসরণের দরুণ হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্যাথোজেনিসিটি সর্বদা প্যাথোজেন ও পোষকের পুষ্টিগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না। অতএব প্যাথোজেনিসিটিকে আমরা এভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করতে পারি ঃ

প্রধানত ঃ পরজীবিতার দরুণ প্যাথোজেন যখন পোষক উদ্ভিদের দেহের এক বা একাধিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বাধাপ্রদানে সক্ষম হয় তখন সেই ঘটনাকে বলে প্যাথোজেনিসিটি।

9.3.1 প্যাথোজেনেসিস (Pathogenesis) ঃ

একটিমাত্র বাক্যে বলতে গেলে বলা যায় — **কোন একটি প্যাথোজেনের রোগ সৃষ্টি করার পদ্ধতিকেই বলা হয় প্যাথোজেনেসিস।** পদ্ধতিটিকে একাধিক পদ্ধতির সমাহার বলা যায়। প্যাথোজেনের বিপাকীয় কার্যক্রম, পোষক উদ্ভিদের সাথে তার আন্তসম্পর্ক, পোষক কর্তৃক প্যাথোজেনকে বাধা দেওয়া বা আশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা এবং সর্বোপরি পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সাথে প্যাথোজেনের পারস্পরিক সম্পর্ক —এসব কিছুই একই সঙ্গে প্যাথোজেনের রোগ সৃষ্টি করার পদ্ধতিটিকে প্রভাবিত করে। সুতরাং প্যাথোজেনেসিস যদিও প্রাথমিকভাবে প্যাথোজেনের একটি ধর্মের (অর্থাৎ রোগসৃষ্টির ক্ষমতা) বহিঃপ্রকাশ কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে প্যাথোজেন, পোষক এবং পরিবেশগত উপাদানগুলি উপর নির্ভরশীল।

9.4 পোষক (Host) ঃ

উদ্ভিদ রোগবিদ্যার আলোচনায় আমরা আলাদা করে উদ্ভিদ পোষকের কথাই বলব। **পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত একটি উদ্ভিদদেহ, যার থেকে পরজীবিটি পুষ্টি আহরণ করে তাকে বলে পোষক (host)।** একটি পোষক তার পরজীবির মধ্যে সম্পর্ক খুবই বিশেষ ধরনের হতে পারে যার ফলে পরজীবিটি কেবল বিশেষ একটি প্রজাতির গাছকেই আক্রমণ করে। আবার অন্যভাবে একটি পরজীবির পোষকের বিভিন্নতা প্রজাতি ছাড়িয়ে বিভিন্ন গনের মধ্যে ব্যাপৃত। কোন পোষকের কোন অংশ পরজীবির দ্বারা আক্রান্ত হবে তাও বহু ক্ষেত্রে সুনির্ধারিত। সেক্ষেত্রে সংক্রমণ-ধরা যাক মূল, কাণ্ড বা পাতায় সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ স্থানিক প্রকৃতির। আবার কখনও পরজীবি সংবহন নালিকার (যেমন, ফ্লোয়েম) মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত পোষক দেহ থেকে পুষ্টি আহরণ করে অর্থাৎ স্থানাতীত প্রকৃতির। পোষকের অবস্থা, বয়স ইত্যাদিও পরজীবি-পোষক সম্পর্কে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। তাই কোন উদ্ভিদ হয়তো চারা অবস্থায় আক্রান্ত অথচ সেটিরই পূর্ণাঙ্গরূপ দেখা গেল পরজীবি প্রতিরোধক। আবার উল্টোটাও হতে পারে। অর্থাৎ কোন উদ্ভিদ আজীবন সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এসে অন্তিম দশাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। এইসব বিশেষত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি—**যে বিশেষ অঙ্গসংস্থানিক (morphological) ও শারীরবৃত্তীয় (physiological) দশায় একটি উদ্ভিদ কোন বিশেষ পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে সেই অবস্থার উদ্ভিদটিকে আমরা ঐ বিশেষ পরজীবির সাপেক্ষে পোষক নামে অভিহিত করতে পারি।** একটি পরজীবি মুখ্যতঃ যে পোষকের তার মধ্যে জীবনচক্র অতিবাহিত করে তাকে সেই পরজীবি সাপেক্ষে *মুখ্য পোষক* (Primary host) বলে। মুখ্য পোষক ব্যতীত অন্য পোষক যা পরজীবিকে আশ্রয় ও পরিপোষক দান করে তাকে বলে *গৌণ পোষক* (Secondary host)।

9.5 রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু (Causal organism) ঃ

একটি সজীব পদার্থ যা রোগসৃষ্টিতে সক্ষম তাকেই আমরা সেই রোগের সাপেক্ষে রোগজীবাণু বা **Causal organism** বলে থাকি। অধিকাংশ রোগজীবাণুই পরজীবি তাই সাধারণভাবে পরজীবিমাত্রকেই প্যাথোজেন বলা হয়ে থাকে। তবে এই ধারণা যে সব সময় ঠিক নয় তা তো আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছি। সেক্ষেত্রে এক বা একাধিক উপাদান রোগ সৃষ্টির কাজে সমান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। হয়তো একটি উদ্ভিদ আক্রান্ত হবার মত অবস্থায় আসাতেই একটি যথেষ্ট প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ দরকার। হয়তো একই ভাবে দরকার উদ্ভিদের বৃদ্ধির একটি বিশেষ দশা তা সে অঙ্কুর দশা, পরিণত দশা, পুষ্পবাহী বা ফলবাহী দশা যাই হোক না কেন। আবার উদ্ভিদের একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় অবস্থা এই ঘটনার সাথে জড়িত। এই সমস্ত বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ উপাদান যাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর উদ্ভিদের রোগগ্রস্ততা নির্ভরশীল তাদের *রোগসৃষ্টিকারী উপাদান সমষ্টি* বা Causal complex বলে। সাধারণভাবে উপাদানগুলি হল (ক) প্যাথোজেন বা (Causal organism) (খ) অসহায়ক পরিবেশগত অবস্থাসমূহ (গ) উদ্ভিদের প্রতিকূলতা প্রভাবিত শারীরবৃত্তীয় ও অঙ্গসংস্থানিক অবস্থা।

9.6 বীজায়ন (Inoculation) ও রোগবীজ (Inoculum) ঃ

যে পদ্ধতিতে প্যাথোজেন বা রোগসৃষ্টিকারী প্যাথোজেনের যে কোন সক্রিয় অংশ পোষক উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে তাকে বলে বীজায়ন **(Inoculation)**। *রোগবীজ* (Inoculum) কৃত্রিমভাবে বা প্রাকৃতিকভাবে পোষক দেহের সংস্পর্শে আসে। গবেষণাগারে পরীক্ষার প্রয়োজনে যখন একটি সুস্থ উদ্ভিদকে কোন বিশেষ পরজীবি বা তার কোন সক্রিয় অংশ দ্বারা সংক্রামিত করা হয় তখন তাকে বলে কৃত্রিম বীজায়ন (Artificial Inoculation)। প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি উদ্ভিদের বীজায়ন কোন বাহক নির্ভর হতে পারে। বায়ু, জল বা পতঙ্গ বাহিত রোগবীজ নিঃসন্দেহে *স্বাভাবিক বীজায়ন* (Natural Inocultion) ঘটায়। আবার মাটিতে বা বীজের অভ্যন্তরে প্রতিকূল দশা অতিক্রমকারী কোন রোগবীজ নেহাৎই সুপ্ত ও আপাতভাবে দৃষ্টির অতীত রূপেই বর্তমান থাকে। অনুকূল পরিবেশ ফিরে এলে এই সুপ্ত রোগবীজ স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই বীজায়নের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে এটিকেও আমরা স্বাভাবিক বীজায়ন বলতে পারি।

রোগবীজ (Inoculum) ঃ রোগসৃষ্টিকারী প্যাথোজেনের রোগসৃষ্টিকারী অংশকে বলে রোগবীজ। ভাইরাসের ক্ষেত্রে সমস্ত কণিকাটিই রোগবীজের কাজ করে। ব্যাকটেরিয়ার এককোশী অঙ্গজদেহ বা কোশসমষ্টি এই ভূমিকা পালন করে। ছত্রাকের ক্ষেত্রে অঙ্গজ মাইসেলিয়াম বা রেণু রোগবীজরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। পরজীবি সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজ, নিমটোডগুলির ডিম্বাণু ইত্যাদি সক্রিয় রোগবীজরূপে কাজ করতে পারে।

9.6.1 প্রাথমিক ও গৌণ রোগবীজ (Primary and Secondary Inoculum) ঃ

সংক্রামক বা প্যাথোজেনের সক্রিয়তা, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, সর্বদাই ঋতুনির্ভর। সহায়ক ঋতুতে সফল সংক্রমণ পোষক দেহে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। প্রতিকূল ঋতুর আগমনে সংক্রামক পরজীবি একটি সুপ্ত দশা অতিবাহিত করার কাজে রত হয়। পরজীবিটিরি এই প্রতিকূলজীবি অংশ থেকেই প্রাথমিকভাবে পোষক উদ্ভিদ

সংক্রামিত হয়ে পড়ে। এই অংশকে বলে *প্রাথমিক রোগবীজ* (Primary Inoculum)। রোগগ্রস্ত পোষকে পরজীবির বৃদ্ধি ও পরিপোষকের ফলে সেটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং পুনঃপুনঃ রেণু বা ডিম্বাণু সৃষ্টি করে যার দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদের অনাক্রান্ত অংশ বা সম্পূর্ণ নীরোগ উদ্ভিদ সংক্রামিত হয়ে পড়ে। এই রেণু বা জিম্বাণু যা রোগের বিস্তারে অংশ নেয় তাকে বলে *গৌণ রোগবীজ* **(Secondary Inoculum)**। প্রাথমিক রোগবীজ রোগটিকে সৃষ্টি করতে সহায়তা করে আর গৌণ রোগবীজ রোগটির ব্যাপ্তি ঘটায়। রোগবীজের পরিমাণ বহুক্ষেত্রেই সংক্রমণের সাফল্য নির্ধারণ করে। একটি সুস্থ উদ্ভিদের পরিপার্শ্বে উপস্থিত রোগবীজের ঘনত্বকে রোগবীজ সক্রিয়তা (Inoculum Potential) নামে অভিহিত করা হয়।

প্রান্তলিপি : ছত্রাকের রেণুবৈচিত্র অসাধারণ। অ্যাসকোমাইসিটিস গোষ্ঠীর ছত্রাক গঠন করে অ্যাসকোরেণু। বেসিডিও মাইসিটিস গোষ্ঠী উৎপাদন করে বেসিডিও রেণু। এছাড়া কনিডিয়া, ক্ল্যামাইডোরেণু বা টিলিউ-ইউরোডেরেণু বা টিলিউটোরেণু ছত্রাকের সংক্রমণ সৃষ্টিকারী কয়েক প্রকার রেণুর উদাহারণ।

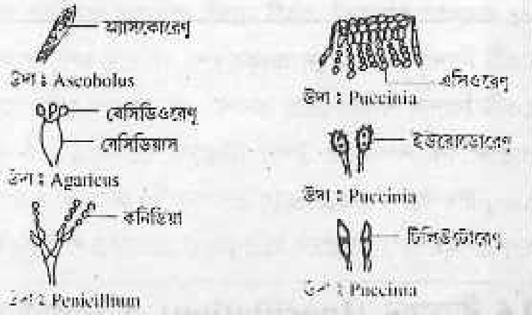

9.6.2 প্রাথমিক ও গৌণ সংক্রমণ (Primary and Secondary Infection) ঃ

প্রাথমিক রোগবীজ দ্বারা সৃজিত সংক্রমণ প্রাথমিক সংক্রমণ **Primary Infection)** নামে পরিচিত। যদি প্রাথমিক রোগবীজ কি এবং সেটি কিভাবে কাজ করে তা আপনি বুঝে থাকেন তাহলে সেটি দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণ সম্পর্কে বুঝতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। একই ভাবে গৌণ রোগবীজ যে সংক্রমণ ঘটায় তাকে বলে গৌণ সংক্রমণ **(Secondary Infection)**। একটি রোগচক্রে প্রাথমিক সংক্রমণের ঘটনা একবারই ঘটতে পারে কিন্তু গৌণ সংক্রমণ বারংবার নতুন নতুন উদ্ভিদ অঙ্গ বা উদ্ভিদকে রোগগ্রস্ত করে ফেলে।

9.7 অনুপ্রবেশ (Penetration) ঃ

যে পদ্ধতিতে প্যাথোজেন উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে তাকে বলে অনুপ্রবেশ () অনুপ্রবেশের পূর্বশর্ত হল ঃ

a) প্যাথোজেনের সঙ্গে পোষক উদ্ভিদের উপরিতলের সংযোগসাধন (Attachment)।

b) পোষক ও প্যাথোজেনের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি নির্ণয় (Recognition)।

এই পরিচিতি নির্ণায়ক পদ্ধতিগুলি একান্তভাবেই জীনঘটিত জৈব রাসায়নিক পদ্ধতি। যদি কোন উদ্ভিদে প্যাথোজেনের সংস্পর্শে আসার পর অনুকূলধর্মী বিক্রিয়া ঘটে তাহলেই অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে নচেৎ নয়। যদি উদ্ভিদটি প্যাথোজেন প্রতিরোধী হয় তাহলে যে ধরনের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি সংযোগ-পরবর্তী দশায় ঘটবে তা প্যাথোজেনের পক্ষে হানিকারক-ফলে সেটির বৃদ্ধি হয় হ্রাস পাবে বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সংক্রমণ আদৌ ঘটবে না সুতরাং রোগটিই সৃষ্ট হবে না।

যদি পরিচিতি নির্ণায়ক বিক্রিয়াগুলি প্যাথোজেনের পক্ষে অনুকূল হয় তাহলে প্যাথোজেন উদ্ভিদদেহে এক বা একাধিক পথে প্রবেশ করতে পারে। অনুপ্রবেশের পথগুলি হল স্বাভাবিক রন্ধ্র যেমন *পত্ররন্ধ্র*(Stomata), *জলরন্ধ্র* (buydathode), *লেন্টিসেল* (lenticel) ইত্যাদির মাধ্যমে, অথবা

a) উদ্ভিদদেহের কোন ক্ষতস্থানের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ।

b) সরাসরি উদ্‌বিদের বহিস্তক ভেদ করে অনুপ্রবেশ।

c) জল শোষণ কালে মূলরোম দ্বারা শোষিত হয়ে অনুপ্রবেশ।

একটা কথা মনে রাখা দরকার-অনুপ্রবেশ সফল হওয়া মানেই কিন্তু সফল সংক্রমণ নয়। যদি উদ্ভিদটির রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হবার প্রবণতা (Susceptibility) না থাকে তাহলে অনুপ্রবেশের পর প্যাথোজেন পোষকের দেহে সফলভাবে প্রতিষ্ঠা নাও লাভ করতে পারে। অনুপ্রবেশের বিভিন্ন পর্যায় ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলি একক - 12 তে আলোচিত হয়েছে।

9.8 সংক্রমণ (Infection) :

যে পদ্ধতিতে প্যাথোজেন পোষক উদ্ভিদে দেহে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং তার কোষকলা থেকে পুষ্টি সংগ্রহে সফলকাম হয় তাকে বলে সংক্রমণ। সংক্রমণ সফল হওয়ার বিষয়টি

a) *প্যাথোজেনের রোগসৃষ্টির ক্ষমতা* (Virulence)।

b) *পোষকের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা* (Susceptibility)।

c) *পরিবেশের অনুকূলধর্মীতা* (favourable climate)।

c) *জীবনগত সাযুজ্য* (Compatibility)।

ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। সংক্রমণকালে প্যাথোজেন পোষকদেহে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে বা বৃদ্ধি এবং বংশবৃদ্ধি দুটি ক্ষেত্রেই সফল হয়। এভাবে প্যাথোজেন পোষক উদ্ভিদের কোষকলার অভ্যন্তরে বৃদ্ধি পাওয়া ও বংশবৃদ্ধি করা অর্থাৎ উপনিবেশিকরণ (Colonization) অর্থাৎ বস্তুতঃপক্ষে সংক্রমণ পদ্ধতিটির দুটি ধাপ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

9.8.1 দৃশ্যমান ও দৃশ্যাতীত সংক্রমণ (Visible and Invisible Infection) :

সংক্রমণ যদি উদ্ভিদেহের উপরিতলের বাইরে থেকেই পরিলক্ষিত হয় তখন তাকে বলে দৃশ্যমান সংক্রমণ। শুঁয়োপোকা কর্তৃক পাতায় ক্ষত সৃষ্টি অথবা ধান গাছের পাতায় বাদামী রঙ্কের দাগ—এসবই দৃশ্যমান সংক্রমণের উদাহরণ।

সংক্রমণ যখন পোষকদেহের উপরিতলে পরিলক্ষিত হয় না অথচ তখন দেহাভ্যন্তরে প্যাথোজেন সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত-সেই সংক্রমণকে বলে দৃশ্যাতীত সংক্রমণ (**Invisible Infection**)। যেমন, গম গাছের বা বার্লি গাছের *আবৃত স্মাট* (covered smut) রোগের কথা বলা যায় যেখানে দানাটির অর্ন্তভাগ বিনষ্ট হয়ে গেলেও বর্হিগাত্রে তার কোন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না।

9.8.2 স্থানিক ও স্থানাতীত সংক্রমণ (Localized and Systemic Infection) :

রোগের লক্ষণগুলি যে সংক্রমণের বেলায় সংক্রমণক্ষেত্রে বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে বলে স্থানিক সংক্রমণ (localized infection)।

যে সংক্রমণে রোগের লক্ষণগুলি সংক্রমণক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন অঞ্চলে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে স্থানাতীত সংক্রমণ (Systemic infection)।

স্থানাতীত সংক্রমণের ক্ষেত্রে সংক্রমণের পর প্যাথোজেন পোষক কলার অভ্যন্তর পরিস্ফুটনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় রোগলক্ষণ সৃষ্টি না করেই অতিবাহিত করে। এই পর্যায়ে প্যাথোজেন এমন কি সুপ্তভাবেও থাকতে পারে। অনুকূল পরিবেশ, পোষকদেহের পরিপূর্ণতা এবং পোষককলায় খাদ্য উপাদানের প্রাপ্তি ইত্যাদি যখন প্যাথোজেনের সহায়ক তখনই প্যাথোজেন বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধির পর্যায়গুলি অতিক্রম করে রোগলক্ষণের প্রকাশ ঘটায়। সংক্রমণ ও রোগলক্ষণ প্রকাশের অন্তবর্তী এই সময়টিকে বলে *ইনকিউবেশন পিরিয়ড* (Incubation Period। স্থানাতীত সংক্রমণে স্বাভাবিক কারণেই এই সময় দীর্ঘতর।

এই পর্যন্ত আলোচিত বিষয়গুলি যদি আপনার কাছে প্রাঞ্জল হয়ে থাকে তাহলে নীচের অনুশীলনীটি নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন ঃ

অনুশীলনী - 2

(a) সঠিক উত্তরটিতে দাগ দিন ঃ

i) প্যাথোজেনের রোগসৃষ্টি করার ক্ষমতাকে বলে (প্যাথোজেনিসিটি / প্যাথোজেনেসিস/সংক্রমণ)।

ii) রোগবীজ বা Inoculum বলে (একটি ব্যাকটেরিয়াকে / একটি ভাইরাসকে / প্যাথোজেনের রোগ সৃষ্টিকারী অংশকে)।

iii) অনুপ্রবেশের ধাপ দুটি হল (সংযোগসাধন ও সংক্রমণ/ সংক্রমণ ও বীজায়ন/ সংযোগসাধন ও পরিচিতি নির্ণয়)।

(b) শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

i) যে সংক্রমণ সংক্রমণস্থল থেকে দূরে প্রকাশিত হয় তাকে বলে ________।

ii) সংক্রমণ ও রোগলক্ষণ প্রকাশের অন্তবর্তী সময়টিকে বলে________।

iii) যে রোগ উৎপাদনকারী অংশ থেকে রোগটি প্রথম সৃষ্ট হয় তাকে বলে________।।

(c) পার্থক্য দেখান ঃ

i) স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বীজায়ন

____

____

____

____

ii) মুখ্য পোষক ও গৌণ পোষক

iii) দৃশ্যমান ও দৃশ্যাতীত সংক্রমণ

9.9 রোগলক্ষণ (Symtoms) :

রোগাক্রান্ত হবার ফলে উদ্ভিদের বহিরঙ্গে বা অন্তঃস্থ অংশে যে প্রতিক্রিয়াজনিত পরিবর্তনগুলি সূচিত হয় তাদের বলা হয় রোগলক্ষণ।

কখনও কখনও রোগের বহিঃপ্রকাশই রোগলক্ষণ বলে চিহ্নিত হয় তবে এই সংজ্ঞা উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে তার প্রতি সুবিচার করে না। কারণ এটি নিশ্চিতভাবেই একটি রোগলক্ষণ। অনুরূপভাবে প্যাথোজেনের দৃষ্টিগ্রাহ্য অংশও একটি অন্যতম প্রধান রোগচিহ্ন। একই রোগচিহ্নগুলি একাধিক রোগের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। আবার একই রোগের জন্য একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হতে পারে। যেমন কোন একটি বিশেষ সংক্রমণের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের পাতার ক্লোরোফিল বিনষ্ট হতে পারে, কাণ্ডে পচন ধরতে পারে, পুষ্প ফলে রূপান্তরিত নাও হতে পারে আবার কাণ্ড বা পাতার গায়ে প্যাথোজেনের রেণু পরিলক্ষিত হতে পারে। উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রোগচিহ্ন ও প্যাথোজেনের দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপ সবগুলিকে একত্রে এই বিশেষ রোগটির *সহলক্ষণ সমষ্টি* (disease syndrome) বলে।

9.10 প্রতিরোধ (Resistance) :

কোন উদ্ভিদ যে অন্তঃস্থ ক্ষমতার বলে প্যাথোজেনের বৃদ্ধি তথা সংক্রমণজনিত ক্ষতির হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করতে পারে তাকে বলে প্রতিরোধ। এটি কোন উদ্ভিদের আক্রান্ত হবার প্রবণতার ঠিক বিপরীত দশা। উদ্ভিদের প্রতিরোধক্ষমতা সহমাত্রিক (uniform) অর্থাৎ সব সংক্রমণের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য অথবা ভিন্নমাত্রিক (differential) অর্থাৎ বিভিন্ন সংক্রমণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

কোন কোন উদ্ভিদ অবশ্য প্রতিরোধী না হয়েও সংক্রমণ পরবর্তী রোগের কবল থেকে রক্ষা পায়। এই সমস্ত উদ্ভিদ প্যাথোজেনের বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধিতে বাধা দান না করলেও নিজস্ব বিপাকক্রিয়াগুলি অনায়াসেই সম্পন্ন করে।

এদের বলে *সংক্রমণ সহকারী* উদ্ভিদ। আবার কিছু উদ্ভিদ অনাক্রমন্যতার (immunity) দরুণ প্যাথোজেনকে স্ব কোশকলায় প্রতিষ্ঠিত হতেই দেয় না। কোন কোন উদ্ভিদ কতগুলি বিশেষ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বা রাসায়নিক যৌগের উপস্থিতির দরুণ প্যাথোজেনকে এড়িয়ে চলতে পারে। সেক্ষেত্রে প্যাথোজেন ও পোষকের সংযুক্তিই বাধাপ্রাপ্ত হয়। পোষকের এই ধর্মকে বলে ক্লেনডিউসিটি (Klendusity)।

9.11 পরজীবি ও পরজীবিতা (Parasites and Parasitism) ঃ

একটি সজীব বস্তু যখন অন্য কোন সজীব বস্তুর উপর খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য নির্ভরশীল হয় তখন তাকে বলে পরজীবি ও তার পোষকের মধ্যে আর্ন্তসম্পর্ককে বলে পরজীবিতা।

একটি উদ্ভিদ-পরজীবি হল সেই সজীব বস্তু যা কোন উদ্ভিদের উপর পরিপোষক, বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধির জন্য নির্ভরশীল। পরজীবির প্রকারভেদ পরজীবিতার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। যখন কোন সজীব বস্তু পোষক নির্ভর পরজীবিতা ব্যতীত অন্য কোন ভাবে জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে পারে না তখন তাকে বলে *পূর্ণ পরজীবি* (obligate parasite)। যখন কোন সজীব বস্তু সাধারণভাবে মৃতগলা পচা ডীবদেহের উপর মৃতজীবিরূপে বসবাস করে কিন্তু সময়বিশেষে অপর কোন সজীব পদার্থের উপর খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য নির্ভরশীল হয় তখন তাকে বলে *আংশিক পরজীবি* (facultative parasite)।

9.12 মৃতজীবি ও মৃতজীবিতা (Saprophyte and Saprophytism) ঃ

যে সজীব পদার্থ মৃত পচা-গলা জৈব পদার্থের থেকে পুষ্টি আহরণ করে তাকে বলে মৃতজীবি। ছত্রাক হল মৃতজীবির আদর্শ উদাহরণ। অন্তঃস্থ ধর্মের ফলে কোন সজীব বস্তু মৃতজীবিরূপে পরিপোষক লাভে সক্ষম হয় তাকে বলে মৃতজীবিতা (**Saprophytism**)। মৃতজীবিতা সাধারণভাবে দেখতে গেলে রোগসৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ নয়। কোন কোন পরজীবি আবার কোন কোন বিশেষ অবস্থায় মৃতজীবিরূপে পুষ্টি লাভ করতে পারে। তাঁদের বলে আংশিক মৃতজীবি। এর পরজীবি দশায় রোগসৃষ্টি করতেও পারে। আর অপর কিছু মৃতজীবি, মৃতজীবিতা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জীবন চক্র সম্পন্ন করতেই অক্ষম। এদের বলে *পূর্ণ মৃতজীবি*।

9.13 মিথোজীবিতা (Symbiosis) ঃ

কখনও কখনও দুটি সজীব পদার্থ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অবস্থান করা সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হয়। এই আর্ন্তসম্পর্ককে মিথোজীবিতা নামে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের পুষ্টি পদ্ধতি অনুযায়ী জীবকে বলা হয় *মিথোজীবি*। মটর গাছের মূলের অর্বুদে *রাইজোবিয়াম (Rhizobium)* নামক ব্যাকটেরিয়ার অবস্থান বা লাইকেন (Lichen) নাম সহবাসী ছত্রাক ও শৈবাল মিথোজীবি (Symbiont) এই ধরনের পুষ্টি উদাহরণ।

9.14 প্যাথোজেনের অতি-শীতকালীন বা অতি-গ্রীষ্মকালীন অবস্থা অতিক্রমকারী দশা (Overwintering or over summering of pathogen) :

সাধারণভাবে অতি-শীতকালীন বা অতি গ্রীষ্মকালীন অবস্থা প্যাথোজেনের পক্ষে বা পোষক উদ্ভিদের পক্ষে অনুকূল নাও হতে পারে। যদি আক্রান্ত উদ্ভিদটি বহুবর্ষজীবি হয় তাহলে প্যাথোজেন অতি কম বা অতি উচ্চ তাপমাত্রা তার মধ্যেই অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু যদি পোষক উদ্ভিদটি বর্ষজীবি হয় তাহলে বৎসরান্তে শীতের আগমনে উদ্ভিদের উপরিভাগ মৃতবৎ হয়ে পড়লে প্যাথোজেন সক্রিয়ভাবে কার্যকরী থাকার মতো কোন পোষকই পায় না। একইভাবে কোন কোন বর্ষজীবি উদভিদের ক্ষেত্রে গ্রীষ্মের উচ্চতর তাপমাত্রায় পোষক উদ্ভিদটি মরে যায় এবং প্যাথোজেনের একই সমস্যা উপনীত হয়। যে উপায়ে প্যাথোজেন পোষক উদ্ভিদের অভ্যন্তরে বা পোষক ছাড়াই এই অতিশীতকালীন বা অতিগ্রীষ্মকালীন অবস্থা অতিবাহিত করে তাকে অনেক সময় *সুপ্তিকালীন দশা* (Perennating stage) বলেও অভিহিত করা হয়।

জীবাণু বিশেষে এই প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রমকারী দশাটি ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, ছত্রাক বহুবর্ষজীবিতে অনুসূত্র (hypha), *রেণু* (spore) রূপে এবং বর্ষজীবিতে মৃত উদ্ভিদের অবশিষ্ট্যাংশের মধ্যে অথবা মাটিতে, বীজের মধ্যে বা বংশবিস্তারকারী অংশ যেমন কন্দ, স্ফীতকন্দ ইত্যাদির মধ্যে অনুসূত্র বা *বিশ্রামকারী রেণু* (Resting spore) অথবা স্ক্লেরোসিয়া রূপে (Sclerotia) অতিবাহিত করে। আবার কিছু কিছু প্যাথোজেন এই অবস্থায় মৃতজীবিরূপে (যেমন *Pythium, Fusarium* ইত্যাদি ছত্রাক) মাটি থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে।

ব্যাকটেরিয়া ছত্রাকের মতই মাটিতে বা উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশে অথবা কীটপতঙ্গজাতীয় বাহকের দেহ আশ্রয় করে বেঁচে থাকে।

ভাইরাস বা আদ্যপ্রাণী (protozoa) যেহেতু সজীব পোষক ছাড়া বাঁচে না সেহেতু তারা পোষকের মৃদগত অংশকে আশ্রয় করে প্রতিকূল অবস্থা কাটায়।

নিমাটোড (nematode) জাতীয় প্রাণী জিম্বরূপে মাটিতে বা উদ্ভিদসমূহ অবশিষ্টাংশে এবং উচ্চতর পরজীবি উদ্ভিদ-বীজরূপে এই দশা অতিবাহিত করে।

> *প্রান্তলিপি :* সাধারণভাবে প্যাথোজেনের যে দশা সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম সেই দশাই আবার প্রতিকূল পরিবেশে নিষ্ক্রিয় সুপ্ত দশায় রূপান্তরিত হয়। তাই অনুসূত্র, রেণু ইত্যাদিরূপে ছত্রাক, কোশ বা কোশসমষ্টিরূপে ব্যাকটেরিয়া, পোষকদেহে ভাইরাস আর ডিম্বরূপে নিমাটোড প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। তবে *Mucor* জাতীয় ছত্রাকের জাইগোস্পোর, *Penicillium* এর ফলদেহ ক্লাইষ্টোথেসিয়াম, *Ustilago*-এর স্ক্লেরোসিয়া ইত্যাদি অত্যন্ত সুগঠিত, জল ও তাপবিরোধী পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট হবার দরুণ প্রতিকূলতা অতিক্রমে দারুণ সফল। ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে *অন্তঃরেণু* (endospore) হল ভীষণভাবে তাপবিরোধী, যার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ এর কোন ক্ষতিই করতে পারে না।

9.15 রোগচক্র (Disease Cycle) :

যে কোন সংক্রমণজাত রোগের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট ঘটনা নির্দিষ্টক্রমে চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বিস্তার ঘটায়। এই ঘটনাক্রমকে রোগচক্র নামে অভিহিত করা হয়। রোগচক্র প্রায়ই প্যাথোজেনের জীবনচক্রের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এটি মূলতঃ রোগের আবির্ভাব, পরিস্ফুটন ও বিস্তারকে বোঝায়। প্যাথোজেন এই

সব কয়টি বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলেও এই ঘটনাগুলি কেবলমাত্র প্যাথোজেনের বিভিন্ন দশাকে নির্দেশ করে না। এর সাথে সাথে উদ্ভিদটির বিভিন্ন দশা এবং রোগলক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ও রোগচক্রের একটি অপরিহার্য অংশ। রোগচক্রের বিভিন্ন দশাগুলি নিম্নরূপ ঃ

বীজায়ন ⟶ অনুপ্রবেশ ⟶ বীজাণুর পোষকদেহে প্রতিষ্ঠা লাভ ⟶ কলোনাইজেশন বা বিস্তার লাভ ⟶ বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি ⟶ প্যাথোজেনের বাহক দ্বারা বিস্তার লাভ ⟶ প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রমকারী দশা ⟶ পুণরায় বীজায়ন।

এই ঘটনাগুলিই চক্রাকালে আবর্তিত হয়ে রোগচক্র অবিচ্ছিন্ন রাখে।

9.15.1 একচক্রী ও বহুচক্রী প্যাথোজেন (Monocyclic and Heterocyclic Pathogen) :

যে সমস্ত প্যাথোজেন এক বর্ষাকালের মধ্যে কেবল একটি রোগচক্র সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে সম্পন্ন করে তাকে বলে একচক্রী প্যাথোজেন। উদাহরণ - ছত্রাকঘটিত স্মাট রোগ।

অধিকাংশ জীবাণুঘটিত রোগের ক্ষেত্রে অবশ্য এক বর্ষকাল সময়ের মধ্যে একটি প্যাথোজেন একাধিকবার তার জীবনচক্র তথা রোগের রোগচক্র সম্পন্ন করতে পারে। এদের বলে বহুচক্রী প্যাথোজেন। এই সংখ্যা 2 থেকে 30 পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। প্রতিটি চক্রের শেষে সংক্রামক জীবাণুর পরিমাণ বহু-বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এরা সাধারণতঃ বায়ুবাহিত হয়ে থাকে এবং এই জাতীয় জীবাণুই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহামারী ঘটানোর জন্য দায়ী। উদাহরণ ঃ আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ।

9.16 রবার্ট ককের মৌলি নীতি (Koch's Postulate) :

রবার্ট কক (1843 - 1910) মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে রোগজীবাণু সনাক্তকরণের সোপানরূপে যে মৌলিক নীতি প্রণয়ন করেন তা জীবাণু ঘটিত উদ্ভিদ রোগের ক্ষেত্রেও সমান কার্যকর। যদি কোন উদ্ভিদ কোন সংক্রামক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং প্রাপ্তব্য তথ্যাবলীর সাহায্যে প্যাথোজেনটিকে সনাক্ত করা সম্ভব। কিন্তু যদি প্যাথোজেনটি সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে বা সেটি সম্পর্কে কোন তথ্যাবলী যদি তখনও অনাবিষ্কৃত হয় তাহলে প্যাথোজেনটিকে সনাক্ত করতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ককের মৌলিক নীতি বস্তুতপক্ষে সেই বিষয় সংক্রান্ত পথনির্দেশ। ইতিপূর্বে অনাবিষ্কৃত প্যাথোজেনটিকে রোগাক্রান্ত অংশ থেকে পৃথকীভূত করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যাচাই করে দেখতে হবে ঃ

(a) ঐ প্যাথোজেন রোগাক্রান্ত যতগুলি উদ্ভিদকে পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের সবার দেহেই উপস্থিত।

(b) পৃথকীভূত প্যাথোজেনটিকে পরিপোষকযুক্ত কৃত্রিম মাধ্যমে (যদি প্যাথোজেন আংশিক পরজীবি হয়) শুদ্ধ জীবগোষ্ঠীরূপে (**Pure culture**) বৃদ্ধি ঘটানো যায়। প্যাথোজেনটি যদি পূর্ণপরজীবি হয় তাহলে পোষক উদ্ভিদের দেহে সেটির বৃদ্ধি ঘটাতে হয়। এই পর্যায়ে প্যাথোজেনটির বহিরাকৃতি ও সেটির উপস্থিতিজনিত প্রভাব নথিভুক্ত করতে হবে।

(c) শুদ্ধ জীবগোষ্ঠী (**pure culture**) থেকে প্রাপ্ত জীবাণুদ্বারা অবশ্যই রোগপ্রবণ পোষক উদ্ভিদটির মত একই প্রজাতি (**species**) বা রূপভেদ (**Variety**) বিশিষ্ট অপর কোন সুস্থ উদ্ভিদকে সংক্রামিত করা যাবে এবং প্যাথোজেনের উপস্থিতিজনিত ফলাফল পূর্বে প্রাপ্ত ফলাফলের অনুরূপ হতে হবে।

(d) এই দ্বিতীয় রোগগ্রস্ত উদ্ভিদটি থেকে প্যাথোজেনকে পুনরায় পৃথকীভূত করে বিশুদ্ধ জীবগোষ্ঠী (**pure culture**) রূপে পাওয়া সম্ভব হবে এবং প্যাথোজেনের সমস্ত ধর্মই পূর্বে বর্ণিত প্যাথোজেনের ধর্মগুলির অনুরূপ হতে হবে।

যদি উপরে বর্ণিত ককের *নীতি* (Koch's Postulate) গুলি মানা হয় এবং যদি প্রতিটি পর্যায় সত্য প্রতিপন্ন হয় তাহলে আমরা ঐ প্যাথোজেনটি ঐ বিশেষ রোগের কারণ বলে সহজেই চিহ্নিত করতে পারি।

বুঝতে পারছেন, যে সমস্ত জীবাণুকে কৃত্রিমভাবে *বিশুদ্ধ জীবগোষ্ঠী* (pure culture) রূপে পাওয়া সম্ভব তাদেরই কেবলমাত্র উপরিউক্ত নীতি অনুযায়ী সনাক্ত করা যেতে পারে। এগুলি হল ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নিমাটোড কিছু ভাইরাস বা উচ্চতর শ্রেণির পূর্ণ পরজীবি উদ্ভিদ। অন্য জীবাণু, যেমন বেশিরভাগ ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া এবং আদ্যপ্রাণী (protozoa) ইত্যাদি এতাবৎকাল পর্যন্ত শুদ্ধ জীব গোষ্ঠীরূপে কৃত্রিম মাধ্যমে বা পোষক দেহে পাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে তাদের দিয়ে সুস্থ উদ্ভিদের দেহে কৃত্রিম বীজায়ন (Inoculation) ঘটানো সম্ভব নয়। সুতরাং ককের নীতি হুবহু সমস্ত উদ্ভিদরোগের ক্ষেত্রে মানার পক্ষে কিছু প্রতিকূলতা থাকলেও যে প্যাথোজেনের *পৃথকীকরণ* (Isolation) ও *শুদ্ধিকরণ* (Purification) সম্ভব তার ক্ষেত্রে এই নীতিগুলি আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

9.17 সারাংশ :

এই এককটি উদ্ভিদ রোগবিদ্যা সংক্রান্ত পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে একটি মুখবন্ধস্বরূপ। এই বিজ্ঞানের আলোচনায় বারবার আপনারা এমন কতগুলি পারিভাষিক শব্দের সম্মুখীন হবেন যাদের অর্থ এবং সংজ্ঞা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। উদ্ভিদের রোগ কাকে বলে, সুস্থ একটি উদ্ভিদের সাথে তার পার্থক্য কোথায়, রোগসৃষ্টির কারণগুলি কি কি এবং কিভাবে তারা রোগসৃষ্টি করে তার একটি প্রাথমিক ধারণা এই এককে দেওয়া হয়েছে। রোগসৃষ্টিকারী উপাদানগুলি জীবজ ও অজীবিয় দু'রকমই হতে পারে। জীবজ উপাদান যখন রোগের কারণ তখন তাকে বলে প্যাথোজেন। যে পদ্ধতিতে প্যাথোজেন রোগসৃষ্টি করে তাকে বলে *প্যাথোজেনেসিস*। সংক্রামক উপাদান *বীজায়ন* পদ্ধতিতে সংক্রমণ ঘটায়। কোন রোগের ক্ষেত্রে প্রথম সংক্রমণটি *প্রাথমিক রোগবীজ*দ্বারা এবং পরবর্তী সংক্রমণগুলি *গৌণ রোগবীজ* দ্বারা হয়ে থাকে। *সংক্রমণ* হতে পারে *দৃষ্টিগ্রাহ্য* অথবা *দৃশ্যাতীত*। এটি সংক্রমণ স্থানে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে *(স্থানিক সংক্রমণ)* অথবা সামগ্রিকভাবে সমস্ত উদ্ভিদদেহে ছড়িয়ে যেতে পারে *(স্থানাতীত সংক্রমণ)*। সংক্রমণের ফলে আক্রান্ত উদ্ভিদের দেহে রোগের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা রোগলক্ষণ নামে পরিচিত। সংক্রামক উপাদানগুলি পরজীবি হলে তাদের পরজীবিতা ধর্মটিই রোগসৃষ্টির মূল কারণ। উপাদানটি মৃতজীবিও হতে পারে সেক্ষেত্রে *মৃতজীবিতা* পরোক্ষভাবে রোগের কারণ হতে পারে। এই দুই প্রকার ছাড়া *মিথোজীবি* কাকে বলে তাও আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি এবং শেই সূত্রে *মিথোজীবিতা* কাকে বলে তা জানতে পেরেছি। উদ্ভিদ যে ধর্মের বলে সংক্রমণ প্রতিহত করে তাকে বলে *প্রতিরোধ*। এর বিপরীত ধর্মটি হল *রোগপ্রবণতা* যার বলে কার্যত উদ্ভিদ সংক্রমণকে আকৃষ্ট করে। সংক্রামক উপাদান যে উদ্ভিদের মধ্যে সংক্রামণ ঘটায় সেটিকে বলে তার *পোষক*। পোষকের মধ্যে পূর্ণপরজীবি রোগজীবাণু তার জীবনচক্র অতিবাহিত করে। এই ঘটনা একটি রোগের রোগচক্রের সাথে অঙ্গা

াঙ্গীভাবে জড়িত। *রোগচক্র* হল চক্রাকারে আবর্তিত একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনাক্রম, একটি প্যাথোজেন বা সংক্রামক উপাদান। একটি রোগচক্রে জীবাণু একবার বা বহুবার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে এদের যথাক্রমে একচক্রী বা বহুচক্রী প্যাথোজেন বলা হয়। সবশেষে আমরা এই অধ্যায়ে *রবার্ট* কক প্রবর্তিত কতগুলি *মৌলিক নীতির* কথা জেনেছি যার মাধ্যমে একটি সংক্রামক উপাদান ও তার দ্বারা সংঘটিত সংক্রমণটি সঠিকভাবে চিনে নিতে পারা যায়।

9.18 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ বলতে কি বোঝায়? কিসের ভিত্তিতে উদ্ভিদরোগের শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব? উদ্ভিদরোগের একটি শ্রেণিবিভাগ ছকের সাহায্যে দেখান।
2. সংক্রমন কাকে বলে? সংক্রমণ কয় প্রকার ও কি কি? প্রতিরোধ বলতি কি বোঝায়?
3. পার্থক্য নির্ণয় করুন ঃ
   a) পরজীবিতা ও মৃতজীবিতা।
   b) প্যাথোজেনেসিটি ও প্যাথোজেনেসিস
   c) রোগলক্ষণ ও সহলক্ষণ সমষ্টি
4. রবার্ট ককের মৌলিক নীতিগুলির সাহায্যে কিরূপে একটি প্যাথোজেনকে সনাক্ত করা যায়?

9.19 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

i) কোন উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কার্যগুলির হার সুনির্ধারিত। যদি কোন কারণে এই কার্যগুলির হারাতে সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয় তখন রোগসৃষ্টি হয়। 'ক' উদ্ভিদের এই হার 'খ' উদ্ভিদের হারের তুলনায় ভিন্নতর এবং জীনগতভাবে নিয়ন্ত্রিত। 'ক' উদ্ভিদের শ্বসনের যা স্বাভাবিক হার 'খ' উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। ফলে এটির সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়। তাই এইট রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ।

ii) কোন উদ্ভিদের পাতা ঝরে পড়লে প্রথমে সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হবে। ফলে খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে। তার ফলে উদ্ভিদের শ্বসনবস্তুর পরিমাণ হ্রাস পাবে। শ্বসনের হার কমলে শক্তি উৎপাদন হ্রাস পাবে। উদ্ভিদটি নেতিয়ে পড়বে এবং সহজেই সংক্রামিত হবে।

iii) মূলের বৃধি অস্বাভাবিক দ্রুত হারে হতে থাকলে পুষ্টিদানকারী পদার্থ সেই অংশেই অধিকমাত্রায় সঞ্চারিত হবে এবং বাকী অংশে আনুপাতিক হারেই পুষ্টিহীনতা দেখা দেবে। তাই এটিকে আমরা রোগগ্রস্ত অবস্থা বলতে পারি।

iv) জীবজ উৎসজাত রোগই মহামারীরূপে দেখা দিতে পারে। এগুলির মধ্যেও পড়ে ভাইরাস, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি প্যাথোজেন ঘটিত রোগ কেন না এরা সহজেই বিপুল সংখ্যায় বংশবৃধি করতে সক্ষম। নতুন নতুন সুস্থ পোষক উদ্ভিদে সহজেই এরা বায়ু, জল বা অন্যান্য মাধ্যম দ্বারা পরিবাহিত হয়ে যেতে পারে।

অনুশীলনী - 2

a) (i) প্যাথোজেনিসিটি (ii) প্যাথোজেনের রোগসৃষ্টিকারী অংশকে (iii) সংযোগসাধন ও পরিচিতি নির্ণয়।

b) (i) স্থানাতীত সংক্রমণ (ii) ইনকিউবেশন পিরিয়ড (iii) প্রাথমিক রোগবীজ।

c) (i) যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক বাহক যথা বায়ু, জল বা পতঙ্গ দ্বারা বাহিত হয়ে রোগবীজ সংক্রামণ ঘটায় তখন তাকে বলে স্বাভাবিক বীজায়ন। আর যখন গবেষণাগারে পরীক্ষার প্রয়োজনে কোন পোষক উদ্ভিদকে তার পরজীবি দ্বারা সংক্রামিত করা হয় তখন তাকে বলে কৃত্রিম বীজায়ন।

(ii) একটি পরজীবি মুখ্যত যে পোষকের মধ্যে তার জীবনচক্র অতিবাহিত করে তাকে বলে মুখ্য পোষক আর সেটি ব্যতীত অন্য পোষক যা পরজীবিকে আশ্রয় ও পুষ্টিদান করে তাকে বলে গৌণ পোষক।

(iii) যে সংক্রমণ উদ্ভিদদেহে বাইরে থেকেই খালি চোখে দেখা যায় তাকে বলে দৃশ্যমান সংক্রমণ আর সংক্রমণ যখন বাইরে তেকে দেখা যায় না অথচ উদ্ভিদদেহে সংক্রমনকারী উপাদান বর্তমান তখন তাকে বলে দৃশ্যাতীত সংক্রমণ।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1) যে কোন উদ্ভিদের গঠন বা তার শারীরবৃত্তীয় কার্যগুলি জীনগতভাবে পূর্বনির্ধারিত। এগুলি সুনিয়ন্ত্রিত থাকলে উদ্ভিদটির একটি সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। যদি সংক্রমণের প্রভাবে অথবা পরিবেশগত কারণে এই সাম্য ব্যাহত হয় তখন উদ্ভিদটিকে আর স্বাভাবিক সুস্থ উদ্ভিদ বলা যায় না। সুতরাং রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ বলতে আমরা বুঝি সংক্রামক বস্তুর প্রভাবে বা পরিবেশগত কারণে উদ্ভিদটির শারীরবৃত্তীয় বা গঠনগত অস্বাভাবিকতা, যার বহিঃপ্রকাশ সেই উদ্ভিদের দেহে কোন সুনির্দিষ্ট রোগলক্ষণ প্রস্ফুরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

রোগ লক্ষণের উপর ভিত্তি করে অথবা আক্রান্ত অংশের উপর ভিত্তি করে অথবা উদ্ভিদের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদরোগের শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব। তবে শ্রেণিবিভাগের সর্বাপেক্ষা সহজ ও গ্রহণযোগ্য ভিত্তি হল রোগসৃষ্টিকারী উপাদানটির প্রকৃতি। এর উপর ভিত্তি করে আমরা নিম্নলিখিত শ্রেণিবিন্যাসটির করতে পারি।

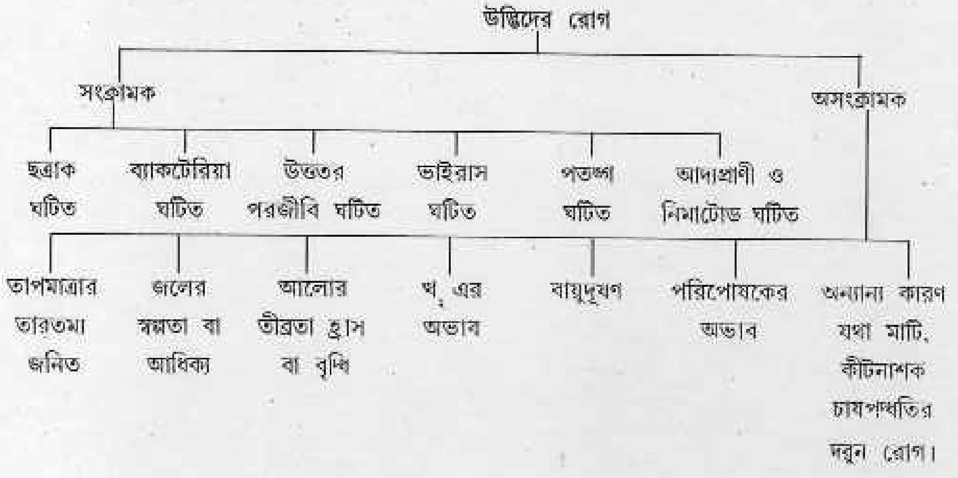

2) উত্তরের জন্য 9.8, 9.8.1 ও 9.1 অংশাঙ্কিত পাঠ্যাংশ দেখুন।

3) a) 9.11 এবং 9.12 অংশাঙ্কিত অংশ পড়ুন।

লক্ষ্য করুণ পরজীবি ও তার পোষকের মধ্যে আনাতঃসম্পর্ককেই পরজীবিতা বলে। সুতরাং পরজীবিতা কি তা বোঝানোর জন্য পরজীবি এবং পোষক কাকে বলে তা বলে তারপর বলুন পরজীবিতা কাকে বলে।

এর তুলনায় মৃতজীবিতা কি তা লক্ষ্য করুন। মৃতজীবির কোন পোষক নেই। এটি পচা গলা জৈব বস্তু থেকে খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে। সুতরাং পরজীবিতার দরুণ যেহেতু পরোক্ষভাবে রোগসৃষ্টি হয় মৃতজীবিতা রোগসৃষ্টির সেরকম প্রত্যক্ষ কারণ নয়।

পরজীবির উদাহরণ সবুজ উদ্ভিদও হতে পারে। মৃতজীবি কিন্তু কখনও স্বদেহে খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম নয়।

b) 9.3 এবং 9.3.1 অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।

c) 9.9 অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।

মনে রাখবেন তুলনামূলক আলোচনা সারণি (Table) আকারে করা বাঞ্ছনীয়।

4) 9.16 অংশ্যাঙ্কিত অংশ দেখুন।

লক্ষ্য করুন, রবার্ট ককের মৌলিক নীতি প্রযোজ্য কেবলমাত্র সেই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে যাদের জীবাণুগুলিকে কৃষ্টিমাধ্যমে বিশুধ্ব জীবগোষ্ঠীরূপে (Pure culture) পাওয়া সম্ভব সনাক্তকরণের জন্য মৌলিক নীতির চারটি ধাপ সুনির্দিষ্ট ক্রমে মানতে হবে। চারটি ধাপের কথা সেইভাবেই লিখুন। মনে রাখবেন এই চারটি ধাপই যদি একই প্যাথোজেনের উপস্থিতি প্রমাণ করে তাহলে সেই নির্দিষ্ট রোগের ক্ষেত্রে সনাক্তকৃত প্যাথোজেনটিকে দায়ী করা যায়।

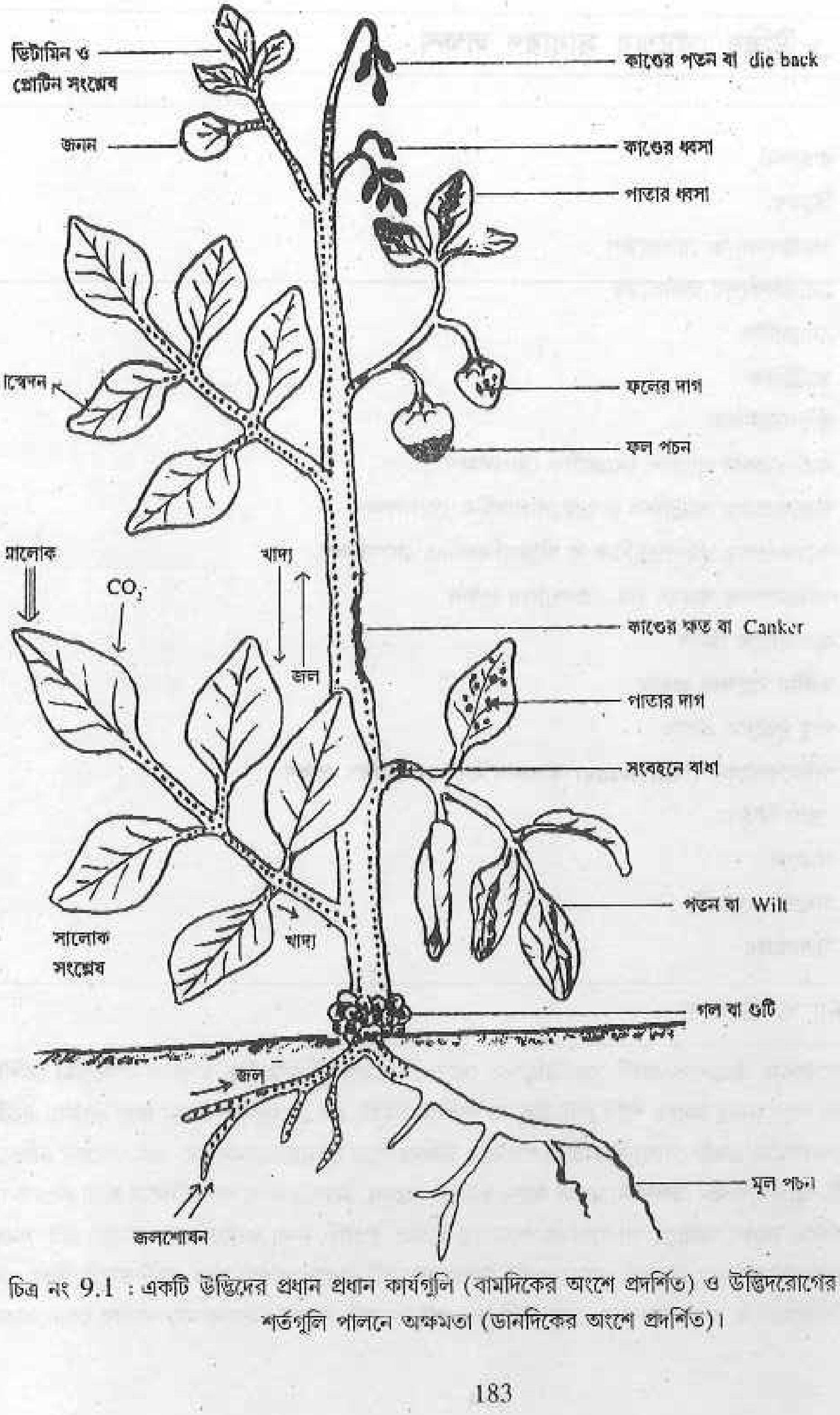

চিত্র নং 9.1 : একটি উদ্ভিদের প্রধান প্রধান কার্যগুলি (বামদিকের অংশে প্রদর্শিত) ও উদ্ভিদরোগের প্রভাবে সাধারণ শর্তগুলি পালনে অক্ষমতা (ডানদিকের অংশে প্রদর্শিত)।

একক 10 ❑ উদ্ভিদ রোগের সাধারণ লক্ষণ

গঠন

10.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

10.2 সনাক্তকরণ ও রোগলক্ষণ

10.3 রোগলক্ষণের প্রকারভেদ

10.3.1 নেক্রোটিক

10.3.2 অ্যাট্রফিক

10.3.3 হাইপারট্রফিক

10.4 কয়েকপ্রকার সাধারণ নেক্রোটিক রোগলক্ষণ

10.5 কয়েকপ্রকার অ্যাট্রফিক বা হাইপোপ্লাসটিক রোগলক্ষণ

10.6 কয়েকপ্রকার হাইপারট্রফিক বা অতিবৃদ্ধিজনিত রোগলক্ষণ

10.7 পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট রোগগুলির লক্ষণ

10.7.1 তাপমাত্রার প্রভাব

10.7.2 জলীয় বাষ্পের প্রভাব

10.7.3 বায়ু দূষণের প্রভাব

10.8 পরিপোষকের (Nutrients) অভাবজনিত রোগগুলির লক্ষণ

10.8.1 রোগ ত্রিভুজ

10.9 সারাংশ

10.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

10.11 উত্তরমালা

10.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য :

একটি রোগাক্রান্ত উদ্ভিদকে একটি সুস্থ উদ্ভিদের থেকে যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট চিহ্ন দ্বারা বা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট দ্বারা আমরা পৃথক বলে সনাক্ত করতে পারি সেই চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য সমূহই হল রোগলক্ষণ। মনে রাখা দরকার একটি রোগলক্ষণ যে কেবলমাত্র একটি রোগসৃষ্টিকারী উপাদানকে চিহ্নিত করে তা নয়। যেমন ধরা যাক, গাছের নেতিয়ে পড়া। এটি একটি অতি সাধারণ লক্ষণ যা একই সাথে ছত্রাক, পতঙ্গ, নিমাটোড বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রামণ, যান্ত্রিক আঘাতজনিত কারণ, মাটিতে পরিপোষক পদার্থের ঘাটতি ইত্যাদি নানা কারণে হতে পারে। এই সমস্ত উপাদানগুলি আলাদা আলাদাভাবে অথবা একত্রে একই রোগলক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। আর একটি জরুরী বিষয় এই যে, রোগলক্ষণ উদ্ভিদের যে অংশে দৃশ্যমান, রোগ উদ্ভিদের সেই অংশেই সীমাবদ্ধ একথা মনে করার কোন কারণ

নেই। রোগের উৎস থেকে দূরতর কোন অংশে রোগের প্রকাশ ঘটা সম্ভব। তাই মূল সংক্রামিত হলে পাতায় বর্ণহীনতা লক্ষ্য করা অস্বাভাবিক নয়। সেই কারণে কেবলমাত্র রোগলক্ষণ দেখে রোগ সনাক্ত করা কঠিন। আপাতভাবে রোগলক্ষণ বিহীন উদ্ভিদও বহুক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেটি অসনাক্ত থেকে যাবার এবং শস্যক্ষেত্রের ব্যাপক ক্ষতি করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- রোগ সনাক্তকরণের জন্য রোগলক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী নির্দেশ করতে পারবেন।
- রোগলক্ষণের প্রকারভেদ করতে সক্ষম হবেন।
- নেক্রোটিক লক্ষণ সমূহ, অ্যাট্রফিক বা হাইপোপ্লাসটিক লক্ষণসমূহ এবং হাইপারট্রফিক লক্ষণসমূহ এগুলি উদাহরণসহ বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অপরজীবি ঘটিত রোগসমূহের কারণ ও লক্ষণ নির্ধারণ করতে পারবেন।

10.2 সনাক্তকরণ ও রোগলক্ষণ

রোগাক্রান্ত উদ্ভিদটিকে সুস্থ উদ্ভিদের থেকে আলাদা করে চিনে নিতে গেলে রোগের লক্ষণগুলির সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। রোগলক্ষণকে আমরা রোগের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া বলতে পারি। সাধারণতঃ এই প্রতিক্রিয়ার একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশ আছে। স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ এগুলিও বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার অংশবিশেষ। সবগুলি প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিগত বাহ্যিক রূপকে আমরা রোগের লক্ষণ সমূহের *সহসমষ্টি* (Syndrome) বলে অভিহিত করে থাকি যার সম্পর্কে আপনারা পূর্ববতী এককে অল্পবিস্তর অবহিত হয়েছেন। রোগলক্ষণগুলি সুনির্দিষ্ট স্থানিক গঠনগত পরিবর্তন দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে। তখন তাদের বলে *আকৃতিগত* (lesional) *রোগলক্ষণ*। আবার রোগ যখন অস্বাভাবিক গঠন বা বহিরাকৃতি দ্বারা প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে *স্বভাবগত* (habitual) *রোগলক্ষণ*। বহুক্ষেত্রেই সনাক্তকরণের জন্য উভয়প্রকার লক্ষণকেই পর্যবেক্ষনের জন্য বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আবার সংক্রামিত রোগের ক্ষেত্রে সংক্রমণের পর পরই যে লক্ষণগুলি দেখা যায় পরবর্তীকালে প্রকাশিত রোগলক্ষণ তার চেয়ে ভিন্নতর হয়। **প্রথম প্রকাশ পাওয়া লক্ষণকে প্রাথমিক (Primary Symtoms) ও পরে প্রকাশ পাওয়া লক্ষণগুলিকে গৌণ (Secondary) রোগলক্ষণ নামে অভিহিত করা হয়।** রোগ সনাক্তকরণের জন্য উদ্ভিদগুলিকে এই কারণেই দীর্ঘতর সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

10.3 রোগলক্ষণের প্রকারভেদ

রোগলক্ষণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। নেক্রোটিক, অ্যাট্রফিক ও হাইপারট্রফিক।

10.3.1 নেক্রোটিক (Necrotic) রোগলক্ষণ

পরজীবি বা অপরজীবিয় রোগসৃষ্টিকারী উপাদানের ক্রিয়ায় যখন আক্রান্ত উদ্ভিদটির কোশকলার মৃত্যু ঘটে তখন এই মৃতকলার পচনজনিত রোগলক্ষণগুলিকে বলে নেক্রোসিস (Necrosis) বা পচন। উদাহরণস্বরূপ

উদ্ভিদের সবুজকলার মৃত্যুজনিত লক্ষণগুলির কথা বলা যায়। আক্রান্ত উদ্ভিদের পাতা প্রথমে হরিদ্রাভ, পরে পীতাভ এবং শেষ অবধি রক্তিম বর্ণ ধারণ করে এবং অবশেষে পাতার কোশগুলির মৃত্যু ও পচন ঘটে। এক্ষেত্রে পচনজনিত বর্হিলক্ষণ, গন্ধ সবগুলিকে একত্রে বলা হয় নেক্রোটিক বা পচনজনিত রোগলক্ষণ।

> *প্রান্তলিপি : ইংরাজি Lesion শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ হল "দাগ"। স্থানিকভাবে সীমাবদ্ধ মৃত বা রোগাক্রান্ত বর্ণহীন দাগবিশিষ্ট অঞ্চলকে বলে Lesion বা দাগ। এই দাগগুলির ভিত্তিতে রোগলক্ষণকে সুনিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা যায়। এরকম যে কোন অস্বাভাবিক দাগই সাধারণতঃ পচনে রূপান্তরিত হতে পারে।*

10.3.2 অ্যাট্রফিক (Atrophic) রোগলক্ষণ

সম্পূর্ণ উদ্ভিদদেহের বা আক্রান্ত অংশের কোশগুলির স্বাভাবিকের তুলনায় মন্থরভাবে কোশবিভাজনের ফলে (*হাইপারপ্লাসিয়া*, hyperplasia) অথবা কোশের মৃত্যু ও ক্ষয়ের ফলে যখন রোগাক্রান্ত উদ্ভিদটির বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় তখন সেই রোগলক্ষণকে বলে অ্যাট্রফিক রোগলক্ষণ। *খর্বতা* Dwarfism হল এই লক্ষণের সবচাইতে সাধারণ উদাহরণ। ভইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি সংক্রামক জীবাণু ছাড়াও অজীবজ কারণে যখন, মাটিতে খনিজ আয়নের অভাবে, তুষারপাতের দরুণ বা অতি উচ্চ বিকিরণ সম্পন্ন এলাকায় এ জাতীয় রোগলক্ষণ দেখা যায়। একে *হাইপোপ্লাসটিক রোগলক্ষণও* বলে থাকে।

10.3.3 হাইপারট্রফিক (Hypertrophic) রোগলক্ষণ

যখন আক্রান্ত উদ্ভিদটির কোশের অস্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধির (*হাপারট্রফি*, hypertrophy) অথবা কোশগুলির অস্বাভাবিক ভাবে দ্রুতহারে কোশবিভাজনের (*হাইপারপ্লাসিয়া*, hyperplesia) দরুণ অথবা উভয় কারণের সমন্বয়ে সামগ্রিক উদ্ভিদদেহে অথবা আক্রান্ত অংশে অতিবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, তখন তাকে বলে হাইপারট্রফিক রোগলক্ষণ। পরজীবি ও অজীবজাত উপাদান সমূহের ক্রিয়ায় এ ধরণের রোগলক্ষণ দেখা যায়।

10.4. কয়েকপ্রকার সাধারণ নেক্রোটিক রোগলক্ষণ

i) **বর্ণবিকার ঃ হরিদ্রায়ন (yellowing) ঃ** পাতা, কাণ্ড বা ফলের সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত অংশে গোলদাগ বা আঁচড়ের মত লম্বা হলুদ রঙের দাগ।

ii) **বর্ণবিকার ঃ পীতায়ন (browning) ঃ** উদ্ভিদের যে সমস্ত অংশে কলার মৃত্যুজনিত পচন পরিলক্ষিত হয় যে সমস্ত অংশে পীতবর্ণের দাগ দেখা যায়।

iii) **জল বিমোচন (hydrosis) ঃ** কোশ থেকে কোশান্তর রন্ধ্রে জল চুঁইয়ে যাবার দরুণ কলা বা উদ্ভিদের আক্রান্ত অংশ একটি ভেজা ভেজা জল চোঁয়ানো অংশের রূপ নেয়। বহু *নেক্রোটিক রোগলক্ষণের এটিই হল প্রথম দশা।*

> *প্রান্তলিপি ঃ রোগলক্ষণ সৃষ্টির পূর্ববর্তী পর্যায়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া ভাল। রোগজীবাণু বা রোগবীজের পোষক দেহে স্থানান্তরনকে বলে Transmission। রোগ বিদ্যার ভাষায় Transmission এবং বিস্তার বা Spread এক জিনিস নয়। কেন না স্থানান্তরকরণ মানেই রোগলক্ষণ প্রকাশ তা নয়। প্রকৃতিতে অজস্র নিষ্ফলা স্থানান্তকরণ ঘটে থাকে যার ফলে রোগ সৃষ্টি হয় না। আর বিস্তার বা Spread বলতে স্থানান্তকরণ এবং তজ্জনিত নিশ্চিত রোগসৃষ্টি বোঝায়। অর্থাৎ Spread বা বিস্তার হল সফলভাবে সংক্রমণের ক্ষেত্র প্রসারিত হবার পূর্বশর্ত।*

iv) নেতিয়ে পড়া (wilting) ঃ এক্ষেত্রে প্রথমে পাতা পরে বোঁটাস অংশ এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র উদ্ভিদটিই ঝুঁকে পড়ে। এই অবস্থা কেবলমাত্র দিবসকালীন হতে পারে এবং রাত্রিকালে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে অথবা স্থায়ী হতে পারে। স্থায়ীভাবে নেতিয়ে পড়লে উদ্ভিদটির অচিরেই মৃত্যু হয়। এই লক্ষণের কারণ একাধিক হতে পারে ঃ

(ক) মূলতন্ত্রে আঘাতজনিত কারণে।

(খ) সংবহনতন্ত্রে প্রতিবন্ধকতার দরুণ শুষ্কতার কারণে।

(গ) প্যাথোজেন কর্তৃক অধিবিষ (Toxin) নিঃসরণের কারণে।

উপরিউক্ত কারণের কোন একটির বা সবকয়টির সমন্বয়ে যখন উদ্ভিদের কোন রসস্ফীত অংশের কোশে জলের পরিমান হ্রাস পায় এবং কোশগুলি শিথিল হয়ে পড়ে তখন সংশ্লিষ্ট অঙ্গটিও ঝুঁকে পড়ে।

v) দাগ (spot) ঃ রোগাক্রান্ত অংশে বা সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদেহের বিভিন্ন অংশে নানা আকৃতিক দাগ দেখা যায় যেগুলি সাধারণতঃ পিঙ্গল হয় এবং একটি অপেক্ষাকৃত বর্ণহীন অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। ঐ অংশের কোশগুলি ক্রমশঃ মরে গিয়ে পচন দেখা দেয়। (চিত্র 10.1 a)

vi) পোড়া বা স্করচ্ (scorch) ঃ পাতার বা ফলের বড় অঞ্চল জুড়ে অনিয়তাকার পিঙ্গলবর্ণের মৃত কোশবিশিষ্ট অঞ্চল। খরা, অত্যাধিক রৌদ্রতাপজনিত উষ্ণতা অথবা অতিশীতল তাপমাত্রার প্রভাবে এ ধরনের রোগলক্ষণ দেখা যায়। (চিত্র 10.1 b) যে সমস্ত উদ্ভিদ অঙ্গে জলের পরিমাণ বেশি যেমন ফল, পাতা ইত্যাদি সহজেই উচ্চ তাপমাত্রায় এই লক্ষণ প্রদর্শিত করে।

প্রান্তলিপি ঃ রোগলক্ষণ রোগের বহিঃপ্রকাশ। রোগের ব্যাপকতা রোগলক্ষণ প্রকাশিত হবার ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। কখনও লক্ষণ একটি মাত্র উদ্ভিদের একটিমাত্র অংশে সীমাবদ্ধ, কখনও একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সেক্ষেত্রে ফসল হানির ব্যাপকতা সাধারণভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, কিন্তু কোন রোগ, তার লক্ষণগুলি প্রকাশের তীব্রতায় ভৌগোলিক বাধা অতিক্রমকারী বিস্তারের ব্যাপকতায় একটি উদ্ভিদগোষ্ঠীকে প্রায় উজাড় করে দেয় তখন তাকে আমরা বলি মহামারী (epidemic)। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত আইরিশ দুর্ভিক্ষ কেবল আলুর ধ্বসা রোগের মহামারীজনিত কারণে হয়েছিল এবং এর ফলে লক্ষাধিক মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছিল।

vii) বাষ্পদাহ বা স্ক্যালড্ (scald) ঃ উদ্ভিদের পাতা বা ফলের খোসায় ফ্যাকাসে রঙের বা সাদাটে দাগ যা দেখতে তরলের ছ্যাঁকা লাগা অংশের মতো লাগে। যেমন, আপেলের ত্বকে সূর্য-বাষ্পদাহ।

viii) ব্লচ (blotch) ঃ ফলে বা পাতায় উপরের স্তরের বিবর্ণতা। এক্ষেত্রে সামান্য পচনযুক্ত এই বিবর্ণ অঞ্চলগুলিতে ছত্রাকের কালো রঙের - রেণু ও অনুসূত্র পরিলক্ষিত হয়। (চিত্র 10.1 e)

ix) ধ্বসা বা ব্লাইট (blight) ঃ পরজীবি জীবাণুর প্রভাবে উদ্ভিদের পত্রবাহী অংশ বা পুষ্পবাহী অংশে পোড়া দাগের ন্যায় ক্ষত দেখতে পাওয়া যায়। আক্রান্ত অংশ মরে যায়। এবং মৃত কোশকলা প্রায়শই থকথকে আঠালো পিণ্ডসদৃশ অংশে পরিণত হয়। এই অংশ থেকে পচনশীল বস্তুর মত দুর্গন্ধ নির্গত হয়। আলুর *নাবি ধ্বসা* বা *জলদি ধ্বসা* রোগ এর উদাহরণ। (চিত্র 10.1 f)

x) ব্লাস্ট (blast) ঃ সাধারণত অপরিণত পুষ্পমুকুল বা পুষ্পমঞ্জরী বা ফলের হঠাৎ মৃত্যু দ্বারা এই রোগলক্ষণ সূচিত হয়।

xi) **ডাই-ব্যাক (die-back)** ঃ উদ্ভিদের বায়বীয় অংশের আগা থেকে ক্রমশ গোড়ার দিকে মৃত্যু ও পচন দেখা যায়। পরিপোষকের অভাবজনিত কারণ অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে প্যাথোজেনের সংক্রমণের দরুণ এই রোগ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যে কোন সুস্থ উদ্ভিদে পরিপোষকের অভাবে এই লক্ষণ দেখা দিতে পারে। (চিত্র 9.1)

xii) **উলম্ব দাগ (streak)** ঃ পাতার কিনারা বরাবর বা কাণ্ডের গায়ে লম্বা সরু দাগ যা জলবিমোচী, হরিদ্রাভ বা পচনজনিত দাগ এই লক্ষণের বৈশিষ্ট।

xii) **গোলাকৃতি দাগ (spot)** ঃ বহু রোগের সাধারণ লক্ষণ এটি। এক্ষেত্রে কমবেশি গোলাকৃতি দাগ পাতায় পুষ্পদলে, কাণ্ডে, ফলে বা পুষ্পে দেখা যায়। আক্রান্ত অঞ্চলের মৃত্যু ও পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করা এই লক্ষণের অপর অনুসঙ্গ। অবশেষে দাগগ্রস্ত অংশটি শুকিয়ে যায়। কোন কোন সময় কেন্দ্রস্থ মৃত শুষ্ক অংশকে ঘিরে রক্তিম বা হরিদ্রাভ এক বা একাধিক স্তর থাকতে পারে। এই স্তরবিন্যাস সুনির্দিষ্ট অভিকেন্দ্রিক বৃত্তাকার কয়েকটি অঞ্চলের রূপ নিতে পারে। সাধারণতঃ দাগগুলি গোলাকার হলেও কোন কোন সময় দাগগুলি কৌণিক হতে পারে যেমন দেখা যায় তুলা গাছের পাতায়। আক্রান্ত অংশের নাম অনুযায়ী দাগগুলির *পত্র দাগ* (leaf-spot), *কাণ্ড দাগ* (stem-spot), *ফল-দাগ* (fruit-spot) ইত্যাদি নামকরণ করা হয়েছে। আবার দাগগুলির বর্ণ অনুযায়ী সেগুলিকে *পিঙ্গল দাগ* (brown spot) বা *কৃষ্ণ বর্ণ দাগ* (black spot) ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা যায়। (চিত্র 10.1a ও d)

> *প্রান্তলিপি ঃ উদ্ভিদ রোগবিদ্যার যে শাখায় মহামারী সৃষ্টিকারী রোগের কারণ, উৎস ও বাহ্যিক এবং রাসায়নিক শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে বলা হয় epidemiology বা মহামারীবিজ্ঞান। রোগাবিদ্যার এই শাখায় মূলতঃ প্রায়োগিক বিষয়গুলি অর্থাৎ ফসল, প্যাথোজেন ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি আলোচনা করা হয়।*

xiv) **শট-হোল বা ছিদ্র (spot hole)** ঃ পাতা এবং বিশেষ করে পুরু শক্ত বহিঃস্তক বিশিষ্ট ফলের ক্ষেত্রে অনেক সময় পচনশীল কলা বাকী অংশের তুলনায় সংকুচিত হয়ে পৃথকীভূত হয়ে যায় এবং অবশেষে খসে পড়ে। ফলে ঐ অংশে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হয় যার সাথে বন্দুকের গুলি দ্বারা সৃষ্ট ছিদ্রের সাদৃশ্য আছে (চিত্র 10.1 c) আপেলের ক্ষেত্রে এটি খুব সাধারণ লক্ষণ।

> *প্রান্তলিপি ঃ রোগবৃদ্ধির হারকে (r) দ্বারা চিহ্নিত করার একটি সুপরিচিত পদ্ধতি চালু আছে। বহুচক্রী বা Polycyclic প্যাথোজেনের ক্ষেত্রে r এর মান দিনপ্রতি 0.1 থেকে 0.5 উদাঃ ভুট্টা গাছের পাতার ধ্বসা রোগ। অপরপক্ষে বহুবর্ষব্যাপী (polycyclic) প্যাথোজেনের ক্ষেত্রে r এর মান 0.02 থেকে 2.3/ প্রতিদিন। উদাঃ ডাচ এলম (Dutch Elam) রোগ। এর মানে হল প্রথম ক্ষেত্রে রোগ বা রোগবীজ উৎপাদনের হার দিন প্রতি 10 থেকে 30 শতাংশ বৃদ্ধি ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই হার 2 থেকে 230 শতাংশ বৃদ্ধি। বোঝা শক্ত নয় যে উভয় ক্ষেত্রেই এই হার প্রকাশিত রোগলক্ষণের ব্যাপকতার সমানুপাতিক।*

xv) **টেঁড়ি রোগ বা অ্যানথ্রাকনোজ (anthracnose)** ঃ পাতার নিম্নতলে শিরা বরাবর কোন কোন সময় কৌণিক দাগ দেখা যায়। দাগগুলি ক্রমশঃ প্রথম আবির্ভাবের স্থল থেকে পার্শ্ববর্তী অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ বিপরীত পৃষ্ঠেও দেখা যায়। পত্রবৃন্ত, কাণ্ড এমনকি ফুলও শেষ অবধি আক্রান্ত হয়। টম্যাটোর টেঁড়ি রোগ এই লক্ষণের সাধারণ উদাহরণ। (চিত্র 10.1h)

xvi) **কূপ (pitting)** ঃ ফল, কন্দ বা এই জাতীয় খাদ্যসঞ্চয়ী অংশে অনেক সময় উপরিত্বকের ঠিক নীচে মাংসল অংশ মরে যাবার ফলে ঐ অংশে বাইরে থেকে একটি অবতল পৃষ্ঠ চোখে পড়ে।

xvii) **পচন (rot)** ঃ এই রোগলক্ষণ আক্রান্ত কলার মৃত্যু পরবর্তী পচন ও গলনের দশাগুলিকে চিহ্নিত করে। মৃত কলার সেলুলোজ, লিগনিন ও অন্যান্য পদার্থ নানাবিধ উৎসেচকের ক্রিয়ায় ভেঙ্গে গিয়ে বা পাচিত হয়ে গিয়ে এই অবস্থা সৃষ্টি করে। বেশিরভাগ পচনের কারণই হল পরজীবি প্যাথোজেন যেমন ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া। তবে অজীবজাত বহু কারণে ও এই ধরনের পচন দেখা যায়। তরকারী বা ফলে পরিবহনকালে যান্ত্রিকক্ষত সৃষ্টি হলেও এই ধরনের পচন আমাদের প্রায়ই চোখে পড়ে।

পচনের প্রকৃতি হল পচনশীল অংশ, পচনের কারণ এবং পরিবেশগত কারণগুলির উপর নির্ভরশীল। মূলতঃ দু'রকমের পচন আমরা দেখতে পাই ঃ **শ্বেত পচন ও পিঙ্গল পচন।**

উভয় প্রকার পচনের জন্যই মূলতঃ *অ্যাসকোমাইসিটিস* ও *বেসিডিওমাইসিটিস* গোষ্ঠীর ছত্রাক দায়ী। ছত্রাকের অনুসূত্র আক্রান্ত অংশের গভীরে প্রবেশ করে এবং সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে বাহিত হয়ে কোশ থেকে কোশান্তরে ছড়িয়ে যায়। **শ্বেত পচনের ক্ষেত্রে কোশপ্রাচীরের লিগনিন নামক যৌগ সরলীকৃত হয়ে যায় এবং পিঙ্গল পচনের ক্ষেত্রে সেলুলোজ ও হেলিসেলুলোজ** এর মত কোশপ্রাচীরের অন্যান্য উপাদানগুলি পাচিত হয়ে যায়।

পচনশীল অংশের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে পচন তিন প্রকার ঃ **শুষ্ক পচন, সিক্ত পচন ও নরম পচন** আসবাব বা গৃহকাঠামো নির্মাণকারী কাঠে যে পচন দেখা দেয় তাকে শুষ্ক পচন বলে যদিও এই নামটি সুপ্রযুক্ত নয়, কেন না ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ ভিন্ন এই জাতীয় পচন ঘটা সম্ভবই নয়। কখনও কখনও গাছের গুঁড়িতে বা কাণ্ডের গায়ে অত্যন্ত ভঙ্গুর অংশ সৃষ্টি হয় যাতে সেটি আলগাভাবে টানলেই মূল উদ্ভিদদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। এই পচনকে বলে নরম পচন, এক্ষেত্রে ছত্রাক মূলতঃ গৌণ কোশপ্রাচীরকে পাচিত করে কলার অন্তর্গত কোশগুলির অবিচ্ছিন্নতাকেই নষ্ট করে দেয়। সিক্ত পচন দেখা যায় ভেজা এবং নর পচনশীল অংশে। এই পচনের ক্ষেত্রে গন্ধ একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ।

আক্রান্ত অংশের বিশেষত্ব অনুযায়ী পচনকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

- **মূলত পচন** ঃ মূল বা মৃদগত সঞ্চয়ী মূলের পচন। (চিত্র 10.2 a)
- **পাদপ পচন** ঃ কাণ্ডের মাটি সংলগ্ন গোড়ার অংশে যখন যখন পচন দেখা যায় তখন তাকে পাদপ পচন বা foot rot বলে। এক্ষেত্রে পচন যদিও ঐ অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে তথাপি গোড়া বেষ্টনকারী পচনশীল অংশের মধ্য দিয়ে জল পরিবহন বাধাপ্রাপ্ত হবার দরুণ সমগ্র উদ্ভিদটিই মরে যায়।
- **পত্র বা কাণ্ড পচন** ঃ নরম কাণ্ড বা পাতায় যখন পচন দেখা দেয়, যেমন আলুর নাবি ধ্বসা রোগের ক্ষেত্রে।
- **মুকুল পচন (bud rot)** ঃ মাংসল মুলুকের পচন। যেমন, নারকেল গাছের মুচির পতন।
- **ফল পচন** ঃ ফলের পচন অবশ্য সর্বদা প্যাথোজেনের একার ভূমিকায় হয় না বরং এটি প্যাথোজেন ও পরিবেশগত বিক্রিয়ার যৌথ প্রকাশ।

- **কাণ্ডের কেন্দ্রস্থ স্তম্ভের পচন (heart rot) ঃ** কাণ্ডের ভেতরকার মৃতকোশ দ্বারা গঠিত কাষ্ঠল (সার কাঠ যে অংশকে বলে) অংশ যখন ছত্রাকের আক্রমণে স্থানে স্থানে পচে যায় তখন এই ধরনের পচনই তার কারণ। এই ধরণের কাঠকে বলে অসার কাঠ। (চিত্র)

- **কাণ্ডের বহিঃস্থ অংশের পচন (sap rot) ঃ** কাণ্ডের বাহিরের দিকে সজীব কোশ দ্বারা নির্মিত অংশের পচন। এটি স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকে সম্পূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছটি মরে যায়।

xviii) **ক্ষরণ (exudation) ঃ** পচনশীল অংশ থেকে বিভিন্ন বস্তুর ক্ষরণ একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা নরম পচনের ক্ষেত্রে গলিত কলার অংশ রোগাক্রান্ত এবং থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। পচা আলুর ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই এই লক্ষণ দেখতে পাই। আবার নানাবিধ দাগজাতীয় রোগলক্ষণের ক্ষেত্রে জীবাণুর অংশ সহ (যেমন ছত্রাকের রেণু) উদ্ভিদের কোশরস কখনও কখনও দাগটির উপর একটি প্রলেপের মত আবরণী তৈরি করে।

আর একধরনের ক্ষরণ হয় ক্ষতস্থান থেকে। সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কোশকলার শর্করা কোহল সন্ধান প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে তরল রসের আকারে চুঁইয়ে পড়তে থাকে।

xix) **ক্যাঙ্কার (canker) ঃ** কাণ্ডের কর্টেক্স অংশে, ফলে বা পাতায় কখনও কখনও অবতল পচনশীল অংশ চোখে পড়ে। এই ক্ষতগুলি আকারে বড় এবং সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবধ থাকে। সীমাবদ্ধ এই অংশ অকে সময় একটি ভিড় সৃষ্টি করে সুস্থ অংশ থেকে আলাদা হয়ে যায়। (চিত্র ৭.1 দ্রষ্টব্য)

ক্যাঙ্কর আক্রান্ত অঞ্চল সাধারণতঃ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং কাষ্ঠল অংশটি তখন দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকাংশ ক্যাঙ্কার ছত্রাকজনিত কারণে হয়ে থাকে। তবে অসংক্রামক উপাদান যথা তুষারক্ষত, সৌরবাষ্পদাহ ইত্যাদি কারণেও ক্যাঙ্কর দেখা যায়। বল্কলটি উন্মোচিত হয়ে যাবার পর অন্তঃস্থ কাষ্ঠল অংশও বাঁচে না যদিও সব সময় যে ছত্রাক ততদূরে পৌঁছাতে পারে তা কিন্তু নয়।

ক্যাঙ্কার এক বর্ষীয় বা বহুবর্ষীয় হতে পারে। বহুবর্ষীয় ক্যাঙ্কার অত্যন্ত হানিকর কেননা একবর্ষীয় ক্যাঙ্কারে ক্ষতিগ্রস্ত বল্কল বর্ষশেষে আবার নতুন কলার উৎপত্তির ফলে পুর্ণগঠিত হবার সুযোগ থাকে, কিন্তু বহুবর্ষীয় ক্যাঙ্কারে সংক্রামক্টি বছরের পর বছর পোষক দেহে থেকে যাবার দরুণ ক্রমনশঃ সমগ্র উদ্ভিদদেহটিকে সংক্রামিত করে ফেলে। লেবু গাছের (Citrus Canker) এই লোগলক্ষণ সহজেই চোখে পড়ে।

xx) **হাজা রোগ (damping off) ঃ** এক্ষেত্রে চারাগাছগুলির ভূমিসংলগ্ন অংশে দ্রুত পচন ঘটার দরুণ চারাটির উপরিভাগ আনত হয়ে পড়ে এবং মরে যায়। এর পচনশীল অংশটি *সিক্ত পচন* (wet rot) জাতীয় রোগলক্ষণ প্রদর্শিত করে। *Pythium* বা *Phytophthora* ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত সবজির চারায় এই লক্ষণ হামেশাই দেখা যায়।

অনুশীলনী - 1

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

(a) অতিবৃদ্ধিজনিত দশাকে বলে ________।

(b) স্বল্পবৃদ্ধিজনিত দশাকে বলে ________।

(c) উদ্ভিদকলার পচনজনিত অবস্থাকে বলে ________।

(d) প্যাথোজেন নিঃসৃত অধিবিষের প্রভাবে হয় ________।

(e) অধিক তাপমাত্রার প্রভাবে দেখা দেয় ________।

2. লক্ষণগুলির সাথে লক্ষণগুলির নামকে সঠিক মেলান।

(a)	ব্লচ	(i)	কাণ্ডের ভঙ্গুরতা
(b)	ডাই-ব্যাক	(ii)	নিম্নতলে শিরা বরাবর কৌনিক দাগ
(c)	অ্যানথ্রাকনোজ	(iii)	কাণ্ডের উপরিভাগ আনত হয়ে পড়া
(d)	ক্ষরণ	(iv)	ফল বা পাতায় বিবর্ণতা
(e)	ক্যাঙ্কার	(v)	উদ্ভিদের আগা থেকে গোড়ার দিকে ক্রমশ পচন
(f)	হাজা রোগ (damping off)	(vi)	পচনগ্রস্ত অংশ থেকে তরল পদার্থ নিঃসরণ।

10.5 কয়েক প্রকার হাইপোপ্লাসটিক বা অ্যাট্রফিক রোগলক্ষণ

i) **কর্বুরতা (variegation)** ঃ উদ্ভিদের পাতা বা অন্যান্য সবুজ অংশে স্থানে স্থানে ক্লোরোফিল সংশ্লেষ না হলে বা সংশ্লেষ পদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হলে এই সব অংশ সাদাটে ছোপ ছোপ আকৃতি ধারণ করে। এই লক্ষণ উদ্ভিদের জীনগত কোন ত্রুটিকেই নির্দেশিত করে।

ii) **পাণ্ডুরোগ (chlorisis)** ঃ উদ্ভিদের ক্লোরোফিলবাহী অংশ যখন স্বাভাবিকের তুলনায় কম সবুজ কণা ধারণ করে পাণ্ডুর হয়ে যায় তখন সেই রোগলক্ষণ ক্লোরোসিস নামে পরিচিত। এই পাণ্ডুরতা অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ অথবা সমগ্র উদ্ভিদদেহে ব্যাপৃত হয়ে যায়। (10.c a)

iii) **শিরা-নিকাশ (vein clearing)** ঃ ভাইরাসঘটিত সংক্রমণের সবচাইতে বেশিমাত্রায় প্রাপ্তব্য রোগলক্ষণ হল এটি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিরার দৈর্ঘ্য বরাবর সবুজ কণা সংশ্লেষের পরিমাণ লক্ষ্যনীয়ভাবে হ্রাস পায় এমনকি এই সমস্ত অংশ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ হয়ে যেতে পারে। (চিত্র 10.3 c)

iv) **বর্ণালী বা মোজাইক (mosaic) :** এটি বস্তুতপক্ষে একধরনের ক্লোরোসিস্ যেখানে পাণ্ডুর অংশ ও গাঢ় সবুজ অংশ একে অন্যের পাশাপাশি থেকে পাতায়, ফলে বা অন্য সবুজ অংশে নানারকম আকার বৈচিত্র সৃষ্টি করে। (চিত্র 10.3 d)

v) **বর্ণহীনতা (achromatosis) :** ক্লোরোফিলভিন্ন অন্য সমস্ত রঞ্জক পতার্থ সৃষ্টি যখন ব্যাহত হয় তখন কোন উদ্ভিদ অঙ্গ স্বাভাবিক বর্ণহীনতায় ভোগে। যেমন, ছত্রাকের আক্রমণে আপেলের রক্তিমবর্ণ ধারণে ব্যর্থতা।

vi) **খসে পড়া (abortion) :** উদ্ভিদের কোন একটি অঙ্গ আংশিকভাবে বৃদ্ধির পর পূর্ণতা-প্রাপ্তির আগেই যদি বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় তখন সেই অংশটি খসে পড়ে। যেমন, রাই শস্যের গর্ভাশয় আরগট (ergot) রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাকের আক্রমণে খসে পড়ে, ফলে দানা গঠিত হয় না।

vii) **অবদমন (Suppression) :** কোন অঙ্গ সংক্রমণ জনিত কারণে আদৌ গঠিত হতে না পারা।

viii) **এটিওলেশন বা এসিওলেশন (etiolation) :** এটি একক রোগলক্ষণ না বলে একটি লক্ষণ সহসমষ্টি বলাই ভাল। এক্ষেত্রে পাতা ও পুষ্পমঞ্জরী অত্যন্ত খর্ব হয়ে যায়। সবুজ কণা কম সংশ্লেষিত হয় এবং কাণ্ড অতিরিক্ত লম্বা হয়ে যায়। ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলে ডালিয়ার ক্ষেত্রে এই লক্ষণ হামেশাই চোখে পড়ে। প্রধানতঃ শারীরবৃত্তীয় কারণে হলেও এই লক্ষণ ছত্রাকঘটিত কারণেও হতে পারে।

ix) **কুঞ্চন (Wrinkling) :** এই লক্ষণটি সর্বদা ক্লোরোসিসের সাথে সহলক্ষণ হিসাবে আবির্ভূত হয়। ক্লোরোসিস আক্রান্ত অংশটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবার ফলে এবং একই সাথে সবুজ অংশের অতিবৃদ্ধির ফলে সাধারণতঃ পাতায় এই লক্ষণ দেখা যায়। (চিত্র 10.3 e)

x) **খর্বতা (Dwarfing) :** সমগ্র উদ্ভিদটি বা উদ্ভিদ অঙ্গগুলি স্বাভাবিক এর তুলনায় কম পরিস্ফুটিত হলে উদ্ভিদটি অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয়। (চিত্র 10.3 d)

ix) **গোলাপাকার ধারন (Rosetting) :** আক্রান্ত উদ্ভিদটির পর্বমধ্য দৈর্ঘ্যে না বাড়তে পারার দরুণ বা কাণ্ডের শাখা প্রশাখার দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি অস্বাভাবিক রকমের কম হবার দরুণ সমগ্র পত্রবাহী বীটপ অংশটি একটি গোলাপাকার ধারন করে। (চিত্র 10.3 f)

অনুশীলনী - 2

1. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটিতে দাগ দিন**

   (a) এটি এক ধরনের ক্লোরোসিস যেখানে সবুজ অংশ ও পাণ্ডুর অংশ পাতায় পাশাপাশি থাকে। (বর্ণালী/কর্বুরতা/বর্ণহীনতা)।

   (b) এই রোগে রাই শস্যের দানা পূর্ণতা পাতার আগেই খসে পড়ে। (খর্বতা/আরগট/ কুঞ্চন)।

   (c) উদ্ভিদের পাতায় যখন সামগ্রিকভাবে ক্লোরোফিল সংশ্লেষ স্বাভাবিকের তুলনায় কম হয় তখন তাকে বলে (কর্বুরতা/কুঞ্চন/ ক্লোরোসিস)।

2. দুই এক কথায় কারণ নির্দেশ করুন ঃ

(a) ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলে ডালিয়ার পুষ্পমঞ্জরী অত্যন্ত ছোট হয়ে যায়।

(b) ক্লোরোসিস আক্রান্ত পাতায় কুঞ্চন দেখা যায়।

(c) আপেলের ক্ষেত্রে ফল কখনও কখনও স্বাভাবিক রক্তিম বর্ণ ধারণে ব্যর্থ হয়।

10.6 কয়েক প্রকার হাইপারট্রাফিক বা অতিবৃদ্ধিজনিত রোগলক্ষণ

i) **পুর্নভবন (restoration) ঃ** উদ্ভিদের স্বাভাবিক লুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলি ছত্রাকের আক্রমণে পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয়ে একটি গঠনগত অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে স্ত্রী পুষ্পের লুপ্তপ্রায় পুংকেশর পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া বা পুংপুষ্পের গর্ভাশয় গঠিত হবার মত ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

ii) **প্রোলেপসিস (prolepsis) ঃ** যখন মুকুল পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই তার থেকে পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাণ্ড গঠিত হয়।

iii) **রূপান্তরণ (alteration) ঃ** পুষ্প বা পুষ্পমঞ্জরী যখন রূপান্তরিত হয়ে ভিন্নতর আকার ধারণ করে। স্মাট রোগের ছত্রাকের আক্রমণে আখ গাছের পুষ্পমঞ্জরী সম্পূর্ণভাবে কালো ধূলোর মত অজস্র গুঁড়ো গুঁড়ো রেণু দ্বারা আবৃত দুর্বল কাঠির মত অংশে রূপান্তরিত হয়।

iv) **পতন (abscission) ঃ** পাতা, ফুল বা ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই ভঙ্গুর একটি কোশস্তর গঠনের ফলে খসে পড়ে।

v) **হেটোরোটপি (heterotopy) ঃ** অস্বাভাবিক অঞ্চলে কোন অঙ্গের স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন কাণ্ডের বায়বীয় অংশে আলুর কন্দের গঠন।

vi) **গল (gall) ঃ** উদ্ভিদের কোন বিশেষ অংশের কোশগুলির অতিবৃদ্ধির দরুণ স্ফীত অনিয়তাকার, বিকৃত গঠন পরিলক্ষিত হয়। বহুরকম নামে এই অংশগুলি পরিচিত। ক্ষুদ্রাকার গঠনগুলি *আঁব* বা *গুটি* (wart) এবং বৃহদাকার গঠনগুলি *গিট* বা *গ্রন্থি* (knot) নামে পরিচিত। (চিত্র 10.4 a) টম্যাটো গাছর গল, সরষের স্ফীত মূল (club root) এই রোগের বহিঃপ্রকাশ।

vii) **ফোসকা (Blister) ঃ** বহু উদ্ভিদের পাতায় আমরা অসংখ্য ফোসকা সদৃশ সাদা সাদা ক্ষত দেখতে পাই। ক্ষতগুলি ছত্রাকের সংক্রমণের জন্যই সৃষ্টি হয় এবং ছত্রাকের রেণু উৎপাদনের পর ফেটে গিয়ে রেণুগুলি বাহিরে ছড়িয়ে পড়ে। (চিত্র 10.4 c) আক্রান্ত দেবদারু বা অশ্বত্থ গাছে *Albugo* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই লক্ষণ চোখে পড়ে।

viii) **কুঞ্চন (curling) ঃ** কাণ্ড বা পাতায় এই ধরনের রোগলক্ষণ অতিবৃদ্ধি ও স্বল্পবৃদ্ধির সমন্বয়ে হয়। পাতায় উপরিতলের স্বল্প বৃদ্ধি ও নিম্নতলের কোশগুলির অতিবৃদ্ধির দরুন পাতা কুঞ্চিত হয়ে পড়ে। একইরকম লক্ষণ কাণ্ডেও দেখা যায়।

ix) স্ক্যাব (scab) ঃ উদ্ভিদের খাদ্যসঞ্চয়কারী অংশে বা ফলে সংক্রমণজনিত কারণে গোলাকার, সামান্য উঁচু উঁচু এবং অমসৃণ উপবৃদ্ধি দেখা যায়। সাধারণতঃ বহিঃস্তক বা কর্টেক্সের কলার অতিবৃদ্ধির ফলে এই জাতীয় গঠন দেখা যায়। আপেলের বা আলুর এই ধরনের ক্ষত প্রায়ই চোখে পড়ে (চিত্র 10.4 b)

x) উইচেস ব্রুম (Witches broom) ঃ পরজীবি সংক্রমণের ফলে রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের স্ফীত কাণ্ড থেকে সমান্তরালভাবে বহুসংখ্যক শাখা নির্গত হয়ে অংশটিকে ঝাঁটার মত দেখতে লাগে (চিত্র 10.4 d) *Taphrina* ছত্রাক বা *Corynebacterium* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই রোগলক্ষণ দেখা যায়।

অনুশীলনী - 3

1. ডানদিকে অংশের সাথে বামদিকের অংশ সঠিক ভাবে যুক্ত করুন ঃ

a) রূপান্তরন	i) পাতার উপর ও নিম্নতলে বৃদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন হার।
b) পুর্নভবন	ii) পুষ্পমঞ্জরীর স্মাট রোগে প্রাপ্ত দশা
c) গল	iii) আঁব বা গুটি আকৃতির গঠন
d) পতন	iv) পুং পুষ্পের গর্ভাশয় গঠন
e) কুঞ্চন	v) ভঙ্গুর কোষস্তর গঠন

2. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

a) উদ্ভিদের খাদ্যসঞ্চকারী অংশে গঠিত উপবৃদ্ধিকে বলে ________।

b) আলু গাছের বায়বীয় অংশে আলু গঠিত হওয়াকে বলে ________।

c) অপরিণত মুকুল থেকে যখন পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাণ্ড গঠিত হয় তখন তাকে বলে ________।

d) ছত্রাকের আক্রমণে কাণ্ড যখন ঝাঁটার আকৃতি ধারণ করে তখন সেটি ________ নামে পরিচিত।

e) উদ্ভিদের পাতায় গঠিত ফোসকার ন্যায় অংশগুলিকে বলে ________।

10.7 পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট রোগগুলির লক্ষণ

এই পর্যায়ে আমরা ইতিপূর্বেই বিভিন্ন রোগলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট রোগগুলির লক্ষণ কি প্রধান তিন প্রকার রোগলক্ষণের মধ্যে পড়ে না? অবশ্যই পড়ে, কিন্তু এই লক্ষণগুলিকে পরিবেশের উপাদান বা সংক্রামক উপাদান থেকে সৃষ্ট কিনা-সেভাবে সঙ্গে সঙ্গে সনাক্ত করে নেওয়া

মুশকিল। আমরা যদি পরিবেশের উপাদানগুলিকে এবং তাদের প্রভাবজনিত লক্ষণগুলিকে আলাদা করে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে বোধ হয় সুবিধা হয়।

সমস্ত উদ্ভিদই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের একটি নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে আদর্শভাবে বাঁচে। এই উপাদানগুলি হল তাপমাত্রা, মাটির জলীয় উপাদান, মাটির পরিপোষক উপাদান, আলোক, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বায়ুতে দূষণকারী পদার্থের পরিমাণ ইত্যাদি। এই সমস্ত উপাদানগুলির পরিমাণ বা গঠন যখন উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে হানিকারক হয় তখন উদ্ভিদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট রোগলক্ষণ প্রকাশিত হয়। অজীবজ হবার দরুণ রোগটি সংক্রামিত হতে পারে না, তবে উদ্ভিদের বৃদ্ধির যে কোন পর্যায়ে পরিবেশগত উপাদানটির কুপ্রভাব দেখা দিতে পারে তা সে বীজ, অঙ্কুর, পুষ্পবাহী বা ফলবাহী যে কোন দশাই হোক না কেন?

10.7.1 তাপমাত্রার প্রভাব :

উদ্ভিদের তাপমাত্রার সহনশীলতার স্তর 1^0C থেকে 60^0C পর্যন্ত বিস্তৃত যদিও 15^0C থেকে 30^0C এর মধ্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। অবশ্য কোন তাপমাত্রায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভাল হবে তা একান্তভাবেই প্রজাতিটির উপর নির্ভরশীল। তাই যে তাপমাত্রায় ধানের বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ সেই একই তাপমাত্রায় মূলা, কপি বা গাজরের চাষ ব্যাহত হয়। অঙ্কুর দশার উদ্ভিদ পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ অপেক্ষা অধিকতর সংবেদনশীল; আবার কাণ্ডের তুলনায় ফুল বা মুকুল অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উচ্চতর তাপমাত্রার প্রভাবে সাধারণতঃ *সূর্যবাষ্পদাহ* জাতীয় লক্ষণ দেখা যায়। এছাড়া উচ্চ তাপমাত্রা ও কম অক্সিজেনজনিত কারণে আলু বা কন্দজাতীয় ফসলের অর্ন্তভাগে *কৃষ্ণবর্ণ দাগ* (Black heart) দেখা যায়। কম তাপমাত্রাজনিত ক্ষতি অবশ্য তুলনায় অনেক ব্যাপক। তুষারক্ষত জনিত চারাগাছের মৃত্যু, মুকুলের মৃত্যু, পুষ্প বা ফলের পচন শীতপ্রধান দেশের অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের *নেক্রোসিস* যথা *ব্লচ* বা *বলয়াকৃতি পচন* দেখা যায়। (চিত্র 10.5)

10.7.2 জলীয় বাষ্পজনিত প্রভাব :

জলীয় বাষ্প হ্রাস পেলে খর্বতা, ডাই-ব্যাক, পত্রমোচন, নেতিয়ে *মাটিতে পড়া* (Wilting) ও মৃত্যু পরিলক্ষিত হয়। বাতাসের আর্দ্রতা হ্রাস পেলে *স্করচ* (Scorch) বা পোড়া (Burn) জাতীয় রোগলক্ষণ দেখা যায়।

10.7.3 বায়ুদূষণজনিত প্রভাব :

বায়ুদূষণের উপাদানগুলি এবং তাদের প্রভাবগুলি নিম্নলিখিত সারণিতে দেখানো হল :

সারণি—10.1

বিভিন্ন বায়ুদূষক উপাদান তাদের প্রভাবজনিত রোগলক্ষণ

বায়ুদূষক	উৎস	লক্ষণ
ওজোন (O_3)	যানবাহনের ধোঁয়া, বায়ুস্তরের স্ট্যাটোস্ফিয়ার স্তর	পাতায় ক্লোরোসিস। পাতার উপরিতলে দাগ (spot)। পত্রমোচন ও খর্বতা
পার অক্সিঅ্যাসিল নাইট্রেট (PAN)	যানবাহন ও ইঞ্জিনের ধোঁয়া	পাতায় সাদা, রৌপ্যবর্ণ বা ব্রোঞ্জ রঙের দাগ

বায়ুদূষক	উৎস	লক্ষণ
সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	কারখানার ও যানবাহনের ধোঁয়া	ক্লোরোসিস ও বর্ণবিকার
নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2)	চিমনির ধোঁয়া	বর্ণহীনতা এবং বৃদ্ধির অবদমন
হাইড্রোজেন ফ্লুওরাইড (HF)	কারখানাজাত বর্জ্য	দ্বিবীজপত্রীর পত্রফলকের প্রান্ত ভাগের এবং একবীজপত্রীর পত্রশীর্ষকের পিঙ্গল বর্ণ ধারণ
ক্লোরিন (Cl) এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl)	তৈল শোধনাগার, কাঁচ কারখানা, পোড়া প্লাসটিকের ধোঁয়া	বতার বিবর্ণতা, শিরা বরাবর পচনশীল দাগ। অপরিণত পত্রমোচন।
ইথিলীন (C_2H_4)	গাড়ির ধোঁয়া, গ্যাসের জ্বলন, তৈল জ্বালানির জ্বলন	খর্বতা, পত্রমোচন, ফুলের সংখ্যাহ্রাস।
ধূলো ও ছাই	সিমেন্ট কারখানা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	ক্লোরোসিস, বৃদ্ধির হার হ্রাস, মৃত্যু

10.8 পরিপোষকের অভাবজনিত লক্ষণ :

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য যে সব অতিমাত্রিক ও স্বল্পমাত্রিক মৌল দরকার হয় তাদের অভাবনিত ফল নিজের সারণিতে দেখানো হল। (চিত্র 10.6)

সারণি—10.2

বিভিন্ন মৌলের কাজ ও তাদের অভাবজনিত ফল

মৌল	মৌলের কাজ	অভাবজনিত ফল
নাইট্রোজেন (N)	দেহ গঠনে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের উপাদান	বৃদ্ধি হ্রাস, পাণ্ডুর বর্ণ, কাণ্ডের খর্বতা
ফসফরাস (P)	নিউক্লিক অ্যাসিডের উপাদান ATP এর উপাদান	বৃদ্ধির হার হ্রাস, পাতার রঙ নীলাভ সবুজ, কখনও কখনও লালচে আভাযুক্ত। খর্বতা।
পটাসিয়াম (K)	বহু বিপাকক্রিয়ার অনুঘটক	দুর্বল কাণ্ড এবং ডাই-ব্যাক। পুরানো পাতাগুলির ক্লোরোসিস, স্বরচ, ফলকপ্রান্ত পচন

মৌল	মৌলের কাজ	অভাবজনিত ফল
ম্যাগনেশিয়াম (Mg)	ক্লোরোফিল ও উৎসেচকের উপাদান	প্রথমে পুরানো ও পরে নতুন পাতাগুলির ক্লোরোসিস, পাতার পচন ও কুঞ্চন।
ক্যালসিয়াম (Ca)	কোশপর্দার ভেদ্যতা রক্ষা, অনেক উৎসেচকের উপাদান	পত্রকুঞ্চন, পাতার আকৃতিগত অস্বাভাবিকতা, শীর্ষমুকুলের মৃত্যু, পুষ্পমঞ্জরীর প্রান্তভাগের পচন। ফলের পচন।
সালফার (S)	কোন কোন প্রোটিনের উপাদান	নবীন পাতার পাণ্ডুর বর্ণ
লৌহ (Fe)	ক্লোরোফিল সংশ্লেষে সহায়তা, উৎসেচকের উপাদান	পাতার ক্লোরোসিস, মুখ্যশিরা সবুজ বর্ণ ধারণ, পিঙ্গলবর্ণের দাগ, পত্রমোচন।
বোরোন (B)	শর্করার পরিবহনে সহায়তা	পত্রমুকুলের গোড়ার বিবর্ণতা এবং অবশেষে পতন। কাণ্ড বা ফলের গায়ে ফাটল এবং অর্ন্তভাগে পচন।
দস্তা (Zn)	উৎসেচকের উপাদান, অক্সিন সংশ্লেষ, শর্করার জারন	শিরামধ্যবর্তী অংশে ক্লোরোসিস, গোলাপাকার ধারন, গোড়া থেকে আগার দিকে পত্রমোচন
তামা (Cu)	জারণকারী উৎসেচকের উপাদান	নীবনপাতার প্রান্তভাগে ক্লোরোসিস, পাতা ঝরে যাওয়া পাতার উন্মোচন বন্ধ হয়ে যাওয়া, নেতিয়ে পড়া, ক্লোরোসিস, গোলাপাকৃতি ধারণ ইত্যাদি।
ম্যাঙ্গানিজ (Mn)	শ্বসন উৎসেচকের উপাদান, নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সহায়তা	ক্লোরোসিস, পচনশীল দাগ
মলিবডেনাম (Mo)	উৎসেচকের উপাদান	তরমুজজাতীয় গাছের সম্পূর্ণ হলুদ হয়ে যাওয়া, ফল না আসা ইত্যাদি।

10.8.1 রোগ ত্রিভুজ (Disease Triangle) ঃ

উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি হয় তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে। উপাদানে তিনটি হল *প্যাথোজেন, পোষক* ও *পরিবেশ*। এই তিন "প" এর পারস্পরিক সম্পর্ক একটি ত্রিভুজের আকারে দেখানো যায়। ত্রিভুজের প্রতিটি বাহু একটি উপাদানকে চিহ্নিত করে, প্রতিটি বাহুর আকার রোগসৃষ্টির অনুকূল শর্তগুলির সমানুপাতিক।

উদাহরণস্বরূপ পোষকটি যদি রোগপ্রতিরোধী হয়, যদি তাদের রোপন দূরত্ব যথেষ্ট বেশি হয় যদি উদ্ভিদটির বয়স রোগাক্রান্ত হবার অনুপযোগী হয় তাহলে এই ত্রিভুজের পোষক বাহুটির দৈর্ঘ্য হবে শুন্যের কাছাকাছি ফলে রোগের পরিমান হবে ন্যুনতম। অপরপক্ষে পোষক উদ্ভিদ যদি রোগপ্রবন হয়, তারা যদি ঘনসংবদ্ধভাবে রোপিত হয়, বয়স যদি সংক্রমনের পক্ষে অনুকূল হয় তাহলে এই বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশি এবং রোগের পরিমানও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। অন্য বাহুগুলির ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। এখন যদি এই উপাদানত্রয়কে আঙ্কিক হিসাবে মেপে নেওয়া যায় তাহলে লোকজনিত ক্ষতির একটা হিসাব পাওয়া সম্ভব।

অনুশীলনী - 4

1. নিম্নলিখিত তথ্যগুলি ঠিক অথবা ভুল বলুন ঃ

   a) কম তাপমাত্রাজনিত ক্ষতি উচ্চতাপ মাত্রাজনিত ক্ষতির চেয়ে কম .... হ্যাঁ/না।

   b) মাটিতে জলীয় বাষ্পের অভাবে Wilting হয়ে থাকে .... হ্যাঁ / না।

   c) তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উদ্ভিদের খর্বতা দেখা দেয় ...... হ্যাঁ / না।

   d) ফসফরাসের অভাবে শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হয় ..... হ্যাঁ/ না।

   e) ম্যাগনেসিয়াম সালোকসংশ্লেষকে প্রভাবিত করে না .... হ্যাঁ / না।

2. নিচের লক্ষণগুলির সাথে মৌলটিকে মেলান ঃ

a) ফুলের সংখ্যা হ্রাস	i) Cu
b) কাণ্ড ও ফলের গায়ে ফাটল	ii) P

c) পাতা উন্মোচন থেমে যাওয়া　　iii) Mg

d) পাতার রঙ নীলাভ সবুজ　　iv) Ca

e) ক্লোরোসিস　　v) B

3. **নিচের বায়ুদূষকগুলির সাথে রোগলক্ষণটিকে মেলান ঃ**

a) PAN　　i) পত্রশীর্ষকের পিঙ্গলতা

b) SO_2　　ii) শিরা বরাবর পচনশীলতা

c) C_2H_4　　iii) পাতায় রৌপ্য বর্ণের দাগ

d) HF　　iv) বর্ণবিকার

e) Cl　　v) ফুলের সংখ্যা হ্রাস

10.9 সারাংশ

উদ্ভিদের রোগটিকে তার লক্ষণগুলি দিয়ে চিনতে পারা যায়। রোগলক্ষণ এককবাবে বা অনেকগুলি লক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তখন তাদের বলে *রোগলক্ষণের সহ সমষ্টি*। প্রথমে প্রকাশিত রোগলক্ষণকে প্রাথমিক ও পরে প্রকাশিত রোগলক্ষণকে *গৌণ রোগলক্ষণ* বলে। রোগলক্ষণগুলি তিনভাগে বিভক্ত। মৃত কোশকলার পচনজনিত রোগলক্ষণগুলিকে বলে *নেক্রোসিস*। এই জাতীয় রোগলক্ষণগুলির মধ্যে বর্ণবিকার, নেতিয়ে পড়া, ব্লাইট বা ধ্বসা রোগ, স্পট বা দাগ, পচন, ডাই ব্যাক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সংক্রমণ বা অন্যান্য কারণে উদ্ভিদের স্বল্প বৃদ্ধিজনিত রোগলক্ষণগুলিকে বলে *অ্যাট্রফিক* বা *হাইপোপ্লাসটিক লক্ষণ*। ক্লোরোসিস, শিরা নিকাশ, বর্ণালী বা মোজাইক, খর্বতা, কুঞ্চন ইত্যাদি হল এ ধরনের লক্ষণ। অতিবৃদ্ধিজনিত লক্ষণগুলি *হাইপারট্রফিক লক্ষণ* নামে পরিচিত। পতন, রূপান্তরন, গল, পতন, স্ক্যাব ইয়তাদি হল এ ধরনের লক্ষনের উদাহরণ। এছাড়া এই এককে পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট রোগলক্ষণগুলির কথাও আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে বিভিন্ন বায়ুদূষক যথা O_3, SO_2, HF. NO_x ইত্যাদির প্রভাবজনিত লক্ষন। আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন *পরিপোষকের অভাবজনিত রোগলক্ষণ*। এদের মধ্যে স্বল্পমাত্রিক ও বহুমাত্রিক উভয় প্রকার মৌলই আছে এবং তাদের প্রতিটির অভাবজনিত সুনির্দিষ্ট রোগলক্ষণ থেকেই আমরা মৌলটির পরিপোষকের অনুপস্থিতি চিহ্নিত করতে পারি।

10.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. নেক্রোটিক, হাইপোপ্লাসটিক ও হাইপারট্রফিক লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন। সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে এদের বৈশিষ্ট্যগুলির সত্যতা প্রমাণ করুন।

2. পচন কাকে বলে? কয় প্রকার পচন দেখতে পাওয়া যায় ও কি কি? বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পচনের শ্রেণিবিভাগ করুন এবং প্রতি প্রকার পচন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

3. স্বল্প বৃদ্ধিজনিত প্রধান পাঁচটি এবং অতিবৃদ্ধিজনিত প্রধান পাঁচটি রোগলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

4. নিম্নলিখিত গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ

i) ধ্বসা রোগ

ii) Wilting বা নেতিয়ে পড়া

iii) স্বল্পমাত্রিক মৌলগুলির অভাবজনিত রোগলক্ষণ

iv) যানবাহনের ধোঁয়া নিসৃত বায়ুদূষক ও তাদের প্রভাবজনিত লক্ষণ

v) তাপমাত্রার প্রভাবে সৃষ্ট রোগলক্ষণ।

10.11 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

1. a) হাইপারট্রফি

b) হাইপোপ্ল্যাসিয়া

c) নেক্রোসিস

d) Wilting

e) স্করচ

2. (a) – (iv)(b) – (v)   (c) – (ii)

(d) – (vi)(e) – (i)   (f) – (iii)

অনুশীলনী - 2

1. (a) — বর্ণালী;

(b) — আরগট ;

(c) — ক্লোরোসিস।

2. (a) কারণ ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলে কান্ডের অতিবৃদ্ধির দরুণ পুষ্প বা পুষ্পমঞ্জরীর স্বল্পবৃদ্ধি হয়।

(b) ক্লোরোসিস আক্রান্ত অংশে বৃদ্ধি হ্রাস এবং একই সাথে স্বাভাবিক অংশে স্বাভাবিক বৃদ্ধি হবার দরুন।

(c) ক্লোরোফিল ছাড়া অন্য সব রঞ্জক পদার্থের সংশ্লেষ ব্যাহত হলে বর্ণহীনতা দেখা যায়।

অনুশীলনী - 3

1. (a) — (iv)
   (b) — (ii)
   (c) — (iii)
   (d) — (v)
   (e) — (i)

2. (a) স্ক্যাব
   (b) হেটেরোটপি
   (c) প্রোলেপসিস
   (d) উইচেস ব্রুম
   (e) ব্লিস্টার

অনুশীলনী - 4

1. (a) না (b) হ্যাঁ (c) হ্যাঁ (d) হ্যাঁ (e) না

2. (a) – Ca(b) –B (c) Cu (d) P (e) –Mg

3. (a) – (iii)(b) – (iv) (c) – (v) (d) – (i) (e) – (ii)

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. 10.3 অংশাঙ্কিত অংশ ও তার উপবিভাগগুলি দেখুন। নেক্রোসিস হল মূলতঃ কোশকলার পচন। হাইপোপ্লাসটিক লক্ষণ উদ্ভিদের স্বল্পবৃদ্ধিজনিত কারণে এবং হাইপারট্রফিক লক্ষণ উদ্ভিদের কোশের অতিবৃদ্ধিজনিত কারণে দেখা দেয়।

   নেক্রোসিস জাতীয় রোগলক্ষণগুলির মধ্যে ধ্বসা বা ব্লাইট রোগের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় তা আলোচনা করার জন্য 10.4 অংশাঙ্কিত অংশের (viii) উপভাগ দেখুন। হাইপোপ্লাসটিক রোগলক্ষণগুলির মধ্যে ক্লোরোসিস হল আদর্শ উদাহরণ, এটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য 10.5 অংশাঙ্কিত অংশের (ii) উপভাগ দেখুন। হাইপারট্রফিক রোগলক্ষণগুলির মধ্যে গল হল আদর্শ উদাহরণ। এটির জন্য 10.6 অংশাঙ্কিত অংশের (vi) উপভাগ দেখুন। প্রতিটি ক্ষেত্রে ছবি দেওয়া আবশ্যিক।

2. পচন একটি নেক্রোটিক রোগলক্ষণ। এটি মূলত ঃ দুই প্রকার শ্বেতপচন ও পিঙ্গল পচন। পচনশীল অংশের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে এবং আক্রান্ত অংশের উপর ভিত্তি করে পচনকে আরও কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। উত্তরের জন্য 10.4 অংশাঙ্কিত (xvi) উপভাগটি দেখুন।

3. স্বল্পবৃদ্ধিজনিত লক্ষণের জন্য 10.5 অংশাঙ্কিত ভাগ এবং অতিবৃদ্ধি জনিত লক্ষণের জন্য 10.6 অংশাঙ্কিত ভাগ দেখুন। পাঁচটি করে লক্ষণের সম্পর্কে চিত্রসহ (সম্ভব হলে) আলোচনা করুন।

4. (i) ধ্বসা রোগের জন্য 10.4 এর viii উপভাগ দেখুন।

   (ii) Wilting রোগের জন্য 10.4 এর iv উপভাগ দেখুন।

   (iii) স্বল্পমাত্রিক মৌলগুলি হল Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo কারণ এরা বিপাকক্রিয়ায় কম পরিমাণে কাজে লাগে। এদের অভাবজনিত লক্ষণগুলি 10.2 নং সারণিতে আলোচিত হয়েছে।

   (iv) সারণি 10.1 এ দেখুন যানবাহনের ধোঁয়া নিঃসৃত বায়ুদূষকসমূহ হল O_3, PAN, SO_2 এবং C_2H_4, এদের প্রভাবজনিত ফল ঐ সারণিতেই আলোচিত হয়েছে।

   (v) 10.7.1 অংশাঙ্কিত অংশ দেখুন।

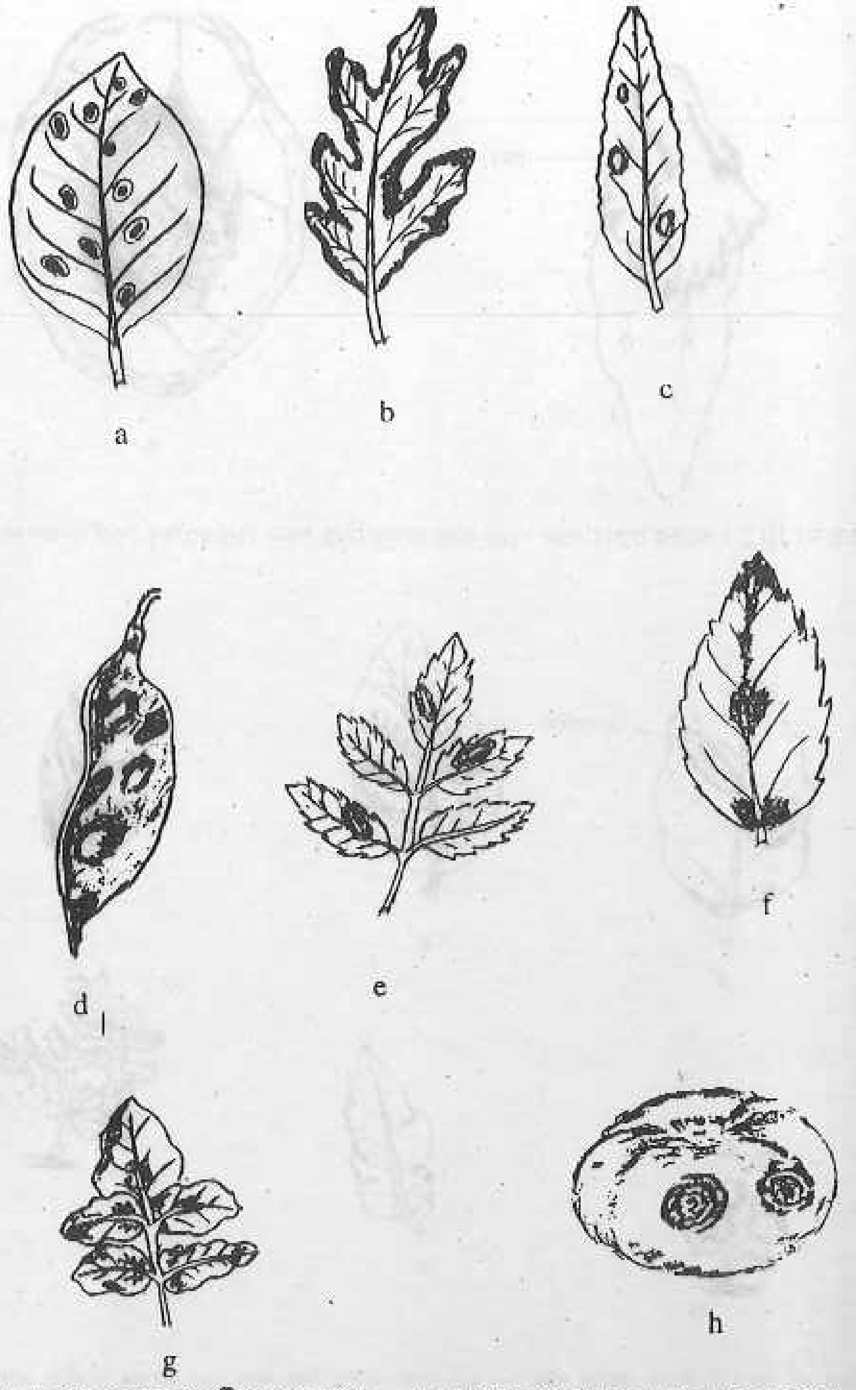

চিত্র নং 10.1 ঃ কয়েকপ্রকার নেক্রোটিক রোগ লক্ষণ — (a) পাতার দাগ বা Spot (b) স্করচ বা পোড়া (c) ছিদ্র (Shot hole) (d) ফলের দাগ বা Spot (e) ব্লচ (Blotch) (f) জলদি ধ্বসা (g) নাবি ধ্বসা (h) টম্যাটোর অ্যানথ্রাকনোজ

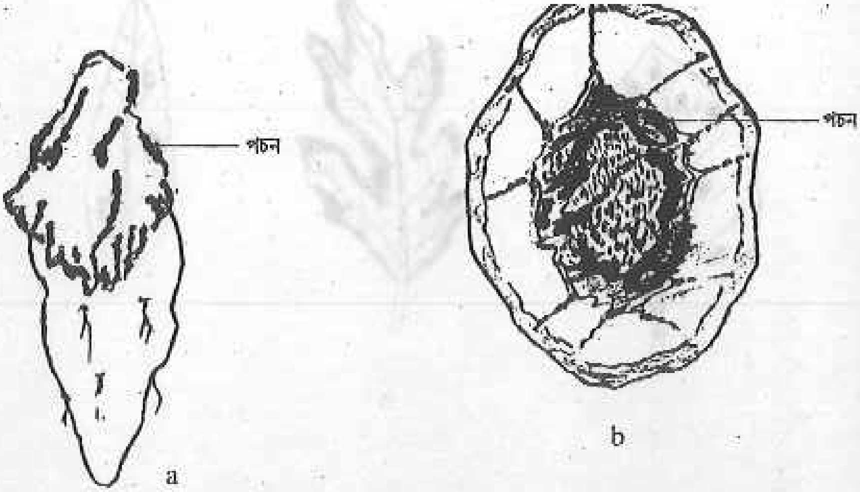

চিত্র নং 10.2 ঃ কয়েক প্রকার পচন - (a) রাঙা আলুর সিক্ত পচন (b) কাণ্ডের কেন্দ্রীয় অংশের পচন

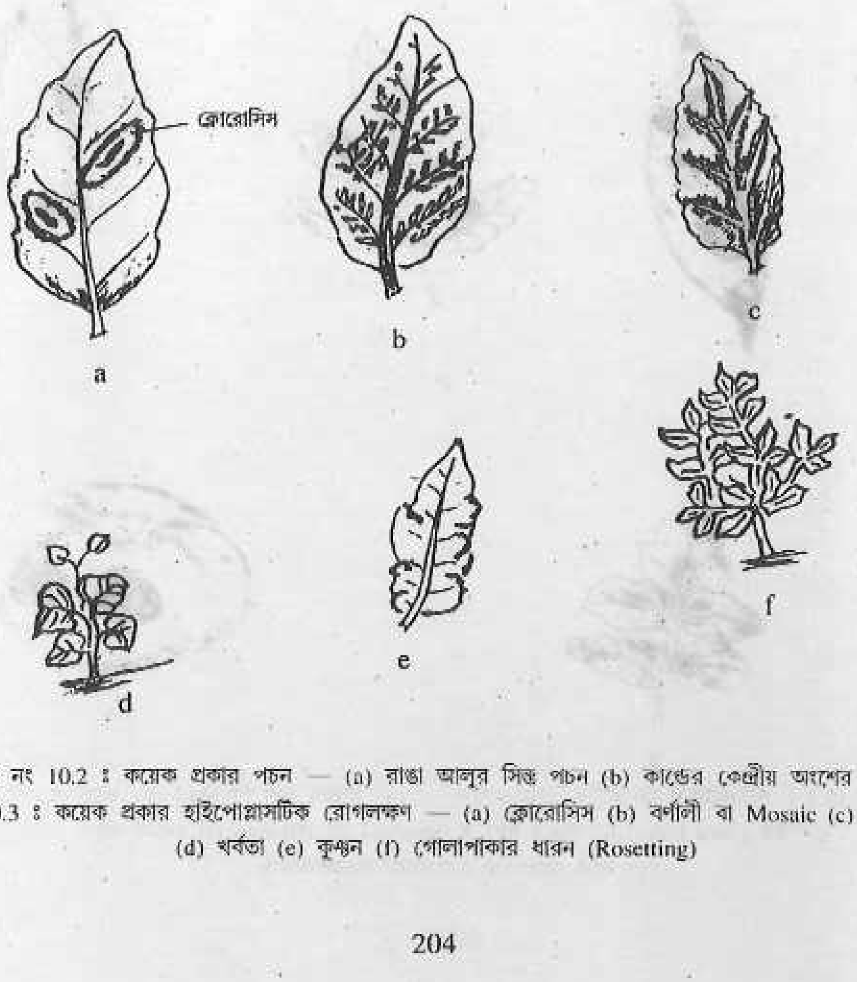

চিত্র নং 10.2 ঃ কয়েক প্রকার পচন — (a) রাঙা আলুর সিক্ত পচন (b) কাণ্ডের কেন্দ্রীয় অংশের পচন
চিত্র নং 10.3 ঃ কয়েক প্রকার হাইপোপ্লাসটিক রোগলক্ষণ — (a) ক্লোরোসিস (b) বর্ণালী বা Mosaic (c) শিরা নিকাশ (d) খর্বতা (e) কুঞ্চন (f) গোলাপাকার ধারন (Rosetting)

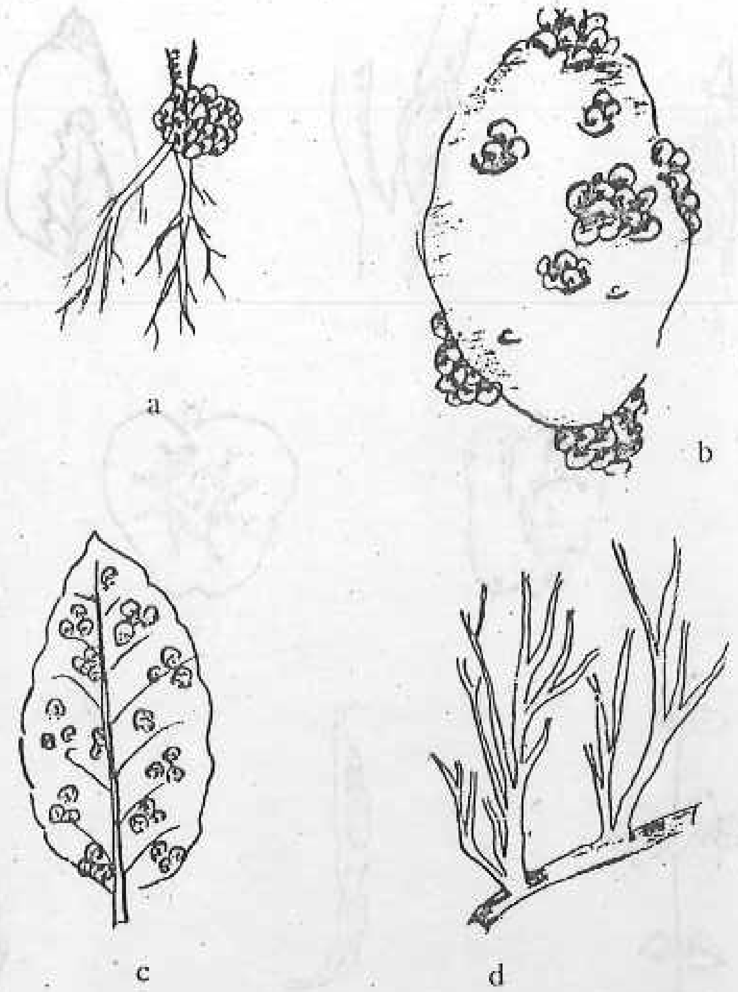

চিত্র নং 10.4 : কয়েক প্রকার হাইপারট্রফিক লক্ষণ — (a) গল : মূলের গোড়ায় (b) স্ক্যাব : আলুর কন্দে (c) ফোসকা : পাতায় (d) উইচেস্ ব্রুম

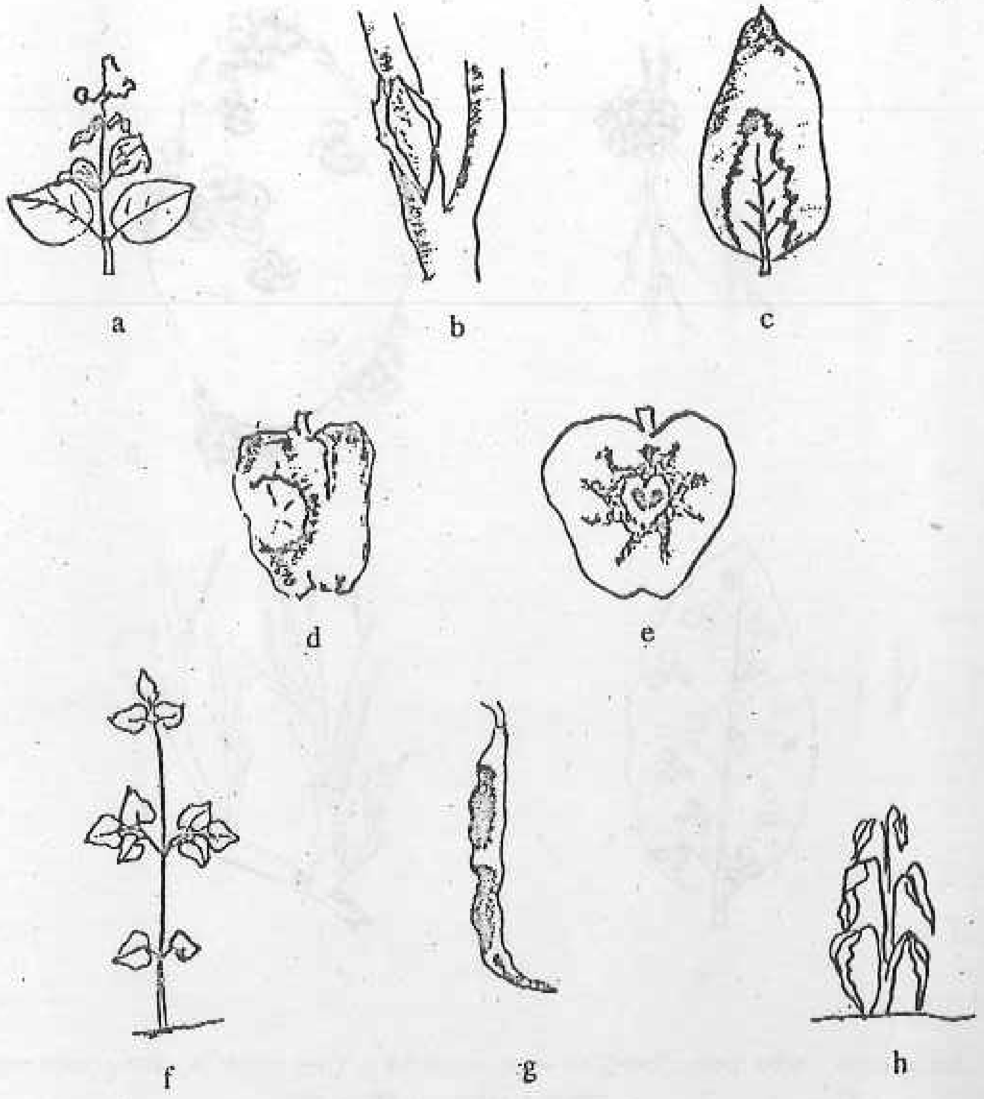

চিত্র নং 10.5 : পরিবেশের প্রভাবজনিত লক্ষণ :
কম তাপমাত্রার প্রভাব : — (a) শীর্ষমুকুলের পচন (b) বল্কল মোচন (c) শৈত্যজনিত শুষ্কতা বেশি
তাপমাত্রার প্রভাব : (d) বাষ্পদাহ (e) আপেলের জলীয় শাঁস
আলোর প্রভাব : (f) কম আলোয় দীর্ঘাকার প্রাপ্তি (g) উচ্চ আলোয় স্ক্যাল্ড (Scald) (h) কম জলীয় বাষ্পজনিত Wilting.

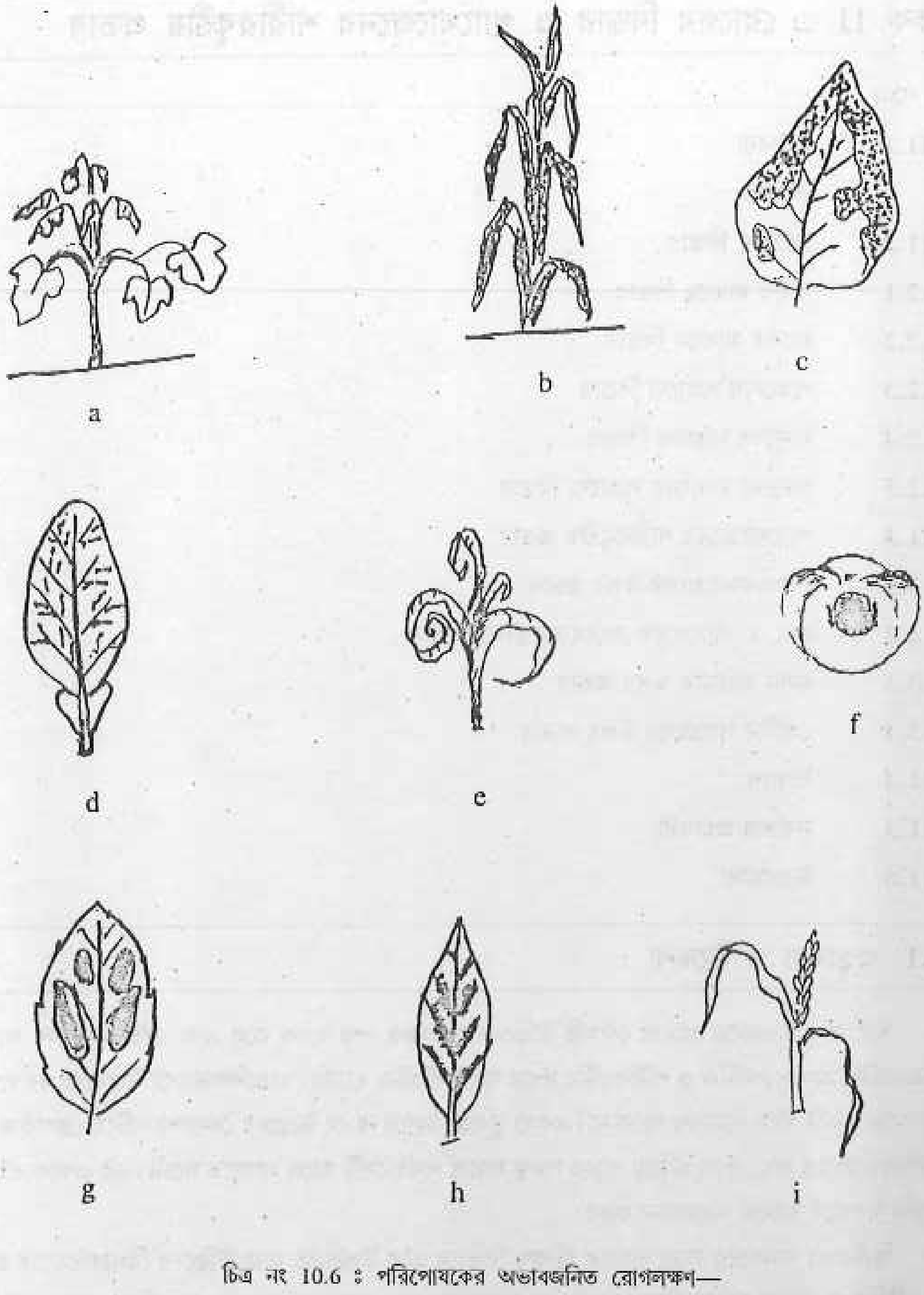

চিত্র নং 10.6 : পরিপোষকের অভাবজনিত রোগলক্ষণ—
(a) N এর অভাবে তামাক গাছ (b) ভুট্টা গাছে P এর অভাব (c) পাতায় K এর অভাব (d) লেবু পাতায় Fe এর অভাব (e) ভুট্টা পাতায় Ca এর অভাব (f) টম্যাটোয় Ca এর অভাব (g) গোলাপে Mg এর অভাব (h) আমে Zn এর অভাব (i) গম গাছে Cu এর অভাব।

একক 11 □ রোগের বিস্তার ও প্যাথোজেনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব

গঠন

11.1	প্রস্তাবনা
	উদ্দেশ্য
11.2	রোগের বিস্তার
11.2.1	বায়ুর মাধ্যমে বিস্তার
11.2.2	জলের মাধ্যমে বিস্তার
11.2.3	পতঙ্গের সাহায্যে বিস্তার
11.2.4	মানুষের সাহায্যে বিস্তার
11.2.5	অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে বিস্তার
11.3	প্যাথোজেনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব
10.3.1	সালোকসংশ্লেষের উপর প্রভাব
10.3.2	জল ও পরিপোষক সংবহনের উপর প্রভাব
10.3.3	শ্বসন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব
10.3.4	প্রোটিন সংশ্লেষের উপর প্রভাব
11.4	সারাংশ
11.5	সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
11.6	উত্তরমালা

11.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য :

আগের দুটি এককে আমরা দেখেছি উদ্ভিদের রোগগ্রস্ত দশা কাকে বলে এবং শেই অনুসঙ্গে আলোচিত বিভিন্ন জটিল অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় দশার সাথে পরিচিত হয়েছি। স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভিদরোগের লক্ষণগুলি কেবলমাত্র একটি গাছে সীমাবদ্ধ থাকে না। একথা ভুললে চলবে না যে উদ্ভিদের দৈন্যদশা ঘটিয়ে রোগবীজ নিজের বংশবিস্তার ঘটাতে চায়। ফলে ছড়িয়ে পড়ার সমস্ত সম্ভাব্য পথই সেটি কাজে লাগাতে সচেষ্ট। এই এককে এই সম্ভাব্য পথগুলি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের জানা দরকার জীবাণু কিভাবে তার উপস্থিতি দ্বারা উদ্ভিদের বিপাকক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যথা সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন, সংবহন ও দেহগঠনের জন্য দায়ী প্রোটিন সংশ্লেষ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্যাথোজেন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- জীবানু বিস্তারের মাধ্যমগুলি কি কি তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা বিস্তারলাভকারী জীবানুগুলির উদাহরণ দিতে পারবেন।
- কিভাবে কৃষিকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান ও ব্যক্তির মাধ্যমে সংক্রমন ছড়ায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রোগজীবাণুগুলির শারীরবৃত্তীয় প্রভাব কত রকম ও কি কি—এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- শারীর বৃত্তীয় কারণে কিরূপে উদ্ভিদ সহজেই আক্রান্ত হতে পারে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

11.2 রোগজীবানুর বিস্তার

বিভিন্ন *শুককীট* (larva) ও নিমাটোড, ছত্রাকের *চলরেণু* (zoospores) ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত ব্যাকটেরিয়া নিজস্ব ক্ষমতাতেই একটি পোষক উদ্ভিদ থেকে অন্য নিকটবর্তী পোষকে ছড়িয়ে যেতে পারে। ছত্রাকের অনুসূত্রগুলি পোষকের কোশকলার কোষান্তররন্ধ্রের মাধ্যমে এক অংশ থেকে অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ছত্রাকের রেণু যা মহামারী ঘটানোর জন্য দায়ী বা ব্যাকটেরিয়া এইভাবে বংশবৃদ্ধি করে সংক্রমণকে সুদূরপ্রসারী করতে অক্ষম কোন কোন ছত্রাকের অবশ্য রেণুস্থলীর বিদারণ পদ্ধতিটিই এরকম যে রেণুগুলি কিছু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। একইভাবে কোন কোন পরজীবি উদ্ভিদের ফল বিদারণ এমনভাবে ঘটে যে বীজগুলি কিছুটা ছড়িয়ে যেতে পারে। এই রকম সামান্য দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া (এমনকি এগুলির ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে) রোগজীবাণুর বিস্তার সবসময় বায়ু, জল, পতঙ্গ, প্রাণী বা মানুষের উপর নির্ভরশীল।

11.2.1 বায়ুর মাধ্যমে বিস্তার :

অধিকাংশ ছত্রাকের রেণু ও কয়েকটি রোগসৃষ্টিকারী পরজীবি উদ্ভিদের বীজ বায়ুপ্রবাহের সাথে ভাসমান অবস্থায় জড়বস্তুর মত স্থানান্তরে ছড়িয়ে যেতে পারে। রেণুস্থলীর বিদারণের পর মুক্ত রেণুগুলি সঙ্গে সঙ্গেই যে ভাসমান দশা প্রাপ্ত হয় তা নয়। এগুলি রেণুস্থলীর গায়েই লেগে থাকে এবং কেবলমাত্র বায়ু প্রবাহের চাপে তারা উৎপত্তিস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ভাসমান দশায় যখন রেণুগুলি কোন ভেজা তলের সংস্পর্শে আসে তখন সেখানেই স্থিত হয়। এছাড়া বৃষ্টিপাতের ফলে বায়ু থেকে রেণুগলি জলকণার মধ্য দিয়ে মাটিতে এসে পৌঁছায়। কোথায় রেণুটি ধরা পড়ল বা কোথায় বৃষ্টি বাহিত হয়ে এসে জমা হল স্বাভাবিক কারণেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে অধিকাংশই নষ্ট হয়। অতি সামান্য সংখ্যক রেণুই তার নির্দিষ্ট পোষকটির সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হয়। বায়ু মাধ্যমে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা রেণুগুলির পক্ষে অসম্ভব বলেই অতিসংবেদনশীলতা এবং পোষক নির্দিষ্টতার কারণে রেণুর বিস্তার সাধারণতঃ তার উৎসের কয়েকশো মিটার পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে দানাশস্যের *মরিচা রোগ* (rust) যা ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে, সেটির মরিচার গুঁড়োর ন্যায় *রেণু* (spores) অত্যন্ত দৃঢ় প্রাচীরযুক্ত হবার দরুন এবং হালকা হবার দরুন শতাধিক কি. মি. পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার নজীর আছে। এইরূপে বিস্তার লাভ করা আর একটি রোগের উদাহরণ হল বিভিন্ন উদ্ভিদের গুঁড়াচিতি (Powdery Mildew disease) রোগ। (চিত্র 11.1 দ্রষ্টব্য)

ছত্রাকভিন্ন অন্য সমস্ত রোগবীজানুর বায়ুর মাধ্যমে পরিবাহিত হবার সম্ভাবনা অনির্দিষ্ট এবং কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। আপেল বা ন্যাশপাতির ধ্বসা রোগের ক্ষেত্রে শুষ্ক সূত্রাকার অংশ ফলের গা থেকে ঝুলতে থাকে যা হল ব্যাকটেরিয়ার আধার এবং বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে ছড়িয়ে যেতে পারে। মাটিতে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়াও বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বায়ুর মাধ্যমে রোগবিস্তারের আর একটি সাধারণ উপায় হল রোগগ্রস্ত বিভিন্ন অংশ একটি উদ্ভিদ থেকে অন্য উদ্ভিদে ছড়িয়ে যেতে পারা।

11.2.2 জলের মাধ্যমে বিস্তার :

জল তিনভাবে রোগজীবাণুর বিস্তারে সহায়তা করে।

(a) ব্যাকটেরিয়া, নিমাটোড, ছত্রাকের রেণু (যেমন চলরেণু বা Zoospore) ও দেহাংশ যা মাটিতে উপস্থিত তা বৃষ্টির জল বা সেচের জল মারফৎ বাহিত হয়ে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

(b) ক্ষতিগ্রস্ত উদ্ভিদ অঙ্গ থেকে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের রেণু চুঁইয়ে পড়া অর্ধতরল পদার্থের মত বেরিয়ে আসে। এই পদার্থ সাধারণতঃ অত্যন্ত আঠালো হয় এবং এগুলির বিস্তার একান্তভাবেই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল।

(c) বায়ুবাহিত ছত্রাকের রেণু বা ব্যাকটেরিয়া বৃষ্টির জলের ফোঁটার মাধ্যমে পোষক উদ্ভিদের সংস্পর্শে এলে রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে

বায়ুর তুলনায় ছত্রাকের জলের সাহায্যে বিস্তার অধিকতর হানিকারক কেন না সেক্ষেত্রে জীবানু স্বতঃই জল পাবার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে সংক্রমণের বিস্তার ঘটাতে পারে। বহু ছত্রাকের বিস্তার জলের মাধ্যমে ঘটে থাকে। তার মধ্যে অ্যাসকোমাইসিটিস গোষ্ঠীর ছত্রাকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

11.2.3 পতঙ্গের সাহায্যে বিস্তার :

বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ বিশেষ করে *চোষক পোকা* (aphids), *পাতা ফড়িং* (leaf-hoppers), *সাদা মাছি* (white flies) *মিলি বাগ* (mealy bugs), *স্পিটল পোকা* (spittle insects), *থ্রিপস* (Thrips), *গুবরে বা কাঁচ পোকা* (beatles) ইত্যাদি রোগ বিস্তারে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। (চিত্র 11.3 দ্রষ্টব্য) চোখ পোকা ও পাতা ফড়িং ভাইরাসঘটিত রোগের এবং পাতা-ফড়িং এককভাবে মাইকোপ্লাজম (mycoplasma) ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের বিস্তারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ধরণের রোগজীবাণুগুলি (চিত্র 11.2 দ্রষ্টব্য) বাহকের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বাহক এক উদ্ভিদ থেকে অন্য উদ্ভিদে স্থানান্তরিত হলে সেগুলি নতুন পোষকে সংক্রমন ঘটায়। বিজ্ঞানী J. G. Leach (1940) এর মতে পতঙ্গ নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ্ধতিতে সংক্রমণে সহায়তা করে :

(a) প্রত্যক্ষভাবে প্যাথোজেন বহন করে।

(b) উদ্ভিদ থেকে পরিপোষক আহরণের সময় প্যাথোজেনকে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

(c) উদ্ভিদদেহে ক্ষতস্থান সৃষ্টি করে অপ্রত্যক্ষভাবে সংক্রমণস্থল প্যাথোজেনের কাছে উম্মুক্ত করে দেয়।

(d) পতঙ্গের আভ্যন্তরীণ অংশ সমূহে (বিশেষতঃ খাদ্যনালীতে) প্যাথোজেনকে আশ্রয় দান করে এবং পরবর্তী অবস্থায় সুস্থ উদ্ভিদদেহের সংস্পর্শে এনে দেয়।

(e) প্যাথোজেনকে প্রতিকূল অবস্থা অতিবাহিত করতে আশ্রয় দান করে।

(f) উদ্ভিদদেহ থেকে খাদ্যরস শোষন কালে বিষাক্ত পদার্থ (toxin) প্রবেশ করিয়ে সুস্থ উদ্ভিদদেহকে রোগাক্রান্ত করে।

এছাড়া ব্যাকটেরিয়া ঘটিত নরম পচন, *অ্যানথ্রাকনোজ* (Anthracnose) বা ছত্রাকঘটিত *আরগট* (Ergot) ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংক্রামিত উদ্ভিদ থেকে পতঙ্গ ডানা বা শুঙ্গের সাহায্য রোগজীবাণু স্থানান্তরে নিয়ে যায় যদিও এই রোগ জীবাণুগুলি স্বাভাবিকভাবে পতঙ্গ দ্বারা পরিবাহিত হয়।

সব প্যাথোজেনই যে পতঙ্গে কেবলমাত্র সাময়িকভাবে আশ্রয় পায় তা নয়, এদের মধ্যে কিছু পতঙ্গের খাদ্যনালীতে বা অন্য অংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। চোষক পোকা (aphid) বাহিত ভাইরাসগুলির মধ্যে কয়েকটি স্থায়ীভাবে (persistent) বসবাসকারী এবং সেগুলির বিস্তার কেবলমাত্র পতঙ্গ দ্বারা রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের রস শোষনের উপর নির্ভরশীল নয়। সুস্থ পোষক উদ্ভিদে এই জাতীয় পতঙ্গ যে কোন সময় সংক্রমণ ঘটাতে পারে, ফলে এগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি হানিকারক। অপরপক্ষে কিছু ভাইরাস চোষক পোকার শরীরে অস্থায়ী (non persistant) ভাবে আশ্রয় লাভ করে এবং পরবর্তী খাদ্য শোষণকালে পতঙ্গদেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়। বিভিন্ন চোষক পোকা বাহিত ভাইরাস ঘটিত রোগের মধ্যে আছে বর্ণালী বা মোজাইক রোগ।

Claviceps purpurea (ক্ল্যাভিসেপস পারপিউরিয়া) ছত্রাক দ্বারা সংক্রামিত রাই গাছের আরগট রোগ (Ergot of rye) সরাসরিভাবে পতঙ্গকে আকর্ষণ করে থাকে। ছত্রাক ও পোষকদেহের গলিত অংশের সমন্বয়ে গঠিত মধুজাতীয় পদার্থের আকর্ষণে পতঙ্গ আকৃষ্ট হলে মধুর সাথে ছত্রাকে *কনিডিয়াও* (conidia) প্রচুর পরিমাণে পতঙ্গের অঙ্গে চলে আসে, পরবর্তী সুস্থ উদ্ভিদের সংস্পর্শে এলে ঐ কনিডিয়া পতঙ্গ থেকে পোষকদেহে স্থানান্তরিত হয় ও সংক্রমণ ঘটায়।

Ulmus sp (আলমাস) গাছের ছত্রাক ঘটিত *Dutch Elm* (ডাত এলম) রোগের প্যাথোজেনের সংক্রামক অংশ পতঙ্গের দেহের বহিরাংশের সাহায্যে সুস্থ উদ্ভিদদেহের সংস্পর্শে আসে।

পতঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত রোগজীবাণুর সংক্রমণের সহায়তা ঘটায়। অপ্রত্যক্ষ পরিবহনের উদাহরণ হল গমের রাষ্ট রোগ। এক্ষেত্রে পতঙ্গগুলি প্যাথোজেনের বিপরীত যৌনতা সম্পন্ন দুটি অংশ পরস্পরের সংস্পর্শে এনে দেয় ফলে প্যাথোজেন জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে রোগবিস্তারে অধিকতর সক্ষমতা লাভ করে।

11.2.4 মানুষের সাহায্যে বিস্তার :

মানুষ নানা উপায়ে স্বল্প দূরত্বের ব্যবধানে বা বহুদূরে নানারকমের প্যাথোজেনের বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। ক্ষেতে কাজ করার সময় কৃষকের সাহায্যে একটি সংক্রামিত উদ্ভিদ থেকে একটি সুস্থ উদ্ভিদে প্যাথোজেনের স্থানান্তরন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে। *তামাক গাছের মোজাইক রোগের* (Tobacco Mosaic Virus) ভাইরাস এইভাবে মানুষের শরীরের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। আবার যেসব যন্ত্রপাতি মাঠের কাজে ব্যবহৃত হয় তাদের মাধ্যমে প্যাথোজেনের বিস্তার ঘটে থাকে যেমনটা হয় *ন্যাশপাতির ধ্বসা* রোগের (blight of *Pyrus*) ক্ষেত্রে। সংক্রামিত মাটি মানুষের পদবাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসবাসকারী প্যাথোজেনও স্থানান্তরিত হয়। এছাড়া মানুষ নিজে বা তার আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে বহু প্যাথোজেন সনাক্ত হবার পূর্বেই দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে আসে। নতুন সংক্রমণ কোন এলাকায় ব্যাপৃত হবার মুখ্য

কারণ হল মানুষ। আলুর *গুটি (Wart disease of potato)* অথবা *মাশক রোগ* এইভাবেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

11.2.5 অন্যান্য মাধ্যমের দ্বারা বিস্তার :

অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে বিস্তার পরোক্ষভাবে মানুষের সহায়তাতেই ঘটে থাকে। তবুও মাধ্যমগুলিকে একটু স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা ভাল।

(a) **বীজের সাহায্যে বিস্তার :** সংক্রামিত বীজ বপন করলে রোগ সহজেই বিস্তার লাভ করতে পারে। প্যাথোজেনগুলি বীজের উপরিতলে অথবা বীজ অভ্যন্তরে ভ্রূণ সংলগ্ন অবস্থায় অথবা বীজরূপে কার্যকরী হলের ত্বকের সাথে যুক্ত অবস্থায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিস্তার লাভ করতে পারে। বীজের বহিঃস্তক ও অন্তঃস্তক বাহিত প্যাথোজেনগুলির মধ্যে *বান্ট* বা *ভুষা রোগ* (bunt) সৃষ্টিকারী ছত্রাক *Tilletia caries (টিলেসিয়া কেরিস), Tilletia foetida (টিলেসিয়া ফোটিডা)* ইত্যাদি, গম ও ওট গাছের *ছেতো রোগ* (loose smut) সৃষ্টিকারী ছত্রাক *Ustilago nuda (উস্টিলাগো নুডা)* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্যাথোজেন নানাভাবে প্রতিকূল দশা অতিবাহিত করে। ছত্রাক রেণুরূপে বা হাইফারূপে বা ফলদেহ স্ক্লেরোসিয়া (sclerotia) রূপে, স্বর্ণলতা বীজরূপে, নিমাটোড লার্ভারূপে ব্যাকটেরিয়া অন্তঃরেণু বা endospore রূপে প্রতিকূল সময় অতিবাহিত করে এবং এইসব দশাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই বীজ সংলগ্ন। তাই বীজ স্থানান্তরিত হলে সংক্রামক বস্তুও স্থানান্তরিত হয়। শিম্বজাতীয় কয়েকটি গাছের পালক চিতি (downy mildew) রোগ উৎপাদনকারী ছত্রাক *Sclerospora (স্ক্লেরোস্পোরা)* ও *Pernospora (পারনোস্পোরা)* ছত্রাকের *উস্পোরগুলি* (Oospore) আক্রান্ত গাছের ফলের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয়। ভাইরাসও বীজের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সংক্রমণকে বয়ে নিয়ে যায়। যেমন *তামাক পাতার মোজাইক ভাইরাস*।

(b) **উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষের সাহায্যে বিস্তার :** বীজ বপনের পূর্বে শস্যক্ষেত্রের মূল কেন্দ্র এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে পূর্ববর্তী বছরের অবশেষ সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিত করা সম্ভব না হলে এবং পুড়িয়ে না ফেলা হলে ঐ অংশগুলি রোগজীবাণু বহনের বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক সংক্রমণের এটিও একটি বড় উৎস কেন না এই অংশগুলির ও মধ্যে সুপ্ত থেকেও প্যাথোজেন প্রতিকূল অবস্থা অতিবাহিত করে। সুস্থ বীজ থেকে সৃষ্ট অঙ্কুর এই অংশ সমূহের সংস্পর্শে এলে সহজেই আক্রান্ত হয় এবং এইভাবেই রোগের বিস্তার ঘটে। *আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের* (late blight) ক্ষেত্রে প্যাথোজেনের উস্পোর এই অবশিষ্টাংশের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে।

(c) **প্রাকৃতিক সারের সাহায্যে বিস্তার :** গোবর কম্পোস্ট ইত্যাদির সাহায্যে প্যাথোজেনের বিস্তার প্রয়শই ঘটে থাকে। বিভিন্ন প্রকার ফসলের "ড্যাম্পিং অফ" (damping off) জাতীয় পচন রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক গোবরের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করতে দেখা যায়। আখের লোহিত পচন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু গোবরের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

(d) **মৃত্তিকার সাহায্যে বিস্তার ঃ** মাটির দূষণের উৎস রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ। আবার **দূষিত মাটি অন্য স্থানে দূষণবিহীন মাটিতে সংক্রামিত করতে পারে।** এছাড়া যানবাহনের মধ্য দিয়ে যখন মাটি পরিবাহিত হয় তখন মাটিতে রোগজীবাণুর মিশ্রণ ঘটে যেতে পারে। বাঁধাকপি, মুলা ইত্যাদির **ক্লাব রট** (club rot) রাগের জীবাণুর বিস্তার মাটির সাহায্যে ঘটে থাকে।

(e) **অন্যান্য প্রাণীর দ্বারা বিস্তার ঃ** পতঙ্গ ও নিমাটোড ছাড়া ইঁদুর, পাখি, শামুক বন্য ও গৃহপালিত স্তন্যপায়ী পশু, বাদুড় ইত্যাদির দ্বারাও রোগের বিস্তার ঘটে। *আলুর ব্যাকটেরিয়া ঘটিত পচন* (bacterial rot of potato) ও *আঙ্গুরের পাতার ভাইরাসঘটিত পচন* রোগের জীবানুগুলি নিমাটোড দ্বারা পরিবাহিত হয়। পাখি, ইঁদুর ও অন্যান্য প্রাণী প্রধানতঃ রোগগ্রস্ত উদ্ভিদের ফল বা বীজ ভক্ষণের পর মলের মাধ্যমে সংক্রমনকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

অনুশীলনী - 1

উপরের অংশগুলি যদি ঠিক মতো পড়ে থাকেন তাহলে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

1. সঠিক উত্তরটিতে দাগ দিন ঃ

a) বায়ুর মাধ্যমে পরিবাহিত প্রধান প্রধান প্যাথোজেনগুলি হল (ব্যাকটেরিয়া /ছত্রাক/ ভাইরাস)।

b) জলবাহিত রোগজীবাণু অধিকতর হানিকারক কেন না (জলজ উদ্ভিদের সংক্রমণ ঘটায় / সহজেই অঙ্কুরোদ্গম ঘটে / তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করে)।

c) রাই গাছের আরগট রোগটির প্যাথোজেনের নাম হল (*Tilletia foetida / Sclerospora sp / Claviceps purpurea*)।

2. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

a) নিজস্ব ক্ষমতাতেই স্থানান্তরে যেতে পারে এরূপ দুটি রোগজীবানু হল ________________ ও ____ __________।

b) দুটি পতঙ্গ যারা প্যাথেজেনের বাহক হিসাবে কাজ করে তারা হল ________ ও________।

c) ________ রোগে প্যাথোজেনের উস্পোর অবশিষ্টাংশের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করে।

3. বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন ঃ

a) অঙ্গজ জননকারী অংশের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করা সংক্রমণ সাধারণত ঃ___________।

b) ভারতে আমদানিকৃত খাদ্যবস্তুর মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়া একটি রোগের নাম হল __________।

c) রোগে আখের পচন রোগের জীবাণু ________________________।

11.3 প্যাথোজেনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব

প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদের যে সব বাহ্যিক লক্ষণ দেখে রোগটিকে আমরা সনাক্ত করতে পারি রোগ কিন্তু কেবল ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাই না এমন এক বা একাধিক শারীরবৃত্তীয় কার্যকে প্যাথোজেন প্রভাবিত করতে পারে। এই অংশে এরকম কয়েকটি প্রভাবের কথা আমরা আলোচনা করব।

11.3.1 সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব :

সবুজ উদ্ভিদের সব রকম কাজেরই ভিত্তিভূমি হল এই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই শক্তি উদ্ভিদ এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাণীর সমস্ত শক্তির উৎস। এই পদ্ধতিতে আলোর উপস্থিতিতে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মাটি থেকে শোষিত জলের সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিল কণার উপস্থিতিতে গ্লুকোজ তৈরি করে।

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলোক}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2 \uparrow$$

উদ্ভিদের বিপাকক্রিয়ায় সালোকসংশ্লেষের এই মৌলিক ভূমিকা প্যাথোজেনের প্রভাব অস্বাভাবিক হয়ে গেলে উদ্ভিদ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় লক্ষণগুলি পাতা ও সবুজ অংশের *ক্লোরোসিস, পচন* এবং *ফলের সংখ্যা হ্রাস* এর মতো একাধিক আপাত প্রকাশ্য অবস্থার দ্বারা সনাক্ত করা যায়।

পাতার দাগ, পাতার ধ্বসা রোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পাতার সালোকসংশ্লেষকারী তল হ্রাস পায়, এই প্রক্রিয়ার হারও কমে যায়। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকঘটিত রোগে অবশ্য দেখা যায় যে ক্লোরোফিল কণিকার পরিণাণ হ্রাস পেলেও সালোক সংশ্লেষের হার হ্রাস পায় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্রামক প্যাথোজেনটি দ্বারা নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ **(toxin)** যেমন ট্যাবটকসিন **(tabtoxin)**, টেনটকসিন **(tentoxin)** সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি উৎসেচকের **(enzyme)** সংশ্লেষে বাধা প্রদান করে। কোন কোন প্যাথোজেন, বিশেষতঃ যারা সংবহন নালিকাগুলিকে আক্রমণ করে তাদের প্রভাবে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় ফলে সালোকসংশ্লেষ কমে যায় এবং শেষ অবধি গাছটি নুয়ে পড়ে (wilting)। প্রায় সব ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা ও নিমাটোড ঘটিত রোগের বৈশিষ্ট্য হল ক্লোরোসিস এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হল উৎপাদন হ্রাস। রোগের পরিণত অবস্থায়, এইসব ক্ষেত্রে, সালোক সংশ্লেষের হার স্বাভাবিকের তুলনায় এক চতুর্থাংশের বেশি নয়।

11.3.2 জল ও পরিপোষক (Nutrients) পরিবহনের উপর প্রভাব :

সমস্ত জীবিত উদ্ভিদকোষেরই পর্যাপ্ত পরিমান জল এবং যথাযথ পরিমাণে খনিজ লবণ প্রয়োজন হয়ে থাকে। মূল দ্বারা শোষিত জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ উদ্ভিদের জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী সংবরনের মাধ্যমে পাতায় পৌঁছায়। এই জলের বহুলাংশ পাতার পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে জলীয় বাষ্পরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। অপরপক্ষে পাতায় তৈরি সমস্ত সালোকসংশ্লেষজাত শর্করা ফ্লোয়েম বাহিকার মধ্য দিয়ে নিম্নমুখী পরিবহন পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বিভিন্ন কোশে পৌঁছায়। উভয় প্রক্রিয়াই প্যাথোজেনের প্রভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় কেন না ঊর্ধ্বমুখী পীরবহন বাধাপ্রাপ্ত হলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে যায় ফলে সালোকসংশ্লেষজাত পদার্থ বা শর্করা উৎপাদন কমে যায় এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন কোশে শর্করার যোগান ব্যাহত হয়।

- **জলশোষণ ও প্যাথোজেন ঃ** মূলদ্বারা জলশোষণ বহু প্যাথোজেনের প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরা দু'ভাবে ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। মূলের গঠনবিকৃতি ঘটিয়ে জল-শোষণের হার কমিয়ে দেয় এবং কোন কোন প্যাথোজেন জাইলেম বাহিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রসের উৎস্রোতের পথটিকেই বন্ধ করে দেয়। *"ড্যাম্পিং অফ" (damping off)* এবং মূলের পচন সৃষ্টিকারী ছত্রাক মূলের গঠনগত বিকার ঘটায় ফলে জলশোষণের হার কমে। *"ক্রাউন গল" (Crown gall)* সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া *Agrobacterium tumefaciens (অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমেফ্যাসিয়েনস), ক্লাবরুট ছত্রাক* (Clubroot fungus) *Plasmodiophora brassicae (প্লাসমোডিওফেরা ব্রাসিকি)* যা সরষে গাছের পচন ঘটায়, ইত্যাদির প্রভাবে জাইলেম নালিকার বাইরে অনিয়মিত বৃদ্ধি ঘটার দরুন জাইলেম নালিকার উপর চাপ পড়ে ফলে রসের উৎস্রোত হ্রাস পায়। আর *Fusarium* (ফিউসারিয়াম) নামক ছত্রাক ও *Pseudomonas* (সিউডোমোনাস) নামক ব্যাকটেরিয়া জাইলেম নালিকাকে সরাসরি আক্রমণ করে এবং তার মধ্যে বৃদ্ধি পায় ফলে জল পহিবহন হ্রাস পায়।

  জল শোষণের হার যেহেতু বাষ্পমোচনের হারের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু যে সমস্ত সংক্রমণ বাষ্পমোচনের হারকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয় যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই দুই পদ্ধতির মধ্যেও তারতম্য এত বেশি হয় যে উদ্ভিদের ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। *রাস্ট* (rust) বা *মরিচা* রোগের ক্ষেত্রে পাতার উপরিত্বকের কোশগুলি আক্রান্ত হলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে জল পাতা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে, ফলে বাষ্পমোচনজনিত টান অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। জল শোষণের হার এর ফলে অন্যবশ্যকভাবে বেড়ে যায় যা উদ্ভিদের শক্তি অপব্যয়ের জন্য দায়ী।

- **খাদ্যের পরিবহন ও প্যাথোজেন ঃ** সমস্ত পূর্ণপরজীবি যারা অন্য উদ্ভিদের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল তারা ফ্লোয়েম কলাকে আক্রমণ করে পাতা থেকে খাদ্যদ্রব্যের কোশে কোশে সঞ্চারণকে ব্যাহত করে। মরিচা (rust) বা *গুঁড়া চিতি* (mildew) রোগসৃষ্টিকারী বিভিন্ন পূর্ণ পরজীবি ছত্রাক এইভবেই পরিপোষক সংগ্রহ করে তেমনি পূর্ণপরজীবি উচ্চতর উদ্ভিদ যেমন স্বর্ণলতা *(Cuscuta relfexa)* পোষক উদ্ভিদের ফ্লোয়েমের মধ্যে চোষক মূল প্রবেশ করিয়ে সেখান থেকে পরিপোষক টেনে নেয় ফলে পোষক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ শক্তির যোগান থেকে বঞ্চিত হয়।

11.3.3 শ্বসন প্রক্রিয়ার উপর প্যাথোজেনের গুরুত্ব :

সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপাদিত খাদ্য হল সবুজ উদ্ভিদের শক্তির উৎস। এই খাদ্য (শর্করা) কোশীয় শ্বসনের মধ্য দিয়ে রাসায়নিক শক্তি উৎপাদন করে যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি, কোশ বিভাজন, উৎসেচক-হরমোন ইত্যাদির

সক্রিয়তা, প্রোটিন সংশ্লেষ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়, ফলে যে কোন উদ্ভিদ যখন প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন যে জৈব প্রক্রিয়াটি সর্বপ্রথম প্রভাবিত হয় সেটি হল শ্বসন। সাধারণতঃ আক্রান্ত উদ্ভিদে শ্বসনের হার বৃদ্ধি পায় কেন না আক্রান্ত কোশ স্বাভাবিক শর্করা ছাড়াও তার সঞ্চিত খাদ্যও শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগিয়ে ফেলে। এই অবস্থা প্যাথোজেন উদ্ভিদের মধ্যে সংক্রমনকে স্থায়ী করতে পারা পর্যন্ত চলে। তারপর স্থায়ী প্যাথোজেন যখন নিজেও বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে তখন শ্বসনের হার কমে যায়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় বহু সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বিপাকক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি (growth) ও কোশ বিভাজনের হার বাড়ে, কোশীয় বস্তু সংশ্লেষের হার বাড়ে এবং এসবই হয় আক্রান্ত অঞ্চলে কোশীয় শক্তির বিনিময়ে। ফলে শক্তির বাড়তি চাহিদার যোগান দিতে উদ্ভিদে শ্বসনের হার বাড়ে। এই বাড়তি শক্তি বস্তুতপক্ষে উদ্ভিদটির কোন কাজে লাগে না এবং এই বাড়তি শক্তির অপব্যয় ঘটে। অথচ দেহের বাকী অংশের সক্ষমতা বজায় রাখতে উদ্ভিদটিকে শ্বসনের হার আরও বাড়াতে হয়। ফলে আক্রান্ত উদ্ভিদ দুর্বলতর হয়ে পড়ে, তার প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সেটির মধ্যে প্যাথোজেন অনায়াসেই অনুকুল পরিবেশ পেয়ে যায়। এই অবস্থায় উদ্ভিদটি খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য সংবহন পদ্ধতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং শ্বসনের হার ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

11.3.4 প্রোটিনের সংশ্লেষ পদ্ধতির উপর প্রভাব :

যে কোন স্বাভাবিক উদ্ভিদকোশের দুটি প্রধান কাজ হল (1) নিউক্লিয়াসের অন্তর্গত DNA বাহিত "সংবাদ"কে বাহক RNA-তে (mRNA) লিপিকরণ (transcription) করা (2) পাঠান্তরিত সংবাদকে প্রোটি অণু গঠনের মাধ্যমে অনুদিত (Translation) করা। লিপিকরণ ও অনুবাদ হল স্বাভাবিক কোশের সক্ষমতার সঠিক শারীরবৃত্তীয় রূপ। প্যাথোজেনের আক্রমনে এই প্রক্রিয়াদ্বয়ের কোনটি বা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হলে আক্রান্ত কোশকে আর স্বাভাবিক বলা যায় না। বহু প্যাথোজেন যেমন *মরিচা* রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাক বা *বর্ণালী* (mosaic) রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস পোষক কোশের উৎসেচকতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে নিজের **mRNA** গঠন করে ফলে লিপিকরণ যদি বা চলতে থাকে তা কিন্তু বাহক RNA তৈরির জন্য নয় বরং প্যাথোজেনের প্রয়োজনের যোগান অব্যাহত রাখতে।

তবে যে কোন সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে পোষকের প্রাথমিক প্রবণতাই হল বাধাদানের। তাই সংক্রমনস্থলের কোশগুলিতে একাধিক উৎসেচক (অর্থাৎ একাধিক প্রোটিন) সংশ্লেষিত হয় যারা কোশে স্বাভাবিকভাবে থাকে না বা থাকলেও খুব কম পরিমানে থাকে। এই সমস্ত প্রোটিনের সংশ্লেষ যেমন একাধারে প্যাথোজেনের সংক্রমনের প্রভাব তেমনি অন্যভাবে এটি পোষখ প্রতিরোধী ব্যবস্থার অঙ্গ। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতিরোধী উদ্ভিদকে যদি এমন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রভাবিত করা যায় যা প্রোটিন সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে উদ্ভিদটি তার প্রতিরোধক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

অনুশীলনী - 2

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

a) সংক্রামক প্যাথোজেন নিঃসৃত দুই প্রকার বিষাক্ত পাদার্থ হল ______________ ও ______________।

b) জলের ________________ পরিবহন রোগাক্রান্ত উদ্ভিদে ________________ কলায় সংক্রমণের দরুণ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

c) ________________ রোগের ক্ষেত্রে পত্রত্বক আক্রান্ত হলে ________________ হার অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বেড়ে যায় ফলে ________________ হারও বাড়ে।

2. সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :

a) পত্ররন্ধ্র হয়ে গেলে সালোকসংশ্লেষের হার কমে ফলে উদ্ভিদটির মধ্যে (ধ্বসা রোগ / নুয়ে পড়া (Wilting)/পচন) রোগলক্ষণ দেখা যায়।

b) আক্রান্ত উদ্ভিদ কোশে বর্ণালী (mosaic) রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস নিজস্ব (mRNA / DNA / উৎসেচক) তৈরি করে।

c) পরজীবি উদ্ভিদ পোষক (জাইলেম / ফ্লোয়েম/ বহিঃস্তক)' এ চোষক মূল প্রবেশ করিয়ে পুষ্টি সংগ্রহ করে।

3. ডানদিকের অংশের সাথে বামদিকের অংশ সঠিকভাবে মেলান :

a) ভাইরাস ও মাইকোপ্লাজমা	i) ক্রাউন গল
b) Agrobacterium tumefasciens	ii) চোষক মূল
c) (Fusarium sp.)	iii) ক্লোরোসিস
d) *মরিচা* রোগের জীবাণু	iv) পাতার উপরিতলের ক্ষয়
e) স্বর্ণলতা	v) জাইলেম বহিকার সংক্রমন

11.4 সারাংশ

প্যাথোজেনের দ্বারা সৃষ্ট রোগ অনুকূল পরিবেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়ে মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে। কিন্তু কয়েকপ্রকার ছত্রাকের চলরেণু ছাড়া অপর কোন প্যাথোজেন নেই যা স্বতঃই স্থানান্তরে গিয়ে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সেক্ষেত্রে প্যাথোজেন এক বা একাধিক বাহকের সাহায্যে একই উদ্ভিদের এক অংশ থেকে অপর অংশে, এক উদ্ভিদ থেকে অন্য সুস্থ উদ্ভিদে অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে। *বায়ু, জল পতঙ্গ ও মানুষ মুখ্যতঃ বাহকের ভূমিকা* পালন করে। রেণু উৎপাদনকারী ছত্রাক এবং পরজীবি সপুষ্পক উদ্ভিদ যারা বীজ উৎপাদন করে তারা মুখ্যত বায়ুর সাহায্যে রোগের বিস্তার ঘটায় এভাবে ছড়িয়ে পড়া সমস্ত রেণুই যে তাদের পোষকের সংস্পর্শে আসে তা নয় বরং অতি সামান্য পরিমাণ রেণুই তাদের পোষকের উপর নীত হয়। এদের মধ্যে যে সমস্ত ছত্রাকের রেণু হালকা ও দৃঢ় প্রাচীরযুক্ত তাদের বিস্তারের সাফল্য অপেক্ষাকৃত বেশি। তাদের মাধ্যমে বিস্তারের ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি কেন না রেণুর অঙ্কুরোদগমের জন্য জল স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া

যায়। এই কারণে বৃষ্টির জল বা সেচের জল মারফত রোগ ছড়িয়ে পড়বার ব্যাপকতা অনেক বেশি। পতঙ্গগুলির মধ্যে *চোষক পোকা, পাতা ফড়িং* ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে সংক্রমণ ঘটায় কেন না এরা জীবাণুকে দেহাভ্যন্তরে আশ্রয় দেয়। আবার বিভিন্ন পতঙ্গ পরোক্ষভাবে *ক্ষতস্থান সৃষ্টি* করেও সংক্রমণ ঘটাতে পারে। পতঙ্গ বহুক্ষেত্রে প্যাথোজেনকে আশ্রয়দাতা হিসাবে কাজ করে এবং পরবর্তকী পর্যায়ে প্যাথোজেনকে সুস্থ উদ্ভিদে স্থানান্তরিত করে রোগ ছড়ায়। মানুষ নানাভাবে রোগের বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা নেয়। চাষবাসের ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ থেকে সুস্থ উদ্ভিদদেহে জীবাণু স্থানান্তরনে মানুষের হাত, যনত্রপাতি, পোষক বড় ভূমিকা নেয়। এছাড়া অন্যান্য মাধ্যমের দ্বারা যেমন *বীজের সাহায্যে, কন্দের সাহায্যে, উদ্ভিদ অবশেষের সাহায্যে, কার বা মৃত্তিকার সাহায্যে* প্যাথোজেনের বিস্তার ঘটে থাকে।

প্যাথোজেনের *শারীরবৃত্তীয়* ভূমিকা মূলতঃ *সালোকসংশ্লেষ, শোষণ, শ্বসন ও প্রোটিন সংশ্লেষ* পদ্ধতির উপর প্রভাবকারী। স্বাভাবিক উদ্ভিদের তুলনায় এইসব প্রক্রিয়ার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে উদভিদের গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় সাম্যাকথা ব্যাহত হয়।

11.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. রোগজীবাণু কোন কোন বাহকের মাধ্যমে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়ে? জল কিভাবে রোগবিস্তারে সহায়তা করে?
2. পতঙ্গ কিরূপে সংক্রমণ বিস্তারে সহায়তা করে? প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ রোগবিস্তারের উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
3. টীকা লিখুন ঃ
   (a) বীজ বাহিত সংক্রমণ
   (b) বৃত্তিকার সাহায্যে সংক্রমণ
   (c) বায়ুবাহিত সংক্রমণ
4. প্যাথোজেনের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ ও জলশোষণ পদ্ধতি কিভাবে প্রভাবিত হয় তা প্রতিক্ষেত্রে অন্ততঃ দুটি করে উদাহরণের সাহায্যে বিবৃত করুন।

11.6 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

1. (a) ছত্রাক
   (b) সহজেই অঙ্কুরোদগম ঘটে
   (c) *Claviceps purpurea*

2. (a) নিমাটোড ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত ব্যাকটেরিয়া

(b) চোষক পোকা ও পাতা ফড়িং

(c) আলুর বিলম্বিত ধ্বসা

3. (a) মানুষের সহায়তায় হয়ে থাকে।

(b) আলুর ওয়ার্ট বা মাশক রোগ।

(c) গোবর সারের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করে।

অনুশীলনী - 2

1. (a) ট্যাবটক্সিন ও টেনটক্সিন।

(b) উর্দ্ধমুখী, জাইলেম।

(c) রাষ্ট্র, বাষ্পমোচনের, জলশোষনের

2. (a) নুয়ে পড়া (b) mRNA (c) ফ্লোয়েম

3. (a) (iii) (b) (i) (c) (v)

(d) (iv) (e) (ii)

11.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1.

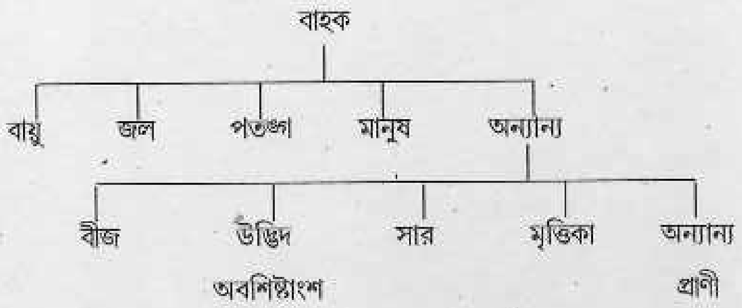

রোগ বিস্তারে জলের ভূমিকা 11.2.2 অংশাঙ্কিত আলোচনায় পাওয়া যাবে।

2. বিজ্ঞানী J. G. Leach (1040) এর মতে পতঙ্গ কয়েকটি উপায়ে সংক্রমণ ঘটায়। এগুলির হল—

(i) প্রত্যক্ষভাবে প্যাথোজেন বহন করে।

(ii) প্যাথোজেনকে সুস্থ উদ্ভিদে স্থানান্তরিত করে

(iii) খাদ্যনালীতে বা অন্য দেহাংশে প্যাথোজেনকে আশ্রয় দিয়ে

(iv) প্রতিকূল দশা অতিবাহিত করতে সাহায্য করে

(v) Toxin নিসৃত করে।

প্রত্যক্ষ রোগবিস্তারের উদাহরণ হল ঃ ছত্রাকঘটিত আরগট ও অ্যানথ্রাকনোজ।

অপ্রত্যক্ষ রোগবিস্তারের উদাহরণ ঃ গমের রাস্ট রোগ

3. (i) 11.2.5 এর (ক) অংশে আলোচিত।

(ii) 11.2.5 এর (ঙ) অংশে আলোচিত।

(iii) স্থানান্তরন। সাধারণতঃ এই রেণু হালকা বা দৃঢ় প্রাচীর যুক্ত হয় যাতে সহজেই ভাসতে পারে অথচ নষ্ট না হয়। তথাপি অধিকাংশ বায়ুবাহিত সংক্রমণই পোষকের সংস্পর্শে আসতে পারে না। দানা শস্যের মরিচা রোগ, বিভিন্ন উদ্ভিদের গুঁড়াচিতি এর উদাহরণ।

4. 11.3.1 ও 11.3.2 অংশাঙ্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

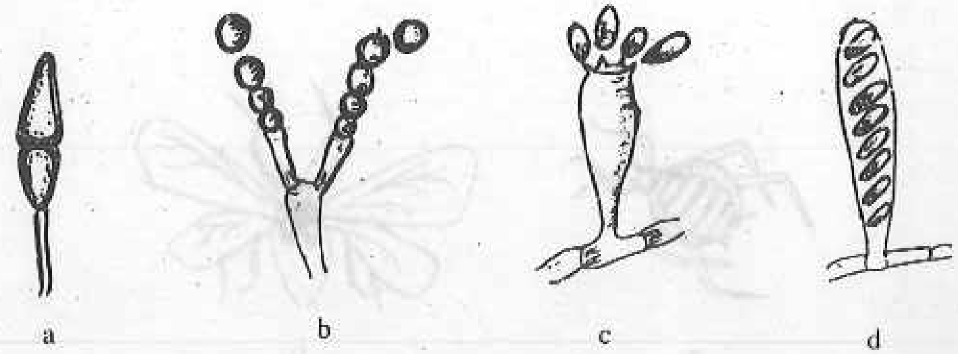

চিত্র নং 11.1 : কয়েকপ্রকার ছত্রাকের রেণু : (a) টিলিউটোরেণু (b) কনিডিয়া
(c) বেসিডিওরেণু (d) অ্যাস্কোরেণু

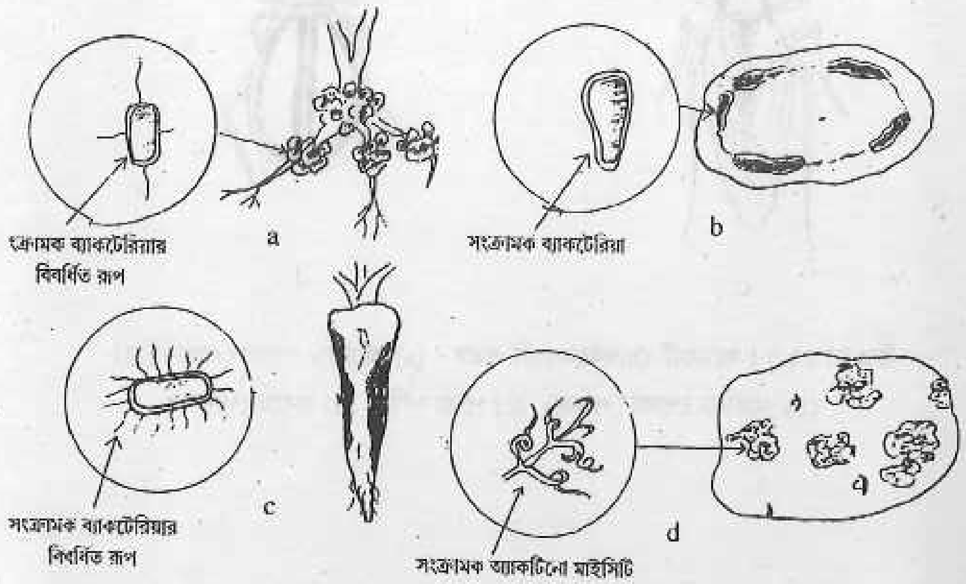

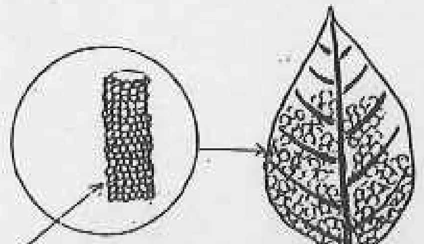

চিত্র নং 11.2 : কয়েকপ্রকার ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসঘটিত রোগ : (a) গল (b) আলুর পচন (c) গাজরের ভিজা পচন (d) অ্যাকটিনোমাইসিটি ঘটিত আলুর পচন (c) TMV ঘটিত বর্ণালী

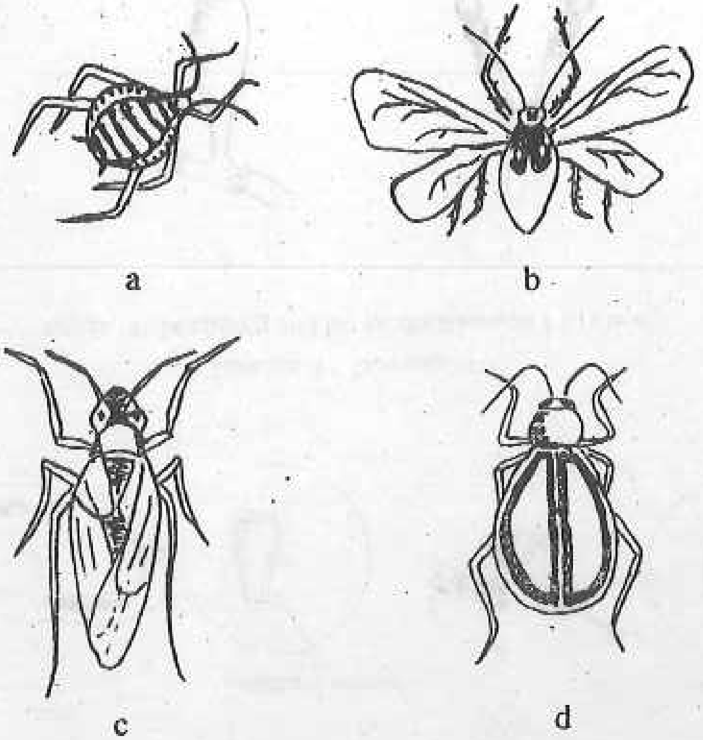

চিত্র নং 11.3 ঃ কয়েকটি রোগবহনকারী পতঙ্গ - (a) অ্যাফিড পোকা (পক্ষবিহীন) (b) অ্যাফিড পোকা (পক্ষল) (c) পাতা ফড়িং (d) গুবরে পোকা

একক 12 □ সংক্রমণের বাহ্যিক ও রাসায়নিক রূপরেখা

গঠন

12.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
12.2 প্যাথোজেনের পোষক দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ
12.2.1 সংযোগ সাধন
12.2.2 অনুপ্রবেশ পূর্ববর্ত্তী পর্যায়
12.2.3 স্বাভাবিক রন্ধ্রের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ
ক) পত্ররন্ধ্র
খ) লেন্টিসেল
গ) অন্যান্য রন্ধ্র
12.2.4 সরাসরি অনুপ্রবেশ
12.2.5 ক্ষতস্থানের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ
12.2.6 মূলরোম ও মুকুলের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ
12.3 প্যাথোজেনের রাসায়নিক ক্ষমতাবলী
12.3.1 উৎসেচক
12.3.2 উৎসেচক ও কোশ প্রাচীর
12.3.3 উৎসেচক ও প্রোটোপ্লাজমীয় পদার্থসমূহ
12.4 রোগসৃষ্টিতে অধিবিষের ভূমিকা
12.4.1 ব্যাপক কার্যকারিতাযুক্ত অধিবিষ
12.4.2 নির্দিষ্ট পোষকে সীমাবধ্ব অধিবিষ
12.5 রোগসৃষ্টিতে হরমোনের ভূমিকা
12.5.1 অক্সিন
12.5.2 জিব্বারেলিন
12.5.3 সাইটোকাইনিন
12.5.4 ইথিলীন
12.5.5 অ্যাবসিসিক অ্যাসিড
12.6 পোষকের অভ্যন্তরে বৃদ্ধি ও বিস্তার
12.7 প্রতিকূল দশা অতিক্রমণ
12.8 সারাংশ
12.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
12.10 উত্তরমালা

12.1 প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী পর্যায়গুলি থেকে আমরা জানতে পেরেছি উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানগুলি কি কি এবং কিভাবে তারা স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। রোগ ছড়িয়ে পড়ে বলেই সীমাবদ্ধ ক্ষতির এলাকা অতিক্রম করে রোগটি মহামারী রূপে দেখা দেয়। কিন্তু রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়া মানেই তো সফল সংক্রমণ নয়। সংক্রমণ একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা, জীবাণুকে পোষক উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করতে হবে, বিভিন্ন উৎসেচকের সহায়তায় পোষক কোশের তথা কলার সুসংবদ্ধতাকে নষ্ট করতে হবে, রোগ সৃষ্টিকারী উপাদান থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা পোষক-উদ্ভিদের দেহের অভ্যন্তরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সহজেই প্যাথোজেন বা রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু পোষক-উদ্ভিদটি থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। পুরো কাজটি প্যাথোজেনের পক্ষে যতটা সহজভাবে বলা হয় ততটা সহজ নয় কেননা একটি সুস্থ উদ্ভিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি দুর্গের সাথেই তুলনীয়। তার যে অংশ পরিবেশের আলো হাওয়ার সান্নিধ্যে আসে অর্থাৎ উদ্ভিদদেহের উপরিতল-সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত দৃঢ় কোষ প্রাচীর আবরণী দিয়ে আবৃত তো থাকেই তা ছাড়াও কোশপ্রাচীরের উপর বহু ক্ষেত্রেই থাকে কিউটিকল আবরণী বা মোম জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত আবরণী। বোঝাই যাচ্ছে যে এই বাধা অতিক্রম করে অনুপ্রবেশের কাজটিই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। অনুপ্রবেশ যদিও বা সম্ভব হল তো পোষক দেহ থেকে সহজেই পুষ্টি আহরণ প্যাথোজেনের পক্ষে সম্ভব নয় কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোশীয় রাসায়নিক পদার্থগুলি প্যাথোজেন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য রূপে পরিণত করাটা হল প্যাথোজেনের দ্বিতীয় সমস্যা, তৃতীয়তঃ পোষক উদ্ভিদের দেহে এমন এক বা একাধিক যৌগ থাকতে পারে যাদের উপস্থিতি প্যাথোজেনের বৃদ্ধি তথা পুষ্টির পক্ষে সহায়ক নয়। সফল সংক্রমণ এই এতগুলি বাধাকে অতিক্রম করেই হওয়া সম্ভব। আলোচ্য এককে আমরা এই বিষয়েই আলোকপাত করব।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- প্যাথোজেন কিভাবে পোষক দেহে অনুপ্রবেশ ঘটায় এ বিষয়ে ধারণা করতে পারবেন।
- স্বাভাবিক রন্ধ্র বা ছিদ্র অথবা ক্ষতস্থান কিভাবে একটি প্যাথোজেনের প্রবেশদ্বার রূপে কাজ করতে পারে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- প্যাথোজেনের সংগ্রহে রাসায়নিক অস্ত্রগুলি কি কি তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত উৎসেচকগুলি কিভাবে সংক্রমণে সহায়তা করে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- প্যাথোজেন নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ (Toxins) 'এর ভূমিকা কি তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- উদ্ভিদ হরমোনগুলি সংক্রমণের সময় কি ভূমিকা পালন করে, পোষকের অভ্যন্তরে কিভাবে প্যাথোজেন বিস্তার লাভ করে এবং পরিবেশের প্রতিকূলতা প্যাথোজেন কিভাবে অতিক্রম করে—এই বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

12.2 প্যাথোজেনের পোষক দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ (Entry of plant Pathogens within the host)

পোষকদেহের অভ্যন্তরে প্যাথোজেন স্বাভাবিক রন্ধ্র বা ছিদ্রের মাধ্যমে অথবা ক্ষতস্থানের মাধ্যমে অথবা পোষকের বাধাদানের স্বাভাবিক প্রবণতাকে বিনষ্ট করে অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হতে পারে।

12.2.1 সংযোগ সাধন (Contact) :

পোষক উদ্ভিদের সাথে প্যাথোজেনের সংযোগ সাধনের পদ্ধতিটি Inoculation (ইনোকিউলেশন) বা বীজায়ন নামে পরিচিত। আমরা একক - 9 পড়ে জেনেছি যে প্যাথোজেনের যে অংশ পোষকের সংস্পর্শে এসে রোগসৃষ্টি করে তাকে বলে Inoculum (ইনোকিউলাম)। **অর্থাৎ ইনোকিউলাম যেই মুহূর্তে পোষক উদ্ভিদের সাথে সংযোগ সাধনে সক্ষম হয় সেই মুহূর্ত থেকেই সংক্রমণের শুরু বলা যায়।** একক-11 থেকে আমরা জানতে পেরেছি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক যারা প্যাথোজেনরূপে কাজ করে, তারা বায়ু বা জল বাহিত হয়ে বা পতঙ্গজাতীয় বাহকের মাধ্যমে পোষকের সংস্পর্শে আসে। তবে ছত্রাকের চলরেণু বা অন্যান্য গমনাঙ্গ বিশিষ্ট প্যাথোজেন (যেমন ফ্লাজেলাযুক্ত ব্যাকটেরিয়া) পোষকের মূল নিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হবার নজীর আছে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে আকর্ষণের উদ্দীপনাটি সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক নাও হতে পারে। Knew ও Zentmyer (1974) এর মতো কেউ কেউ উদ্দীপনাটিকে বৈদ্যুতিক বিভব প্রভেদ সঞ্জাত (Electrotactic responses) বলে চিহ্নিত করেছেন।

12.2.2 অনুপ্রবেশ-পূর্ববর্তী পর্যায় :

সমস্ত প্যাথোজেনই স্বাভাবিক অবস্থায় সংক্রমণ ঘটাতে পারে। কিন্তু ছত্রাকের রেণু, উন্নত পরজীবি উদভিদের বীজ ইত্যাদিকে স্বাভাবিক জীবদেহটি গঠন করতে গেলে অঙ্কুরিত হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য নিমাটোড জাতীয় প্রাণীর ডিম অথবা পতঙ্গজাতীয় সংক্রমন সৃষ্টিকারী প্রাণীর লার্ভা প্রসঙ্গে

ছত্রাকের রেণু বা পরজীবির বীজ অঙ্কুরিত হবার পূর্বশর্ত হল পর্যাপ্ত পরিমাণ জল, তাপমাত্রা ইত্যাদি। জল বৃষ্টিপাত বা শিশির থেকে পাওয়া যেতে পারে অথবা বাতাসের জলীয় বাষ্প অঙ্কুরোদগমে সাহায্য করে। এই উচ্চতর আর্দ্রতা এবং উপযুক্ত তাপমাত্রার স্থায়িত্ব ক্ষণকালীন হলে চলবে না কেন না সেক্ষেত্রে অঙ্কুরোদগমের পরেও প্যাথোজেন শুষ্কতার শিকার হতে পারে। সমস্ত বীজ বা রেণু যে উৎপাদিত হবার সাথে সাথেই অঙ্কুরিত হয় তা নয়, এদের মধ্যে কিছু কিছু একটি দীর্ঘ *সুপ্ত দশা* (Dormant Phase) অতিবাহিত করার পরই অঙ্কুরিত হবার উপযোগী হয়। অঙ্কুরোদগম প্রায়শই পোষক উদ্ভিদ দ্বারা নিঃসৃতক পদার্থ সমূহ যারা দেহের বহিরাবরণীর বাইরে জমা হয় (যেমন শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড)—তাদের দ্বারা ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং এই জাতীয় পরিপোষক যত দ্রুতহারে পোষকদেহের বহিরে সঞ্চিত হবে তত দ্রুততার সাথেই রেণু অঙ্কুরিত হবে। অপরপক্ষে উদ্ভিদের মূলতন্ত্রের নিকটবর্তী জলে বিশেষ বিশেষ মূলনিঃসৃত উপাদানের উপস্থিতির দরুণ অথবা উদ্ভিদগাত্রে বা উদ্ভিদের নিকটবর্তী অংশে বিশেষ বিশেষ অনুজীবের উপস্থিতি রেণুর অঙ্কুরোদগমে বাধা দিতে পারে। প্রতিরোধী অনুজীবের উপস্থিতিতে ছত্রাক অঙ্কুরোদগমে প্রতিবন্ধকতাকে Fungistasis *(ফাঞ্জিষ্ট্যাসিস)* নামে অভিহিত করা হয়।

যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে ছত্রাকের রেণু *জার্ম টিউব* (germ tube) গঠন করে অঙ্কুরিত হয় অথবা চলরেণু (zoospore) গঠন করে। জার্ম টিউব বা চলরেণু উদ্ভিদের বহির্গাত্রে অনুপ্রবেশের অনুকূল অংশের সংস্পর্শে এসেই অনুপ্রবেশ ঘটা সম্ভব। অনুকূল অংশগুলি বলতে সাধারণভাবে স্বাভাবিক ছিদ্র অর্থাৎ *পত্ররন্ধ্র*(stomata) অথবা *লেন্টিসেল* (lenticel) নামক কাণ্ডস্থ ছিদ্র অথবা কৃত্রিম ছিদ্র অর্থাৎ ক্ষতস্থান (wound) ইত্যাদিকে বোঝায়। নিমাটোড (Nematode) দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত কোন কোন উইলট প্যাথোজেনের (Wilt Pathogens) অনুপ্রবেশের বিশেষ সহায়ক তবে এই সব রন্ধ্রপথ ছাড়াও উদ্ভিদের বহিরাবরণীর যে কোন অংশকে বিনষ্ট করে রেণু থেকে উৎপন্ন জার্ম টিউব (germ tube) বা ছত্রাকের মাইসেলিয়াম পোষক দেহে অনুপ্রবেশ করতে পারে। কোন কোন ছত্রাক কেবলমাত্র স্বাভাবিক ছিদ্র বা ক্ষতস্থান দিয়ে প্রবেশ করে আবার অন্য কিছু ছত্রাকের ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ *Botrytis cinerea (বট্রাইটিস সাইনেরিয়া)* ছত্রাকটির কথা বলা যায় সেটি স্বাভাবিক পথে বা সরাসরি পোষক-কোশকে বিদীর্ণ করে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

এতো গেল ছত্রাকের কথা, **নিমাটোড** জাতীয় রোগসৃষ্টিকারী জীব যারা মাটিতে ডিম পাড়ে তাদের ক্ষেত্রেও ডিম থেকে লার্ভা উৎপন্ন হওয়া **তাপমাত্রা, জলীয় বাষ্প** ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। প্রথম লার্ভা দশার পরে উৎপন্ন দ্বিতীয় লার্ভা দশা অথবা পূর্ণাঙ্গ জীব অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম, এগুলি সাধারণতঃ মূল থেকে নিঃসৃত হওয়া রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং প্রধানতঃ মূলের মধ্য দিয়েই অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে।

এখনও পর্যন্ত খুব পরিষ্কার ভাবে জানা যায়নি কিভাবে প্যাথোজেন পোষককে অথবা পোষক প্যাথোজেনকে "চিনে" নিতে পারে। এটি সুনিশ্চিতবাবে দেখা গেছে যে একটি প্যাথোজেন যখন একটি উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে তখন উভয়ের মধ্যেই অতি দ্রুত কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যার ফলে প্যাথোজেন অনুপ্রবেশ সক্ষম হয় অথবা সেটির বৃদ্ধি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ **রোগাক্রান্ত হবার প্রবণতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষতা উভয় প্রক্রিয়াই প্যাথোজেন ও পোষকের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার (Host-Parasite interactions) উপর নির্ভরশীল**, সম্ভবতঃ পোষক নিঃসৃত কোন রাসায়নিক পদার্থ এক্ষেত্রে *সিগন্যালস্বরূপ* (Signal) কাজ করে। যদি সিগন্যালটি অনুকুল হয় তবে প্যাথোজেন অতি দ্রুততার সাথে অনুপ্রবেশ সম্পন্ন করে। যদি সিগন্যাল প্রতিকূল হয় তবে প্যাথোজেনের বৃদ্ধি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং সংক্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর বিপরীত প্রতিক্রিয়াও ঘটা সম্ভব; অর্থাৎ প্যাথোজেন এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে যার প্রভাবে উদ্ভিদ প্যাথোজেনকে স্বদেহে গ্রহণ করে ফলে রোগাক্রান্ত হয় অথবা সেটি কোন প্রতিরোধী রাসায়নিক উৎপন্ন করে প্যাথোজেনের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে। সংক্রমণে **সাফল্য অথবা ব্যর্থতা দুটি প্রক্রিয়াই প্যাথোজেন ও পোষক উভয়ে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল**। অর্থাৎ "চিনে নেওয়া" বলতে আমরা কেবল সংক্রমণ নয়, সংক্রমণ প্রতিরোধকেও বুঝি।

12.2.3 প্যাথোজেনের পোষক দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ (Entry through Natural Openings) :

উদ্ভিদদেহে উপস্থিত স্বাভাবিক রন্ধ্র বা ছিদ্রগুলি হল পাতায় উপস্থিত *পত্ররন্ধ্র*(Stomata), কাণ্ডে উপস্থিত *লেন্টিসেল* (Lenticel), পত্রাগ্রে উপস্থিত *জলছিদ্র বা হাইডাথোড* (Hydathode), ফুলের *মধুক্ষরা গ্রন্থির* (Nectarthode) ইত্যাদি। এর সব ক'টিই অুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার পক্ষে অনুকূল পথ বলে পরিগণিত হয়।

(a) **পত্ররন্ধ্র (Stomata) ঃ** দ্বিবীজপত্রীর পাতার নিম্নত্বকে এবং একবীজপত্রীর পাতার উভয় ত্বকে উপস্থিত স্বাভাবিক রন্ধ্রগুলি যারা প্রস্বেদনে ও গ্যাসীয় আদান-প্রদানে সহায়তা করে তাদের বলে পত্ররন্ধ্র। এরা দৈর্ঘ্যে 10-20μm এবং প্রস্থে 5-8μm হয়ে থাকে। ছিদ্রগুলি দিনে উন্মুক্ত ও রাত্রিকালে সাধারণত বন্ধ থাকে। পত্ররন্ধ্রের ঠিক নীচে একটি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা স্থান আছে যা *পত্ররন্ধ্রবর্তী গহ্বর* বা (Substomatal cavity) নামে পরিচিত। ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণের ক্ষেত্রে জীবাণু এক বা একাধিক সংখ্যায় এক বা একাধিক সংখ্যায় জলে ভাসমান অবস্থায় পত্ররন্ধ্রের কাছাকাছি আসে এবং অতি সহজেই অনুপ্রবেশের পর পত্ররন্ধ্রবর্তী গহ্বরে বংশবৃদ্ধি করে। সংখ্যায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবার পর জীবাণু সংক্রমণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে পারে। এই ধরনের অনুপ্রবেশের কয়েকটি উদাহরণ হল, কাণ্ডের মরিচা রোগের জন্য দায়ী ছত্রাক *Puccinia graminis tritici* (পাকসিনিয়া গ্রামিনিস্ ট্রিনিসি) সৃষ্ট ইউরোডোস্পোর; টোমাটো (Tomato) পাতার রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক *Cladosporium fulvum* (ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম ফালভাম) অথবা তামাক (Tobacco) পাতার রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া *Pseudomonas tabaci* (সিউডোমোনাস টাবাকি); আপেল অথবা নাসপাতির (apple or pear) রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া *Erwinia amylovora* (আরউইনিয়া অ্যামাইলোভোরা) ইত্যাদি।

> **প্রান্তলিপি ঃ** উদ্ভিদের সবুজ অংশে, বিশেষত পাতায়, যে সমস্ত অতি ক্ষুদ্রাকৃতি ছিদ্র দেখা যায় তাকে বলে পত্ররন্ধ্র বা স্টোমাটা। প্রতিটি স্টোমা একটি ছিদ্র এবং তাকে দুপাশে ঘিরে থাকা দুটি রক্ষী
>
> 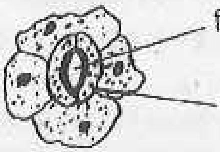
>
>
> কোষ দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদদেহে উপস্থিত সবচাইতে উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক ছিদ্র হল স্টোমাটা যার মাধ্যমে উদ্ভিদ গ্যাসীয় আদান প্রদান সম্পন্ন করে এবং অতিরিক্ত জল দেহ থেকে বাষ্পমোচন পদ্ধতিতে অপসারিত করে।

ছত্রাক কর্তৃক অনুপ্রবেশ কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ ছত্রাকের *রেণু* (spore) জার্ম টিউব গঠন করে অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরিত জার্মটিউবের সমস্ত প্রোটোপ্লাজম এই নলাকৃতি অংশের অগ্রভাগে চলে আসে ফলতঃ সেই অংশটি স্ফীত হয়ে যায়। এই স্ফীত অগ্রভাগকে বলে appresorium *(অ্যাপ্রেসোরিয়াম)* যা পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রের উপর নিপুণভাবে স্থিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই স্ফীত অগ্রভাগ একটি কোশ প্রাচীর গঠন করে জার্ম-টিউবের বাকী অংশের থেকে পৃথকীভূত হয় তবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। এরপর অ্যাপ্রেসোরিয়াম থেকে এক বা একাধিক হাইফা নির্গত হয়ে পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অনুবর্তী গহ্বরে প্রবেশ করে। অ্যাপ্রেসোরিয়ামের প্রোটোপ্লাজম অতঃপর এই হাইফায় স্থানান্তরিত হয়। এই প্রাথমিক হাইফাটি থেকে এবার বহু হাইফা নির্গত হয় এবং যেগুলি *চোষক* বা houstoria গঠন করে অথবা সরাসরি কোশ এবং কোশান্তর রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদদেহে ছড়িয়ে পড়ে। (চিত্র 12.1 দ্রষ্টব্য)

একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল *গুঁড়া চিতি* (powdery mildew) রোগের জন্য দায়ী ছত্রাক যেটি মুক্ত পত্ররন্ধ্রের উপর দিয়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় কিন্তু সেটির মধ্য দিয়ে উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে না।

(b) **লেন্টিসেলের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ ঃ** বহু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বহিঃস্তকের বাইরে একটি সুরক্ষা প্রদানকারী কলা গঠিত হয়। এই কলা পেরিডার্ম নামে পরিচিত। এই *পেরিডার্ম* (কথ্য ভাষায় গাছের ছাল বা বল্কল)

একাধিক কোশস্তর দ্বারা গঠিত। একদম বাইরের কোশস্তরটি বহু ক্ষেত্রে অন্তভাগে পুনঃ পুনঃ নতুন কোশ গঠনের সচাপে ছিন্ন হয়ে গিয়ে একটি স্বাভাবিক রন্ধ্র গঠন করে যা লেন্টিসেল নামে পরিচিত (প্রান্তলিপি দ্রষ্টব্য) এই রন্ধ্রপথ বহু ছত্রাক সফলভাবে অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করে *Penicillium expansum (পেনিসিলিয়াম এক্সপ্যানসাম)* কর্তৃক আপেল এর পচন এর একটি উদাহরণ। লক্ষ্যণীয় এই যে অনুপ্রবেশ কাণ্ডের ছিদ্র মাধ্যমে হয়ে থাকলেও সংক্রমণ স্থলটি হল উৎপাদিত ফল। *Streptomyces scabies (স্ট্রেপটোমাইসেস স্ক্যাবিস্)* অথবা *Oospora Pustulans (উস্পোরা পুস্টুলানস)* যা আলুর কন্দে common scab ও skin scab রোগ সৃষ্টি করে সেটির প্রবেশপথও লেন্টিসেল। এখানেও লক্ষ্যণীয় যে, অনুপ্রবেশ স্থল ভূউপরিস্থ কাণ্ড হলেও সংক্রমনের লক্ষণগুলি খাদ্যসঞ্চয়কারী ভূগর্ভস্থ কাণ্ডে (Under ground stems) প্রকাশিত। তবে অধিকাংশ জীবাণু যারা লেন্টিসেলের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করে তারা কাণ্ডের ক্ষতের মাধ্যমেও অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং তাদের প্রায় প্রতিটির ক্ষেত্রে লেন্টিসেনেলর মাধ্যমে অনুপ্রবেশ আপেক্ষাকৃত কম কার্যকরী পদ্ধতিরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে।

> **প্রান্তলিপি** ঃ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ডের বহিঃত্বক ভিতরের কোষের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধির কারণে স্থানে স্থানে ছিন্ন হয়ে গিয়ে এক ধরনের ছিদ্র গঠন করে থাকে বলে লেন্টিসেল। লেন্টিসেল
>
> 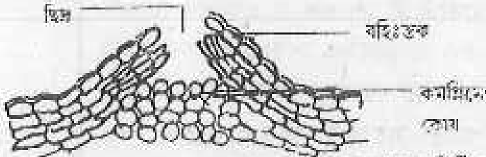
>
>
> অবশ্য সবধরনের বৃক্ষে দেখা যায় না। কেবলমাত্র দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড যাদের গৌণ বৃদ্ধি ঘটে তাদের ক্ষেত্রে লেন্টিসেল একটি স্বাভাবিক ছিদ্র। লেন্স আকৃতির এই উত্তল গঠনটিও গ্যাসীয় আদান প্রদানে সহায়ক।

(c) অন্যান্য রন্ধ্র ঃ অন্যান্য স্বাভাবিক রন্ধ্রপথগুলির মধ্যে জলছিদ্র, মধুক্ষরা গ্রন্থির মুক্ত নালিকা ইত্যাদি অনুপ্রবেশের দ্বাররূপে বহু জীবাণু দ্বারা ব্যবহৃত হয়। লেন্টিসেল ছাড়াও *Erwinia amylovora (আরউইনিয়া অ্যামাইলোভোরা)* নামক ব্যাকটিরিয়া আপেল, ন্যাশপাতি ইত্যাদির ফুলের মধুক্ষরা গ্রন্থির ছিদ্রপথে পোষক দেহে প্রবেশ করে থাকে। এক্ষেত্রে মধুক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ প্রাথমিকভাবে জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাহায্য করে যার ফলে পরবর্তী পর্যায়ের অনুপ্রবেশ সফলতর হয়। চলছিদ্র বা hydathode হল পত্রের অগ্রভাগে উপস্থিত স্বাভাবিক ছিদ্র যা গঠনগত বা কার্যগতভাবে পত্ররন্ধ্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। *Xanthomonas Campestris (জ্যান্থোমোনাস ক্যামপেসট্রিস) Xanthomonas oryzae (জ্যান্থোমোনাস ওরাইজি)* জাতীয়

> **প্রান্তলিপি-** ঃ টম্যাটো বা অন্যান্য কয়েকপ্রকার উদ্ভিদের পাতার প্রান্তে বিশেষতঃ শীতকালে ভোরবেলায় ফেনা ফেনা জলবিন্দু জমা হতে দেখা যায়। পাতার প্রান্তে উপস্থিত এক বিশেষ ধরনের স্বাভাবিক
>
> 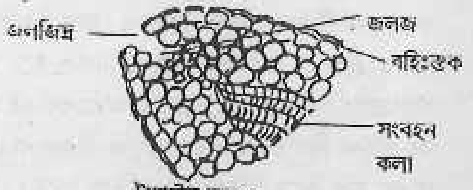
>
>
> টম্যাটোর জলরন্ধ্র
>
> ছিদ্র জলরন্ধ্র বা হাইডাথোড হল এই জলের নির্গমন পথ। এই ছিদ্রের ঠিক নীচেই দেখা যায় একটি জলগহ্বর। সংবহন নালিকার মধ্য দিয়ে জল এসে এই গহ্বরে জমা হয় এবং বাষ্পমোচনের হার অত্যন্ত কমে গেলে অতিরিক্ত জল এই রন্ধ্রপথে উদ্ভিদদেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

ব্যাকটেরিয়া ধানগাছে সংক্রমণ ঘটায় এই রকম জলছিদ্রের মাধ্যমে। সাধারণত ব্যাকটিরিয়া দ্বারা সৃষ্ট উদ্ভিদ রোগ জীবাণু অনুপ্রবেশের এটাই হল অন্যতম প্রধান পথ।

12.2.4 সরাসরি অনুপ্রবেশ (Direct penetration) :

স্বাভাবিক ছিদ্র ব্যতীত উদ্ভিদদেহের বহিরাবরণীর যে কোন অংশকে ভেদ করে যখন ছত্রাক বা অনুজীব পোষকদেহে অনুপ্রবেশ করে তখন তাকে সরাসরি অনুপ্রবেশ বা **direct penetration** বলা হয়। অধিকাংশ ছত্রাক বা নিমাটোড এবং সমস্ত পরজীবি উচ্চতর উদ্ভিদ এই পদ্ধতিতে পোষকদেহে প্রবেশ করে, তবে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সহ অন্য কোন জীবাণু এই উপায়ে উনুপ্রবেশ করতে পারে না।

যে সব ছত্রাক এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের *হাইফা* বা *জার্ম টিউব* যখন পোষকগাত্রের সংস্পর্শে আসে তখন একটি বিশেষ হাইফা গঠিত হয় যাকে বলে *অ্যাপ্রেসোরিয়াম* (appresorium)। পত্ররন্ধ্র যখন প্রবেশ পথ হিসাবে কাজ করে তখনও অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠিত হয় একথা পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে, তবে তখন সেটি পত্ররন্ধ্রের উপর স্থিত হয় আর এক্ষেত্রে সেটি পোষক গাত্রের যে কোন অংশের উপর স্থিত হয়ে একটি অতি সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশকারী হাইফা গঠন করে যেটির কাজ হল *কোশপ্রাচীর কিউটিকল আবরণী* ইত্যাদিকে ভেদ করে কোশের সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করা। এই অংশ যা *অ্যাপ্রেসোরিয়াম* থেকে নির্গত, তাকে বলা হয় *পেনিট্রেশন পেগ* (Penetration peg)। যখন এটি ভেদকরূপে কাজ করে তখন সাধারণ হাইফার তুলনায় তার ব্যাস অনেক কম, কিন্তু একবার সব বাধা অতিক্রম করে যখন সেটি কোশ গহ্বরের অভ্যন্তরে জায়গা করে নিতে পারে তখন সেটি অচিরেই স্বাভাবিক হাইফার আকার ও আকৃতি ধারণ করে। (চিত্র 12.2 দ্রষ্টব্য)। অধিকাংশ ছত্রাক প্যাথোজেন এভাবে কিউটিনঘটিত কিউটিকল আবরণী এবং সেলুলোজগঠিত কোশ প্রাচীর ভেদ করে অনুপ্রবেশ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন আপেলের scab রোগের ক্ষেত্রে ছত্রাকের অনুপ্রবেশকারী হাইফা কিউটিকল ও কোশ প্রাচীরের অন্তবর্তী অংশে সীমাবদ্ধ থাকে।

স্বর্ণলতার মতো পরজীবি উদ্ভিদের অনুপ্রবেশও একই রকমবাবে *অ্যাপ্রেসোরিয়াম* ও *অনুপ্রবেশকারী হাইফা* গঠনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংযোগকারী অংশ হল ভ্রূণমূল। নিমাটোড জাতীয় জীব উদ্ভিদদেহে সরাসরি ছিদ্র তৈরি করে প্রবেশ করে তাই জীবাণুর তুলনায় তাদের অনুপ্রবেশ পদ্ধতি কম জটিলতর। এদের মধ্যে কিছু হল বহিঃপরজীবি যাদের *Stylet (স্টাইলেট অথবা spear) ব্যতীত দেহের বাকী অংশ পোষকদেহের বাইরেই থাকে এবং stylet-এর সাহায্যে কোশরস থেকে তারা পুষ্টি আহরণ করে। যারা অন্তঃপরজীবি তাদের সম্পূর্ণ দেহ পোষক অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। (চিত্র 12.2 দ্রষ্টব্য)।

12.2.5 ক্ষতস্থানের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ (Penetration through wounds) :

সমস্ত ব্যাকটেরিয়ার পোষক দেহে প্রবেশ দ্বার হল ক্ষতস্থান। এছাড়া ছত্রাক, ভাইরাস ইত্যাদি সরাসরি ক্ষতস্থানের মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন বাহকের দ্বারা (যারা ক্ষত সৃষ্টি করেছে) পরোক্ষভাবে বাহিত হয়ে পোষকদেহের অভ্যন্তরে যেতে পারে। ক্ষতস্থান যেহেতু পচাগলা কোশরস সমৃদ্ধ সেহেতু জীবাণু সেখান থেকেই কিছু পুষ্টি উপাদান পেয়ে যায়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সুস্থ কোশকলাকে আক্রমণের আগেই জীবাণুর বেশ কিছুটা বৃদ্ধি ঐ ক্ষতস্থানের অঞ্চলেই সম্পন্ন হয়। ক্ষতস্থান সৃষ্টির কারণ বহু হতে পারে। বায়ু প্রবাহের চাপে ভেঙে যাওয়া শাখা

*Stylet, (স্টাইলেট) মৌখিক তন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নিমাটোডের দেহের সম্মুখভাগের একটি অংশ বিশেষ যার সাহায্যে নিমাটোড উদ্ভিদ পোষকের অভ্যন্তর থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে ও অনেকটা শুঙ্গের মতো অথবা বর্শার মত কাজ করে থাকে।

প্রশাখা, তাপমাত্রার উচ্চতা জনিত কারণে আবার অতিশীতলতা বা তুষাপাতের কারণে, দাবানলের প্রভাবে ক্ষতথান সৃষ্টি পতে পারে। এতো গেল প্রাকৃতিক কারণ। আর জীব দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতথান তো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আদ্য প্রাণী বা নিমাটোড থেকে শুরু করে শাকাহারী প্রাণী পর্যন্ত নানা কারণে হয়ে থাকতে পারে। গাছের পত্রবৃন্ত খসে পড়াও একটি সাময়িক ক্ষতথান সৃষ্টির কারণ যা অনুপ্রবেশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাঁচা ক্ষত যে প্যাথোজেনের বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক তা তো আগেই বলা হয়েছে, এটাও লক্ষ্যণীয় যে পরবর্তী ক্ষেত্রে প্যাথোজেন নিঃসৃত উৎসেচক বা বিযাক্ত রাসায়নিক পদার্থ আশেপাশের সুথ কোশগুলিকেও দ্রাব্য, সহজেই আত্মীকরণের উপযোগী, গলিত অংশে পরিণত করে এবং এভাবেই সংক্রমণ ক্রমশঃ অন্তর্ভাগের দিকে এগোতে থাকে (চিত্র 12.3 দ্রষ্টব্য)।

12.2.6 মূলরোম ও মুকুলের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ (Penetration through root hairs and buds) :

মূলরোমের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারী উল্লেখযোগ্য প্যাথোজেন হল *Plasmodiophora brassicae* যা *ক্রুসিফেরী* গোত্রের সদস্যদের finger and toe disease *(ফিংগার ও টো রোগ)* অথবা *রাইজোবিয়াম (Rhizobium)* ব্যাকটিরিয়া যা *লেগুমিনোসী* গোত্রের উদ্ভিদের সংক্রমণের কারণ। মুকুলের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ খুবই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন— *Taphrina cerasi* প্যাথোজেনটি চেরী (cherry) মুকুলের সংক্রমণের ফলে witches broom নামে লক্ষণ প্রকাশ করে (Gaumann, 1950) *T. deformans* ছত্রাকটি পত্র মুকুলের মাধ্যমে peach leaf curl disease, (পিচ লিফ কার্ল রোগ) অথবা *রাষ্ট* প্যাথোজেন যেমন *Urimycespisi* এই উপায়ে পোষ দেহে প্রবেশ করে।

অনুশীলনী - 1

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

a) ছত্রাকের রেণু অঙ্কুরিত হয় ________ গঠন করে অথবা ________ গঠন করে।

b) ________, ________ এবং ________ হল উদ্ভিদের তিনটি স্বাভাবিক রন্ধ্রপথ যার মাধ্যমে প্যাথোজেনের অনুপ্রবেশ ঘটা সম্ভব।

c) ________ হল একটি অ্যাকটিনোমাইসিটি গোষ্ঠীর ব্যাকটেরিয়া যা ________ 'এর মাধ্যমে আলুর কন্দে প্রবেশ করে এবং ________ হল এক ব্যাকটেরিয়া যা মধুক্ষরা গ্রন্থির ছিদ্রপথে আপেল বা ন্যাশপাতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে।

2. নীচের ঘটনাগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী সাজান :

পেনিট্রেশন পেগ, অ্যাপ্রেসোরিয়াম, জার্ম-টিউব, অনুপ্রবেশকারী হাইফা, সংযোগসাধন

3. ডানদিকের অংশের সাথে বামদিকের অংশ সঠিকভাবে মেলান :

a) জন্মছিদ্র	i) পেরিডার্ম
b) লেন্টিসেল	ii) ফ্যাজিষ্ট্যাসিস
c) প্রতিরোধী অনুজীব	iii) পত্রের কিনারায় রন্ধ্রপথ
d) সংক্রমণ হাইফা	iv) ক্ষতস্থান
e) পত্রবৃন্ত খসে পড়া	v) অনুপ্রবেশ

12.3 প্যাথোজেনের রাসায়নিক ক্ষমতাবলী

যদিও প্যাথোজেনের মধ্যে অধিকাংশই হয় স্বাভাবিক রন্ধ্রপথে অথবা কৃত্রিম যান্ত্রিক ক্ষমতাবলে ভেদনশক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে, কিন্তু প্রবেশ পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ প্রায় সার্বিকভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সুতরাং প্যাথোজেনের উপস্থিতির কারণে যে প্রতিক্রিয়া উদ্ভিদদেহে পরিলক্ষিত হয় তা প্রায় সম্পূর্ণতঃ প্যাথোজেন ও উদ্ভিদের কোশ হতে নির্গত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি হল মুখ্যতঃ উৎসেচক, *অধিবিষ* (toxin), *বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোন* (growth regulating hormone) এবং বিভিন্ন *বহুশর্করা* বা Polysaccharides ইত্যাদি। যদিও এদের আনুপাতিক প্রভাবের হার সব রোগের ক্ষেত্রে একরকম নয় তথাপি গুরুত্বের ক্রম অনুসারে আমরা পদার্থগুলিকে উপরে উল্লিখিত ক্রম অনুসারে সাজাতে পারি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সব চাইতে জরুরী রাসায়নিক অস্ত্র যা প্যাথোজেনের ভাণ্ডারে মজুত তা হল উৎসেচক।

12.3.1 উৎসেচক (Enzymes) :

উদ্ভিদ রোগ উৎপাদনে উৎসেচক যে বিশেষভাবে জড়িত, এই মতবাদটি সর্বপ্রথম A. De. Bary (এ. ডি. বারি) পরিলক্ষিত করেন 1886 সালে, Sclerotinia ছত্রাকটি ছিল গবেষণার উপাদান। পরবর্তীকালে বিশেষ অবদানের জন্য De. Bary কে Experimental plant pathology-র জনক বলে অভিহিত করা হয়।

> প্রান্তলিপি : উৎসেচক ঃ যে কোন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে প্রোটিন জাতীয় যৌগ জৈব অনুঘটকের কাজ করে তাকে বলে উৎসেচক / উৎসেচক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পর অপরিবর্ত্তিত থাকে। একটি বিশেষ বিক্রিয়ায় কেবলমাত্র একটি বিশেষ উৎসেচকই অংশগ্রহণ করতে পারে। বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী যৌগের *(সাবসট্রেট)* সাথে উৎসেচকের সম্পর্ক তালা ও চাবির মত। একটি তালা যেমন একটি বিশেষ চাবি দ্বারাই খোলে ঠিক তেমনি একটি বিশেষ সাবসট্রেট একটি বিশেষ উৎসেচকের সাথে যুক্ত হয়ে বিক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের সাথে উৎসেচক অবিকৃতভাবে সাবস্ট্রেটের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় $S + E = P + E$ যেখানে, S = সাবসট্রেট, P = বিক্রিয়ালব্ধ যৌগ, E = উৎসেচক।

সাধারণভাবে উৎসেচকসমূহ যা প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত হয় তারা পোষক কলার গঠনগত বিন্যাস ও সাযুজ্যকে নষ্ট করে দেয়, কোশের গঠনে অংশগ্রহণকারী প্রোটিন অথবা কোশে সঞ্চিত কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যকে সরলীকৃত করে,

সরাসরি প্রোটোপ্লাজমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং বিভিন্ন কোশীয় বিপাককাজে বাধাদান করে তার স্বাভাবিকতা নষ্ট করে। সাধারণভাবে উৎসেচক বলতে আমরা বুঝি দীর্ঘ প্রোটিন অনুসমূহকে যারা কোশীয় জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে। কোশের প্রতিটি জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া কোন না কোন উৎসেচক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত— অতএব তাদের গঠন ও কার্য এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে একটি উৎসেচক কেবলমাত্র একটি কোশীয় পদার্থের সাথে বিক্রিয়ার অংশ নিতে পারে।

12.3.2 উৎসেচক ও কোশ প্রাচীর (Enzymes and Cell Wall Materials) :

যে কোন প্যাথোজেন সাধারণভাবে পোষক দেহের যে অংশের সাথে সর্বপ্রথম সংযোগ সাধন করে তা হল পোষক দেহের বহিঃস্তক। বহিঃস্তকের কোশপ্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত। এছাড়া যদি উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ আক্রান্ত হয় তা হলে কোশ প্রাচীরের উপরিতলে *কিউটিন* নামক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নির্মিত একটি সুরক্ষাতলকে অতিক্রম করা প্যাথোজেনের সামনে বড় সমস্যা। এই সুরক্ষাতল **কিউটিকল** নামে পরিচিতি এবং এই অংশের মধ্যে বা বাইরের দিকে আবার মোম দিয়ে তৈরি আবরণী থাকে। কিউটিকল এর নীচে কোশপ্রাচীর যে কেবল সেলুলোজঘটিত তা নয়—এখানে তাছাড়াও আছে হেমিসেলুলোজ, পেকটিন, লিগনিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ। দুটি কোশের অন্তবর্তী স্তর যা কোশ বিভাজনের পরেই সৃষ্টি হয় অর্থাৎ *মধ্যচ্ছদাও* পেকটিন দ্বারা নির্মিত। এই প্রতিটি রাসায়নিক পদার্থ এক বা একাধিক উৎসেচক, যা প্যাথোজেন দ্বারা নিঃসৃত হয়, তা দ্বারা সরলীকৃত হয় এবং প্যাথোজেনের অন্তর্ভুক্তি সহজতর করে তোলে।

চিত্র-12.4 তে একটি আদর্শ কোশ প্রাচীরের গঠন বিচিত্র হয়েছে। উচ্চতর উদ্ভিদের কোশপ্রাচীর তিনটি স্তরযুক্ত মধ্যচ্ছদা, প্রাথমিক কোশ প্রাচীর ও গৌণ কোশ প্রাচীর। দুটি কোশের অন্তবর্তী সংযোগকারী স্তরকে বলে মধ্যচ্ছদা—অর্থাৎ কেবলমাত্র মধ্যচ্ছদা বিলুপ্ত হলেই দুটি পার্শ্ববর্তী কোশ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, নচেৎ নয়। এটি, পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রধানতঃ পেকটিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। অন্যান্য দুটি স্তরের প্রধান পদার্থ হল সেলুলোজ যা কেলাসিত সূত্রাকার *মাইক্রোফাইব্রিলরূপে* হেমিসেলুলোজ ঘটিত ধাত্রের উপর একটি জালিকাবিন্যাস গঠন করে এই জালিকাবিন্যাস কোশ প্রাচীরের দৃঢ়তা, গঠন, ভেদ্যতা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেলুলোজ ছাড়া অন্য একটি রাসায়নিক পদার্থ যা দৃঢ়তা প্রদান করে তা হল লিগনিন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কোশ প্রাচীরের বৃদ্ধি ঘটে সব সময় পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে। প্রাথমিক কোশ প্রাচীর সামান্য দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব কোশের আবশ্যিক উপাদান। কোশের বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রাথমিক কোশ প্রাচীরের উপর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয় গৌণ কোশ প্রাচীর। এই

প্রান্তলিপি : মধ্যচ্ছদা : দুটি পার্শ্ববর্তী কোষের মধ্যবর্তী একমাত্র সংযোগকারী স্তর হল মধ্যচ্ছদা। কোষ বিভাজনের অন্তিম পর্বে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের সময় একটি কোষের মধ্যবর্তী বিষুব অঞ্চল বরাবর গঠিত হয় *কোষ পাত* বা *সেল প্লেট।*

এই কোষ পাত মূলতঃ পেকটিক পদার্থ দ্বারা তৈরী। কোষপ্রাচীরের পরবর্তী স্তরগুলি যেমন *প্রাথমিক কোষ প্রাচীর* ও *গৌণ কোষ প্রাচীর* অভিকেন্দ্রিকভাবে এই কোষপাত বা মধ্যচ্ছদার উপর স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়।

উপস্তরগুলিকে S_1, S_2 ও S_3 স্তররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কোশ প্রাচীরের বৃদ্ধি সর্বদাই অর্ন্তমুখী এবং সেটি যত পুরু, কোশগহ্বর তত কম ব্যাসবিশিষ্ট। কিউটিকল স্তর সার্বজনীনভাবে কোশপ্রাচীরে থাকে না; যেখানে থাকে সেখানে সেটি মোম ও কিউটিন দ্বারা নির্মিত। প্যাথোজেন যদি বাইরে থেকে কোশের ভিতরে অনুপ্রবেশ করতে চায় তাহলে এই প্রতিটি স্তর তথা তাদের গঠন নিয়ন্ত্রণ রাসায়নিক পদার্থকে সুনির্দিষ্ট উৎসেচকদ্বারা সরলীকৃত করে ফেলতে হয়

কিউটিকল ঃ প্রধানত, কিউটিন ও মোম দ্বারা নির্মিত। মোমের স্তর কোশপ্রাচীরকে জলনিরোধী করে তোলে। এখনও পর্যন্ত এমন কোন জীবাণুঘটিত উৎসেচকের সন্ধান পাওয়া যায় নি যা মোমকে দ্রবীভূত করে দেয়, সুতরাং প্যাতোজেনের এইস্তর অতিক্রমন যান্ত্রিক বলের প্রয়োগের সাধিত হয়। কিউটিন হল একটি অদ্রাব্য C_{16} ও C_{18} (অর্থাৎ 16টি ও 18টি কার্বন অনুবিশিষ্ট) ফ্যাটি অ্যাসিডের এসটার। বহু ছত্রাক যথা *Penicillium spinulosum (পেনিসিলিয়াম স্পাইনুলোসাম), Collectotrichum gleosporioides (কোলেটোট্রিকাম গ্লিওস্পোরিয়ডিস)* এতাদি এবং একটি ব্যাকটেরিয়া যথা *Streptomyces scabies (স্ট্রেপটোমাইসেস স্ক্যাবিস)* **কিউটিনেজ** (Cutinase) নামক উৎসেচক উৎপন্ন করে যা **কিউটিনকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে দ্রাব্য ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত** করে। ছত্রাকের কোশদ্বারা গৃহীত হয়ে বা শোষিত হয়ে এই ফ্যাটি অ্যাসিড ছত্রাককে আরো বহুগুণ বেশি মাত্রায় কিউটিনেজ উৎপাদনে সক্রিয় করে তোলে। এর ফলে সংক্রমণ সহজতর হয়।

পেকটিক পদার্থ ঃ দুটি কোশের মধ্যবর্তী একমাত্র সংযোগকারী স্তর মধ্যচ্ছদা প্রধানতঃ পেকটিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। এছাড়াও এগুলি প্রাথমিক কোশপ্রাচীরে সেলুলোজ তন্তুগুলির অন্তবর্তী ফাঁকা জায়গায় অবস্থান করে।

এদের রাসায়নিক গঠন বহুশর্করা জাতীয় যা প্রধানতঃ গ্যালাকটো ইউরোনান অনু দ্বারা গঠিত। এছাড়া অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় র‍্যামনোজ (rhamnose) নামক পঞ্চশর্করার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

পেকটিক পদার্থ সহজেই পেকটিনেজ (Pectinase) নামক উৎসেচক দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে যায়। পেকটিনেজ দুই প্রকার।

এন্ডোপেকটিনেজ (Endopectinase) ঃ এরা দীর্ঘ পেকটিন শৃঙ্খলকে কোন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থান ব্যতিরেকেই অনিয়মিতভাবে ভেঙ্গে দেয় এবং **একসোপেকটিনেজ** (ectopectinase) যারা শৃঙ্খলিত পেকটিন অণুকে কেবলমাত্র প্রান্তীয় অংশে ভাঙে। ফলে প্রথম ক্ষেত্রে যখন আমরা ক্ষুদ্রতর পেকটিন শৃঙ্খল পাই তখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রান্তীয় অংশ থেকে একক গ্যালকটো-ইউরোনান অণু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাসায়নিক প্রকৃতি অনুসারে পেকটিনেজ গুলি দুইরকম (i) **পেকটিন এসটারেজ** [Pectinesterase] (PE বা PME) ঃ পেকটিন এসটারেজ (PE) বা পেকটিন মিথাইল এসটারেজ (PME) সাধারণভাবে পেকটিন অণুর দৈর্ঘ্যের কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায় না কিন্তু তার দ্রাব্যতার বৃদ্ধি ঘটিয়ে সেটিকে শৃঙ্খলভঙ্গাক উৎসেচক দ্বারা আক্রমণের উপযোগী করে তোলে (ii) *পলিগ্যালাক্টুরোনেজ,* [Polygalacturonase] (PG) যারা শৃঙ্খলভঙ্গাক উৎসেচক এবং পেকটিন অণুকে সরলীকৃত করে একক শর্করা গ্যালাকটো ইউরোনান অণুকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বস্তুতঃপক্ষে এরাই এন্ডো-ও একসো-এই দুই প্রকারভেদে দেখতে পাওয়া যায়।

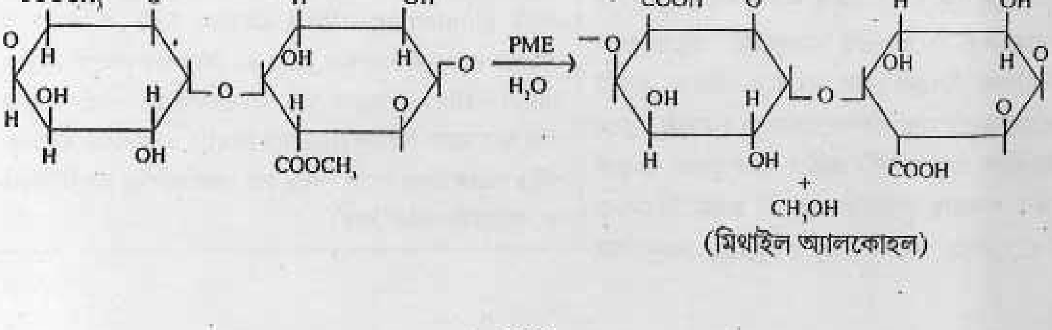

(মিথাইল অ্যালকোহল)

উপরোক্ত বিক্রিয়ায় শৃঙ্খল দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলেও মিথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হবার ফলে দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়।

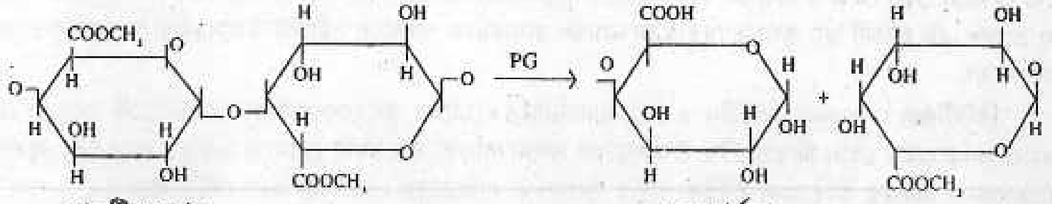

পেকটিন শৃঙ্খল একক শর্করা

এছাড়া Wood (1960) দ্বারা পেকটিন ট্রান্সএলিমিনেজ নামক একটি উৎসেচক এর কথা বর্ণিওত হয়েছে যা PTE নামে পরিচিত এবং দুটি শর্করা অন্তবর্তী বন্ধনীতে ছিন্ন করার সাথে সাথে C_5 অবস্থান থেকে এক অনু H^+ অপসারণ করে। ফলে একক শর্করা ছাড়াও জল গঠিত হয়।

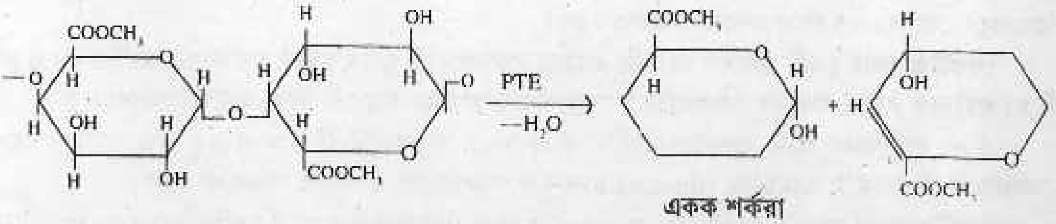

একক শর্করা

কিউটিন এর ন্যায় এক্ষেত্রেও এইসব একক শর্করাগুলি প্যাথোজেন দ্বারা শোষিত হয় এবং অধিকমাত্রায় পেকটিনেজ নিঃসরণে প্যাথোজেনকে প্ররোচিত করে। *Helminthosporium turcicum, Puccinia Purpurea, Cercospora sorghi* ইত্যাদি প্যাথোজেনে উল্লেখযোগ্য পেকটিনেজ নিঃসরণ দেখা যায় (Vidhyasekaran et al., 1973).

সেলুলোজ ঃ সেলুলোজ এক কোশপ্রাচীর গঠনকারী অনুগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণকারী অনু। এগুলি অসংখ্য গ্লুকোজ অনু দ্বারা গঠিত শৃঙ্খলিত বৃহদানু। দুটি পার্শ্ববর্তী গ্লুকোজ অনু পরস্পরের সাথে β-1-4 গ্লাইকোসিডিক বন্ড দ্বারা যুক্ত। এর জটিল গঠন বৈশিষ্ট অন্যত্র আলোচিত হবে। আপাততঃ এটা জানা দরকার যে সেলুলোজ 'এর উপর ক্রিয়াশীল উৎসেচক *সেলুলেজ* (Cellulase) এই বৃহদানুকে ভেঙে সরলীকৃত শর্করা শর্করা গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে। এই সেলুলেজ বস্তুতঃপক্ষে একাধিক উৎসেচকের সমন্বয়ে গঠিত একটি উৎসেচকতন্ত্র যারা পরস্পরের সাথে সুনিয়ন্ত্রিত ক্রমে ক্রিয়াশীল হয়ে একটি জটিল সেলুলোজ অনুকে একক শর্করায় রূপান্তরিত করে। প্রথম উৎসেচক যা C_1 নামে পরিচিত তা সেলুলোজ অনুগুলির

> প্রান্তলিপি ঃ *সেলুলোজের পরমাণুগঠন ঃ* উচ্চতা ক্ষমতা সম্পন্ন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে সেলুলোজ অনুর পরানুগঠনে সুনির্দিষ্ট বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি সেলুলোজ অনু 8Å বেধবিশিষ্ট। এরকম 40 থেকে 100 টি অনু একত্রে গঠন করে একটি elementary-fibril এইরকম 20টি বা ততোধিক elementary-fibril দ্বারা গঠিত হয় সেলুলোজ মাইক্রো ফাইব্রিল (micro-fibril), বহু সংখ্যক মাইক্রোফাইব্রিল আবার একত্রে গঠন করে ম্যাক্রোফাইব্রিল (macro-fibril), একটি হেমিসেলুলোজ গঠিত ধাত্রের উপর এগুলি বিন্যস্ত হয়ে কোশপ্রাচীরের মূল ভিত্তিভূমি বা কাঠামোটি গঠন করে।

মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী বন্ধনীগুলিকে ছিন্ন করে। দ্বিতীয় উৎসেচক C_2 সেলুলোজ অনুকে ভেঙে ক্ষুদ্রতর খণ্ড গঠন করে। তৃতীয় উৎসেচক Cx এই ক্ষুদ্রতর অনুর উপর ক্রিয়াশীল হয়ে দ্বিশর্করা সেলোবায়োজ গঠন করে। অন্তিম পর্যায়ে B-*গ্লুকোসিডেজ* নামক উৎসেচক দ্বিশর্করাকে খণ্ডিত করে একক গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে। ক্রমটিকে সাজালে আমরা নিম্নলিখিত বিন্যাসটি পাই ঃ

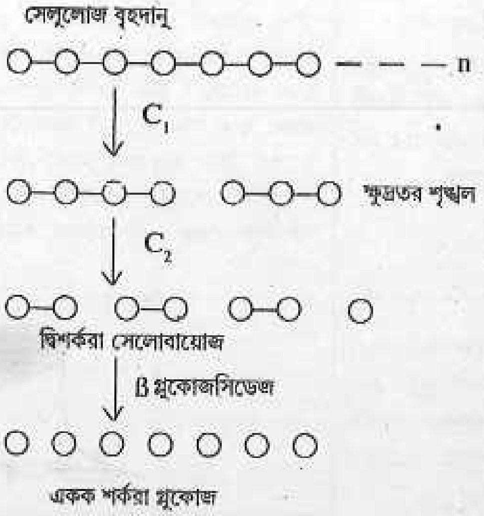

সেলুলোজ উৎপাদনকারী ছত্রাকগুলির মধ্যে *Rhizoctonia solani (রাইজকটনিয়া সোলানি), Fusarium* sp *(ফিউসোরিয়াম), Chaetomium* sp (*কিটোমিয়াম* sp) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হেমিসেলুলোজ ঃ হেমিসেলুলোজ হল অনেকগুলি পলিস্যাকারাইড অনুর একটি জটিল মিশ্রণ। এটির গঠন এবং ঘনত্ব সব উদ্ভিদ কলায়, সব উদ্ভিদে অথবা একই উদ্ভিদের বিভিন্ন কলায় একই রকম নয়। এটি হল প্রাথমিক কোশ প্রাচীরের একটি আবশ্যিক উপাদান, তবে মধ্যচ্ছদা এবং গৌণ কোশ প্রাচীরেও এটি কম বেশি দেখা যায় এটির উপাদানগুলির মধ্যে Xyloglucan *(জাইলোগ্লুকান)* glucomannan *(গ্লুকোম্যানান)*, galactomannan *(গ্যালাকটোম্যানান)*, arabinogalactan *(অ্যারাবিনোগ্যালাকটান)* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জাইলোগ্লুকান হল প্রধানতঃ গ্লুকোজ অনু দ্বারা গঠিত দীর্ঘ পলিস্যাকারাইড অনু যার প্রান্তস্থ অংশে ক্ষুদ্র জাইলোজ অনু দ্বারা গঠিত শৃঙ্খল বর্তমান। অন্যান্য একক শর্করা যা হেমিসেলুলোজ গঠনে শৃঙ্খলিত অবস্থায় অংশ নেয় তাদের মধ্যে *গ্যালাকটোজ, অ্যারাবিনোজ, ফিউকোজ* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হেমিসেলুলোজ ভঙ্গাক উৎসেচক হল *হেমিসেলুলেজ* (hemicellulase) যার কাজই হল জটিল শৃঙ্খলিত অনুগুলির সংযোগরক্ষাকারী বন্ধনীগুলিকে ভেঙ্গে ফেলে সেটিকে সরলীকৃত করা অর্থাৎ তার একক শর্করা উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। যেমন হেমিসেলুলোজ গঠনের উপাদানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি এটির ভঙ্গাক উৎসেচকও প্রতিটি উপাদানের জন্য সুনির্দিষ্ট, অর্থাৎ হেমিসেলুলোজকে সেলুলেজের মতই একটি উৎসেচকতন্ত্র বলাই বাল। এই তন্ত্রের অন্তর্গত উৎসেচকগুলির প্রকৃতি শৃঙ্খলে উপস্থিত একক শর্করার উপর নির্ভরশীল। যেমন *জাইলানেজ* জাইলান শৃঙ্খলকে, *গ্যালাকটানেজ* গ্যালাকটান শৃঙ্খলকে, *গ্লুকানেজ* গ্লুকান শৃঙ্খলকে, *অ্যারাবিনেজ* অ্যারাবিনোজ শৃঙ্খলকে খণ্ডিত করে যথাক্রমে জাইলোজ, গ্যালাকটোজ, গ্লুকোজ, অ্যারাবিনোজ নামক একক শর্করায় রূপান্তরিত করে। বহু ছত্রাকজাতীয় ও ব্যাকটিরিয়া জাতীয় (bacterial) প্যাথোজেন হেমিসেলুলোজ সংশ্লেষিত করে কিন্তু তা কোশ প্রাচীরকে ভেদ করে সংক্রমণ ঘটানোর ক্ষেত্রে কতটা দায়ী সেটি এখনও গবেষণা সাপেক্ষ।

লিগনিন ঃ মধ্যচ্ছদা, গৌণ কোশপ্রাচীর এবং যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদানকারী কোশসমূহের প্রাচীরে লিগনিন দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন উদ্ভিদের বহিঃস্তকে এবং অধঃস্তক অংশের কোশসমূহে লিগনিন দেখতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশে 15 থেকে 38 শতাংশ লিগনিন দেখা যায় যা পরিমাণে সেলুলোজের ঠিক পরে।

এটির রাসায়নিক গঠন পুরোপুরি শর্করা বা প্রোটিনের মত নয়। এটি একটি ত্রিমাত্রিক গঠনবিশিষ্ট জটিল অনু যার মূল একক হল ফিনাইলপ্রোপানয়েড—

এর এক অথবা একাধিক কার্বন অনুর পাশে $OH_2 - OCH_3$ বা = 0 মূলক যুক্ত। এক একটি দীর্ঘ লিগনিন অনু এরকম 103টি বা চার চেয়ে বেশি সংখ্যক *ফিনাইল প্রোপানয়েড* একক দ্বারা গঠিত।

প্রান্তলিপি ঃ উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশ (Wood) ঃ প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম দ্বারা গঠিত উদ্ভিদের কেন্দ্রীয় স্তম্ভকে কাষ্ঠল অংশ বা Wood নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে গৌণ বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় স্তম্ভ পুনঃ পুনঃ গৌণ জাইলেম গঠন করে ক্রমশঃ চওড়ায় বৃদ্ধি পায়। গৌণ জাইলেমের কোশগুলি অত্যন্ত দৃঢ়, পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট। পরিধির দিকে জাইলেমের নবীনতর অংশ সংবহনের কাজ চালালেও কেন্দ্রস্থ অংশ সম্পূর্ণভাবে কঠিন, নিষ্প্রাণ কাষ্ঠল অংশ গঠন করে যা অন্যভাবে Heart Wood নামে পরিচিত। এই অংশের দৃঢ়তা স্বাভাবিক ভাবেই লিগনিন গঠিত পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। লিগনিনের আধিক্য Wood কে অধিকতর দৃঢ়তা প্রদান করে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এই ধরনের কাঠই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

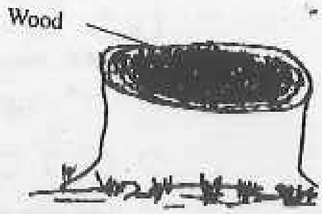

কোশপ্রাচীরের উপাদানগুলির মধ্যে লিগনিন হল সর্বাপেক্ষা উৎসেচক প্রতিরোধী অর্থাৎ সহজে এটি উৎসেচকদ্বারা সরলীকৃত হয় না। মাত্র বিশেষ কিছু বেসিডিওমাইসিটিস জাতীয় ছত্রাক *লিগনোলাইটিক* উৎসেচক উৎপাদন করতে পারে। তার মধ্যে তিন চতুর্থাংশ লিগনিনের একক উপাদানকে খাদ্য হিসাবে কাজে লাগাতে পারে না। কেবলমাত্র *শ্বেত-পতন সৃষ্টিকারী ছত্রাক* (white rot fungi) এই জাতীয় উৎসেচক নিঃসৃত করে লিগনিনকে ভেঙে সরলীকৃত করতে এবং তার উপাদানগুলিকে কাজে লাগাতে পারে। *Hypoxylon deustum (হাইপোজাইলন ডিউষ্টাম)* এবং *Xylaria polymorpha (জাইলারিয়া পলিমরফা)* হল এরূপ দুটি ছত্রাকের উদাহরণ।

12.3.3 উৎসেচক ও প্রোটোপ্লাজমীয় পদার্থসমূহ (Enzymes and protoplasmic materials):

অধিকাংশ প্যাথোজেন আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণতঃ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যেই বসবাস করে। এরা স্বাভাবিকভাবেই প্রোটোপ্লাজমের উপাদান সমূহকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। শর্করা বা অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদ উপাদান সহজেই ছত্রাক দ্বারা শোষিত হয় কেননা এগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অনু। তবে স্টার্চ অথবা

প্রান্তলিপি ঃ প্রোটোপ্লাজম ঃ প্রতিটি সজীব কোশের কোশ প্রাচীর দ্বারা আবৃত অর্ধস্বচ্ছ, প্রধানতঃ জলঘটিত অর্ধতরল পদার্থ বা কোশীয় সমস্ত প্রক্রিয়ার আধার স্বরূপ তাকেই বলা হয় প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজমের উপাদানগুলিকে একটি ধাত্র এবং একাধিক কোশীয় অঙ্গাণুতে ভাগ করা যায়। ধাত্রটি সাইটোপ্লাজম নামে পরিচিত। অঙ্গাণু সমূহের মধ্যে নিউক্লিয়াস, এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, প্লাসটিড, মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বস্তু ইত্যাদি উল্লেখ্য। এছাড়া কোশের প্রোটোপ্লাজমে কিছু অজীবিয় বস্তু দেখা যায় যেমন সঞ্চিত খাদ্য, রেচন পদার্থ, ভ্যাকুওল বা কোশগহ্বর ইত্যাদি। এই অজীবিয় পদার্থসমূহকে নন-প্রোটোপ্লাজমিক কোশীয় পদার্থরূপে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ কোশের সামগ্রিক সজীব পদার্থসমূহকে একত্রে আমরা প্রোটোপ্লাজম বলতে পারি।

শ্বেতসার এবং প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ কেবলমাত্র উৎসেচক দ্বারা সরলীকৃত বহার পরই শোষিত হতে পারে। এই উৎসেচকগুলি ছত্রাক দ্বারা নিঃসৃত হয়।

প্রোটিন ঃ উদ্ভিদ কোশে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রোটিন আছে যারা কোশের গঠনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহন করে। এছাড়া কোশে যত রকম উৎসেচক আছে অথবা যত রকম একক পর্দা আছে তাদের মুখ্য উপাদানও হল প্রোটিন। প্রায় সব প্রোটিনই 20টি অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা পরস্পরের সার্থে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলিত প্রোটিন অণু গঠন করে।

প্রোটিন ভঙ্গক উৎসেচকগুলি প্রোটিনেজ গোষ্ঠীভূক্ত। প্রোটিয়েজ হল এইরকম একটি প্রোটিনভঙ্গক উৎসেচক। আলুর নাবি ধ্বসা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক *Phytophthora infestans (ফাইটপথোরা ইনফেস্টানস)* এইরকম একটি প্রোটিয়েজ নিঃসরণকারী ছত্রাক। আর একটি এই জাতীয় উৎসেচক হল অ্যামিনো অ্যাসিড অকসিডেজ। *Piricularia oryzae (পিরিকিউলারিয়া ওরাইজি)* যা ধান গাছের রোগসৃষ্টি করে এবং *Fusarium oxysporum (ফিউসারিয়াম অকসিস্পোরাম)* এবং *ফিউসারিয়াম*-এর বিভিন্ন প্রজাতি যা তুলো গাছের *উইল্ট* (Wilt) রোগের জন্যে দায়ী, এই উৎসেচক সৃষ্টি করে। যেহেতু প্রোটিন হল কোশের মুখ্য গঠন উপাদান, তাই এইসব উৎসেচকের প্রভাবে কোশের গঠন সম্পূর্ণভাবে অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে।

> **প্রান্তলিপি ঃ প্রোটিন ঃ** কোশ তথা উদ্ভিদের দেহগঠনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা নেয় প্রোটিন। এটি এক প্রকার নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ যার মধ্যে অন্য তিনটি প্রধান মৌল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং কার্বন থাকে। প্রোটিন প্রকৃতপক্ষে কতগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিড হল প্রোটিনের সংগঠনিক একক এবং আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিডে বিশ্লেষিত হয়।

শ্বেতসার ঃ শ্বেতসার উদ্ভিদের কোশে উপস্থিত মূল সঞ্চিত খাদ্য। সবুজ অংশে ক্লোরোপ্লাস্টে এবং অন্যান্য অংশে অ্যামাইলোপ্লাস্ট থেকে স্টার্চ ও শ্বেতসার গঠিত হয়।

রাসায়নিকভাবে, এটি হল একটি বহু শর্করা যা গ্লুকোজ দ্বারা গঠিত। দু রকমের শ্বেতসার পাওয়া যায় অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপেকটিন, এর মধ্যে প্রথমটি শাখাবিহীন ও দ্বিতীয়টি শাখান্বিত শ্বেতসার। শ্বেতসার ভঙ্গক উৎসেচকগুলি অ্যামাইলেজ নামে পরিচিত এবং সরলীকৃত উপাদান হল গ্লুকোজ, গ্লুকোজ ছত্রাক দ্বারা এবং অন্যান্য প্যাথোজেন দ্বারা সহজেই গৃহীত হয়।

> **প্রান্তলিপি ঃ প্লাসটিড ঃ** প্লাসটিড হল একটি কোশীয় অঙ্গাণু যা সাইটোপ্লাজমে ভাসমান কিন্তু একটি আবরণী দ্বারা সাইটোপ্লাজমের থেকে পৃথকীভূত। রঞ্জক পদার্থের উপস্থিত ও অনুপস্থিতির ভিত্তিতে প্লাসটিড তিন রকম। বর্ণহীন প্লাসটিড লিউকোপ্লাসটিড নামে পরিচিত এবং ভূনিম্নস্থ অংশগুলির কোশে দেখা যায়। রঞ্জক পদার্থযুক্ত প্লাসটিড আবার দুইরকম ঃ ক্লোরোপ্লাসটিড বা সবুজ কনা ক্লোরোফিল বিশিষ্ট প্লাসটিড এবং ক্রোমোপ্লাসটিড যেখানে সবুজ ছাড়া অন্য রঙের রঞ্জক দেখা যায়। ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে পাতায় এবং সবুজ কাণ্ডে আর ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে ফুল, ফল ইত্যাদি অংশের কোশে।

স্নেহপদার্থ ঃ সমস্ত উদ্ভিদকোশেই নানারকম লিপিড বা স্নেহপদার্থ দেখা যায়, যার মধ্যে *তৈল ও চর্বি* (Oils & fats) হল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এরা বীজ ও অন্যান্য সঞ্চয়ী অংশে বেশি মাত্রায় থাকে, তাছাড়া কোশপর্দার অন্যতম প্রধান উপাদান হল *লিপিড*। সমস্ত লিপিডই *ফ্যাটি অ্যাসিড* দ্বারা গঠিত এবং লিপিডভঙ্গক উৎসেচক লাইপোলাইটিক উৎসেচক নামে পরিচিত। এদের মধ্যে *লাইপেজ, ফসফোলিপিডেজ* ইত্যাদি উল্লেখ্য, লাইপেজ নিঃসরণকারী ছত্রাকগুলির মধ্যে *Botrytis cincrea (বট্রাইটিস সাইনেরিয়া)* উল্লেখযোগ্য।

প্রান্তলিপি ঃ কোশপর্দা ও লিপিড ঃ লিপিড বা স্নেহপদার্থ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এতে হাইড্রোজেনের পরিমান অক্সিজেনের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। এছাড়া অনেক স্নেহপদার্থে N, S ও P থাকে। উৎসেচকের ক্রিয়ার লিপিড বা স্নেহপদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে বিশ্লেষিত হয়।

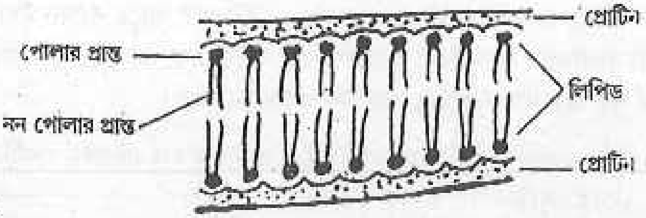

কোশপর্দার অন্যতম ঃ … জ্জিত হয়ে লিপিড কোষপর্দার যে বিশেষ আকৃতি প্রদান করে তা সংক্ষেপে P-L-P (Protein–Lipid-Protein) নামে পরিচিত। আনুমানিক 75-100Å পুরু কোশপর্দার লিপিড স্তর প্রায় 35Å পুরু এবং দুই পাশের দুই প্রোটিন স্তরের প্রতিটি 20Å পুরু। লিপিড অংশে অনুগুলি দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। প্রতিটি লিপিড অনুতে একটি তড়িৎবিভবযুক্ত পোলার প্রান্ত এবং একটি বিভবহীন নন পোলার প্রান্ত থাকে।

12.4 রোগসৃষ্টিতে অধিবিষের (Toxin) ভূমিকা (Toxins in Plant disease development) :

জীবিত উদ্ভিদকোশ হল এমন একটি জটিল জৈব পদার্থ যেখানে বহু রাসায়নিক বিক্রিয়া পাশাপাশি অথবা সুনির্দিষ্ট ক্রমে অনবরত সংঘটিত হয়ে চলেছে। জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক এই বিক্রিয়াগুলি যখন কোন কারণে ব্যাহত হয় বা বাধাপ্রাপ্ত হয় তখনই উদ্ভিদ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বহু রাসায়নিক পদার্থই এ ধরনের বিপর্যয় ঘটাতে পারে। তার মধ্যে কিছু কিছু প্যাথোজেন দ্বারা সৃষ্ট এবং এদের বলা হয় Toxin বা অধিবিষ। অধিবিষ সরাসরি প্রোটোপ্লাজমকে প্রভাবিত করে যার ফলে কোশ সাংঘাতিকবাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অথবা কোশের মৃত্যু ঘটতে পারে। অধিবিষ মাত্রেই অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ এবং অত্যন্ত কম মাত্রাতেই ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এগুলির মধ্যে কিছু কিছু আবার অস্থায়ী এবং ক্রিয়াশীলতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তারা পোষক কোশের সুনির্দিষ্ট গ্রাহক অনুর সাথে যৌগ তৈরি করে ফেলে। অধিবিষগুলি হয় কোশের ভেদ্যতাকে প্রভাবিত করে পদার্থের আদান প্রদানে বাধা দেয় অথবা সেগুলি বিপাকক্রিয়ার কোন কোন ধাপে বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে। সাধারণতঃ ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেই অধিবিষ সৃষ্টির ধর্ম সীমাবদ্ধ। কার্যকারিতার ব্যাপকতার ভিত্তিতে এদের দুভাগে ভাগ করা যায়।

প্রান্তলিপি ঃ Wheeler & Luke (1963) অধিবিষ বা Toxin গুলিকে তাদের উৎসস্থলের ভিত্তিতে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন। এগুলি হল— (ক) ফাইটোটক্সিন ঃ জীবাণু নিঃসৃত যে কোন পদার্থ যা উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক তাকে বলে ফাইটোটক্সিন। এই যৌগগুলির কোন পোষক বিশেষকে নয় বরং সামগ্রিকভাবে সব উদ্ভিদেই হানিকারক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (খ) ভিভোটক্সিন ঃ কোন সংক্রামিত পোষক উদ্ভিদে সংক্রমণের প্রভাবে কেবলমাত্র পোষক দ্বারা অথবা কেবলমাত্র প্যাথোজেন দ্বারা অথবা উভয়ের দ্বারা যে অধিবিষ তৈরি হয় তাকে বলে ভিভোটক্সিন। অর্থাৎ রোগের ফলস্বরূপ এটির উৎপত্তি। (গ) প্যাথোটক্সিন ঃ যে অধিবিষ হোষ্ট বা পোষক দ্বারা বা প্যাথোজেন দ্বারা বা উভয়ের দ্বারা উৎপাদিত এবং যেগুলি সংক্রমণের সূচনা করে তাকে বলে প্যাথোটক্সিন। অর্থাৎ এটির উৎপাদনই রোগসৃষ্টির কারণ।

12.4.1 ব্যাপক কার্যকারিতাযুক্ত অধিবিষ ঃ

যে সমস্ত অধিবিষ বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পোষক উদ্ভিদে আক্রান্ত করতে পারে তাদের কার্যকারিতার ব্যাপকতা কোশ বা পোষক উদ্ভিদের প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয় না—স্বাভাবিকভাবেই এরা হল অপেক্ষাকৃত মারাত্মক ক্ষমতা বিশিষ্ট অধিবিষ। এরকম দুটি সুপরিচিত অধিবিষ হল Tabtoxin *(ট্যাবটকসিন)* ও Tentoxin *(টেনটকসিন)* যারা যথাক্রমে কোশীর আদান প্রদান ও ATP সংশ্লেষ পদ্ধতিতে বাধা দান করে।

Tabtoxin (ট্যাবটকসিন) or Wildfire toxin ঃ *Pseudomonas Syringae (সিউডোমোনাস সাইরিনগি)* নামক ব্যাকটেরিয়া যা তামাক গাছের 'Wild fire' রোগ সৃষ্টি করে, এছাড়া যব, ভুট্টা, কফি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গাছে পতন ঘটানোর জন্য দায়ী তার রাসায়নিক অস্ত্রটি বস্তুতঃপক্ষে এই ট্যাবটকসিন। এটি হল দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড বিশিষ্ট একটি ডাইপেপটাইড জাতীয় প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বয় হল যথাক্রমে *থ্রিওনিন* ও অশ্রুতপূর্ব *ট্যাবটক্সিনিন।*

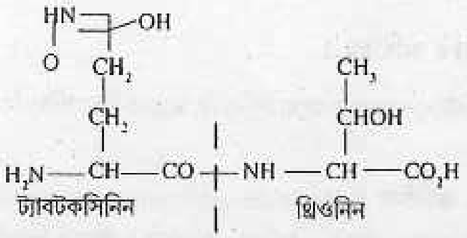

একটি ট্যাবটকসিনিন অণু

এই *ট্যাবটকসিনিন* নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডটি কোশের *গ্লুটামিন সিনথেটেজ* নামক উৎসেচককে অকেজো করে ফেলে, ফলে কোশে জমা হওয়া অ্যামোনিয়া আর গ্লুটামিনে পরিণত হতে পারে না। অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া সালোকসংশ্লেষকে প্রভাবিত করে এবং তার ফলে ক্লোরোসিস জাতীয় লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

Tentoxin (টেনটক্সিন) ঃ *Alternaria altrnata (অলটারনেরিয়া অলটারনেটা) Alternaria tenuis (অলটারনেরিয়া টেনুইস)* নামক ছত্রাক এই অধিবিষ নিঃসরণ করে বহু কচি অঙ্কুরের বিনাশ ঘটায় অথবা বহু চারা গাছে (seedlings) *ক্লোরোসিস* (chlorosis) সৃষ্টি করে। এটি চারটি অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা গঠিত একটি টেট্রাপেপটাইড যা ক্লোরোপ্লাস্টে সংঘটিত ADP $\rightarrow$ ATP বিক্রিয়া অর্থাৎ ফটোফসফোরাইলেশন বিক্রিয়াকে বন্ধ করে দেয়। ক্লোরোসিস হল এই অধিবিষের প্রবাবে সৃষ্ট সবচাইতে স্বাভাবিক রোগলক্ষণ।

Phaseolotoxin (ফ্যাসিওলোটক্সিন) ঃ আগে উল্লেখিত *Pseudomonas syringae (সিউডোমোনাস সাইরিনগি)* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে এটি সৃষ্ট। এটি একটি ত্রি-অ্যামাইনো অ্যাসিড ঘটিত ট্রাইপেপটাইড। অ্যামাইনো অ্যাসিড তিনটি হল *অরনিথিন, অ্যালানিন* ও *আরজিনিন।*

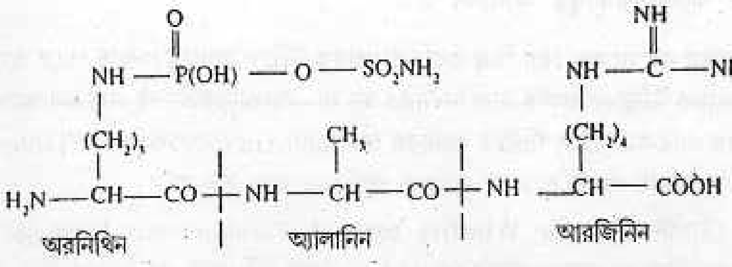

একটি ফ্যাসিওলোটকসিন অণু

এই অধিবিষের প্রভাবজাত সাধারণ লক্ষণগুলি হল নবপত্রের অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি, অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি হ্রাস, এবং স্থানিকভাবে চোখে পড়া ক্লোরোসিস।

12.4.2 নির্দিষ্ট পোষকে সীমাবদ্ধ অধিবিষ ঃ

এই সমস্ত অধিবিষ সুনির্দিষ্ট পোষকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট মাত্রায় ক্রিয়াশীল কিন্তু অন্য পোষকে এগুলির তেমন কোন হানিকারক প্রভাব নেই।

Victorin অথবা HV- অধিবিষ ঃ *Helminthosporium victoriae (হেলমিনথোস্পোরিয়াম ভিকটোরি)* নামক ছত্রাক এই অধিবিষ সৃষ্টি করতে পারে এবং তা কেবলমাত্র যবের ভিকটোরিয়া নামক (oat-Victoria)। প্রকারভেদকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। মজার কথা হল এই প্রকার যব ছাড়া অন্য কোন প্রকার যব অথবা অন্য কোন উদ্ভিদে এর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। এটি সর্বপ্রথম উদ্ভিদের গোড়ায় প্রভাব ফেলে এবং পরবর্তীকালে উদ্ভিদটি ধ্বসা রোগে আক্রান্ত হয়।

T-Toxin (T-অধিবিষ) ঃ *(Helminthosporium maydis)* হেলমিনথোস্পোরিয়াম মেডিস নামক ছত্রাক কেবলমাত্র ভুট্টার (corn) একটি প্রকরণকে প্রভাবিত করতে পারে এবং পাতার ধ্বসা রোগ সৃষ্টি করে।

এটি রাসায়নিকভাবে একটি দীর্ঘ অণু যাতে 35 থেকে 45 টি কার্বন অণু আছে। এই গঠনকে বলে পলিকিটোল। এই অধিবিষ আক্রান্ত পোষকের মাইটোকনড্রিয়ায় ধাত্রকে অকেজো করে ফসফোরাইলেশন পদ্ধতিতে বাধা দান করে।

> প্রান্তলিপি ঃ প্রকরণ ঃ একই প্রজাতির একটি উদ্ভিদের মধ্যে সবগুলিই সমস্ত বাহ্যিক ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একইরকম নাও হতে পারে ধানের (Oryza sativa) কথাই ধরা যাক। সব ধান গাছই কি সমান লম্বা বা সমসংখ্যক দিনে পরিপক্কতা অর্জন করে, সবগুলিই কি একই রকম শস্যদানা উৎপাদন করে, অবশ্যই নয়। তাই একই প্রজাতির সদস্য হলেও তাদের আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণরূপে চিহ্নিত করি। IR-8, জয়া, রত্না ইত্যাদি নানারকম নামে প্রকরণগুলিকে চিহ্নিত করা হয়।

AK-Toxin ঃ *Alternaria alternata (অলটারনেরিয়া অলটারনাটা)* নামক ছত্রাক যা জাপানী ন্যাশপাতির পাতার কালো দাগ সৃষ্টির জন্য দায়ী সেটি এই অধিবিষ গঠন করে। এটির প্রবাবে পাতার কোশগুলি থেকে দ্রুত K^+ ও PO_4 = আয়ন মুক্ত হয়। ফলে কোশপ্রাচীর দৃঢ়তা হারায়।

AM-Toxin (AM- অধিবিষ) : এটি Alternaria alternata *অলটারনেরিয়া অলটারনাটা* নামক ছত্রাক থেকে সৃষ্ট এবং আপেল গাছের পাতায় ক্লোরোসিস সৃষ্টি করে। রাসায়নিক ভাবে এটি 'Cyclic depsipeptide' গঠনযুক্ত। ঐ বিশেষ আপেল ভিন্ন অন্য গাছে এমনকি দশা হাজার গুন ঘনত্বের AM-অধিবিষ কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

অনুশীলনী - 2

1. নিম্নলিখিত যৌগগুলির কোশ প্রাচীরে অবস্থান, ভঙ্গাককারী উৎসেচক এবং উৎসেচক উৎপাদনকারী জীবাণুর নাম একটি ছকের আকারে লিখুন :

   (a) কিউটিন (b) সেলুলোজ (c) পেকটিক পদার্থ (d) লিগনিন।
2. নিম্নলিখিত যৌগগুলির আর্দ্রবিশ্লেষণে উৎপন্ন সরলীকৃত উপাদানগুলির নাম লিখুন।

   শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহ পদার্থ, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ।
3. তিনটি পরিচিত অধিবিষের নাম, উৎপাদনকারী জীবাণু এবং কার্যপদ্ধতি একটি ছকের আকারে দেখান।

12.5 রোগসৃষ্টিতে হরমোনের ভূমিকা (Hormons in disease development) :

উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে হরমোনের ভূমিকা অবিসংবাদিত। এগুলির মধ্যে *অকসিন, জিবারেলিন* ও *সাইটোকাইনিন* বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হিসাবে এবং *ইথিলিন* ও *অ্যাবসিসিক* অ্যাসিড বৃদ্ধি রোধক রূপে কাজ করে।

উদ্ভিদের প্যাথোজেন উদ্ভিদের মতই কিছু কিছু হরমোন সংশ্লেষ করতে পারে। এগুলির ভূমিকাও অবস্থান্তরে বিবর্ধক বা বিরোধক, তবে যাই হোক না কেন প্যাথোজেন যে নিশ্চিতভাবে পোষক উদ্ভিদের হরমোন মাত্রায় গুরুতর পরিবর্তন নিয়ে আসে একথা ঠিক। হরমোনের প্রভাবে বা হরমোন মাত্রায় অসাম্যজনিত কারণে যে উদ্ভিদের রোগ হয় তা একাধিক রোগলক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত। খর্বতা, অতিবৃদ্ধি, গোলাপাকার ধারন, মূলের অত্যাধিক শাখা গঠন, কাণ্ডের অনিয়মিত বৃদ্ধি, পত্রমোচন পত্রমুকুলের বাধাপ্রাপ্ত উন্মোচন— এসবই হরমোনঘটিত রোক। হরমোনগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি এক্ষেত্রে আলোচিত হল :

12.5.1 অকসিন:

উদ্ভিদদেহে প্রাপ্ত স্বাভাবিক অকসিন রাসায়নিকভাবে ইন্ডোল-3-অ্যাসিটিক অ্যাসিড নামে পরিচিত IAA। উদ্ভিদের শীর্ষমুকুল অঞ্চলে সংশ্লেষিত হয়ে (IAA) স্থায়ী কলা অঞ্চলে সংবাহিত হয় এবং সেখানে

প্রাস্তলিপি : অকসিন (Auxin) শব্দটি এসেছে গ্রীক Auxein শব্দটি থেকে যার মানে হল বৃদ্ধি। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অকসিন নামক হরমোনটির প্রভাব সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন চার্লস ডারউইন এবং তাঁর পুত্র ফ্রান্সস। ওট বা যব গাছের অঙ্কুর নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা দেখতে পান যে অঙ্কুরের শীর্ষভাগে উৎপাদিত কোন রাসায়নিক পদার্থ অঙ্কুরটির আলোক অভিমুখীচলনের জন্য দায়ী। পরবর্তীকালে মূলের ভূ অভিমুখী

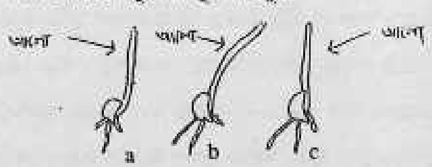

চলন, কোশ বৃদ্ধি ও বিভাজন, বীজহীন ফল উৎপাদন, কলম থেকে মূলের উৎপত্তি ইত্যাদি নানা বিষয়ে অকসিনের প্রয়োগিক ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চিত্র (ক) এবং (খ) এ দেখানো হয়েছে যবের অঙ্কুরের আলোক অনুকূলবর্তী চলন। কিন্তু (খ) এ প্রদর্শিত নিয়মে অঙ্কুরের শীর্ষভাগ অপসারিত করলে এই চলন পরিলক্ষিত হয় না যে থেকে প্রমাণিত হয় শীর্ষে উৎপাদিত কোন পদার্থই এই ঘটনার জন্য দায়ী। পদার্থটি, পরবর্তীকালে অকসিন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই IAA অক্সিডেজ উৎসেচক দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ কারণে উদ্ভিদের অকসিন ঘনত্ব স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত কম।

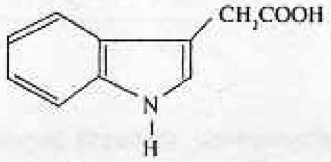

ইন্ডোল 3 অ্যাসিটিক অ্যাসিড

এর প্রভাব অনেকরকম। এটি কোশ বিভাজন, কোশের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুটনকে ত্বরান্বিত করে। এটি কোশ পর্দার ভেদ্যতা, কোশের শ্বসন, RNA সংশ্লেষ তথা প্রোটিন সংশ্লেষ পদ্ধতিতে প্রভাবিত করে।

অধিকাংশ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে পোষকের IAA ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। বাঁধাকপির গলাকৃতি মূল (Clubroot of Cabbage) সৃষ্টিকারী *Plasmodiophora brassicae (প্লাসমোডিওপোরা ব্রাসিকি)* আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ সৃষ্টিকারী *Phytophthora infestans (ফাইটপথোরা ইনফেস্টানস)*, কলাগাছের Wilt রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক *Fusarium oxysporum (ফিউসারিয়াম অকসিস্পোরাম)* ইত্যাদি যে কেবল পোষক উদ্ভিদকে অধিকমাত্রায় IAA সংশ্লেষে প্রভাবিত করে তা নয়, এরা নিজেরাও IAA সংশ্লেষিত করে অকসিন মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে *Pseudomonas solonacearum (সিউডোমোনাস সোলোনাসিরাম)* যা আলু জাতীয় উদ্ভিদের Wilt ঘটাতে সক্ষম তার সংক্রমণের ক্ষেত্রে 100 গুণ বেশি হারে অকসিন সংশ্লেষিত হতে দেখা যায়।

ক্রাউন গল রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া *Agrobacterium tumifaciens (অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফাসিয়েন্স)* শতাধিক উদ্ভিদে গল বা টিউমার জাতীয় লক্ষণ সৃষ্টি করে। সংক্রমণের পর ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদকোশের কোশপ্রাচীরের সংযুক্ত হয়। এই পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া কোশের কোন বিভাজন হয় না এবং কোশের বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হারে চলতে থাকে, সংক্রমণের পর তৃতীয় বা চতুর্থ দিন থেকে ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA কোশে প্রবিষ্ট হয়ে কোশীয় DNA এর সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। ফলে কোশ অনিয়মিতভাবে বিভাজিত হতে থাকে এবং টিউমার গঠন করে। এই টিউমার কোশগুলির অকসিনমাত্রা বহুগুণ বেশি এবং দেখা গেছে যে IAA গঠনকারী জীন ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিডে অবস্থান করে। সেটির স্থানান্তরন কোশকেও অধিকমাত্রায় IAA সংশ্লেষে উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে অনিয়মিত বৃদ্ধিও টিউমার।

12.5.2 জিব্বারেলিন (Gibberellins)

এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থটি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ধানগাছে সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ছত্রাক *Gibberella fujikoroi (জিব্বারেলা ফুজিকোরোই)* থেকে এবং তারপর দেখা যায় যে সমস্ত সবুজ উদ্ভিদের এটি একটি স্বাভাবিক

হরমোন এটির রাসায়নিক নাম হল *জিব্বারেলিক অ্যাসিড* এবং ভিটামিন E এবং হেলমিন থোস্পোরোল জাতীয় কয়েকটি যৌগ জিব্বারেলিন এর মত একই পদ্ধতিতে কাজ করে।

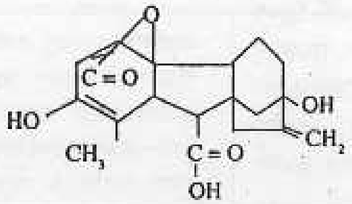

জিব্বারেলিক অ্যাসিড (GA)

এদের কার্যকারিতা চমকপ্রদ। এগুলি খর্বাকৃতি উদ্ভিদকে দৈর্ঘ্যে বাড়তে সাহায্য করে, ফুল প্রস্ফুটনে সাহায্য করে। কাণ্ড ও মূলের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধিতে সহায়ক, ফলের বৃদ্ধিতে সহায়ক ইত্যাদি নানা সহায়ক ভূমিকা GA পালন করে থাকে। ধানগাছের অঙ্কুরে *জিব্বারেলা ফুজিকোরোই* ছত্রাকের সংক্রমণে গাছে দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ার ঘটনা এটাই ইঙ্গিত করে যে ছত্রাকটি নিজেই GA সংশ্লেষে সক্ষম এবং সেই কারণেই পোষকের বৃদ্ধি প্রণোদিত হয়। তবে এখনও পর্যন্ত খর্বতা (Dwarfism) রোগের কারণ হিসাবে GA কে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি অর্থাৎ কম GA সংশ্লেষের জন্যই যে উদ্ভিদের কম বৃদ্ধি হয় এমনটা মনে করার মত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

প্রান্তলিপি ঃ 1920 খ্রিস্টাব্দে একদল জাপানি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধানের অঙ্কুর বিনাশকারী একটি ছত্রাকের উপর গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ছত্রাকটির নাম ছিল *Gibberella* (জিব্বারেল্লা)। তাঁরা দেখেন এই ছত্রাকের সংক্রমণে ধানের অঙ্কুরটি অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হয়ে যায়। এবং কিছুটা বিবর্ণ, দুর্বল এই অঙ্কুরটি হয় বিনষ্ট হয় অথবা খুব কম ফসল উৎপাদন করেই মারা যায়। 1926 এ এই ছত্রাকটি থেকে সংগৃহীত রস নিয়ে দেখা গেল একই রকম লক্ষণগুলি পাওয়া যাচ্ছে। 1935 এ এই হঠাৎ বৃদ্ধির কারণ ঘটানো রাসায়নিক যৌগটিকে কেলাসিত করা সম্ভব হল। জাপানি বৈজ্ঞানিকরা এর নাম ছত্রাকটির নামে রাখলেন **জিব্বারেলিন**। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণার খবর ইউরোপ, আমেরিকায় পৌঁছল অনেক পরে। 1954 খ্রিস্টাব্দে একদল ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক যৌগটির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে জানালেন এটি বস্তুতঃপক্ষে *জিব্বারেলিক অ্যাসিড* নামে একটি প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরমোন যা উন্নততর উদ্ভিদেও পাওয়া যায় এবং অকসিনের মতই যা কোশ বৃদ্ধি ও বিভাজনে সহায়ক।

12.5.3 সাইটোকাইনিন (Cytokinin) ঃ

কোশের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুটনের জন্য দায়ী একটি উদ্ভিদ হরমোন হল সাইটোকাইনিন। এছাড়া এরা প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের আর্দ্রবিশ্লেষণে বাধা দেয়, পত্রমোচনে বাধা দেয় ইত্যাদি। উদ্ভিদের বীজে এবং কোশরসে অতি অল্প পরিমানে সাইটোকাইনিন পাওয়া যায়। কাইনেটিন (Kinetin) হল প্রথম রাসায়নিক পদার্থ যাকে সাইটোকাইনিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তবে এইট স্বাভাবিক অকথায় উদ্ভিদ কোশে পাওয়া যায় না। স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত একটি উদ্ভিদ হরমোন যার সাইটোকাইনিন এর মত কার্যকারিতা আছে সেটি হল *জিয়াটিন* (Zeatin)। বিভিন্ন উদ্ভিদ রোগ যেমন গল বা টিউমার, স্মাট বা রাস্ট (মরিচা রোগ) ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাইটোকাইনিন মাত্রা বেড়ে যাবার প্রমাণ পাওয়া গেছে। (উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে Clubroot gall, crown gall, rust gall ইত্যাদি)।

12.5.4 ইথিলীন : $CH_2 = CH_2$

উদ্ভিদদেহে স্বাভাবিকভাবে সংশ্লেষিত এই উদ্বায়ী পদার্থটি ক্লোরোসিস, পত্রমোচন, এপিন্যাস্টি, গুচ্ছমূলের অতিরিক্ত বৃদ্ধি, ফলের পক্কতা ইত্যাদি বহু শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এটি কোশ পর্দার ভেদ্যতা বাড়ায় এবং অনেক সংক্রমণ প্রতিরোধকারী উৎসেচকের সংশ্লেষে সহায়তা করে। *Pseudomanas sp.* (*সিউডোমোনাস*), জাতীয় ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য কয়েকপ্রকার ছত্রাক ইথিলীন তৈরি করতে পারে।

> প্রান্তলিপি : লেবু জাতীয় ফল বহুদিন ফেলে রাখলে সেটির গায়ে কালো ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায় এবং একটি উদ্বায়ী গ্যাসের গন্ধও পাওয়া যায়। কলার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো প্রকট। কালো দাগের সাথে জড়িত এই গন্ধটি বস্তুতঃপক্ষে ইথিলীন নামক গ্যাসের যা আরও বহু ফলের পক্কতার সাথে জড়িত। আসলে এই উদ্বায়ী গ্যাসটি উদ্ভিদের হরমোনের কাজ করে যা শ্বসনের হার বাড়িয়ে দেয়। শ্বসন-হার বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই ফলের পক্কতার প্রাথমিক শর্ত। তবে ইথিলীনকে বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন না বলে বৃদ্ধি নিরোধক হরমোন বলাই ভাল। এটি কাণ্ড ও মূলের বৃদ্ধিতে বাধা দান করে। ফল পাকতে সাহায্য করাটাও বৃদ্ধির একটি পর্যায় বটে কিন্তু সেক্ষেত্রে উদ্ভিদের অপরিচিতির হার উপচিতির তুলনায় অনেক বেশি বলে এটাকে নঞর্থক বৃদ্ধি বলাই শ্রেয়।

12.5.5 অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscisic acid) :

অধিকাংশ সবুজ উদ্ভিদ এবং বহু সংখ্যক প্যাথোজেনিক ছত্রাক দ্বারা সংশ্লেষিত এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোন বস্তুতঃ পক্ষে "বৃদ্ধি নিরোধী" হিসাবে কাজ করে। এটি অঙ্কুরোদগমে বাধা দেয়, সুপ্ত দশা (dormancy) ত্বরান্বিত করে, বৃদ্ধিতে বাধা দেয়, পত্ররন্ধ্র বন্ধ করার পদ্ধতিকে বাধা দেয় ইত্যাদি। TMV (টোবাকো মোজাইক ভাইরাস) অথবা শসার মোজাইক বা বর্ণালী রোগ, ব্যাকটিরিয়া ঘটিত তামাক গাছের wilt, *Verticillium* ছত্রাক ঘটিত টম্যাটোর Wilt ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে অ্যাবসিসিক অ্যাসিডের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে।

12.6 পোষকের অভ্যন্তরে প্যাথোজেনের বৃদ্ধি ও বিস্তার (The growth and spread of the pathogen inside host tissue) :

অনুপ্রবেশ সম্পন্ন হবার সাথে সাথেই সংক্রমণ জাত বহির্লক্ষণ প্রকাশিত নাও হতে পারে। অনেক সময় অনুপ্রবেশ ও সংক্রমনের লক্ষণ প্রকাশ এই দুয়ের মধ্যবর্তী একটি লীন দশা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়টুকু বিশে, বিশে, পোষক-প্যাথোজেন সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পোষক যদি প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ না গড়ে তুলতে পারে তাহলে সংক্রমণ পরবর্তী অবস্থায় পোষকের অভ্যন্তরে প্যাথোজেনর বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটে। একে বলে কলোনাইজেশন (colonization) বা উপনিবেশীকরণ।

> প্রান্তলিপি : ইথিলীনের মতই অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA) হল তেমনই একটি উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক যৌগ যাকে বৃদ্ধি সহায়ক না বলে বৃদ্ধি নিরোধী বলা ভাল। আমরা তো জানি বীজ বা মুকুল উৎপন্ন হবার সাথে সাথেই অঙ্কুরিত হয় না, তার একটি বিশ্রামদশা আছে যাকে শারীরবৃত্তীয় পরিভাষায় বলে dormancy ওয়্যারিং নামক এক উদ্ভিদবিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাবারস্টিথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে জানান যে মুকুল বা বীজের বৃদ্ধিতে এই হঠাৎ ছেদ পড়ার কারণটি হল একটি রাসায়নিক যৌগ যার নাম প্রথমে ছিল dormin। 1967 খ্রিস্টাব্দে সর্বসম্মতভাবে পদার্থটির নাম দেওয়া হল অ্যাবসিসিক অ্যাসিড যা উদ্ভিদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে ঠিকই কিন্তু তা বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দিয়ে নয় বরং উল্টোটা অর্থাৎ বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে।

অধিকাংশ ছত্রাক তার অনুপ্রবেশের জায়গা থেকে অনবরত ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমগ্র

উদ্ভিদদেহে। ছত্রাক আমরা জানি—মাইসেলিয়াম গঠন করে বিস্তার লাভ করে। মাইসেলিয়াম, সংক্রমনের ক্ষেত্রে, দুই প্রকার হওয়া সম্ভব। *অন্তঃকোশীয় মাইসেলিয়াম* বা intracellular mycelium (কয়েকটি মাত্র প্যাথোজেনে দেখা যায়) যা কেবলমাত্র পোষক কোশগুলির ভেতর দিয়ে বিস্তার লাভ করে এবং *আন্তঃকোশীয় মাইসেলিয়াম* বা intercellular mycelium (চিত্র নং 12.5a) যা কোশান্তর রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করে (যথা *Taphrina* প্রজাতির ছত্রাক), বিস্তার লাভ করার পর ছত্রাকের পরবর্তী প্রয়োজন হল বংশবিস্তারের। পোশক দেহ থেকে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে পুষ্টি আহরণ করে ছত্রাক মাইসেলিয়ামগুলি বংশবিস্তারের জন্য আবশ্যিক পূর্ণতা লাভ করে। ছত্রাকের বংশবিস্তার অযৌন ও যৌন দুই পদ্ধতিতেই হতে পারে। অযৌন রেণু, কনিডিয়া ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে ছত্রাক দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটায়। সমস্ত ছত্রাকে যৌন জনন দেখা যায়। যাদের ক্ষেত্রে যৌন জনন হয় তারা যৌন রেণু গঠনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। ছত্রাকের ক্ষেত্রে রেণু তৈরি হয় সংক্রামিত অঞ্চলের মধ্যে বা তার ঠিক নীচে, উদ্ভিদেহের সংক্রামিত কলায়। সেক্ষেত্রে রেণু সহজেই সংক্রামিত অঞ্চল থেকে বাইরে বিস্তার লাভ করে। অপর পক্ষে কিছু ছত্রাক (উদাঃ ক্লাবরুট ছত্রাক বা গদাকৃতি মূল সৃষ্টিকারী ছত্রাক) পোষক দেহের অভ্যন্তরে রেণু তৈরি করে এবং সেই রেণু পোষকের মৃত্যু ও পচন ঘটার পূর্বে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। উপনিবেশীকরণের একটি সহজ পদ্ধতি হল রেণুগুলিকে উদ্ভিদের সংবহনতন্ত্রে মুক্ত করা যাতে সেগুলি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত উদ্ভিদদেহকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারে।

প্রান্তলিপি ঃ ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে মূলতঃ দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে। আদর্শ অবস্থায় অর্থাৎ তাপমাত্রা অম্ল বা ক্ষারত্ব, পৌষ্টিক পদার্থ ইত্যাদি অনুকূল হলে একটি ব্যাকটেরিয়া দ্বিবিভাজিত হতে সুনির্দিষ্ট সময় নেয়। সময়টি এক একটি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এক

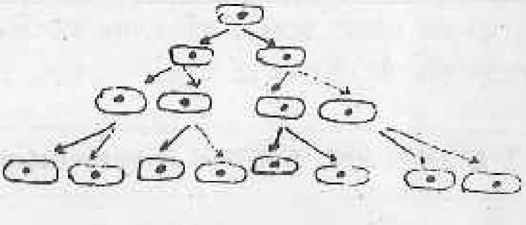

একরকম। যেমন *Escherichia coli* (Colon bacterium) নামক সুপরিচিত ব্যাকটেরিয়াটি দ্বিবিভাজিত হতে সময় নেয় 20 মিনিট। এই সময়টি তার জেনারেশন টাইম নামে পরিচিত। আবার *Thiobacillus* এর ক্ষেত্রে এই সময়টি প্রায় 40 ঘণ্টা। উপরের ছবিতে একটি থেকে আটটি কোশ তৈরিতে সময় লেগেছে 60 মিনিট। হিসাব করে দেখতে পারেন এক দিনে (= 24 ঘঃ) একটি *E. Col.* কোশ থেকে কত সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া কোশ সৃষ্টি হতে পারে?

ব্যাকটেরিয়া কোশের অভ্যন্তরেই বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি ঘটায় এবং পোষক কোশের মধ্যে সংখ্যায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে সেগুলি কোশান্তর অঞ্চরে মুক্ত হয় (চিত্র নং 12.5b)। সংবহন নালিকার রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া জাইলেম বাহিকায় ছড়িয়ে পড়ে সাধারণভাবে ব্যাকটেরিয়ার দ্বিবিভাজনের সময়কাল 20 থেকে 30 মিনিট অর্থাৎ প্রতি 20 থেকে 30 মিনিটে একটি ব্যাকটেরিয়া কোশ থেকে দুটি কোশ পাওয়া যায়। এই বৃদ্ধির হার ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের বা সংক্রমণের সাফল্যের অন্যতম কারণ। আক্রান্ত গাছের প্রতি ফোঁটা দেহরসে কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া থাকে।

প্রান্তলিপি ঃ ভাইরাস কণিকা সজীব কোশের মধ্যেই কেবল সংখ্যায় বাড়তে পারে এবং বিনিময়ে পোশক কোশটির মৃত্যু ঘটায়। পোশক কোশে ভাইরাস কণিকার নিউক্লিক অ্যাসিডই কেবল প্রবেশ করে এবং প্রোটিন খোলকটি কোশের বাইরে থেকে যায়। নিউক্লিক অ্যাসিড পোষক কোশের মধ্যে নিজের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। তারপরে সেটি পোষককোশকে বাধ্য করে ভাইরাসের দেহগঠন কারী প্রোটিন তৈরি করতে। প্রোটিন খোলকের মধ্যে নবগঠিত নিউক্লিক অ্যাসিড অণুকে নিয়ে তৈরি হয় নতুন নতুন ভাইরাস কণিকা, অতঃপর পোষক কোশটির বিদারণ ঘটে যাকে বলে লাইসিস (Lysis)। ফলে নবপ্রজন্মের বহু সংখ্যক ভাইরাস আবার নতুন সুস্থ কোশকে আক্রমণে উদ্যোগী হয়।

ভাইরাস অবশ্য কেবল জীবিত কোশের মধ্যেই বংশবিস্তার করে। সংক্রামিত উদ্ভিদের জীবিত কোশে ভাইরাস অতি দ্রুত হারে সংখ্যায় বাড়ে। কখনও কখনও কোশপ্রতি দশলক্ষাধিক ভাইরাস কণিকা দেখা যায়। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর কোশের *লাইসিস* (lysis) বা বিদারণ ঘটে এবং কণিকাগুলি বাইরে বেরিয়ে এসে নতুন সুস্থ উদ্ভিদকোশকে সংক্রামিত করে।

নিমাটোড ঘটিত সংক্রমণের ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রাণীটি 300 থেকে 600 ডিম পাড়ে পোষক দেহের ভিতরেই। এগুলি থেকে উদ্ভূত প্রাণী পুনরায় ঐ একই হারে ডিম পাড়ে। এভাবে একটি রোগচক্রের মধ্যে 10 থেকে 12 টি প্রজন্মের নিমাটোড পোষকের মধ্যে সৃষ্ট হয়। সংক্রামিত উদ্ভিদদেহের মৃত্যু ও পচনের ফলে নিমাটোড পুনরায় মাটিতে ফিরে আসে। যদি প্রতি প্রজন্মের অর্ধেক স্ত্রী প্রাণীও সফল ভাবে ডিম ধারণ করতে পারে তাহলেও মাটিতে নিমাটোড সংখ্যা একশতগুণ বৃদ্ধি পায় (চিত্র নং 12.5c)।

12.7 প্রতিকূল দশা অতিক্রমন (overwintering and/or oversummering) :

সংক্রমণ সফল হলে প্রাথমিক অনুপ্রবেশ ও পরিবেশ প্যাথোজেনের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে ওঠা—এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে প্যাথোজেন বংশবিস্তার করে বহুবার নতুন নতুন সুস্থ উদ্ভিদ অংশকে বা উদ্ভিদদেহকে সংক্রামিত করতে পারে। সফল সংক্রমণ পরিবেশের আলো CO_2, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত পরিবেশগত পরিস্থিতি যখন প্রতিকূল হয়ে ওঠে তখন প্যাথোজেনকে সুপ্ত অবস্থায় চলে যেতে হয় এবং পরবর্তী ঋতুর অনুকূল পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই চক্রাকার আবর্তন *রোগচক্র* নামে পরিচিত। চিত্র 12.6 'এ প্যাথোজেনের প্রতিকূলতা অতিক্রমকারী বিভিন্ন অবস্থা দেখানো হয়েছে। ঐ সম্পর্কে আরও একটু বলা হয়েছে সারাংশ (12.8) অংশে।

অনুশীলনী - 3

1. এমন তিনটি জীবাণুর নাম লিখুন যাদের প্রভাবে ঃ

a) পোষকে অকসিন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

b) পোষক ও প্যাথোজেন উভয়ের অকসিন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

c) অনিয়মিত কোশ বিভাজন ও বিভাজিত কোশে অকসিন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

2. বামদিকের লক্ষণগুলির সাথে ডানদিকের উদ্ভিদ হরমোনটিকে মেলান ঃ

a) রাষ্ট বা মরিচা রোগ	i) অ্যাবসিসিক অ্যাসিড
b) পত্রমোচন	ii) ইথিলীন
c) dormancy	iii) জিব্বারেলিন
d) অঙ্কুরের অনিয়ন্ত্রিত দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি	iv) অকসিন
e) উদ্ভিদ টিউমার	v) সাইটোকাইনিন

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

a) ভাইরাস কেবল ____________ কোশেই সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে।

b) একটি রোগচক্রের সম্পূর্ণ আবর্তনে ____________ থেকে ____________ টি প্রজন্মের নিমাটোড পোষকদেহে সৃষ্ট হয়।

c) ছত্রাক ____________ ও ____________ মাইসেলিয়াম বা অনুসূত্র তৈরি করে পোষকদেহে বিস্তার লাভ করে থাকে। এই চক্রাকারে আবর্তন রোগচক্র নামে পরিচিত।

12.8 সারাংশ :

এই পর্যায়ে আমরা প্যাথোজেন ও পোষকের পারস্পরিক সম্পর্ক তথা রোগসৃষ্টির পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। রোগসৃষ্টির জন্য প্যাথোজেনকে পোষকদেহ প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশ করার পথটি *স্বাভাবিক রন্ধ্রপথ* (যথা পত্ররন্ধ্র বা লেন্টিসেল) হতে পারে আবার ক্ষতস্থান ইত্যাদিও হতে পারে। অনুপ্রবেশের পূর্বশর্ত হল প্যাথোজেন কর্তৃক পোষকের সাথে *সংযোগস্থাপন*, সংযোগস্থাপনের ব্যাপারটি পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। এই কারণে রোগপ্রবণ উদ্ভিদদেহে প্যাথোজেন প্রবেশ করতে পারে কিন্তু প্রতিরোধী উদ্ভিদদেহে বাধা পায়। ছত্রাকের অনুপ্রবেশ পদ্ধতিটি সাধারণভাবে একটি রেণুর অঙ্কুরোদগমে সৃষ্ট *জার্ম টিউব* গঠনের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর জার্ম টিউবের অগ্রভাগ স্ফীত হয়ে গঠন করে *অ্যাপ্রেসোরিয়াম*। এটি থেকে সৃষ্ট হয় *সংক্রামক হাইফা* যা রন্ধ্রপথে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে এবং বিস্তার লাভ করে। এই ঘটনা পুরোপুরি যান্ত্রিক নয় এর সাথে প্যাথোজেনের *রাসায়নিক ক্ষমতাবলী* জড়িত। প্যাথোজেন বিশেষ বিশেষ উৎসেচক তৈরি করে কোশপ্রাচীর গঠনকারী সেলুলোজ, লিগনিন, কিউটিন, পেকটিক পদার্থ ইত্যাদিকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে এবং উৎপন্ন সরলীকৃত পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এছাড়া প্যাথোজেন নয় নিজে *হরমোন* তৈরি করে অথবা পোষকের হরমোন স্তরে ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়ে পোষকদেহে রোগসৃষ্টিতে রাসায়নিক ক্ষমতাকে কাজে লাগায়। অনুপ্রবেশ সম্পন্ন হবার পর প্যাথোজেন উদ্ভিদদেহে বৃদ্ধি পায় বিস্তার লাভ করে এবং *অযৌন* বা *যৌন রেণু* তৈরি করে হয়। বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদের মধ্যে প্যাথোজেন এই *শৈত্য বা গ্রীষ্মকালীন প্রতিকূলতা* কাটিয়ে দিতে পারে। বর্ষজীবি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেহেতু উদ্ভিদটিই বর্ষশেষে মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় সেহেতু প্যাথোজেন হয় উদ্ভিদটির অবশিষ্টাংশ অথবা সেটির বীজ বা ফলে অথবা অঙ্গজ জননকারী অংশে ঘুমন্ত অথবা *নিষ্ক্রিয় অবস্থায়* থাকে। ছত্রাকের ক্ষেত্রে এই দশাটি রেণু অথবা মাইসেলিয়াম হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া *অন্তঃরেণু* (endospore) গঠন করে প্রতিকূল দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারে। অন্তঃরেণু উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশে, মাটিতে বা অন্য যে কোন স্থানে অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে সব ক্ষতি এড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারে কেননা endospore বা অন্তঃরেণু অত্যন্ত দৃঢ় এবং সুপ্রতিরোধী। যেসব ব্যাকটেরিয়া অন্তঃরেণু গঠনে সক্ষম নয় তারা নিষ্ক্রিয় কোশরূপে উদ্ভিদের বীজ, ফল, দেহাংশ বা মাটিতে প্রতিকূল দশা কাটায়।

উদ্ভিদের দেহাংশ বা মাটি ছাড়া প্রতিকূল দসা অতিবাহিত করার অপর একটি মাধ্যম হল পতঙ্গদেহ। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক বা আদ্যপ্রাণী পতঙ্গদেহে নিষ্ক্রিয়ভাবে এই দশা কাটিয়ে দিতে পারে। নিমাটোড ডিম্ব রূপে মাটিতে প্রতিকূল পরিবেশের হানিকারক ক্ষমতার প্রভাব বাঁচিয়ে চলে।

এই সব কটি ক্ষেত্রেই যখন পুনরায় অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসে তখন প্যাথোজেনের এই দশাগুলি প্রাথমিক সংক্রমণ ঘটাতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। এইভাবে পূর্ণবার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি অর্থাৎ অনুপ্রবেশ, বিস্তার, বৃদ্ধিও বংশবৃদ্ধির পর্যায়গুলি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। এইভাবে একটি ঋতুতে একটি প্যাথোজেন বহুবার বুনঃ পুনঃ বংশবৃদ্ধি করে পুনঃ পুনঃ সংক্রমণ ঘটাতে পারে। পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে উঠলে প্যাথোজেন সংক্র মক ভূমিকা সাময়িকবাবে সুপ্তির আড়ালে অবদমিত থাকে। এই পর্যায়ে প্যাথোজেন নিষ্ক্রিয় থাকে এবং পুনরায় যখন পরিবেশ অনুকূল হয়ে ওঠে তখন সেটি আবার সংক্রমণ ঘটায়।

12.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. প্যাথোজেন কর্তৃক পোষকদেহে অনুপ্রবেশের পূর্ববর্ত্তী পর্যায়ে কি ধরনের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে এবং তা কিরূপে অনুপ্রবেশের ঘটনাটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে? একটি ছত্রাকের পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে অনুপ্রবেশের পদ্ধতিটি চিত্রসহ আলোচনা করুন।
2. প্যাথোজেনের রাসায়নিক ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়? সংক্রমনের ক্ষেত্রে উৎসেচকের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
3. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন

a) উপনিবেশীকরণ

b) প্রতিকূল দশা অতিক্রমণ

c) উদ্ভিদের টিউমার

d) পোষক নির্দিষ্ট অধিবিষ

e) সেলুলোজ

12.10 উত্তরমালা :

অনুশীলনী - 1

1. a) জার্মটিউব, চলরেণু

   b) পত্ররন্ধ্র, লেন্টিসেল এবং জলছিদ্র

   c) স্ট্রেপটোমাইসেস, Erwinia amylovora

2. সংযোগসাধন → জার্মটিউব → অ্যাপ্রোসোরিয়াম → পেনিট্রেশন পেগ → অনুপ্রবেশকারী হাইফা

3. (a) (iii)

(b) (i)

(c) (ii)

(d) (v)

(e) (iv)

অনুশীলনী - 2

1.	যৌগ	কোশপ্রাচীরে অবস্থান	ভঙ্গালকারী উৎসেচক	উৎসেচক উৎপাদনকারী জীবাণু
(a)	কিউটিন	কিউটিকল	কিউটিনেজ	*Streptomyces scabies*
(b)	সেলুলোজ	প্রাথমিক ও গৌণ কোশপ্রাচীর	সেলুলেজ	*Rhizoctina solani*
(c)	পেকটিক পদার্থ	মধ্যচ্ছদা	পেকটিনেজ	Helmonthosporium turcicum
(d)	লিগনিন	মধ্যচ্ছদা ও গৌণ প্রাচীর	লিগনিনেজ	Xylaria polymorpha

2.	যৌগ	আদ্র বিশ্লেষিত সরলীকৃত উপাদান
(a)	শ্বেতসার	গ্লুকোজ
(b)	প্রোটিন	অ্যামাইনো অ্যাসিড
(c)	স্নেহপদার্থ	ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল
(d)	সেলুলোজ	গ্লুকোজ
(e)	হেমিসেলুলোজ	গ্যালাকটোজ, অ্যারাবিনোজ ফিউকোজ ইত্যাদি শর্করা

3.	অধিবিষের নাম	উৎপাদনকারী জীবাণু	কার্যপদ্ধতি
	ট্যাবটক্সিন	*Pseudomonas syringae*	গ্লুটামিন সিনথেটেজ নামক উৎসেচককে অকেজো করে দেয়।

টেনটক্সিন	*Alternaria alternata* (পূর্ব নাম *Alternaria tenuis*)	ADP → ATP বিক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।
ফ্যাসিওলোটক্সিন	*Pseudomonas sp.*	ক্লোরোফিল উৎপাদনে বাধা দেয়.

অনুশীলনী - 3

1. (a) *Plasmodiophora brassicae*
   (b) *Phytophthora infestans*
   (c) *Agrobacterium tumifaciens*

2. (a) (v)
   (b) (ii)
   (c) (i)
   (d) (iii)
   (e) (iv)

3. (a) সজীব
   (b) 10 থেকে 12 টি
   (c) অন্তঃকোশীয় ও আন্তঃকোশীয়

1. অনুপ্রবেশ পূর্ববর্তী পর্যায়টি হল সংযোগসাধন। প্যাথোজেন যখন পোষকের সাথে সংযোগসাধন করে তখন উভয়ের মধ্যেই কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনগুলি উভয়ে উভয়কে চিনে নেবার উপর নির্ভরশীল। তাই পরিবর্তনগুলি অনুপ্রবেশের পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল দুইই হওয়া সম্ভব। পোষক নিঃসৃত কোন রাসায়নিক যৌগ এক্ষেত্রে সিগন্যালরূপে কাজ করে। সিগন্যাল আক্রান্ত হবার প্রবণতা সম্পন্ন উদ্ভিদে সংক্রমন আহ্বায়ক। আবার প্রতিরোধী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সংক্রমনকে সঞ্চারিত হতে বাধাপ্রদান করে। অতএব সংক্রমণের সাফল্য বা ব্যর্থতা দুইই প্যাথোজেন ও পোষকের পারস্পরিক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

   পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ 12.3.2 এর (a) পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

2. প্যাথোজেনের রাসায়নিক ক্ষমতা বলতে আমরা মূলতঃ উৎসেচক, অধিবিষ, বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক হরমোনকে বুঝি।

উৎসেচকগুলি কোশপ্রাচীরকে দ্রবীভূত করে অনুপ্রবেশে সহায়তা করে এবং জটিল কোশীয় বস্তুকে সরলীকৃত করে প্যাথোজেনের পুষ্টিতে সহায়তা করে।

অধিবিষ পোষকদেহে সংক্রমনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হতে পারে অথবা অধিবিষের প্রতিক্রিয়ায় সংক্রমনের লক্ষণগুলি দেখা যেতে পারে।

বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক হরমোন সমূহ সংক্রমনজনিত কারণে পোষকদেহের অভ্যন্তরে অথবা পোষক ও প্যাথোজেন উভয় জীবেই কম বা বেশি বা অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় উৎপাদিত হয়ে রোগ লক্ষণের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

সংক্রমণে উৎসেচকের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে পেকটিনেজ, সেলুলেজ, লিগনিনেজ, কিউটিনেজ ইত্যাদি উৎসেচকের সহায়তায় কোশপ্রাচীরের দ্রবীভবন এবং প্রোটিনেজ, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ইত্যাদির সহায়তায় প্রোটোপ্লাজমীয় পদার্থের সরলীকরণ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ ঃ

(i) **পেকটিনেজ ঃ** মধ্যচ্ছদা কোশ প্রাচীরের অন্যান্য অংশে উপস্থিত পেকটিক পদার্থকে সরলীকৃত করে। দুই প্রকার ঃ *এন্ডোপেকটিনেজ* ও *এক্সোপেকটিনেজ*।

প্রথমটি দীর্ঘ পেকটিন শৃঙ্খলকে পূর্বনির্দিষ্ট স্থান ব্যতিরেকে ভেঙে দেয় এবং দ্বিতীয়টি পেকটিন শৃঙ্খলকে প্রান্তীয় অংশ বরাবর ভেঙে দেয়। রাসায়নিক প্রকৃতি অনুযায়ী PE এবং PG এই দুই প্রকার। এছাড়া PTE নামক অপর এক প্রকার পেকটিনেজ এর কথা Wood কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

3. (a) উপনিবেশীকরণ 12.6 অংশাঙ্কিত পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও নিমাটোডের সংখ্যাবৃদ্ধি ও পোষকের দেহে উপনিবেশীকরণ পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এর ভিত্তিতে উত্তরটি লিখুন।

(b) 12.7 অংশাঙ্কিত পর্যায়ে আলোচিত।

(c) 12.5.1 অংশে *Agrobacteriam tumifaciens* কর্তৃক সংক্রমনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনাটি পড়ে উত্তরটি লিখুন।

(d) পোষক-নির্দিষ্ট অধিবিষগুলির কথা 12.4.2 অংশে আলোচিত হয়েছে।

(e) সেলুলোজ উৎসেচকের বিভিন্ন অংশ এবং তাদের কার্যকারিতা 12.3.2 অংশে রেখাঙ্কিত চিত্র সহ আলোচিত হয়েছে। উত্তরটিও সেভাবে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

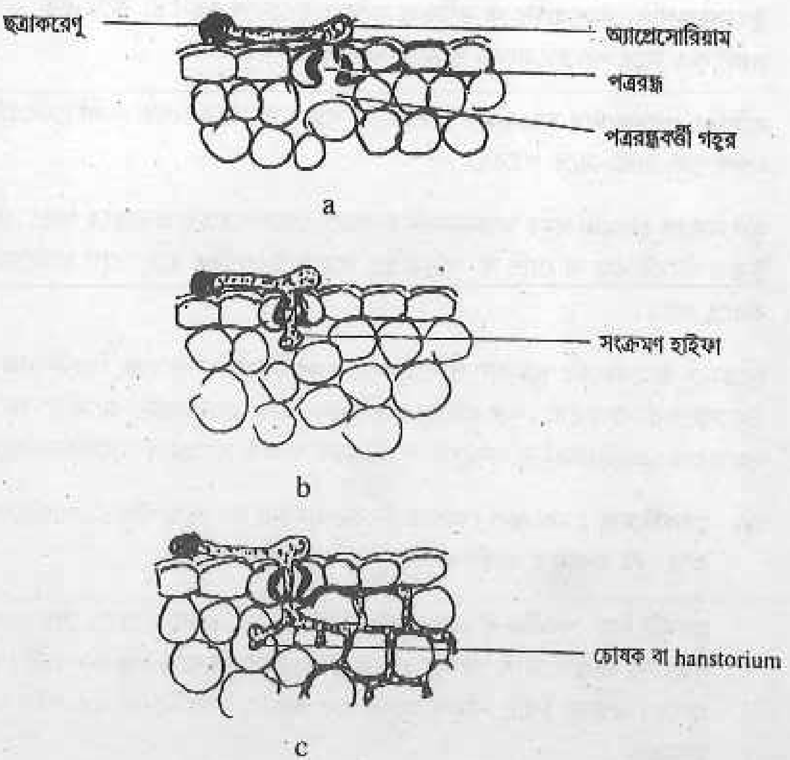

চিত্র নং 12.1 ঃ স্টোমাটার মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশ ঃ— (a) ছত্রাকের রেণুর পাতার উপরিতলে অঙ্কুরোদগমের ফলে অ্যাপ্রোসোরিয়াম গঠন করে। (b) অ্যাপ্রোসোরিয়াম থেকে সংক্রমণ হাইফা নির্গত হয়ে পত্ররন্ধ্র অনুপর্তী গহ্বরে প্রবেশ করে। (c) এই হাইফা শাখান্বিত হয়ে অথবা চোষক গঠন করে যথাক্রমে কোষান্তর স্থল বরাবর অথবা কোশ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সংক্রমণ বিস্তারে অংশ গ্রহণ করে।

চিত্র নং 12.2 ঃ সরাসরি অনুপ্রবেশ ঃ এই ছবিতে সরাসরি অনুপ্রবেশে চারটি পর্যায় দেখানো হয়েছে। ছত্রাকরেণুর অঙ্কুরোদগমের ফলে গঠিত হয় জার্ম টিউব। সেটির অগ্রভাগ স্ফীত হয়ে গঠন করে অ্যাপ্রেসোরিয়াম। এখান থেকে গজাল আকৃতির উপবৃদ্ধি কোশকে বিদীর্ণ করে অনুপ্রবেশ করে যাকে বলে পেনিট্রেশন পেগ। এরপর হাইফা কোশমধ্যস্থ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ সংক্রমণকে বিস্তৃত করে।

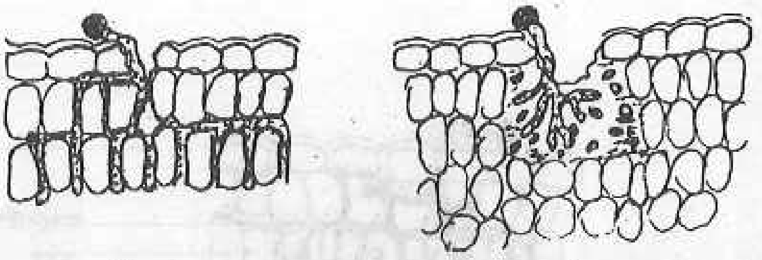

a b

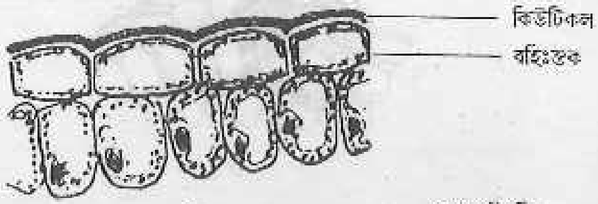

a

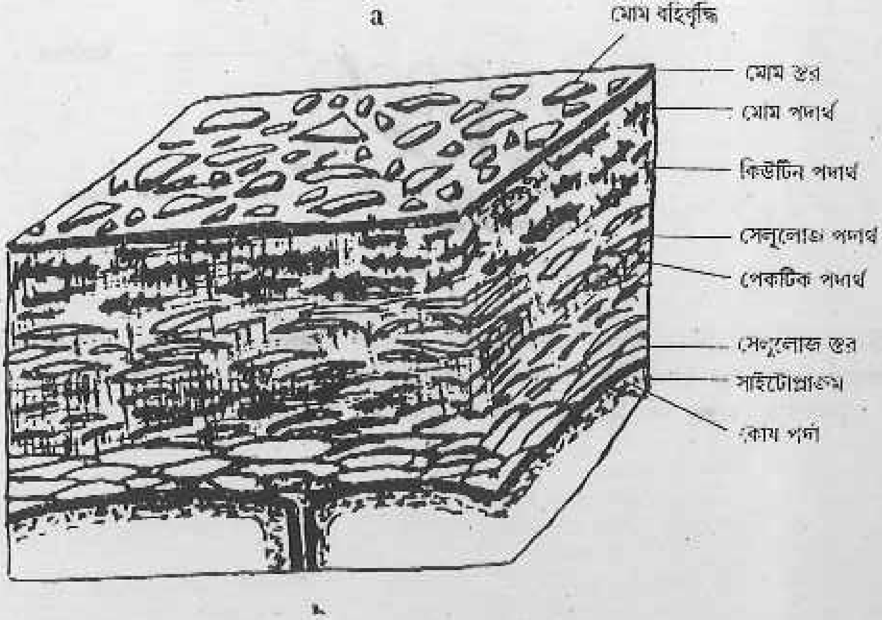

চিত্র নং 12.4 : বহিঃত্বকের কোশ ও কোশপ্রাচীরের গঠন— (a) পাতার বহিঃত্বক। (b) অংশবিশেষের রৈখিক চিত্র যাতে কোশপ্রাচীর ও তার উপরিবর্তী কিউটিকল অংশের গঠনশৈলী দেখানো হয়েছে।

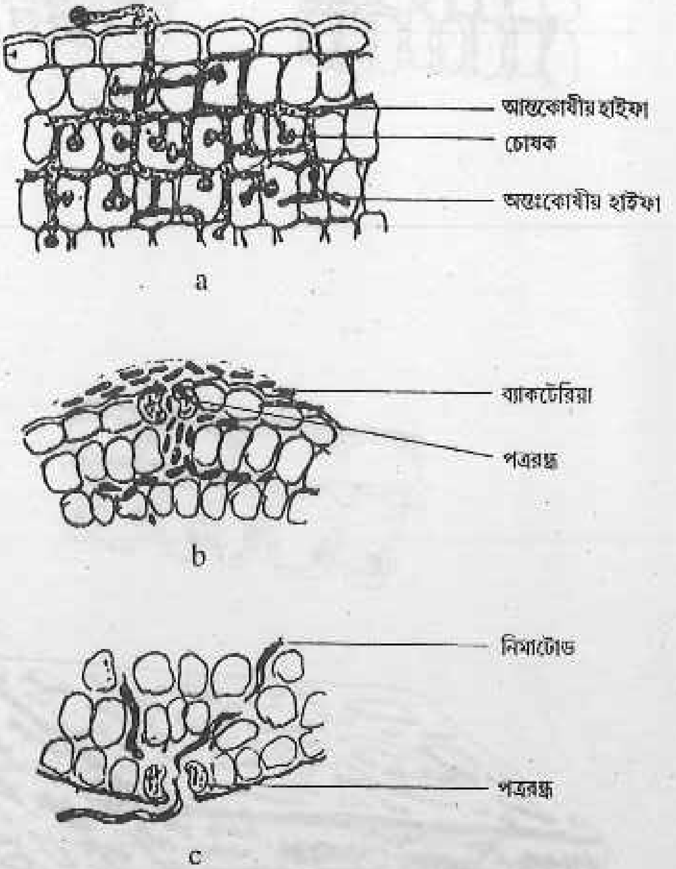

চিত্র নং 12.5 ঃ বিভিন্ন ধরনের অন্তঃপরজীবির পোষকের অভ্যন্তরে বিস্তার ঃ (a) ছত্রাকের অন্তঃকোশীয় হাইফার সাহায্যে বিস্তার (b) ব্যাকটেরিয়া সাধারণতঃ কোশান্তররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পোষক দেহে ছড়িয়ে পড়ে (c) অন্তঃপরজীবি নিমাটোড কোশের মধ্য দিয়ে বা কোশান্তর রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ পোষকের দেহের ভিতর ছড়িয়ে যায়।

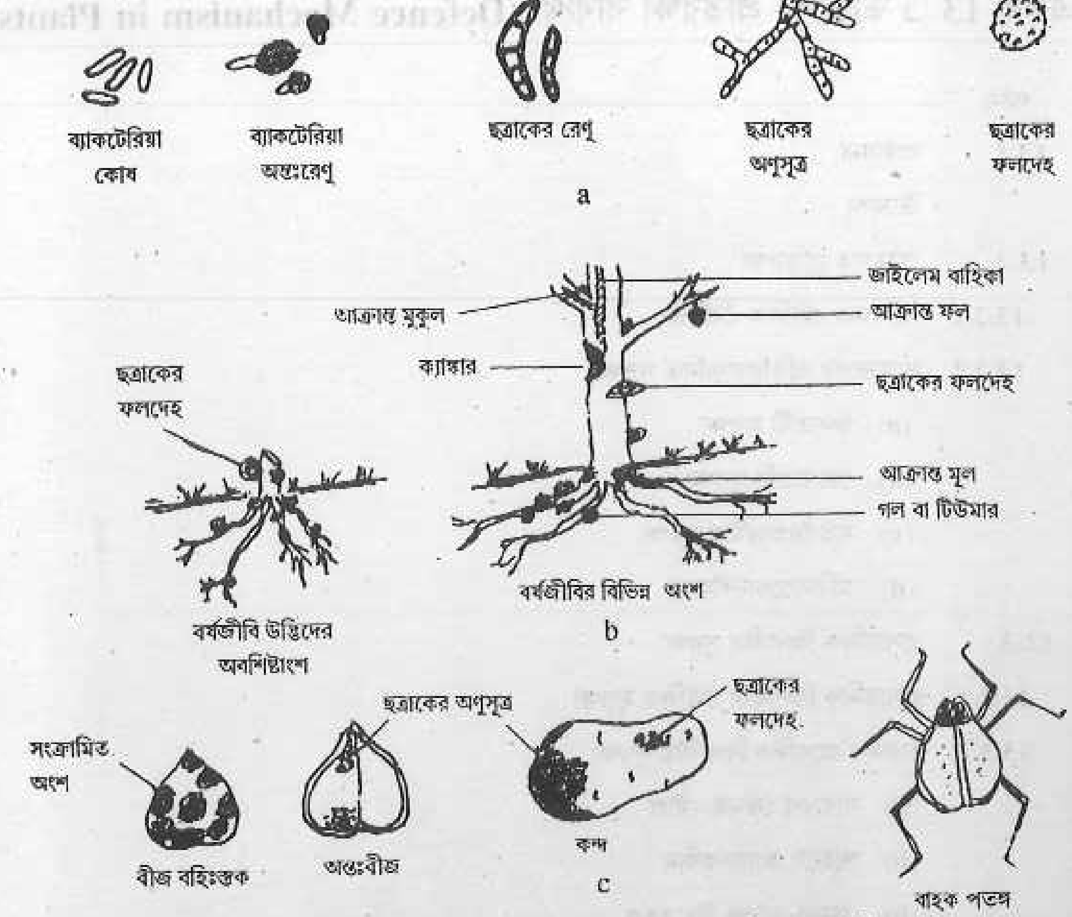

চিত্র নং 12.6 ঃ প্যাথোজেনের প্রতিকূলতা অতিক্রমণের বিভিন্ন উপায় ঃ (a) মাটিতে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের দেহাংশ অথবা রেণু বা ফলদেহ রূপে। (b) বর্ষজীবি উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশে অথবা বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদের বিভিন্ন আক্রান্ত অংশে। (c) বীজের বাইরে বা ভিতরে, বীজরূপে ব্যবহৃত কন্দে অথবা পতঙ্গরূপী বাহকের দেহে সবরকম প্যাথোজেন সুপ্ত দশা অতিবাহিত করতে পারে।

একক 13 ❑ উদ্ভিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Defence Mechanism in Plants)

গঠন

13.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

13.2 গঠনগত প্রতিরক্ষা

13.2.1 গঠনগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য

13.2.2 সংক্রমণের প্রতিক্রিয়াজনিত সুরক্ষা

(a) কলাশ্রয়ী সুরক্ষা

(b) কোশাশ্রয়ী সুরক্ষা

(c) সাইটোপ্লাজমীয় সুরক্ষা

(d) অতিসংবেদনশীলতা

13.3 রাসায়নিক বিপাকীয় সুরক্ষা

13.3.1 রাসায়নিক বিপাকীয় মৌলিক সুরক্ষা

13.3.2 সংক্রমণ প্রণোদিত বিপাকীয় সুরক্ষা

(i) সাধারণ ফেনল-যৌগ

(ii) ফাইটো অ্যালেক্সিন

(iii) ফেনল-জারক উৎসেচক

(iv) প্রণোদিত উৎসেচক

(v) প্যাথোজেনের উৎসেচক নিয়ন্ত্রণ যৌগ

(vi) প্যাথোজেনের উৎসেচকের ক্ষমতা হ্রাস

(vii) ছত্রাকনাশক যৌগের উৎপাদন

(viii) প্যাথোজেনের অধিবিষের কার্যকারিতা হ্রাস

(ix) কৃত্রিম প্রণোদিত সুরক্ষা

13.4 সারাংশ

13.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

13.6 উত্তরমালা

13.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য :

পরিবেশে প্রতিনিয়ত আমরা কতশত সংক্রামক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চলেছি। তথাপি কম বেশি ক্ষতি সহ্য করে অথবা আদৌ কোন ক্ষতির মুখোমুখি না হয়েই আমরা আমাদের অঙ্গ সংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্য্যাবলীকে মোটামুটি অবিকৃত রাখতে পারি বলেই সুস্থ থাকি। ঠিক তেমন ভাবেই একটি উদ্ভিদ প্রকৃতিতে নেহাৎ স্বাভাবিক অবস্থাতেই অন্ততঃ শতাধিক সংক্রামক জীবাণু যথা ভাইরাস, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নিমাটোড ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর প্রতিটিই যদি রোগলক্ষণের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় তাহলে উদ্ভিদজগৎ সবুজ থাকার অবকাশ নেই বললেই চলে। কিন্তু আদতে তা হয় নি? একটি সুস্থ উদ্ভিদে এই সব জীবাণুর প্রভাবে কখনও কখনও সামান্য ক্ষতি হলেও হতে পারে। কিন্তু তাতে করে তার পুষ্টি, বৃদ্ধি, জনন ইত্যাদি মৌলিক জৈব প্রক্রিয়াগুলি বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অতএব মেনে নিতেই হয় যে মানুষ বা প্রাণীর মত উদ্ভিদেরও একটি দেহজ প্রতিরোধব্যবস্থা আছে যা এইসব সংক্রমণের হাত থেকে উদ্ভিদটিকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করছে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের প্রতিরক্ষার হাতিয়ার দুটি। প্রথমতঃ উদ্ভিদের গঠনগত কিছু বৈশিষ্ট্য যা তাকে এক ধরনের যান্ত্রিক দৃঢ়তা দেয়, যার ফলে সংক্রামকের অনুপ্রবেশ ও বৃদ্ধি প্রতিহত হয়। দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অথবা সংক্রামকের প্রভাবে কিছু জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে যার দরুণ প্যাথোজেনের বৃদ্ধি চূড়ান্তভাবে ব্যহত হয়। সুদক্ষ সেনানায়কের মত উদ্ভিদ নিজেই ঠিক করে নেয় কোন বিশেষ সংক্রামকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এই দুটি অস্ত্রাগারের ঠিক কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন। এও দেখা গেছে একই সংক্রামকের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের প্রতিরোধের ধরন ধারণ সেটির আক্রান্ত অংশ, আক্রান্ত কলা, উদ্ভিদটির বৃদ্ধির পর্যায়, বয়স, পুষ্টির যোগান ইত্যাদির নানা পরিস্থিতিতে নানারকম। মানুষের ক্ষেত্রেও জীবনের সমস্ত দশায় কি একইরকম অনাক্রমণ্যতা দেখা যায়? তা তো নয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রতিরোধী ভূমিকাকেটিকে আমরা আমাদের সমান্তরাল বলে ভেবে নিতে পারি, কেবল প্রতিরোধকের রকমফের তারা ভিন্নতর।

এই পর্যায়টিতে আমরা যেমন উদ্ভিদের স্বাভাবিক বা মৌলিক প্রতিরোধক ক্ষমতা সমূহের কথা আলোচনা করব তেমনি সংক্রমনের প্রতিক্রিয়াজনিত প্রতিরোধের কথাও জানতে পারব।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে উদ্ভিদে কোন কোন গঠন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- সংক্রামকের প্রভাবে কি ধরনের গঠনগত বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদদেহে প্রকাশিত হয় যার কাজ হল সংক্রমণ প্রতিরোধ— তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- কি কি বিপাকীয় পদার্থ উদ্ভিদকে তার জন্ম থেকে সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে—এ বিষয়ে ধারণা করতে পারবেন।
- সংক্রমণ জনিত কারণে উদ্ভিদদেহে নিঃসৃত যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ আত্মরক্ষায় উদ্ভিদকে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- ফেনলঘটিত যৌগের গুরুত্ব এবং ফাইটোঅ্যালেকসিন নামক ফেনলঘটিত যৌগসমূহের প্রতিরোধী ভূমিকার কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

13.2 গঠনগত সুরক্ষা (Structural mechanism) :

উদ্ভিদের যেসব গঠনগত বৈশিষ্ট্য প্যাথোজেনের অনুপ্রবেশ বা বিস্তারের পথে বাধাস্বরূপ সেগুলিকে দুটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। (a) *গঠনগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য* অর্থাৎ সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যা নিয়েই একটি উদ্ভিদ জন্মায় এবং (b) *সংক্রমণের প্রতিক্রিয়া জনিত বৈশিষ্ট্য* অর্থাৎ সংক্রামকের প্রভাবে যে সমস্ত বাধাদানকারী গঠন উদ্ভিদদেহে সৃষ্ট হয়।

13.2.1 গঠনগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য :

প্যাথোজেন দ্বারা সংক্রমণের পথে উদ্ভিদ প্রথম যে বাধার প্রাচীরটি খাড়া করে সেটি হল তার বহিঃত্বক (epidermis)। এই স্তরটিকে ভেদ না করে প্যাথোজেনের পক্ষে উদ্ভিদদেহে অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব নয়। প্রতিটি উদ্ভিদের বহিঃত্বকেই কোন না কোন উপাদান আছে যা সংক্রমণকে যথাসম্ভব প্রতিহত করার চেষ্টা করে এগুলি হলঃ

(i) বহিঃত্বকের বাইরের আবরণীতে উপস্থিত মোমজাতীয় পদার্থ (wax) ও কিউটিকলের (cuticle) পরিমান ও ধরন। পাতা ও ফলের গায়ে এই পদার্থগুলির উপস্থিতি একটি জলনিরোধী স্তর গড়ে তোলে যার উপর প্যাথোজেনের অঙ্কুরোদগম (ছত্রাক রেণুর ক্ষেত্রে) অথবা সংখ্যাবৃদ্ধি (ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে) অত্যন্ত অসুবিধাজনক। কচু বা আকন্দের পাতায় এই ধরনের পুরু জলনিরোধী স্তরের উপস্থিতি আমরা যে কোন সময় দেখতে পাই।

> **প্রান্তলিপি :** আকন্দ গাছের পাতায় যে সাদাটে আস্তরণটি আমাদের চোখে পড়ে তা ঘসলেই গুঁড়ো গুঁড়ো দানার মত শিথিল হয়ে যায়। এটি হল মোমের আসতরণ। যদিও এত পুরু মোম আস্তরণ সব গাছে দেখা যায় না তবুও বহু উদ্ভিদের ভূ-উপরিস্থ অংশের বহিরাবরণীতে কিউটিন নামক অন্য একটি রাসায়নিক পদার্থের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় মোম উপস্থিত থাকে এবং একত্রে এরা গঠন করে কিউটিকল নামক অত্যন্ত জলনিরোধী স্তর। কিউটিন এবং মোম দুটিই হল স্নেহজাতীয় পদার্থ। আমরা জানি স্নেহপদার্থ জলে দ্রাব্য নয়। তাছাড়া জলের সংস্পর্শে এলে এরা কোন রকম রাসায়নিক সংযোগ জলের অনুর সাথে গড়ে তোলে না ফলে জলতল কিউটিকল থেকে সম্পূর্ণ আলগা ভাবে থাকে। এই অবস্থান অস্থায়ী ফলে কিউটিকল আবরণীর উপর জলের আস্তরণ তৈরি হওয়া সম্ভব হয় না।

(ii) বহিঃত্বকের উপরিভাগে *রোম* (hairs) বা ঐ জাতীয় বহিঃবৃদ্ধির উপস্থিতির দরুণ সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ অঙ্গটি জল প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং সংক্রমণে বাধা দান করে। লাউ বা কুমড়ো পাতায় এই রকম ঘন রোমের স্তর লক্ষণীয়।

(iii) কোশপ্রাচীরের দৃঢ়তা বা স্থূলতা গঠনগত সুরক্ষার একটি বড় উপাদান। বহিঃত্বকের কোশপ্রাচীরের যে স্তর সরাসরি পরিবেশের সংস্পর্শে আসে সেই স্তরটি যদি যথেষ্ট যান্ত্রিক দৃঢ়তা সম্পন্ন হয় তাহলে প্যাথোজেনের পক্ষে সরাসরি অনুপ্রবেশ প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে সংক্রমণ যদি হয় তাহলে তা ক্ষতস্থানের মাধ্যমে হবার সম্ভাবনাই বেশি যদিও একবার অনুপ্রবেশ সাধিত হলে বহিঃত্বকের বাধা ভিতরের অপেক্ষাকৃত নরম কোশকলাকে কোন ভাবেই বাঁচাতে পারে না।

(iv) *পত্ররন্ধ্র*(Stomata) হল আর একটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমেই অনুপ্রবেশ সাধিত হয় আবার যা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ প্যাথোজেন বন্ধ পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়েই

অনুপ্রবেশের পথ করে নেয়। তবে কিছু কিছু প্যাথোজেন কেবল উন্মুক্ত পত্ররন্ধ্র পথেই সংক্রমণ ঘটায়। তাই গমের কোন কোন প্রকারভেদে দেখা গেছে পত্ররন্ধ্র খোলার সময়টি বেশ বেলার দিকে যখন রাত্রের শিশির, যা ছত্রাকের রেণুর অঙ্কুরোদগমের জন্য দরকারী আধার, দিনের সূর্যতাপে শুকিয়ে গেছে। ফলে সংক্রমণ ঘটানোর পক্ষে সব চাইতে জরুরী সময়কালে পত্ররন্ধ্র বন্ধ রেখে এই জাতীয় গমগাছের সুরক্ষাব্যবস্থা অবিরত তাদের রক্ষা করে চলেছে। এছাড়া পত্ররন্ধ্রের গঠন ও অবস্থান কোন কোন উদ্ভিদে এতটাই জটিল যে সেই পথে সংক্রমণ পরজীবির পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়। গমের ক্ষেত্রেই উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পত্ররন্ধ্রের ছিদ্রটি এত সরু এবং রক্ষী কোশ (guard cell) দ্বারা এত নিপুণভাবে আড়াল করা যে প্যাথোজেন অনেক সময়ই সেটির হদিশ পায় না। আবার করবী *(Nerium sp)* পাতায়, নিম্নত্বকে উপস্থিত পত্ররন্ধ্রগুলি গভীর প্রকোষ্ঠের মধ্যে একগুচ্ছ রোমের আড়ালে থাকার দরুণ একদিকে যেমন বাষ্পমোচনজনিত জল ক্ষয় কমানো যায় তেমনই প্যাথোজেনের পক্ষে সেটির হদিশ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। (চিত্র 13.1 দ্রষ্টব্য)।

(v) অর্ন্তগঠনে বিশেষ কলার (tissue) উপস্থিতি সংক্রমণের বিস্তারে উদ্ভিদের দিক থেকে গড়ে তোলা আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা। অনুপ্রবেশ সাধিত হয় বহিঃস্তকের মাধ্যমে। কিন্তু প্যাথোজেনের বিস্তার ঘটে পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ অর্ন্তভাগের কোশগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে সংক্রামক উপাদানটির পক্ষে সমগ্র উদ্ভিদদেহে ছড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে অর্ন্তভাগের কোশ যদি পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট, দৃঢ়, যান্ত্রিক কলা হয় তাহলে উদ্ভিদ অনেকটাই ক্ষতি এড়াতে পারে। এ ধরনের কলা বলতে আমাদের *স্ক্লেরেনকাইমার* (Sclerenchyma) কথাই সবচেয়ে আগে মনে আসে। কান্ডের জাইলেম কলায়, *বান্ডিল টুপি* (bundle cap) অংশে, পাতার *শিরাস্বক* (vein) কলায় স্ক্লেরেনকাইমার উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদকে একটি অত্যন্ত কার্যকরী সুরক্ষা প্রদান করে (চিত্র 13.2)।

> প্রান্তলিপি : উদ্ভিদের যে কোশে লিগনিন ঘটিত পুরু প্রাচীর দেখা যায় সেই কোশগুলিই তাদের যান্ত্রিক সুরক্ষার ভিত্তি। এমন পুরু প্রাচীর সরল কলার মধ্যে কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা জাতীয় কোশে এবং জটিল কলার মধ্যে ট্রাকীড, ট্রাকীয়া, জাইলেম ও ফ্লোয়েম তন্তু ইত্যাদি কোশে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে স্ক্লেরেনকাইমার স্তর বিন্যাস এমনভাবে হয় যাতে উদ্ভিদের উপর বাইরে থেকে চাপ বা উদ্ভিদের নিজের শাখা প্রশাখার চাপ কেন্দ্রীয় স্তম্ভে ন্যূনতম হয়।' বাড়ি তৈরির কংক্রীট স্তরে লোহার রডের ভূমিকা যেমন, বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের কান্ডে স্ক্লেরেনকাইমার ভূমিকা ঠিক তেমনই।

13.2.2 সংক্রমণের প্রতিক্রিয়াজনিত সুরক্ষা (Defence induced by the Pathogen) :

পূর্বে উল্লিখিত গঠনগত বাধা সমূহকে অতিক্রম করেও অনেক প্যাথোজেন যে সংক্রমণ ঘটাতে পারে এটা সত্য। প্যাথোজেনের কার্যকারিতা, পোষকে সংক্রামিত হবার প্রবণতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ঠিক কতটা ক্ষতি এই সংক্রমনের ফলে সাধিত হতে পারে, তবে এ সব ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মাথায় রাখা দরকার। প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হবার পরও পোষক উদ্ভিদের দেহে এমন একাধিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে শুরু করে যে তা প্যাথোজেনের বিস্তারে যথেষ্ট বাধারূপে প্রতিপন্ন হয়। সংক্রমণ যখন এই সমস্ত গঠনগত পরিবর্তন আনয়নের কারণরূপে বিবেচিত হয় তখন আমরা এই সব বৈশিষ্ট্যকে *সংক্রমণের প্রতিক্রিয়াজনিত গঠনগত সুরক্ষা* বলে অভিহিত করতে পারি। এই গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা দুটি মুল ভাগে ভাগ করতে পারি। কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে

প্যাথোজেন আক্রান্ত অঞ্চল থেকে গভীরতর কোশকলায় (Tissue) যাতে সংক্রমণ বিস্তৃত হতে না পারে। এই সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা **কলাশ্রয়ী সুরক্ষা** (Histological Defense Structures) রূপে চিহ্নিত করতে পারি। অপর কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় আক্রান্ত কোশের ভিতরে—মূলতঃ আক্রান্ত কোশটির কোশ প্রাচীরের কিছু বৈশিষ্ট্য এই পর্যায়ে লক্ষ্যণীয়। এটিকে আমরা কোষাশ্রয়ী সুরক্ষা (Cellular Defense Structures) বলে জানি। কোশের কোশ প্রাচীর ঘিরে রাখে তাই সাইটোপ্লাজমকে। সংক্রামিত কোশের সাইটোপ্লাজমে যে কোন প্রণোদিত বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবকে আমরা **সাইটোপ্লাজমীয় সুরক্ষা** (Cytoplasamic Defense Reaction) বলে চিহ্নিত করতে পারি। উপরোক্ত তিন রকম বৈশিষ্ট্যই দেখা দেয় সজীব কোশে বা কলায়, কিন্তু আক্রান্ত কোশের মৃত্যুও অনেক সময় অর্ন্তভাগের জীবিত কোশকে সংক্রমণের হাত থেক বাঁচিয়ে দেয়। পোষক যখন সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত কোশের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে তখন সেই সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা **অতিসংবেদনশীলতা** (Hypersensitivity) নামে অভিহিত করতে পারি।

(ক) কলাশ্রয়ী সুরক্ষা (Histological defense) ঃ

- **কর্ক স্তরের গঠন (Formation of Cork layers) ঃ** ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা নিমাটোড দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদে সংক্রামিত অঞ্চলের ঠিক নীচে একাধিক কর্ক কোশের স্তর গঠিত হতে দেখা যায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্যাথোজেন নিঃসৃত কোন পদার্থই কোশকে বিভাজিত হয়ে এই বিশেষ ধরনের প্রতিরক্ষাকারী কলা নির্মাণে প্রণোদিত করে। এই কলা যে প্যাথোজেনের বিস্তারে বাধা দেয় তা নয়, প্যাথোজেন দ্বারা সৃষ্ট কোন অধিবিষও এই স্তর অতিক্রম করে অন্তভাগের কোশগুলির অঙ্গহানি ঘটাতে পারে না। এছাড়া কর্ক স্তর পোষক দেহের সংক্রামিত অঞ্চলকে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করে ফেলে যে সেই অঞ্চলে জল বা পৌষ্টিক পদার্থের চলাচল বধ হয়ে যায়। যার ফলস্বরূপ প্যাথোজেন সংক্রমণ ঘটানোর যেটা মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ পুষ্টি আহরণে ব্যর্থ হয় (চিত্র 13.3 ও 13.4)। *আলুর কন্দে* (Tuber) এইরকম সীমাবদ্ধ সংক্রমণ প্রায়ই চোখে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে সংক্রামিত অংশটি একটি পচনশীল ক্ষতরূপে আক্রান্ত কন্দের একটি ক্ষুদ্রতর অংশে থেকে যায় এবং বাকী অংশ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত থাকে। আপেল গাছের পাতায় বা ফলে *Venturia inaequalis* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই একই রকম প্রতিক্রিয়া একটি ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত অংশ প্রথমে কর্ক স্তর দ্বারা সীমাবধ হয় এবং এরপর ভিতরের সুস্থ কোশের বৃদ্ধির কারণে মূল উদ্ভিদদেহ থেকে খসে পড়ে। এভাবে উদ্ভিদ প্যাথোজেনের হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পায়।

> প্রান্তলিপি ঃ কর্ক স্তর সৃষ্টি হয় কর্ক ক্যাম্বিয়াম নামক একটি ভাজক কলা স্তর থেকে। কর্ক ক্যাম্বিয়াম বস্তুতঃপক্ষে স্থায়ী কর্টেক্স স্তরের কলা যা পরিণত উদ্ভিদে ভাজক কলার বৈশিষ্ট্যগুলি লাভ করে নতুন নতুন কোশস্তর সৃষ্টি করে চলে। কর্ক ক্যাম্বিয়াম দ্বারা সৃষ্ট স্তরকেই বলা হয় কর্ক স্তর।
> কর্কস্তর যখন উদিভদের কাণ্ড বা মূলের বহিঃত্বক (epidermis) কে প্রতিস্থাপিত করে গৌণ ভাজক কলা দ্বারা গঠিত নতুন একটি সুরক্ষা প্রদানকারী বহিরাবরণী গঠন করে তখন তাকেই বলে পেরিডার্ম।

- **পতন স্তর নির্মাণ (Formation of Abscission layers) ঃ** উদ্ভিদের পাতা বা ফল বৃদ্ধির অন্তিম পর্যায়ে আপনি খসে পড়ে এ আমরা সবাই জানি। কিন্তু খসে পড়ার পূর্বে মূল উদ্ভিদদেহ থেকে পাতা বা

ফলটি একটি স্তর দ্বারা পৃথকীভূত হয়ে যায়। একে বলে Abscission layer বা পতন স্তর। এই কারণে কাঁচা ফলকে টেনে ছিঁড়তে হয় কিন্তু পাকা ফলটি বৃন্ত থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাতা বা ফল খসে পড়া উদ্ভিদের বৃদ্ধির একটি জরুরী পর্যায় যার মাধ্যমে সেটি রেচন পদার্থ দেহ থেকে অপসারিত করে অথবা বীজ বিস্তার করে। এই পূর্ণতা নির্ধারক স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি কখনও কখনও আক্রান্ত উদ্ভিদের অতি কচি পাতায় বা অপরিপক্ক ফলে লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরের নির্মাণকে আমরা সংক্রমণের প্রতিক্রিয়া বলে সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। সংক্রমণ যেখানে ঘটে সেই অংশে দুই স্তর কোশের মাঝখানে একটি ফাঁকা অংশের আবির্ভাবই পতন স্তরের সূচনা ঘটায়। আসলে প্যাথোজেনের প্রভাবে দুটি কোশের মাঝখানে মধ্যচ্ছদা অবলুপ্ত হয়ে এই ফাঁকা অংশের আবির্ভাব। এরপর লম্বালম্বিভাবে পুরো পত্রবৃন্তে বা ফলবৃন্তে প্রস্থ বরাবর এই ফাঁকটুকুর প্রসার ঘটে অর্থাৎ ক্রমশঃ এই স্তরটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় (চিত্র 13.5) ক্রমশঃ এই অংশটি বা স্তরটি একটি যান্ত্রিক বাধার মত সুস্থ উদ্ভিদদেহ থেকে আক্রান্ত পাতার ফলককে (lamina) বা ফলটিকে পৃথক করে দেয় যাতে সেই অংশে কোন পরিপোষক না পৌঁছায় এবং সেটি মরে গিয়ে খসে পড়ে। এইভাবে উদ্ভিদ পূর্ণতাপ্রাপ্ত পাতার সাথে সাথে অত্যন্ত নবীন অথচ আক্রান্ত পাতাকেও খসিয়ে দিয়ে সংক্রমণকে মূল উদ্ভিদ দেহ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখে। *আপেল (Malus sp)*, *ন্যাসপাতি (Pyrus sp)* ইত্যাদি অর্থকরী উদ্ভিদের পাতায় সংক্রমণের ফলে পতন স্তরের নির্মাণ একটি পরীক্ষিত ঘটনা।

প্রান্তলিপি : দ্বিবীজপত্রী কাষ্ঠল উদ্ভিদের দেহে গৌণ বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়। গৌণ বৃদ্ধির ফলে নতুন নতুন সংবাহী কলা কঠিত হয় যাদের বলে গৌণ জাইলেম ও গৌণ ফ্লোয়েম। ক্রমান্বয়ে গৌণ জাইলেম গঠিত হতে থাকলে উদ্ভিদের জল শোষণের হারও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবার কথা। এই জলের অধিকাংশই উদ্ভিদের নিজের কোন কাজে লাগে না। তাই এই অপচয় রোধ করতে অপেক্ষাকৃত প্রবীণতর জাইলেম বাহিকার ট্র্যাকীয়াগুলির কার্যকারিতা উদ্ভিদ নিজেই বন্ধ করে দেয় টাইলোসেস গঠন করে। এগুলি হল ট্র্যাকীয়ার পার্শ্ববর্তী কোশ জাইলেম প্যারেনকাইমার একধরনের বহির্বৃদ্ধি বা ট্র্যাকীয়ার কূপগুলির মধ্য দিয়ে ট্র্যাকীয়া গহ্বরে প্রবেশ করে এবং বেলুনের মত ফুলে উঠে গহ্বরটির মাধ্যমে জল চলাচলের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়।

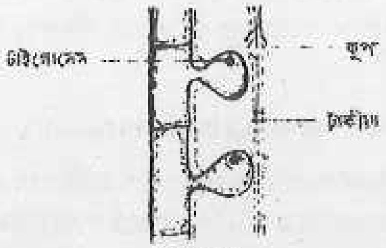

টাইলোসেস

- **টাইলোসিস (Tyloses Formation) গঠন** : উদ্ভিদের সংবাহী নালিকার মূল উপাদান দুটি— একটি হল জাইলেমের *ট্র্যাকীয়া* (Trachea or Vessel) ও *ট্র্যাকিড* (Trachied) আর অপরটি হল ফ্লোয়েমের সীভ নল (Sieve tube), এর মধ্যে প্রথমোক্ত বাহিকাদ্বয় জল সংবহন করে এবং মূল থেকে পাতায় অবিচ্ছিন্ন জল সংবহনের জন্য সবচাইতে প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে উদ্ভিদ যখন পরিবেশগত বা সংক্রমণগত কারণে কোন *পীড়ন* বা *টান* (Stress and strain) অনুভব করে তখন বিশেষতঃ ট্র্যাকীয়ার মধ্যে টাইলোসিস নামে বেলুন সদৃশ স্ফীত অংশের আবির্ভাব ঘটে। এগুলি বস্তুতঃ পক্ষে জাইলেম প্যারেনকাইমা কোশের প্রোটোপ্লাস্ট অংশের বৃদ্ধিসঞ্জাত উপবৃদ্ধি যা ট্র্যাকীয়ার গায়ে উপস্থিত কূপের মাধ্যমে ট্র্যাকীয়ার মূল বাহিকা-গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ আয়তনে বেড়ে গিয়ে বা পরস্পরের সাথে মিশে গিয়ে জল সংবহন

পদ্ধতিটিকেই বাধা দেয়। (চিত্র 13.6)। সংক্রামিত উদ্ভিদের মূল আক্রান্ত হলেই কাণ্ডের জাইলেমে টাইলোকেক এর সৃষ্টি হবার ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি সংক্রমণকে বিস্তৃত হবার পথে বাধা তৈরি করাই এই বিশেষ অংশগুলি নির্মাণের উদ্দেশ্য। এমনকি ট্র্যাকীয়া প্রতি টাইলোসেসের সংখ্যা বা ঘনত্ব একটি উদ্ভিদের *প্রতিরোধক্ষমতা* (Resistance) ও *রোগ প্রবণতার* (Susceptibility) সাথে সমানুপাতিকভাবে যুক্ত।

- গঁাদ জমা হওয়া (**Deposition of Gums**) ঃ আক্রান্ত অংশে প্যাথোজেন দ্বারা সংক্রামিত কোশগুলি থেকে গঁদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা হবার ঘটনা বহু উদ্ভিদে পরিলক্ষিত হয়। *Physalospora cydoniac* নামক ছত্রাকের সংক্রমণে আপেল গাছের কাণ্ডে এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে গঁদের প্রতিরোধী ভূমিকাটি পরোক্ষ। এই গঁদ কোশান্তররন্ধ্রে ও সংক্রামিত অংশের ঠিক আশেপাশের কোশগুলিতে জমা হয়ে এমন একটি দুর্ভেদ্য বাধা সৃষ্টি করে যাকে পার হওয়া প্যাথোজেনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব (চিত্র 13.7)।

> প্রান্তলিপি ঃ গঁদ ও রজন হল উদ্ভিদকোশের নাইট্রোজেনবিহীন বর্জ্য পদার্থ। রজনের উদাহরণ হল লাক্ষা, গালা, তার্পিন, হিঙ, ধুনা ইত্যাদি। এদের মধ্যে লাক্ষা, গালা, কঠিন রজন, তার্পিন বা কানাডা বালসাম তরল রেজিন। অপর এক প্রকার রজন হল গঁদ রজন যার উদাহরণ হিঙ। রজন জলে নয়, ইথার বা কোহলে দ্রাব্য। গঁদ তৈরি হয় মৃত কোশের কোশ প্রাচীর থেকে। গঁদ জলে দ্রাব্য। বাবলা গাছ থেকে প্রাপ্ত আঠা এর উদাহরণ। উভয় প্রকার বর্জ্য পদার্থেরই বহু ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে।

(খ) কোশাশ্রয়ী সুরক্ষা (Cellular defense) ঃ

প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত কোশের কোশ প্রাচীরে যে সব পরিবর্তন সাধিত করে উদ্ভিদ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে তাকে কোশাশ্রয়ী সুরক্ষা নামে অভিহিত করতে পারি। তিন ধরনের পরিবর্তন সাধারণতঃ চোখে পড়েঃ

- ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত প্রতিরোধী উদ্ভিদের প্যারেনকাইমা কোশের কোশ প্রাচীর স্ফীত হয়ে যায় এবং এক ধরনের সূত্রাকার, অনিয়ত (fibrillar and amorphous) পদার্থ সংশ্লেষিত করে যা ব্যাকটেরিয়াটিকে ঘিরে একটি ফাঁদ বা trap গঠন করে। এই কারণে ব্যাকটেরিয়ার বংশবিস্তার অর্থাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিহত হয় এবং উদ্ভিদটি রক্ষা পায়।

- ছত্রাক ও ভাইরাসঘটিত সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রতিরোধী উদ্ভিদের কোশ প্রাচীর পুরু হয়ে ওঠে ফলে জীবাণুর বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ স্ক্যাব ছত্রাক *Clodosporium cucumerinus* দ্বারা আক্রান্ত শশা গাছের কথা বলা যায়। এক্ষেত্রে কোশ প্রাচীর সংক্রমণজনিত কারণে অতিরিক্ত সেলুলোজ জমা হবার ফলে অনেক পুরু হয়ে ওঠে এবং শুধু তাই নয় কোশ প্রাচীরে *ফেনল* (Phenol) ঘটিত পদার্থ জমা হবার কারণে ছত্রাককে পুরোপুরি অকার্যকারী করে ফেলতে পারে।

> প্রান্তলিপি ঃ ফ্লোয়েম এর গঠনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান হল সীভ নল, সীভ নল এর ছাঁকনির মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তু এক কোশ থেকে অন্য কোশে যাতায়াত করে। কখনও কখনও এই ছাঁকনির ছিদ্র ক্যালোজ দ্বারা গঠিত এক ধরনের ঢাকনি দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ক্যালোজ হল এক ধরনের কার্বহাইড্রেট এবং সেখান থেকে ক্যালাস নামটি এসেছে। ফ্লোয়েম এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই উদ্ভিদ দেহে এই অদ্ভুদ ব্যবস্থা। প্রয়োজনমত এই ক্যালাস ঢাকনি উৎসেচকের সাহায্যে অপসারিত করে উদ্ভিদ নিম্নমুখী পরিবহনের হার বাড়িয়ে নিতে পারে।

- কোশ প্রাচীরের ভিতরের দিকে গঠিত হওয়া *ক্যালোজ প্যাপিলা* (Callose papilla) কোশাশ্রয়ী প্রতিরক্ষার আর একটি চমৎকার উদাহরণ। ক্যালোজ হল একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক যৌগ যা উদ্ভিদের ক্ষতস্থানকে বিপদমুক্ত রাখে। ক্ষত সৃষ্টি হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সংবেদনশীল কোশে ক্যালোজ জমা হতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তল বিন্দু সদৃশ এই ক্যালোজস্তরকে বলা হয় *ক্যালোজ প্যাপিলা*। সংক্রামিত কোশের ক্ষেত্রে বীজায়নের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এই প্যাপিলা গঠিত হয় এবং কোশকে অনুপ্রবেশজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। অনেকক্ষেত্রে ছত্রাকের অনুসূত্র কোশের অন্তর্ভাগে অনুপ্রবেশের সাথে সাথেই সেই অনুসূত্রের প্রান্তভাগকে ঘিরে গড়ে ওঠে একটি ক্যালোজ স্তর (চিত্র 13.8)। অচিরেই এই স্তরে ফেনলঘটিত পদার্থ জমা হয়ে তা অনুসূত্রকে ঘিরে রাখা একটি প্রতিরোধী আবরণীর রূপ পরিগ্রহ করে। এই আবরণী বা Sheath অনেক সময় *লিগনিটিউবার* (Lignituber) নামে পরিচিত কেন না আবরণীটির অন্যতম উপাদান হল লিগনিন।

> **প্রান্তলিপি :** ছত্রাকের বৃদ্ধির পক্ষে বাধাদানকারী পদার্থ দু'ভাবে কাজ করতে পারে। কোন রাসায়নিক পদার্থ ছত্রাক কর্তৃক শোষিত হবার পর ছত্রাকের কোশদেহ বা হাইফায় তা বহুবিধ প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ায় বাধা দান করে। ফলে ছত্রাকটির মৃত্যু ঘটে। ছত্রাকনাশক বলতে আমরা এমন পদার্থই বুঝি। অপরপক্ষে অন্য কোন রাসায়নিক এর প্রভাবে ছত্রাকটির মৃত্যু না ঘটলেও সেটির বৃদ্ধি এবং বিস্তার বন্ধ হয়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে পদার্থটি ছত্রাক দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পদার্থটি ছত্রাক দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেটির উপস্থিতি একটি বিপরীতধর্মীতার সৃষ্টি করে ফলে ছত্রাকনাশক না হয়েও সেটি ছত্রাকনিরোধী। একই পদার্থ কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক ও আর একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছত্রাকনিরোধী হতে পারে।

(গ) সাইটোপ্লাজমীয় সুরক্ষা (Cytoplasmic Defense Reactions) :

খুব দুর্বলভাবে সংক্রমণশীল কিছু ছত্রাকের ক্ষেত্রে হাইফা বা অনুসূত্র কোশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের পর আক্রান্ত কোশের সাইটোপ্লাজম সেটিকে ঘিরে একটি মণ্ড (clump) সদৃশ আস্তরণ তৈরি করে। এর ফলে সাইটোপ্লাজম দুটি স্তরে বিভেদিত হয়ে যায়, যার একটি থাকে সংক্রামিত অনুসূত্রের চারপাশে এবং অপরটি থাকে এই মণ্ডটিকে ঘিরে। কোশের নিউক্লিয়াসও দ্বিখণ্ডিত হয়ে সাইটোপ্লাজমের এই দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজমের এই প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক বাধাপ্রদানে সক্ষম হলেও ছত্রাকের বৃদ্ধিকে বাধা দিতে অক্ষম, ফলে অণুসূত্রের বৃদ্ধির সাথে সাথে এই মণ্ডটিও অন্তর্হিত হয়। তবে অন্য কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সাইটোপ্লাজমের মণ্ডটি এবং নিউক্লিয়াসের আয়তন দুই-ই বৃদ্ধি হয়। সাইটোপ্লাজমে দানাদার পদার্থ জমা হবার ফলে সেটি আরও ঘনত্ব লাভ করে। এর মধ্যে বহুসংখ্যক বৃদ্ধি নিরোধী পদার্থ জমা হয় যা অণুসূত্রকে অকার্যকরী করে ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে নিয়ে যায় ফলে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়।

(ঘ) অতিসংবেদনশীলতা (Hypersensitive response) :

আক্রান্ত কোশের অতিসংবেদনশীলতা কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী সুরক্ষা। কোশপ্রাচীর ভেদ করে প্যাথোজেন কোশগহ্বরে অনুপ্রবেশের সাথে সাথেই কোশের নিউক্লিয়াস সেটির কাছাকাছি চলে আসে এবং অবলুপ্ত হয়। বাদামীবর্ণের দানারূপে খণ্ডিত নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমে সঞ্চিত হয় প্রথমে কেবলমাত্র প্যাথোজেনকে ঘিরে এবং অবিলম্বে সমস্ত সাইটোপ্লাজম জুড়ে। সাইটোপ্লাজমের এইরকম বাদামী বর্ণ ধারণ কোশের মৃত্যু ঘটায় তো বটেই কিন্তু তার থেকেও জরুরী কথা হল, কোশের সাথে সাথেই অনুপ্রবেশকারী ছত্রাকটির মৃত্যু ঘটে (চিত্র 13.9)। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে অতিসংবেদনশীল উদ্ভিদের পাতার ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। আক্রান্ত পাতার কোশের সমস্ত

কোশীয় অঙ্গাণুই অবলুপ্ত হয় ফলে আক্রান্ত অঞ্চল অথবা সমস্ত পাতাটিই একটি *পচনশীল অঞ্চলে* (Necrotic lesion) পরিণত হয় যার স্থানিক সীমাবদ্ধতা উদ্ভিদের বাকী অংশকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

এই সুরক্ষাব্যবস্থা পূর্ণপরজীবি ছত্রাক, ভাইরাস এবং নিমাটোড ঘটিত সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রায়ই কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়। সংক্রামককে পচনশীল অংশে সীমাবদ্ধ রেখে সেটিকে খাদ্য ও পুষ্টির যোগান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে উদ্ভিদ সংক্রামককে প্রথমে অপুষ্টি এবং পরে মৃত্যুর শিকার করে ফেলে। কত তাড়াতাড়ি আক্রান্ত কোশের মৃত্যু হবে তার উপর এই সুরক্ষার কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

অনুশীলনী - 1

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(a) প্যাথোজেনের পথে উদ্ভিদ প্রথম যে বাধাটি খাড়া করে সেটি হল তার ________ যা ________ ও ________ 'এর সমন্বয়ে একটি জলনিরোধী আস্তরণ গড়ে তোলে।

(b) ________ হল একটি সরল উদ্ভিদ কলা যা উদ্ভিদকে যান্ত্রিক সুরক্ষা দানে সক্ষম। কাণ্ডের ________ এবং পাতার ________ কলায় এই কলার অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

(c) সংক্রমণের প্রতিক্রিয়াজনিত সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ________ ভাগে ভাগ করা যায় এবং যেগুলি হল ________।

2. নিম্নের দুই সারিতে যথাক্রমে প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। তাদের সঠিকভাবে মেলানোর চেষ্টা করুন।

প্রতিক্রিয়া	ফলাফল
(a) মধ্যচ্ছদার অবলুপ্তি	(i) কর্ক স্তর গঠন
(b) প্রণোদিত কোশ বিভাজন	(ii) টাইলোসেস
(c) ট্র্যাকীয়ার অর্ন্তভাগে উপবৃদ্ধি গঠন	(iii) পতন স্তর গঠনের সূচনা
(d) ক্যালোজ জমা হওয়া	(iv) অতিসংবেদনশীলতা
(e) আক্রান্ত কোশের মৃত্যু	(v) লিগনিটিউবার

3. উদ্ভিদের গঠনগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও সংক্রমণের প্রতিক্রিয়াজনিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে তিনটি পার্থক্য নির্দেশ করুন।

(a) ____

(b) ____

(c) ____

13.3 রাসায়নিক বিপাকীয় সুরক্ষা (Biochemical defense and metabolism) :

উদ্ভিদ রোগবিদ্যার বৈজ্ঞানিক চর্চার ক্ষেত্রটি যতই প্রসারিত হয়েছে ততই আমরা জানতে পেরেছি যে সুরক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা যদিও গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবুও সংক্রমণ প্রতিরোধে উদ্ভিদ নিজস্ব বিপাকীয় অস্ত্রগুলির উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। একটি প্রতিরোধী প্রজাতির উদ্ভিদ যদি কোন বিশেষ গঠনগত প্রতিরক্ষা প্রদানে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম হয় তবুও সেটি প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কেননা কোন গঠনগত বাধা না পেলেও প্যাথোজেন ঐ প্রজাতির বিপাকীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারাই বাধাপ্রাপ্ত। আমরা আগেই জেনেছি রোগের প্রকাশ একই সাথের সংক্রামকের ক্ষমতা এবং পোষকের আক্রান্ত হবার প্রবণতা এই দুইয়ের যোগফল। সঠিক উদ্ভিদের সাথে *সংযোগসাধন* (attachment), তার সাথে পরিচিতি নির্ণায়ক বৈশিষ্টগুলিকে *চিনতে* পারা (recognistion) ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে অথবা মূলতঃ রাসায়নিক বিপাকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যখন প্যাথোজেনের পক্ষে অনুকূল তখনই সেটি পোষক দেহে আশ্রয় পায় এবং বৃদ্ধি লাভ করে। তাই যখন কোন প্যাথোজেন স্বাভাবিকভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে কোন অপোষক (non-host) উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে তখন সেটি সংক্রমণ ঘটাতে পারে না। যদি আক্রান্ত উদ্ভিদে কোন বাধাদানকারী গঠন নাও থাকে তাহলেও পারে না। এই দৃষ্টান্তগুলিই প্রমাণিত করে প্রতিরোধের ক্ষমতাটি উদ্ভিদের রাসায়নিক বা বিপাকীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা যতটা নিয়ন্ত্রিত গঠনগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা ততটা নয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই কোন কোন প্রজাতিকে, কোন কোন *প্রকরণকে* (variety) বিশেষ বিশেষ প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয় কিন্তু এই ক্ষমতাগুলিকে সার্বজনীন ভাবলে ভুল হবে। অর্থাৎ অন্য কোন প্যাথোজেনের ক্ষেত্রে ঐ একই উদ্ভিদের একই রকম বিপাকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কার্যকরী না ও হতে পারে। তাই রোগপ্রতিরোধী প্রজাতি বলতে আমরা কোন একটি বিশেষ প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পন্ন করে প্রজাতিকে বোঝাই।

13.3.1 রাসায়নিক বিপাকীয় মৌলিক সুরক্ষা ব্যবস্থা :

উদ্ভিদ জন্ম থেকেই যে সমস্ত সহজাত বিপাকীয় বৈশিষ্ট নিয়ে জন্মায় এই সুরক্ষা ব্যবস্থা তারই অন্যতম উপাদান।

- **পরিবেশে উদ্ভিদ দ্বারা ক্ষরিত বৃদ্ধি নিরোধী পদার্থের উপস্থিতি (Inhibitors Released by the Plant in its Environment) :** উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের বহিঃআবরণী থেকে বহু রকমের পদার্থ নিসৃত হয় যার মধ্যে মাটির তলায় মূলকে সুরক্ষা প্রদানকারী রাসায়নিক পদার্থ যেমন আছে, তেমনই আছে ভূ-উপরিবর্তী বীটপ অংশকে রক্ষাকারী পদার্থ। আগেই বলা হয়েছে রাসায়নিক পদার্থগুলির ভূমিকা সংক্রামকের উপর

নির্ভরশীল। কোন বিশেষ প্যাথোজেনের ক্ষেত্রে সেগুলির কার্যকারিতা সন্দেহাতীত যদিও সব প্যাথোজেনই তাতে অবদমিত হয় তা নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় টম্যাটো, বীট ইত্যাদি উদ্ভিদের কথা। এগুলির পাতা থেকে এমন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিসৃত হয় যা ছত্রাকের পক্ষে বিষবৎ (Fungitoxic) *Botrytis Sp* নামক ছত্রাকের রেণুর অঙ্কুরোদগম তথা বৃদ্ধি এই পদার্থটির উপস্থিতিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ পাতা থেকে বৃষ্টি বা শিশিরবিন্দুর মারফৎ পরিবেশে এসে জমা হয় এবং উদ্ভিদের সংলগ্ন মাটি ও পারিপার্শ্বকে এই বিশেষ ছত্রাকটির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে।

পিঁয়াজের রোগপ্রতিরোধী প্রজাতিগুলির শল্কপত্র অপেক্ষাকৃত বেশি লাল বর্ণের হয়ে থাকে। অতিরিক্ত লাল রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি ছাড়াও লক্ষ্যণীয় বিষয় হল অতিরিক্ত *ক্যাটেকল (Catechol)* নামনক রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি। এর ফলে *Colletotrichum circinans* নামক ছত্রাক অকার্যকরী প্রতিপন্ন হয়। *ক্যাটেকল (Catechol)* এবং সংশ্লিষ্ট আরও দু একটি বিপাকীয় পদার্থ পরিবেশে জমা হয়ে ছত্রাকনিরোধী একটি পরিমন্ডল তৈরি করে যার মধ্যে ঐ ছত্রাকটির (এটি পিঁয়াজের smudge রোগ সৃষ্টি করে) রেণু বা কনিডিয়ার অঙ্কুরোদগম অসম্ভব। সাদা শল্কপত্রবিশিষ্ট পিঁয়াজে এই পদার্থগুলি না থাকার দরুন সেইগুলি সহজেই আক্রান্ত হয়।

- আবশ্যিক পদার্থের অনুপস্থিতি সঞ্জাত প্রতিরোধ (Defense through lack of essential factors) ঃ আগেই বলা হয়েছে, সংক্রমণ হল প্যাথোজেন এবং পোষকের মধ্যে সঠিক পরিচিতি স্থাপনের (recognition) ফলাফল। একটি উদ্ভিদের বহিরাবরণীতে বিশেষ বিশেষ প্যাথোজেনের *পরিচিতি জ্ঞাপক উপাদানের* (recognition factor) অনুপস্থিতি সেই সেই প্যাথোজেনের প্রতি উদ্ভিদটিকে প্রতিরোধী করে তোলে। এই উপাদানটির অনুপস্থিতিতে সংযোগ স্থাপিত নাও হতে পারে বা *সংযোগ* (attachment) পরবর্তী বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হবার সুযোগ পায় না। যেমন, প্যাথোজেন সংক্রমণে সহায়তাকারী উৎসেচকগুলি সংশ্লেষ করে না, অ্যাপ্রেসোরিয়াম তৈরি করে না, চোষক তৈরি করতে পারে না ইত্যাদি। ঠিক কোন কোন অণু বা যৌগ এই উপাদান গঠন করে তা ভাল করে জানা যায় না তবে বিভিন্ন ধরনের শর্করা ও প্রোটিন এই পরিচিতি জ্ঞাপক সিগন্যাল হিসাবে কাজ করে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি *গ্লাইকোপ্রোটিন* যার নাম হল *লেকটিন* (Lectin)।

পোষকের বহিরাবরণীর কোশগুলিকে উপস্থিত অধিবিষ গ্রহীতা অণুর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। *অধিবিষ* (Toxin) গুলি সাধারণতঃ পোষক বিশেষে ক্রিয়াশীল হয়। সেক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট অধিবিষ (Toxin) পোষকগাত্রে তার নির্দিষ্ট *গ্রহীতাকে* (receptor) চেনে বলে অধিবিষটি তার কার্যকারিতা প্রমাণ করার সুযোগ পায়। যে প্রজাতিতে এই গ্রহীতা অংশ নেই সেই প্রজাতি অধিবিষের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

প্যাথোজেনের পক্ষে দরকারী কোন পৌষ্টিকের পদার্থের অভাব অনেক সময় কোন উদ্ভিদকে প্রতিরোধী করে তোলে। যেমন Rhizoctonia নামক ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদে সফল সংক্রমণ হয় তখনই যখন আক্রান্ত কোশ এমন কোন বিপাকীয় পদার্থ সংবরাহ করে যা একটি *অণুসূত্র স্তর* (hyphal cushion) গঠনে আবশ্যক। এই স্তর থেকে তৈরি হয় অনুপ্রবেশকারী হাইফা। প্রতিরোধী প্রজাতি এই কোশীয় উপাদানটি তৈরি করতে অক্ষম। এই অক্ষমতা প্যাথোজেনকে একটি আবশ্যিক উপাদান থেকে বঞ্চিত করেছে। আবার কোন

কোন সংক্রমণে বিশেষ বিশেষ বিপাকীয় পদার্থের ঘনত্ব সংক্রমনের প্রাবল্য নির্ধারণ করে। যেমন আলুর *নরম পচন* (soft rot) যা Erwinia carotovora নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে হয়ে থাকে, তা অনেক কম মাত্রায় প্রকাশ পায় যখন আলুকে বিজারক শর্করার (যেমন, শ্বেতসার) পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। আলুতে শ্বেতসারের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে সংক্রমণের প্রাবল্যও বৃদ্ধি পায়।

- **সংক্রমণের পূর্বেই বৃদ্ধি নিরোধী পদার্থের উপস্থিত** (Iinhibitors present in plant cells before infection) : বিভিন্ন ফেনল ঘটিত পদার্থ, ট্যানিন ইত্যাদির উপস্থিতিতে অনেক সময় কচি পাতা, অপরিপক্ব ফলের রোগ প্রতিরোধের কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সমস্ত পদার্থগুলির উপস্থিতিতে কোশপ্রাচীর-বিশ্লেষক উৎসেচক, প্রোটিন-বিশ্লেষী উৎসেচক ইত্যাদি অকার্শকরী। পরিপক্বতা অর্জনের সাথে সাথে বৃদ্ধি নিরোধী পদার্থগুলির পরিমাণ কমে যায় এবং তাদের *রোগ প্রতিরোধক্ষমতা* ও (resistance) কমে যায় এই রকম আরও কিছু উল্লেখযোগ্য পদার্থ হল কাঁচা টম্যাটোয় *স্যাপোনিন* (Saponine) জাতীয় *টোমাটাইন* (Tomatine), যবে *অ্যাভেনাসিন* (Avenacin) ইত্যাদি। এগুলির উপস্থিতিতে ছত্রাকের (যেমন *Botrytis sp.*) বৃদ্ধি বাধা পায় ঠিকই, কিন্তু প্রতিরোধ ক্ষমতার কতখানি এদের উপস্থিতি সঞ্জাত তা এখনও নির্ণীত হয়নি।

অনুশীলনী - 2

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

   (a) পিঁয়াজের শল্কপত্রে উপস্থিত একটি ছত্রাক নিরোধী রাসায়নিক পদার্থ হল ________।

   (b) ________ হল একটি গ্লাইকোপ্রোটিন যা পরিচিতিজ্ঞাপন যৌগ হিসাবে কাজ করে।

   (c) আলুতে শ্বেতসারের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পচনের মাত্রা ________ পায়।

2. রোগলক্ষণগুলির সাথে জীবাণুগুলিকে সঠিকভাবে মেলান :

(a) আলুর নরম পচন	(i) *Colletotrichum circinans*
(b) পেঁয়াজের শল্ক পত্রে পচন	(ii) *Rhizoctonia sp.*
(c) অণুসূত্র স্তর	(iii) *Erwinia carotovora*

3. বাঁদিকে উল্লিখিত যৌগগুলির উৎসরূপে সঠিকভাবে ডানদিকের বস্তু গুলিকে চিহ্নিত করুন :

(a) টোমাটাইন	(i) যব
(b) অ্যাভেনাসিন	(ii) কচি ফল
(c) ট্যানিন	(iii) টম্যাটো

13.3.2 সংক্রমণ প্রণোদিত বিপাকীয় সুরক্ষা (Metabolic Defence induced by the attacking pathogen):

উদ্ভিদের সহজাত বিপাকীয় উপাদানগুলি ছাড়াও সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় আরো বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষ ঘটে। প্যাথোজেন-সৃষ্ট ক্ষত বা অন্য কোন কারণে সৃষ্ট আঘাত এক্ষেত্রে উদ্দীপকের কাজ করে যার প্রতিক্রিয়ায় এই পদার্থ সমূহ সংশ্লেষিত হয়। এগুলি যে সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাকে প্রণোদিত সরক্ষা বলে অভিহিত করা ভাল।

- **জৈব রাসায়নিক বৃদ্ধি নিরোধী পদার্থ (Biochemical Inhibitors) ঃ** প্যাথোজেন সৃষ্ট ক্ষত বা যান্ত্রিক আঘাত সঞ্জাত ক্ষত বা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত— যে কোন রকম ক্ষত 'এর ক্ষেত্রে উদ্ভিদের দেহে একাধিক সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখা যায় উদ্দেশ্য দ্বিমুখী। ক্ষতের উৎসটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ক্ষতস্থানের মেরামতি। *ছত্রাকনাশক* (Fungitoxic) পদার্থ নিঃসরণ করে বা কর্ক এবং ক্যালোজ স্তর গঠন করে উদ্ভিদ এই কাজটি করে। এগুলির মধ্যে অধিকংশই ফেলন ঘটিত যৌগ যেমন **ক্লোরোজিনিস অ্যাসিড** (chlorogenic acid), **ক্যাফিক অ্যাসিড** (caffeic acid) ইত্যাদি। ফেনল যৌগের জারণের ফলে উৎপাদিত পদার্থসমূহ এবং ফেনল ঘটিত আর একটি যৌগ **ফাইটো অ্যালেকসিন** (Phytoalexin) ইত্যাদির সংশ্লেষও সংক্রমণ পরবর্তী দশায় হয়ে থাকে। এই যৌগগুলি উপযুক্ত ঘনত্বে ছত্রাকের বৃদ্ধি ও বিস্তার সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

- ফেনলঘটিত যৌগের অতিমাত্রায় উৎপাদন **(Production of increased leavels of phenolic compounds) ঃ** যে সব ফেনল ঘটিত যৌগের রোগ প্রতিরোধী ভূমিকা আছে তাদের মধ্যে কয়েকটি রোগাক্রান্ত এবং সুস্থ সব রকম উদ্ভিদেই দেখা যায়। তবে রোগাক্রান্ত অর্থাৎ প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদে সংশ্লেষের হার অনেক বেড়ে যায়। এদের বলা হয় সাধারণ বা common phenolic যৌগ। আর কিছু ফেলন যৌগ এমন আছে যে তাদের সুস্থ উদ্ভিদে দেখা যায় না অথচ যান্ত্রিক বা প্যাথোজেনঘটিত ক্ষতের প্রতিক্রিয়াতেই তাদের উৎপাদন ঘটে। এই সমস্ত ফেনল যৌগকে বলা হয় *ফাইটোঅ্যালেকসিন* (Phytoalexins)।

    (i) **সাধারণ ফেনল-যৌগ (Common Phenolics) ঃ** পূর্বে উল্লিখিত **ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড** বা **ক্যাফিক অ্যাসিড** এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। *স্কোপোলেটিন* (Scopoletin) হল আর একটি এরকম যৌগ। সুস্থ উদ্ভিদদেহে এদের দেখা যায় এবং এককভাবে প্রায় সব কটিই উপযুক্ত ঘনত্বে ছত্রাকদমনে সক্ষম। তবে সংক্রমন নিয়ন্ত্রণে কোন একটির তুলনায় সব কয়টি যৌগের মিলিত প্রভাব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

    (ii) **ফাইটোঅ্যালেকসিন (Phytoalexins) ঃ** "ফাইটো" শব্দটির অর্থ হল উদ্ভিদ। উদ্ভিদ প্যাথোজেনকে বলা হয় "ফাইটো প্যাথোজেন" এবং তার প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত রাসায়নিক ফেনল্ যৌগ হল **ফাইটোঅ্যালেকসিন**। সংক্রামিত কোশের পার্শ্ববর্তী সুস্থ কোশ থেকে এগুলি উৎপাদিত হয়। সম্ভবতঃ আক্রান্ত কোশ থেকে কোন রাসায়নিক এই উৎপাদনে সিগন্যাল হিসাবে কাজ করে। যখন এক বা একাধিক ফাইটোঅ্যালেকসিন সেই মাত্রায় সংশ্লেষিত হয় যা প্যাথোজেনের বৃদ্ধির পক্ষে ঋণাত্মক তখনই সংশ্লিষ্ট উদিভদটি প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করে। আজ পর্যন্ত 20টি বিভিন্ন গোত্রের শতাধিক

উদ্ভিদ প্রজাতিতে এদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছত্রাক প্রতিরোধী তবে ব্যাকটেরিয়া এবং নিমাটোড প্রতিরোধক্ষমতার প্রমাণও পাওয়া গেছে। কয়েক ডজন ফাইটোঅ্যালেকসিনের মধ্যে বীন গাছ থেকে পাওয়া *ফ্যাসিওলিন* (Phaseollin), মটর থেকে প্রাপ্ত *পাইসাটিন* (Pisatin), সয়াবীন থেকে প্রাপ্ত *গ্লাইসিওলিন* (glyceollin) আলুর *রিশিটিন* (Rishitin) তুলোর *গস্‌সিপল* (gossypol) ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা হয়েছে।

এই যৌগের প্রণোদিত উৎপাদন প্যাথোজেন নিঃসৃত কোন পদার্থের উপস্থিতিতে ঘটে থাকে। এই পদার্থগুলিকে বলা হয় *এলিসিটর* বা *দ্যোতক* (elicitor)। দ্যোতকগুলি উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন যৌগ যার মৌলিক গঠনগত উপাদানগুলি ছত্রাকের কোশপ্রাচীরের উপাদান যেমন গ্লুকান, কাইটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন ইত্যাদি। দ্যোতকগুলির কাজ অর্থাৎ দ্যোতনা অতিবিশেষ (specific) ধরনের নয়, ফলে অপোষক উদ্ভিদেরও এদের যে কোনটির প্রভাবে ফাইটোঅ্যালেকসিন সৃষ্টি হয়।

দ্যোতকের প্রভাবেও কোন কোন প্যাথোজেন-পোষক সম্পর্কের মধ্যে ফাইটোঅ্যালেকসিনের অস্তিত্ব নেই। এর কারণ ঐ প্যাথোজেন নিসৃত আর এক প্রকার যৌগ যারা Suppressor বা *অবদমনকারী যৌগ* রূপে পরিচিত। এই যৌগগুলিও ঐ ছত্রাক কোশ প্রাচীরের উপাদান দ্বারাই গঠিত। একটা মজার কথা হল, কোন প্যাথোজেন যা কোন একটি বিশেষ উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে সংক্রমণ ঘটাতে পারে, সেটির প্রভাবে প্রণোদিত ফাইটোঅ্যালিকসিনের মাত্রা কোন অজীবানু বা *নন-প্যাথোজেন* (non-pathogen) দ্বারা প্রণোদিত ফাইটোঅ্যালেকসিনের তুলনায় কম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মটর গাছে *(Pisum satirum)* সংক্রমণ সৃষ্টিকারী একটি জীবাণু হল *Ascochytapisi* (অ্যাসকোকাইটা পিসি)। এটি

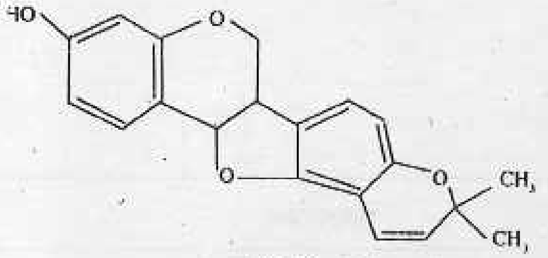

ফ্যাসিওলিন (Phaseolin)

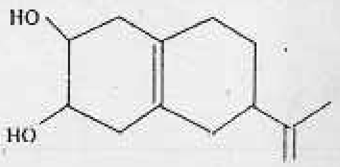

রিশিটিন (Rishitin)

পাইসাটিন (Pisatin)

একটি ছত্রাক যার কয়েকটি প্রকরণ (Strain) প্যাথোজেনিক বা রোগসৃষ্টিকারী, কয়েকটি নন-প্যাথোজেনিক বা রোগসৃষ্টিকারী নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্যাথোজেনিক ছত্রাকের প্রবাবে মটর গাছে যে পরিমাণ বা ঘনত্বের **পাইসাটিন** (Pisatin) তৈরি হয়, নন-প্যাথোজেনিক Strain এর প্রভাবে তার তুলনায় অনেক বেশি মাত্রা বা ঘনত্বের পাইসাটিন তৈরি হয়। সয়াবীনের ক্ষেত্রে আর একটি ছত্রাক *Phytophthora megaspermia.* একইরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, অর্থাৎ যে Strain গুলি সংক্রামক নয় তাদের প্রভাবেই উৎপাদিত ফাইটোঅ্যালেকসিন ঘনত্ব অনেক বেশি। তবে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় বীনগাছে *Colletotrichrum sp.* বা আলুতে *Phytophthora infestans* এর দ্বারা সংক্রমণ ঘটলে। তাদের ক্ষেত্রে সংক্রামক Strain এর দ্বারা প্রণোদিত ফাইটোঅ্যালেকসিন উৎপাদন অন্ততঃ অসংক্রামক (non-pathogenic) Strain এর তুলনায় কম নয় এটা বলা যায়। এর সাথে সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে সংক্রামক strain এর সংবেদনশীলতার তুলনায়, এই রাসায়নিক পদার্থটির প্রতি অসংক্রামক strain এর সংবেদনশীলতা অনেক বেশি। তাই অসংক্রামক জীবাণুর প্রতি পোষকের প্রতিরোধ অনেক বেশি কার্যকরী। এর কারণ হিসাবে দুটি কথা বলা যায়। (1) সংক্রামক বা প্যাথোজেনিক জীবাণুর (strain) তুলনায় অসংক্রামক বা নন-প্যাথোজেনিক জীবাণুর (strain) দ্যোতনা ফাইটোঅ্যালিকসিন তৈরিতে অনেক বেশি কার্যকরী। (2) প্যাথোজেনিক জীবাণু বিষাক্ত ফাইটোঅ্যালেকসিনকে রূপান্তরিত করে নির্বিষ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এটা প্যাথোজেনের বিপাক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। যে সমস্ত প্যাথোজেন এটা করতে পারে তারা অত্যন্ত সক্ষম, ক্ষতিকারক সংক্রামক জীবাণু কেন না আক্রান্ত কোশের রাসায়নিক অন্ত্রটিকে নিজের মত করে বদলে নেওয়ার ক্ষমতা তার আছে।

নীচের সারণিতে কয়েকটি প্যাথোজেন পোষক জোড় (combination) এবং তাদের যৌথ ক্রিয়া সঞ্জাত ফাইটোঅ্যালেকসিন যৌগের নাম দেওয়া হল ঃ

সারণি-১

ফাইটোঅ্যালেকসিন	পোষক	প্যাথোজেন
পাইসাটিন (Pisatin)	*Pisum sativum*	*Sclerotiana fructicola*
ফ্যাসিওলিন (Phaseollin) কিয়েভিটোন (Kievitone)	*Phaseolus vulgaris*	*S. fructicola*
অরচিনল (Orchinol)	*Orchis militaris*	*Rhizoctonia repens*
আইপোমিয়াম্যারোন (Ipomeamarone)	*Ipomouea batatas*	*Caratocystis fimbriata*
আইসোকুমারিন (Isocoumarin)	*Daucus carota*	*C. fimbriata*

গসিপল (gossypol)	*Gossypium hirsutum*	*Verticillium albo-artum*
রিশিটিন (Rishitin)	*Solanum tuberosum*	*Phytophthora infestans*
ট্রাইফোলিরিজিন (Trifolirhizin)	*Trifolium pratense*	*Helminthosporium turcicum*
মেডিকারপিন (Medicarpin)	*Medicago sativa*	*H. hirsutum*
সাইসারিন (Cicerin)	*Cicer arientinum*	*Ascochyta rabiei*

ফাইটোঅ্যালকসিন সংক্রান্ত গবেষণার সবচেয়ে বড় অবদান **Muller** ও **Boerger** (1940) নামক দু'জন বৈজ্ঞানিকের। এই রাসায়নিক সুরক্ষা অস্ত্রটি সম্পর্কে তাঁরা বিভিন্ন গবেষণা থেকে যে সিধান্তে পৌঁছান সেগুলি হল ঃ

1. ফাইটোঅ্যালেকসিন হল এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ যা ছত্রাক জাতীয় প্যাথোজেনের প্রভাবে পোষক কোশ দ্বারা নিসৃত হয়।
2. এটি উদ্ভিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ যা কেবলমাত্র জীবিত কোশেই পরিলক্ষিত হয়।
3. এই পদার্থটি একটি বৃদ্ধি নিরোধী রাসায়নিক যা পোষক কলার পচনশীলতার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারূপে বিবেচ্য।
4. ফাইটোঅ্যালেকসিনের বিষক্রিয়া মোটামুটিভাবে সার্বজনীন অর্থাৎ ছত্রাক বিশেষে সীমাবদ্ধ নয় তবে ছত্রাকের সংবেদনশীলতার মাত্রা ভিন্ন ভিন হওয়া সম্ভব।
5. রোগ প্রতিরোধী **(Resistant)** বা রোগপ্রবণ **(susceptible)** উভয়প্রকার পোষকেই ফাইটোঅ্যালেকসিন উৎপাদিত হয়। শুধু কত দ্রুত সংক্রামকের প্রভাবে সেই উৎপাদিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে কোন পোষকের প্রতিরোধ ক্ষমতা বা রোগপ্রবণতা।
6. রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি যা ফাইটোঅ্যালেকসিন সৃষ্টির জন্য দায়ী—সেগুলি কেবলমাত্র ছত্রাক দ্বারা সংক্রামিত কোশ এবং তার নিকটতম প্রতিবেশী কোশগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকে।
7. ফাইটোঅ্যালেকসিন প্রণোদিত সুরক্ষার বৈশিষ্ট্য যে উদ্ভিদকে দান করে, তা কখনই বংশান্তরে সঞ্চারিত হয় না।

অনুশীলনী - 3

1. (i) অন্ততঃ পক্ষেদুটি সাধারণ ফেনল যৌগের নাম লিখুন যারা রোগ প্রতিরোধে সক্ষম।

উঃ (a) (b)

(ii) অন্ততঃ পক্ষে তিনটি ফাইটোঅ্যালেকসিন এবং তাদের উৎসের নাম লিখুন।

উঃ

ফাইটোঅ্যালিকসিন	উৎস

(a)

(b)

(c)

(iii) অন্ততঃ পক্ষে কোশীয় যৌগের নাম লিখুন যারা দ্যোতক বা eleicitor রূপে কাজ করে

(a)

(b)

2. ঠিক বা ভুল লিখুন ঃ

(i) প্যাথোজেনিকছত্রাকের তুলনায় মটর গাছে নন-প্যাথোজেনিক ছত্রাকের সংক্রমণে বেশি পাইসাটিন নিসৃত হয়। (ঠিক / ভুল)

(ii) ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটলেই ফাইটোঅ্যালেকসিন নিসৃত হয়। (ঠিক / ভুল)

(iii) সেই জীবাণুই মারাত্মক ক্ষতিকারক যারা ভাইটোঅ্যালেকসিনকে নিজেদের অনুকূলে বদলে নিতে পারে। (ঠিক / ভুল)

(iv) জীবিত বা মৃত যে কোন কোশই ফাইটোঅ্যালিকসিন উৎপাদনে সক্ষম। (ঠিক / ভুল)

(v) ফাইটোঅ্যালিকসিন উৎপাদনের ধর্মটি বংশানুক্রমিক। (ঠিক / ভুল)

(iii) **রোগ প্রতিরোধে ফেনল-জারণকারী উৎসেচকের ভূমিকা (Role of Phenol Oxidising Enzyme) ঃ** উদ্ভিদদেহে একাধিক ফেনল জারণকারী উৎসেচক সংক্রমণের প্রভাবে সৃষ্টি হতে পারে যাদের বলা হয় *পলিফেনল অকসিডেজ* (Polyphenol oxidase)। প্রতিরোধী পোষকে এদের পরিমাণ রোগপ্রবণ প্রজাতির তুলনায় অনেকবেশি হয়ে থাকে। এই উৎসেচকের প্রভাবে ফেনল যৌগ *কুইনোন* (quinone) যৌগে পরিণত হয় যার জীবাণুর প্রতি বিষক্রিয়া ফেনল যৌগের তুলনায় অনেক বেশি।

একটি ফেনল-জারক উৎসেচক **পারঅকসিডোজ** (Peroxidase) এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এটি যে কেবল ফেনলকে জারিত করে তা নয়, এটি জারিত ফেনল অনুকে পরস্পর সংযুক্ত করে লিগনিন জাতীয় পদার্থ তৈরি করে যা কোশ প্রাচীরের গায়ে জমা হয়ে ছত্রাকের অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করে।

(iv) প্রণোদিত উৎসেচকের ভূমিকা (**Role of Induced Enzyme**) : প্যাথোজেন দ্বারা সংক্রামিত পোষক কোশের উৎসেচক তন্ত্রে এমন পরিবর্তন দেখা যায় যা কোশটিকে বা পোষককে রোগ প্রতিরোধী করে তোলে। PAL বা Phenylamine Ammonia Lyase *(ফিনাইলঅ্যামিন অ্যামোনিয়া লাইয়েজ)* হল তেমনই এক উৎসেচক সংক্রামিত কোশে যার উৎপাদনহার সুস্থ কোশের তুলনায় অনেক বেশি PAL হল অধিকাংশ ফেনল ঘটিত যৌগের উৎপাদনে ব্যবহৃত মুখ্য উৎসেচক। ফাইটোঅ্যালেকসিন এবং লিগনিন যৌগের কোন না কোন ধাপে PAL কাজে লাগে। এটির উৎপাদন হার বাড়া এই জাতীয় রোগ প্রতিরোধী পদার্থের উৎপাদন বৃদ্ধির হারের সাথে সমানুপাতিক।

(v) প্যাথোজেনের উৎসেচক নিয়ন্ত্রক যৌগ উৎপাদন (**Formation of Substrates Resisting Enzyme of the Pathogen**) : প্যাথোজেন পোষকের শরীরে বাসা বাঁধে সেটি থেকে পুষ্টি আহরণের জন্য। পুষ্টি আহরণের প্রক্রিয়াটি যে উৎসেচক নিয়ন্ত্রিত এ আমরা সবাই জানি। প্যাথোজেনের উৎসেচক যদি পোষকের কোশ থেকে উপযোগী পদার্থ পায় তাহলে সেই পদার্থকে বিশ্লেষিত করে প্যাথোজেন সরল খাদ্য পেয়ে থাকে। অনেক উদ্ভিদের প্রতিরোধী বিক্রিয়া এমন সমস্ত যৌগ উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হয় যাদের প্যাথোজেন উৎসেচক ভেঙে ফেলতে পারে না। এই পদার্থগুলি সাধারণতঃ পেকটিন, প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের যৌগ।

(vi) প্যাথোজেনের উৎসেচকের ক্ষমতা হ্রাস (**Inactivation of Pathogen Enzyme**) : প্যাথোজেনের প্রভাবে পোষকে উৎপাদিত ফেনলঘটিত যৌগগুলি অনেক সময় প্যাথোজেনের *পেকটিনেজ* (Pectinase) ও অন্যান্য উৎসেচককে অকার্যকরী করে পোষককে প্রতিরক্ষা প্রদান করে। এইরকম প্রতিরোধক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায় অপরিপক্ক ফলে। কাঁচা আপেলে *Monilinia sp.* নামক ছত্রাকের সংক্রমন, কাঁচা আঙ্গুরে *Botrytis sp.* ছত্রাকের সংক্রমণ যে অপেক্ষাকৃত অনেক কম ফসলহানির কারণ তার পিছনে আছে পলিফেনল জাতীয় যৌগগুলির যারা পেকটিন ভঙ্গক পেকটিনেজকে অকার্যকরী করে দেয়। পাকা কমলালেবু গুদামজাত দশায় *Diplodia sp.* নামক ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। কাঁচা অবস্থায় এই ছত্রাকের পলিগ্যালাকটো ইউরানেজ নামক উৎসেচকটি এটির খোসায় উৎপাদিত একটি প্রোটিন দ্বারা ক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে।

(vii) ছত্রাক নাশক সায়ানাইড যৌগের উৎপাদন (**Release of Fungitoxic Cyanides**) : Sorghum, cassava ও flax হল মূলতঃ পশুখাদ্য উৎপাদনকারী গাছ যাদের কোশে এমন কিছু যৌগ দেখা যায় যাদের বলাহয় সায়ানোজেনিক যৌগ অর্থাৎ এই যৌগগুলি সায়ানাইডে পরিণত হতে পারে। তবে এই সমস্ত যৌগগুলি যতক্ষণ কোশের মধ্যে আছে ততক্ষণ তারা কোন রকম বিষক্রিয়া হীন। যেই মুহূর্তে কোশ প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই এই যৌগগুলি কোশ হতে মুক্ত হয়। এদের সঙ্গে কোশের কিছু উৎসেচকের মিশ্রণ ঘটে এবং তার ফলে উৎপাদিত হয় দারুণভাবে বিষাক্ত যৌগ সায়ানাইড (HCN)। সায়ানাইড প্যাথোজেনের মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটতে থাকা সবাত শ্বসন প্রক্রিয়াকে বাধা দেয় ফলে যে বিক্রিয়া প্যাথোজেনের প্রভাবেই শুরু হয়েছিল সেটিই তার প্রতিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতদসত্ত্বেও এই সমস্ত উদ্ভিদে ছত্রাক সংক্রমণ হয়, তাদের রোগ লক্ষণও দেখা যায়। সে সব ক্ষেত্রে প্যাথোজেনের সাফল্যের সারণ দুটি হতে পারে। (ক) প্যাথোজেন বিষাক্ত HCN কে নিজের উৎসেচকের সাহায্যে অবিষ

পদার্থে রূপান্তরিত করে, অথবা (খ) প্যাথোজেন একটি বিকল্প শ্বসন ব্যবস্থা চালু করে দেয় যেটি সায়ানাইড দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

(viii) **প্যাথোজেন নিসৃত অধিবিষের কার্যকারিতা হ্রাস (Detoxification of Pathogen Toxin) :** কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে প্যাথোজেনের সৃষ্ট অধিবিষই যে রোগের কারণ তা আমরা আগেই জেনেছি। এসব ক্ষেত্রে রোগটির বিরুধে প্রতিরোধ মানেই হল অধিবিষটির বিরুধে প্রতিরোধ। **ফিউসারিত অ্যাসিড** (fusaric acid) বা **পিরিকিউলারিক** (Pyricularin) জাতীয় অধিবিষগুলি প্রতিরোধী প্রজাতির পোষককে অকার্যকরী হয়ে পড়ে বটে তবে ঠিক কিভাবে এই কাজটি ঘটে তা এখনও পরিষ্কার নয়। প্রতিরোধী প্রজাতির পোষকে *Helminthosporium sp, Periconia sp.* এবং *Alternaria sp.* নামক ছত্রাক প্যাথোজেনগুলির অধিবিষের কোন ক্রিয়া নেই এবং এটিই প্রতিরোধক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎস সন্দেহ নেই।

(ix) **কৃত্রিমভাবে প্রণোদিত প্রতিরক্ষা (Induced Resistance) :** কোন উদ্ভিদকে কৃত্রিমভাবে কোন জীবজ পদার্থ দ্বারা বা কোন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সংক্রামিত করলে তার মধ্যে যে প্রতিরোধী বৈশিষ্টের আবির্ভাব ঘটে তাকেই বলা যায় কৃত্রিমভাবে প্রণোদিত সুরক্ষা। এভাবে বহু উদ্ভিদকে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এমনকি পতঙ্গের বিরুধেও প্রতিরোধী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। ব্যাপারটি কতকটা টীকাকরণের সাথে তুলনীয়, তবে একটি পদার্থ দ্বারা গড়ে তোলা কৃত্রিম প্রতিরোধ কেবল সেই পদার্থের সংক্রমণেই সীমাবধ থাকে না বরং বহুতর প্যাথোজেনের ক্ষেত্রেই তার কার্যকারিতা অবিকৃত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তামাক পাতার সংক্রামক প্রতিরোধের কথা বলা যায়। তামাক গাছের **মোজইক ভাইরাস** (Tobacco Mosaic Virus সংক্ষেপে TMV) দ্বারা কৃত্রিম বীজায়ন (inoculation) ঘটালে অতিসংবেদনশীল তামাকগাছ কেবল **TMV** নয়, আরো অনেক প্যাথোজেন যেমন **ছত্রাক** *(Phytophthora)*, **ব্যাকটেরিয়া** *(Pseudomonas tabaci)* **ও অ্যাফিড** *(aphids)* পোকার **আক্রমণের বিরুধে প্রতিরোধ** গড়ে তুলতে পারে। একইভাবে একটি নন প্যাথোজেনিক strain দ্বারা বীজায়ন ঘটিয়ে অথবা তাপদগ্ধ (Heat killed) ছত্রাক রেণু বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বীজায়ন ঘটিয়ে শিশু বয়সের উদ্ভিদকে তার সারা জীবৎকালের জন্য রোগ প্রতিরোধী করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

প্রথমে কৃত্রিম প্রতিরোধ বীজায়নের অঞ্চলের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ থাকে। একে বলে **স্থানিক কৃত্রিম প্রতিরক্ষা** (local induced resistance), কিন্তু অচিরেই এই প্রতিরোধ স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র উদ্ভিদ দেহই রোগ প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। একে বলে **সর্বাঙ্গীন কৃত্রিম প্রতিরক্ষা** (Systemic induced resistance)। এই প্রতিরক্ষার প্রকাশ ঘটার জন্য কৃত্রিম বীজায়ন ও পরবর্তী সংক্রমণের মধ্য একটি সময়ান্তর দরকার যাকে বলা হয় (Lag period)। প্রয়োজনীয় সুরক্ষা-যৌগগুলির উৎপাদনের জন্য উদ্ভিদের এই সময়টি দরকার, শুধু তাই নয় সংক্রামিত অঞ্চল থেকে যৌগগুলির সুস্থ অঞ্চলে পরিবহনের জন্যও এই সময়টুকু প্রয়োজন।

শুধুমাত্র সজীব পদার্থ নয়, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যেমন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের প্রোটিন দ্বারাও এই কাজটি করা যায়। অজৈব যৌগ যথা অ্যাসপিরিন (aspirin এবং Salicylic অ্যাসিড), পরিঅ্যাক্রিলিক

অ্যাসিড (polyacrylic acid) ইত্যাদি দ্বারাও কৃত্রিম প্রতিরক্ষা প্রদান করা সম্ভব। পাতায় বা মূলে স্প্রে করলে এই পদার্থগুলি সাধারণভাবে স্থানিক প্রতিরোধরূপে সংক্রমণে বাধা দেয়।

কৃত্রিম প্রতিরোধ উদ্ভিদদেহে অতিসংবেদনশীল (hypersensitive) প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর প্রকাশ ঘটে কোশের সাইটোপ্লাজমে **b-protein** নামক একটি বিশেষ প্রোটিন গঠনের মাধ্যমে। অতি সংবেদনশীলতা ও প্রতিরোধ উভয় বৈশিষ্ট্যই b-protein গঠন দ্বারা চিহ্নিত এবং উভয় বৈশিষ্ট্যই অবদমিত হয় যখন উদ্ভিদকে actinomycin-D দ্বারা বা উচ্চ তাপমাত্রা ($30^0C – 35^0C$) দ্বারা প্রভাবিত করা হয়। দেখা গেছে উভয় ক্ষেত্রেই b-protein গঠন বন্ধ হয়ে যায়। যদিও কিভাবে b-protein অতিসংবেদনশীলতা বা প্রতিরোধক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে তা এখনও বোঝা যায় নি। কৃত্রিম প্রতিরোধ b-protein ছাড়াও ফাইটোঅ্যালিকসিন, কোশ প্রাচীর গঠনকারী লিগনিন, PAL, পারঅকসিডেজ ইত্যাদি পদার্থ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বীজায়ন ঘটিয়ে এই পদার্থগুলি উৎপাদনের হার বাড়িয়ে উদ্ভিদকে রোগ প্রতিরোধী করে গড়ে তোলার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা অপরিসীম।

13.4 সারাংশ :

উদ্ভিদের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল রোগ প্রতিরোধ করা, তাই প্রতিনিয়ত অসংখ্য রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্ভিদগুলির মধ্যে কেবল সেগুলিই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে যেগুলির রোগাক্রান্ত হবার *প্রবণতা* বা Susceptibility আছে। প্রতিরোধ করার ক্ষমতাগুলি একত্রে উদ্ভিদের মধ্যে একটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্ম দেয়। এই সুরক্ষা *গঠনগত* বা *বিপাকীয়* হওয়া সম্ভব। গঠনগত কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য যেমন *কোশপ্রাচীরের স্থূলতা, পত্ররন্ধ্রের অবস্থান* ইত্যাদি প্যাথোজেনের পক্ষে অনুকূল নাও হতে পারে। এছাড়া কিছু গঠন বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদ নিয়ে জন্মায় না ঠিকই, কিন্তু সংক্রমনের প্রভাবে সেগুলির আবির্ভাব ঘটে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে *কলাশ্রয়ী, কোশাশ্রয়ী, সাইটোপ্লাজমীয় সুরক্ষা* এবং *অতিসংবেদনশীলতা*—এই চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। *কর্কস্তরের নির্মাণ, পতন স্তর নির্মাণ, টাইলোসিস গঠন, সংক্রামিত অঞ্চলে গঁদ জমা হওয়া*—এগুলি হল কলাশ্রয়ী সুরক্ষার অঙ্গ। কোশাশ্রয়ীসুরক্ষা *কোশপ্রাচীরের গঠন, ক্যালোজ জমা* হওয়া ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত। অতিসংবেদনশীলতা বলতে আক্রান্ত কলা বা অঙ্গের দ্রুত মৃত্যু বোঝায় যার দ্বারাও প্রতিরোধ গড়ে ওঠা সম্ভব বিপাকীয় সুরক্ষার ও এই রকম দুটি ভাগ। যথাক্রমে মৌলিক ও প্রণোদিত। মৌলিক সুরক্ষার মধ্যে পড়ে উদ্ভিদে জন্ম থেকেই উপস্থিত ফেনল যৌগ, প্যাথোজেন ও পোষকের মধ্যে পরিচয়জ্ঞাপন বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি, অধিবিষের বা সংযোগস্থানের অনুপস্থিতি ইত্যাদিকে। প্রণোদিত বিপাকীয় সুরক্ষা বলতে প্যাথোজেন দ্বারা প্রণোদিত বিপাকীয় যৌগগুলিকে বোঝায়। *ফেনল যৌগ*গুলি সব চাইতে উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে স্বতন্ত্র জায়গা দাবী করে *ফাইটোঅ্যালিকসিন* নামক একধরনের বিশেষ যৌগ যারা প্যাথোজেনের দ্যোতনায় আক্রান্ত কোশ থেকে নির্গত। 20টিরও বেশি উদ্ভিদ গোষ্ঠী থেকে শতাধিক ফাইটোঅ্যালিকসিন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন *ছত্রাকনাশক পদার্থ, উৎসেচক নাশক পদার্থ* সংক্রমণের প্রভাবে পোষক কোশে তৈরি হয়। তৈরি হয় এমন কিছু উৎসেচক ও *অধিবিষ* যারা সুরক্ষা প্রদানে গাছকে সাহায্য করে। এই বাইরে আছে কৃত্রিম বীজায়ন করে উদ্ভিদকে *প্রতিরোধী* করে গড়ে তোলার সাফল্য। এসবের যৌথ ফলাফলেই উদ্ভিদের প্রতিরোধ ক্ষমতার কার্যকারিতা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত।

13.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. উদ্ভিদের সংক্রমনজাত কলাশ্রয়ী সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে চিত্রসহ আলোচনা করুন।
2. ফাইটোঅ্যালেকসিন কি? এগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবধ্ব করুন। অজীবাণু (non-pathogen) কখনও কখনও জীবাণুর (pathogen) তুলনায় বেশি ফাইটোঅ্যালেকসিন উৎপাদনে উদ্ভিদকে প্রণোদিত করে। এর কারণ কি?
3. টীকা লিখুন
   a) অতিসংবেদনশীলতা
   b) PAL
   c) কৃত্রিমভাবে প্রণোদিত সুরক্ষা
   d) সায়ানাইড যৌগ দ্বারা সুরক্ষা
   e) ফেনল জারণকারী যৌগ

13.6 উত্তরমালা :

অনুশীলনী - 1

1. (a) কোশপ্রাচীর; মোম; কিউটিকল
   (b) স্ক্লেরেন কাইমা; বান্ডিল টুপি, শিরাত্বক
   (c) চার; কলাশ্রয়ী, কোশাশ্রয়ী, সাইটোপ্লাজমীয় এবং অতিসংবেদনশীলতা প্রসূত সুরক্ষা

2. (a) – (iii)
   (b) – (i)
   (c) – (ii)
   (d) – (v)
   (e) – (iv)

3. পার্থক্যগুলি হল ঃ
   (a) উদ্ভিদ মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, আর প্রতিক্রিয়াজনিত বৈশিষ্ট্য সংক্রমণের প্রভাবে পরে দেখা যায়।

(b) মৌলিক বৈশিষ্ট্য সংক্রমণে বাধা দেয় মাত্র, আর প্রতিক্রিয়াজনিত বৈশিষ্ট্য জীবাণুকে বিনাশ করে সংক্রমণ দূরীভূত করতে পারে।

(c) মৌলিক সুরক্ষা বাহ্যিক অর্থাৎ রাসায়নিক সুরক্ষার সাথে যুক্ত নয়, আর প্রতিক্রিয়াজনিত সুরক্ষা রাসায়নিক সুরক্ষার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অনুশীলনী - 2

1. (a) ক্যাটেকল
   (b) লেকটিন
   (c) হ্রাস

2. (a) – (iii)
   (b) – (i)
   (c) – (ii)

অনুশীলনী - 3

1. i) (a) ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড
   (b) স্কোপোলেটিন

ii)

ফাইটোঅ্যালিকসিন	উৎস
(a) পইসাটিন	(মটর) *Pisum sativum*
(b) রিশিটিন	(আলু) *Solanum tuberosum*
(c) ফ্যাসিওলিন	(ডাল) *Phaseolus vulgaris*

iii) (a) গ্লুকান
   (b) কাইটিন

2. i) ঠিক
   ভুল
   ঠিক
   ভুল
   ভুল

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. 14.2.2 (ক) অংশাঙ্কিত পর্যায়ে আলোচিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিত্রসহ আলোচনা করুন।

- কর্ক স্তরের গঠন
- পতন স্তর নির্মাণ
- টাইলোসিস গঠন
- গঁদ জমা হওয়া

প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোথায় দেখা যায় (অর্থাৎ উদাহরণ), কিভাবে এই বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয় এবং তা কিভাবে উদ্ভিদের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে তা উল্লেখ করুন।

যেমন ঃ

- কর্ক স্তরের গঠন

কোথায় ঃ উদ্ভিদের ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা নিমাটোড দ্বারা আক্রান্ত অংশের ঠিক নীচে পরিলক্ষিত হয়।

কিভাবে গঠিত হয় ঃ প্যাথোজেন নিঃসৃত কোন যৌগের প্রভাবে উদ্ভিদের আক্রান্ত কলার নিম্নবর্তী সুস্থ কোশগুলি দ্রুত বিভাজনক্ষম হয়ে ওঠে এবং একটি সুরক্ষাস্তর নির্মাণ করে ফেলে যা কর্কস্তর নামে পরিচিত।

কিভাবে প্রতিরক্ষার সাহায্য করে ঃ (i) এই কলা প্যাথোজেনের বিস্তারে বাধা দেয় (ii) প্যাথোজেনের সৃষ্ট অধিবিষ বা Toxin এই স্তর অতিক্রম করতে পারে না। (iii) প্যাথোজেন সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আটকে পড়ার দরুন পুষ্টি আহরণে ব্যর্থ হয়। (iv) **Venturia** নামক ছত্রাক দ্বারা সংক্রামিত আপেলে আক্রান্ত অংশ কর্কস্তরের কোশের চাপে মূল ফলদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(এই প্রকল্পটি অনুসরণ করে বাকী বিষয়গুলি সম্পর্কে লিখুন)

2. প্যাথোজেনিক বা নন-প্যাথোজেনিক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদদেহের ক্ষতিগ্রস্ত কলার নিকটবর্তী কোশগুলি থেকে এক ধরনের ফেনল ঘটিত যৌগ নিসৃত হয় যা উদ্ভিদটিকে রোগ প্রতিহত করতে সাহায্য করে। একেই বলে ফাইটোঅ্যালেকসিন।

এগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি Muller ও Boerger (1940) কর্তৃক যেভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে সেভাবে লিখুন।

অজীবাণু অর্থাৎ নন-প্যাথোজেনিক ছত্রাক দ্বারা সংক্রমণে কখনও কখনও এই যৌগ অধিকমাত্রায় নিসৃত হয়। *Ascochyta pisi* দ্বারা *Pisum sativum* এর সংক্রমণের উদাহরণটি এখানে উল্লেখ করুন। এমনটা হবার দুটি সম্ভাব্য কারণের কথা সংশ্লিষ্ট অংশে বলা আছে। কারণগুলি উল্লেখ করুন।

3. টীকাগুলি আখ্যানভাবে আলোচিত বিষয়বিস্তর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিরক্ষার উদাহরণ সহ সংক্ষেপে লিখুন।

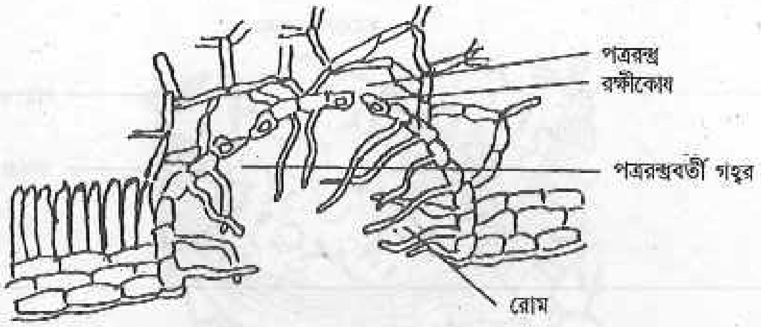

চিত্র নং 13.1 ঃ করবী পাতার নিম্নতলে প্রকোষ্ঠগত পত্ররন্ধ্র

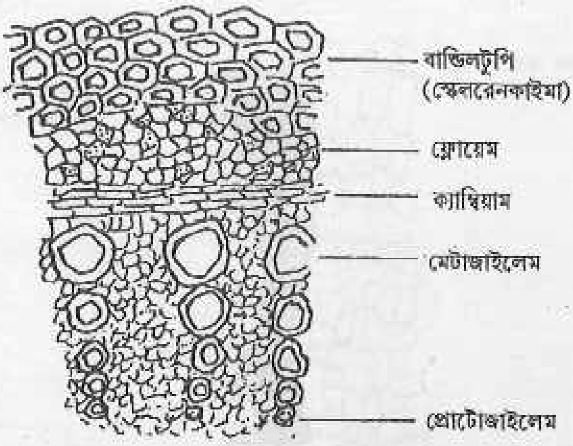

চিত্র নং 13.2 ঃ শিরাত্মক কলায় স্কেলারেনকাইমার উপস্থিতি

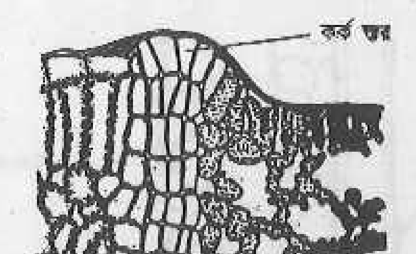

চিত্র নং 13.3 ঃ পাতার সংক্রামিত ও সুস্থ অঞ্চলের মধ্যে বাধাস্বরূপ কর্কস্তর গঠন

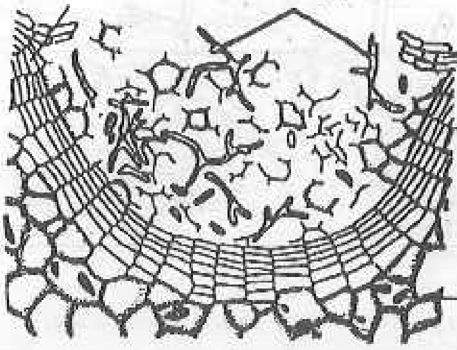

চিত্র নং 13.4 : আলুর স্ফীতকন্দে *Rhizoctonia* Sp. সংক্রমণজনিত কারণে কর্কস্তর গঠন

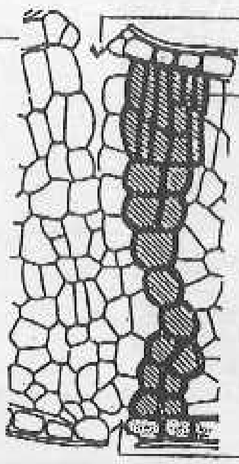

চিত্র নং 13.5 : পতন স্তর গঠন

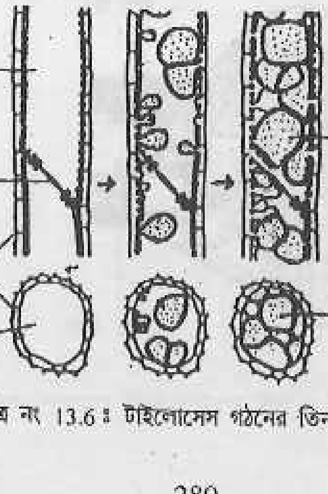

চিত্র নং 13.6 : টাইলোসেস গঠনের তিনটি স্তর

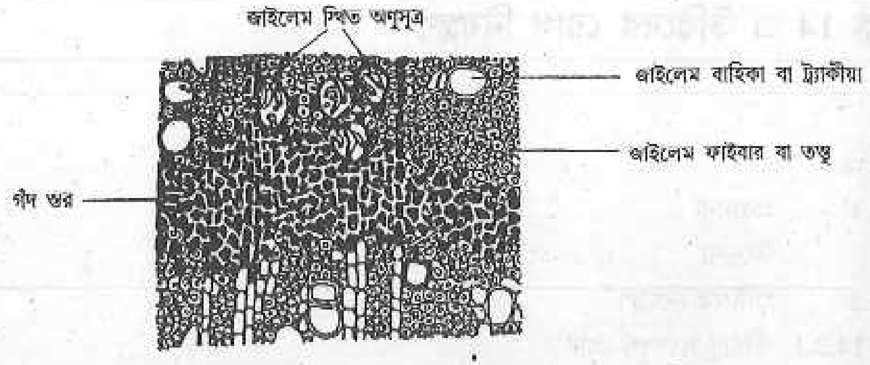

চিত্র নং 13.7 : আপেলের শাখায় গঠিত গঁদস্তর অণুসূত্রের বিস্তারে বাধা দেয়-

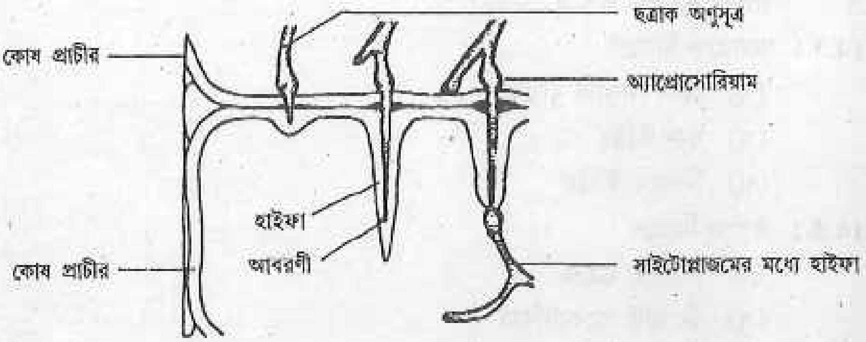

চিত্র নং 13.8 : কোষ প্রাচীরকে ভেদ করে অনুপ্রবেশরত হাইফাকে ঘিরে গঠিত আবরণী

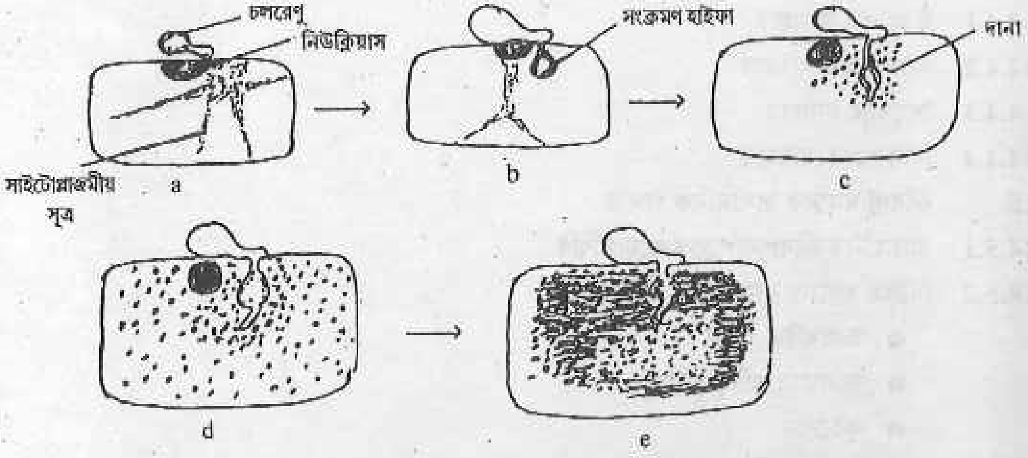

চিত্র নং 13.9 : *Phytophthora* Sp. *(ফাইটপথোরা)* নামক ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত আলুর কোশে অতিসংবেদনশীলতা জনিত প্রতিরক্ষার বিভিন্ন দশা। (a) ও (b) ছত্রাকে চলরেণু দ্বারা পোশক কোশে সংক্রমণ (c) নিউক্লিয়াস দানারূপে সংক্রমণ হাইফাকে ঘিরে জমা হয় (d) ও (e) কোশের মৃত্যু হাইফারও অপসারণ ঘটায় ফলে রোগ আর বেশিদূর ছড়াতে পারে না।

একক 14 ❑ উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণ :

গঠন
14.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
14.2 কৃষ্টিগত নিয়ন্ত্রণ
14.2.1 জীবাণু সংস্পর্শ রোধ
14.2.2 প্যাথোজেন বিনাশের কৃষ্টিগত পদ্ধতি
14.3 জীবজ নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি
14.3.1 অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ
(ক) অবদমনকারী মৃত্তিকা
(খ) ফাঁদ উদ্ভিদ
(গ) বিরোধী উদ্ভিদ
14.3.2 প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ
(ক) বিরোধী ছত্রাক
(খ) বিরোধী ব্যাকটেরিয়া
(গ) বিরোধী ভাইরাস
14.4 রোগ দমনের ভৌত পদ্ধতি
14.4.1 উত্তাপের ব্যবহার
14.4.2 আলোকের ব্যবহার
14.4.3 শৈত্যের ব্যবহার
14.4.4 বিকিরণের ব্যবহার
14.5 জীবাণু দমনের রাসায়নিক পদ্ধতি
14.5.1 রাসায়নিক জীবাণুনাশকের প্রয়োগবিধি
14.5.2 বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক জীবাণুনাশক
- তাম্রঘটিত যৌগ
- সালফার ঘটিত যৌগ
- কুইনোন
- অ্যারোমেটিক যৌগ
- হেটোরোসাইক্লিক যৌগ
- বেনজিন যৌগ

● সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক
● অ্যান্টিবায়োটিক
● বৃদ্ধি সহায়ক, হাইড্রোকার্বন, অর্গানোফসফেট ও কার্বামেট
14.5.3 রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার সতর্কতা
14.6 সারাংশ
14.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
14.8 উত্তরমালা

14.1 প্রস্তাবনা

আগের এককগুলিতে আমরা উদ্ভিদের রোগসৃষ্টির কারণ, রোগের লক্ষণ, রোগের বিস্তার এবং উদ্ভিদের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞান লাভ করেছি। এখন উদ্ভিদ রোগবিদ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে যদি আমাদের খুব প্রাথমিক ধারণাও জন্মিয়ে থাকে তাহলে কৃষিকাজে এই বিজ্ঞানটির ব্যবহারিক গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের মনে আপনা থেকেই এই প্রশ্ন জাগে যে এই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের উপায় কি? আগেই বলা হয়েছে উদ্ভিদের রোগ সংক্রামক (inectious) এবং অসংক্রামক (non infectious) দুইই হতে পারে। অসংক্রামক রোগ অর্থাৎ মাটি, পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদি অজীবজ কারণ যে সব রোগ সৃষ্টি হয় সেগুলিকে রোগ নিয়ন্ত্রণের আলোচনায় আমরা আনছি না কেননা প্রকৃতির উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় বড় একটা আমাদের হাতে নেই। আমরা হয়তো মাটির উন্নতিসাধন করতে পারি বা আলোর প্রাবল্য নিয়ন্ত্রণে ছায়াচ্ছন্ন বা আলোকিত অঞ্চলে চাষবাস করতে পারি কিন্তু সরাসরি রোগের কারণটিকে অপসারিত করতে পারি না। অপরপক্ষে জীবজ রোগ অর্থাৎ জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগগুলিকে কিন্তু দমন করতে পারি। সরাসরি জীবাণুকে আক্রমণ করে অথবা ফসলকে জীবাণুর সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসের মধ্যেই নিহিত আছে উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণ করার বিভিন্ন উপায়। এই উপায় বা পদ্ধতিগুলিকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি (Regulatory methods) ঃ প্যাথোজেনের প্রভাব থেকে উদ্ভিদ বা কোন অঞ্চল বিশেষকে রক্ষা করাই যার উদ্দেশ্য। **কৃষ্টি পদ্ধতি** (Cultural methods) ঃ চাষের কাজে যে সমস্ত পদ্ধতিতে জীবাণু সংস্পর্শে থেকে ফসলকে রক্ষা করা হয়, **ভৌত ও রাসায়নি পদ্ধতি** (Physical and chemical methods) ঃ যে সমস্ত পদ্ধতিতে ভৌত বা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে জীবাণু ধ্বংস করে ফসল বাঁচানো হয় এবং **জীবজ পদ্ধতি** (Biological methods or Biological control) ঃ যে পদ্ধতিতে জীবাণুকে অন্য জীবিত পদার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

কোন একটি রোগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা নির্ভর করে সংক্রমণের দশা, রোগের প্রকোপ এবং উদ্ভিদটির অবস্থা অর্থাৎ দশা, বয়স ইত্যাদির উপর, তবে মোটের উপর এটা সত্য যে অধিকাংশ রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ফসলকে রোগের কারণটির ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে বেশি নিয়োজিত কেননা সংক্রমন ঘটলে শস্য হানি এড়িয়ে ফসল বাঁচানো খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভব।

উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি পাঁচটি মুখ্য নীতি অনুসরণ করে প্রয়োগ করা হয়। এই নীতিগুলি হল (1) *জীবাণুর সংস্পর্শরোধ* (Avoidance) (2) *জীবাণু বিতাড়ন* (exclusion) (3) *জীবাণু দমন* (eradication) (4) *উদ্ভিদকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো* (Protection) এবং (5) *অনাক্রম্যতা* (immunization) এই নীতি সমূহের উপর ভিত্তি করে অনুসৃত বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। কৃষিকার্যে পদ্ধতিগত পরিবর্তন এনে যখন রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন তাকে বলে **কৃষ্টিগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি** (Cultural methods)। চাশবাসের ক্ষেত্রে যখন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে রোগদমন করা হয় তখন পদ্ধতিগুলি **রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical methods)** এবং যখন ভৌত উপাদানগুলি যেমন উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদির ব্যবহারে রোগ দমন করা হয় তখন তাকে বলে **ভৌত (Physical) পদ্ধতি**। এছাড়া কৃষির জৈব উপাদানগুলির পরিবর্তন সাধন করে অথবা অন্য জীবাণু ব্যবহার করে প্যাথোজেনের সংক্রমণ প্রবণতাকে দমন করা হয় তখন তাকে বলে **জীবজ (Biological) পদ্ধতি**।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- কৃষ্টি পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ কিভাবে ফসল রক্ষা করতে পারে এ বিষয়ে অবহিত হবেন।
- উপযুক্ত মাটি, প্রতিরোধী উদ্ভিদের ব্যবহার ইত্যাদি কিভাবে রোগের প্রভাব থেকে ফসল বাঁচাতে পারে তার ধারণা করতে পারবেন।
- উত্তাপ, শৈত্য, আলো, বিকিরণ ইত্যাদির ব্যবহারে কিভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।
- রাসায়নিক জীবাণুনাশকের ব্যবহারে কিভাবে ফসল, মাটি ও শস্যাগার শোধন করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস দ্বারা কিভাবে জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তা নির্দেশ করতে পারবেন।

14.2 কৃষ্টিগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Cultural Methods) :

প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ষ্টিভেনস (Stevens) 1960 খ্রিস্টাব্দে রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কৃষিকার্যে একাধিক সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলেন। তাঁর মতে ফসল ফলানোর বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন শস্যক্ষেত্রে, ফসল কাটার সময়, ফসল গুদামজাত করার সময়, মাটি পরীক্ষার সময়ে, বীজ বাছার আগে ইত্যাদি সব কয়টি ধাপে যদি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা যায় তাহলে কোন জীবাণুনাশক ব্যবহার না করে শুধুমাত্র কৃষ্টিগত পদ্ধতিতেই রোগ নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সাফল্য আশা করা যায়।

14.2.1 জীবাণুর সংস্পর্শ রোধ (Avoidance of Pathogen) :

(a) শস্যক্ষেত্রের ভৌগলিক অবস্থান ঃ ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকঘটিত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ শুষ্ক অঞ্চলের তুলনায় সিক্ত অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশি। সুতরাং যে সব ফসল এ ধরনের ভৌগলিক অবস্থানের প্রতি অধিক

সংবেদনশীল তাদের প্রতিকূল পরিবেশে চাষ না করাই ভাল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, *Tylosporium penicillariae* নামক ছত্রাক যা বাজরার স্মাট রোগের জন্য এবং *Claviceps microcephala* নামক ছত্রাক যা ঐ একই ফসলের আরগট (ergot) রোগের জন্য দায়ী, তারা শুষ্ক অঞ্চলে প্রায় কোন ক্ষতিই করতে পারে না। অথচ বাজরা সিক্ত অঞ্চলে চাষ করলে প্রায়শই এই দুইটি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

(b) মাটির উপযুক্ত ব্যবহার ঃ শস্যক্ষেত্রের মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অতএব যে অঞ্চলে একবার কোন সংক্রমণ হয়েছে, শোধন না করে সেই অঞ্চলের মাটিতে পরবর্তীকালের চাষ করা হলে সংক্রমনের প্রকোপ বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে কেন না *রোগবীজের পরিমাণ* (inculum build-up) মধ্যবর্তী সময়ে গাণিতিক হারে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(c) রোপনের সময় ঃ সমস্ত প্যাথোজেনই উপযুক্ত পরিবেশে সর্বাধিক হানিকারক। যেমন, *গুঁড়া চিতি রোগ* (dowry mildew) বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি হলেই বিস্তার লাভ করে। সুতরাং বীজ বপনের কাল যদি এমন বেছে নেওয়া হয় যাতে আর্দ্রতা এড়িয়েই ফসল ঘরে তোলা যাবে তাহলে রোগজনিত ক্ষতি এড়ানো যায়।

(d) রোগ-এড়ানো প্রকরণ (Disease escaping variety) ব্যবহার ঃ *রোগ-প্রতিরোধী* (Disease resistant) ও *রোগ-এড়ানো* (disease escaping) প্রকরণ কিন্তু এক ব্যাপার নয়। রোগ প্রতিরোধী প্রকরণগুলি তাদের অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট দ্বারা সংক্রমণ প্রতিহত করে কিন্তু রোগ-এড়ানো প্রকরণগুলির কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এমনই যে তারা রোগের প্রকোপ তীব্র হবার আগেই পরিণতি লাভ করে ফলে ফসলের ক্ষতি হয় না। উদাহরণ স্বরূপ গমের শীঘ্র পূর্ণতা লাভ করে এমন early maturing variety র কথা বলা যায় না *Puccinia graminis tritici* নামক মরিচা রোগের ছত্রাক আক্রমণ কালের পূর্বেই পেকে যায়।

(e) বীজ বাছার কাজে সতর্কতা ঃ বীজ বা বীজরূপে ব্যবহৃত উদ্ভিদ অঙ্গ যা চাষের কাজে ব্যবহার করা হয় তাদের উৎস বা গুণাগুন জানাটা বিশেষ জরুরী। ভারতে যেমন আলুর বীজ রূপে সিমলা থেকে আনা আলু ব্যবহার করা হয় কেননা এগুলি হল ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন প্রতিরোধী। আমেরিকায় দেশের যে কোন অঞ্চলে চাষের জন্য বাঁধাকপি, বীন, মটর ইত্যাদির বীজ আনা হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দক্ষিণ উপকূলভাগ থেকে কেন না এই বীজগুলি সহজে সংক্রামিত হয় না।

(f) চাষের কাজে আধুনিকীকরণ (Modernization of Cultural Practices) ঃ দুটি উদ্ভিদ বা দুই সারি উদ্ভিদের মধ্যে দূরত্ব, জলসেচনের সময় ও পরিমাণ, সারের পরিমাণ ও প্রকৃতি, চারা রোয়ার সময় বেছে নেওয়ার সঠিকতা, *মিশ্র প্রথায়* (mixed cropping) *চাষ*, চারা বপনের গভীরতা ইত্যাদি কৃষিকার্যঘটিত বিষয়গুলিকে উপযুক্ত পরিবর্তন সাধন করে অথবা সেগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রয়োগ করে আমরা রোগ দমন করতে পারি অথবা রোগের প্রাবল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারি। মাটি কর্ষণের গভীরতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ছত্রাকঘটিত রোগের প্রাবল্যকে প্রভাবিত করে। দুটি বিপরীতধর্মী গবেষণার কথা এখানে বলা যায়। গম চাষের ক্ষেত্রে Garren ও Duke (গ্যারেন ও ডিউক, 1957) তাঁদের পর্যবেক্ষণে দেখিয়েছিলেন যে গভীর কর্ষণে বিগত বছরের উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ মূল যত বেশি মাটির গভীরে চলে যায় সংক্রমণের হারও ঠিক সেই অনুপাতে কমে। অপরপক্ষে Brooks ও Dawson (ব্রুকস ও ডসন, 1968) দেখেন যে অগভীর কর্ষণ বা কর্ষণবিহীন মাটিতে গম চাষ করলে সংক্রমনের প্রাবল্য এত বেশি থাকে যে ফসল পাওয়া যায় না বললেই চলে।

মিশ্রচাষ পদ্ধতি সংক্রমণ প্রতিরোধে একটি উল্লেখযোগ্য দমনকারী হাতিয়ার। পাঞ্জাবে ও হরিয়ানায় তুলার মূলের পচন রোগ সৃষ্টিকারী *Rhizoctonia bataticola* নামক ছত্রাকের প্রকোপ দৃশ্যতঃই কমে যায়, যখন তুলা ও ডাল একসাথে চাষ করা হয়। একইভাবে ডালের ধ্বসা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক *Phyllostica phaseolina* এর সংক্রমনও ঐ মিশ্রচাশের ফলে নিয়ন্ত্রণে থাকে।

অনুশীলনী - 1

1. উপযুক্ত উদাহরণ সহ নিম্নের উক্তিগুলির সত্যতা নির্ধারণ করুন ঃ

   a) শস্যক্ষেত্রের ভৌগলিক অবস্থান শস্যের রোগপ্রবণতার জন্য দায়ী।

   b) বাতাসের আর্দ্রতার পরিমান কখনও সংক্রমনের হার নিয়ন্ত্রণ করে।

   c) ফসলের পরিণতি কাল এগিয়ে আনলে ফসল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচে।

   d) মিশ্র পদ্ধতিতে চাষ ফসল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার কার্যকরী উপায়।

   e) বিশেষ অঞ্চলের বীজ বপনের কিছু বিশেষ সুবিধা আছে।

2. রোগ দমনের মূল নীতিগুলি কি কি?

3. কৃষ্টিগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রবক্তা কে এবং এই পদ্ধতিতে কি নীতি অনুসৃত হয়?

(g) কোয়ারানটাইন (Quarantine) ঃ যে আইনগত বাধ্যবাধকতার ফলে উদ্ভিদের সংক্রমণজাত রোগ সংক্রামিত অঞ্চল থেকে অসংক্রামিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে না সেই আইনী ব্যবস্থাকে বলে কোয়ারানটাইন। সাধারণভাবে একটি ভৌগলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ প্যাথোজেন যখন সীমানা ছাড়িয়ে নতুনতর অঞ্চলে ঢুকে পড়ে তখন তার জন্য ফসলের ক্ষতি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। অসংক্রামিত অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বিনা বাধায় সেটি ধ্বংসলীলা চালাতে পারে কেন না অসংক্রামিত উদ্ভিদে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়েই ওঠে নি। পৃথিবীতে ফসলের কয়েকটি ভয়ঙ্কর মহামারী এইরকম বিজাতীয় প্যাথোজেনের সীমানা অতিক্রমণের ফলেই ঘটে গিয়েছিল। নীচের সারণিতে এইরকম (সারণি 1) কয়েকটি মহামারীর সময় ও প্যাথোজেনের উৎসস্থলের কথা জানানো হল ঃ

সারণি - 1

রোগ	খ্রিস্টাব্দ	কোন দেশে আগত	উৎস
1. আলুর ধ্বসা রোগ (জীবাণু ঃ *Phytophthora infestans*)	1830	ইয়োরোপ	দঃ আমেরিকা
2. আঙুরের শ্বেত চিতি (Powdery mildew) (জীবাণু ঃ *Uncinula necator*)	1845	ইংল্যান্ড	যুক্তরাষ্ট্র

3. পাইন গাছের মরিচা-দাহ রোগ (Blister rust of pine) (জীবাণু ঃ *Cronortium ribicola*)	1910	যুক্তরাষ্ট্র	ইয়োরোপ
4. আঙুরের গুঁড়া চিতি (Downy mildew of grapes) (জীবাণু ঃ *Plasmopara viticola*)	1878	ফ্রান্স	যুক্তরাষ্ট্র
5. লেবু বা কমলালেবুর ক্যাঙ্কার রোগ (Citrus canker) (জীবাণু ঃ *Xanthomonas citri*)	1907	যুক্তরাষ্ট্র	এশিয়া
6. ধানের "ব্লাষ্ট" রোগ (জীবাণু ঃ *Pyricularia oryzae*)	1918	ভারত	দঃ পূঃ এশিয়া

কেবলমাত্র ভারতবর্ষে বহিরাগত কয়েকটি রোগের জীবাণু ও উৎস নীচের 2 সারণিতে বিবৃত হলঃ

সারণি- 2

রোগের নাম	জীবাণু	বৎসর	উৎস ভূমি
1. কফির পাতায় মরিচা রোগ (Leaf rust of Coffee)	*Hemileia vestarix*	1879	শ্রীলঙ্কা
2. আলুর নাবি ধ্বসা রোগ (Late blight of Potato)	*Phytophthora infestans*	1880	দঃ আমেরিকা
3. গমের "স্মাট" রোগ (Flag smut of wheat)	*Urocystis tritici*	1906	অস্ট্রেলিয়া
4. ভুট্টার গুঁড়া রোগ (Dowry mildew of Maize)	*Sclerospora Phillipinensis*	1912	জাভা দ্বীপপুঞ্জ
5. ধারেন "ব্লাষ্ট" রোগ (Paddy blast)	*Pyricularia oryzae*	1918	দঃ পূঃ এশিয়া
6. তামাকের কালো ছোপ দাগ (Black shank of Tobacco)	*Phytophthora nicotianae*	1938	ইষ্ট ইন্ডিজ
7. আপেলের ক্রাউন-গল (Crown gall of apple)	Virus	1940	ইংল্যান্ড
8. আলুর গুটি রোগ (wart disease of potato)	*Synchitrium endobioticum*	1955	হল্যান্ড
9. পেঁয়াজের স্মাট রোগ (Onion smut)	*Urocystic cepulae*	1958	ইয়োরোপ

উপরিলিখিত সারণি থেকেই বোঝাই যাচ্ছে যে আমদানিকৃত কৃষিপণ্যের মাধ্যমে রোগগুলি নতুনতর জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং মহামারীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই কৃষির উন্নতির সাথে সাথে রোগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে এই ধরনের আইন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সমস্ত কৃষিতে উন্নত দেশের ক্ষেত্রেই কৃষিপণ্য আমদানি রপ্তানিতে এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 1912 খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই আইন চালু হয়। ভারতে 1914 খ্রিস্টাব্দে **Destructive insects and Pests act** এর মাধ্যমে আইনটি বলবৎ করা হয় এবং ধারাটির এখনও পর্যন্ত আটটি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। কোয়ারানটাইন আইন অনুযায়ী কোন একটি বিশেষ খাদ্যশস্য বা অন্য যে কোন প্রয়োজনে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা উদ্ভিদ দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছানোর আগেই পরিদর্শকদের পরামর্শ মতো সেটিকে "পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে" নিয়ে আসা হয়। সারা দেশে এরকম বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র আছে যেগুলি বহিরাগত উদ্ভিদটিকে অন্য দেশজ উদ্ভিদের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে বেশ কিছুদিন কড়া নজরে রাখে। এই নজরদারির পর্যায়ে উদ্ভিদটি কোনরকম জীবাণু বহন করছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে যাচাই করা হয়। বেশ কিছুদিন নিরীক্ষার পর বহিরাগত উদ্ভিদটির রোগমুক্ত দশা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলেই সেটিকে আমদানিকারকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে আটটি সমুদ্রবন্দরে, ছয়টি বিমানবন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরে দুটি এ ধরনের কোয়ারানটাইন কেন্দ্র আছে। এগুলির মধ্যে একটি দার্জিলিং জেলার সুকিয়াপোখরিতে অবস্থিত।

উদ্ভিদরোগের সমস্যাটি কেবলমাত্র আঞ্চলিক নয়, বরং বিশ্বব্যাপী সমস্যারূপেই এটি চিহ্নিত হওয়া উচিৎ। সেইমত রোম শহরে 1951 খ্রিস্টাব্দে 50টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি উদ্ভিদ সুরক্ষা সমাবেশ বা Plant Protection Convention অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি হল ঃ

1. একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির গঠন যারা ফসলের নিরীক্ষণ সাপেক্ষে বিপদমুক্ত ঘোষণাপত্র জারি করতে সক্ষম হবেন।
2. বিভিন্ন দেশের মধ্যে রোগ ও রোগজীবাণু সম্পর্কিত তথ্যের আদান প্রদান এবং একই তথ্য রাষ্ট্রসংঘের FAO বা Food and Agriculture Organization কে প্রদান।
3. আন্তর্জাতিক গবেষণার সুযোগ-যাতে দেশের বাইরের সম্ভাব্য রোগগুলি সম্পর্কে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির বৈজ্ঞানিকরা ওয়াকিবহাল হতে পারেন।

সেইমত ছয়টি আঞ্চলিক গোষ্ঠী গঠন করা হয় ঃ

(i) ইয়োররোপীয় উদ্ভিদ-রক্ষা গোষ্ঠী।

(ii) আন্তঃ আফ্রিকা উদ্ভিদ-রক্ষা কমিশন।

(iii) দঃ পূঃ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কমিশন।

(iv) মধ্য আমেরিকা ও মেকসিকোর আঞ্চলিক কমিশন।

(v) দঃ আমেরিকা আঞ্চলিক কমিশন।

(vi) নিকট প্রাচ্য উদ্ভিদ-রক্ষা কমিশন।

উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক আদান প্রদান আজ এইসব সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত নিয়মাবলীর অধীন। তবু একথা ঠিক উদ্ভিদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ স্থানবিশেষের নজরদারিতে আটকানো সম্ভব নয়। সুতরাং এত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত রোগের প্রভাব থেকে দেশজ উদ্ভিদকে সব সময় রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ফলে রোগ দমনের অন্যান্য উপায়গুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

14.2.2 প্যাথোজেন বিনাশের কৃষ্টিগত পদ্ধতি (Eradication of the pathogen by cultural methods) :

কৃষ্টি পদ্ধতি প্যাথোজেন বিনাশ অপেক্ষাকৃত বেশি আয়াসসাধ্য এবং পরোক্ষ পদ্ধতি কেন না প্যাথোজেন বিনাশের অনেক শক্তিশালী রাসায়নিক পদ্ধতি চালু আছে। কৃষ্টি পদ্ধতিতে প্যাথোজেনকে সরাসরি আক্রমণ না করে অপ্রত্যক্ষভাবে তার পুষ্টি সংকট তৈরি করে সেটিকে অপসারণের চেষ্টা করা হয়। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ :

1. আক্রান্ত উদ্ভিদ বা তার অংশবিশেষের শস্যক্ষেত্র থেকে অপসারণ।
2. ফসল যখন মুখ্যপোষক তখন আঞ্চলিক স্তরে প্যাথোজেনের গৌণপোষকের অপসারণ। যেমন, *Puccinia graminis* নামক ছত্রাকের মুখ্যপোষক হল গমগাছ। গমগাছের পাশাপাশি অন্য একটি উদবিদ, *Barberis vulgaris* এর প্রয়োজন এটির জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে। এই উদ্ভিদটি হল গৌণ পোষক এবং এটির অপসারণে জীবাণু জীবনচক্র সম্পূণও করতে বাধা পায়।
3. ফসল ফলানোর কালে দুটি চাষের অন্তর্বর্ত্তী সময়ে অন্য কোন ফসল চাষ করলে প্যাথোজেনের কার্যকারিতা বহুলাংশে কমে যায়। মাটি বাহিত রোগ যেমন গমের মোজাইক, অড়হড় বা মসুরের Wilt বা অবনমন, আখের লোহিত পচন ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে দুই ফসলী চাষের সুফল পাওয়া গেছে।
4. স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্যাথোজেনের প্রকোপ কমানোর জন্য একটি বড় উপায় হতে পারে। ফসলের এবং মাটির উভয়ের স্বাস্থ্যবিধি সম্মত পরিচর্যা প্রয়োজন।
5. আক্রান্ত উদ্ভিদের উত্তাপ বা রাসায়নিক দ্বারা শোধন প্যাথোজেন বিনাশে সহায়ক। গম বা বার্লির বীজকে গরম জল (কম বেশি 60°C উষ্ণতা) দ্বারা শোধন করা একটি চালু পদ্ধতি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সবজি চাষের জন্য যেসব উদ্ভিদ দেহাংশ নেওয়া হয় (যেমন, আলু) সেগুলির গরম হওয়ার প্রভাবে শোধন করে নেওয়া হয়। রাসায়নিকের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।
6. মাটি শোধন কৃষিকার্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। এজন্য কীট ও ছত্রাকনাশক বাষ্পের ব্যবহার (fumigation), উত্তাপের বা রাসায়নিক পদার্থের (heat or chemical treatments) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - 2

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

a) ভারতবর্ষের কোয়ারানটাইন আইনটি কি নামে পরিচিত ?

b) ভারতবর্ষে কয়টি কোয়ারানটাইন কেন্দ্র আছে ?

c) পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোয়ারানটাইন কেন্দ্র আছে ?

d) ভারতে বহির্বিশ্ব থেকে আগত একটি ভাইরাসঘটিত রোগের নাম ও উৎসস্থলের নাম বলুন।

e) ভারতে ঘটে যাওয়া একটি উদ্ভিদ মহামারীর নাম, সময় ও উৎসস্থলের নাম বলুন।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলির সত্যতা নিরূপণে উদাহরণ দিন ঃ

a) গৌণ পোষক অপসারণে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

b) দুই ফসলী চাশ রোগদমনে সহায়ক।

c) উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহে বীজ শোধন করা সম্ভব।

d) গরম জল দ্বারা শোধন করবার জন্য সুনির্দিষ্ট উষ্ণতার ব্যবহার করা হয়।

14.3 জীবজ নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি (Biological Control Measures)

অন্য জীব বা জীবাণুর প্রভাবে প্যাথোজেনের আংশিক বা সম্পূর্ণ অপসারণ পদ্ধতিকে বলে জীবজ নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি। প্রকৃতিতে এ রকম হামেশাই দেখা যায়। যেমন, কোন বিশেষ অঞ্চলে মাটির অবদমনকারী ভূমিকার জন্য প্যাথোজেন কার্যকারিতা হারায়। আবার এবং অসংক্রামক বীজাণুর প্রভাবে প্যাথোজেনের বৃদ্ধি কখনও রহিত হয়। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে রোগ নিয়ণ্রণ করার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কৌশল এখানে আলোচিত হল।

14.3.1 অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ :

(a) অবদমনকারী মৃত্তিকা **(Suppresive Soil)** ঃ অধিকাংশ মাটিতে বসবাসকারী প্যাথোজেন যেমন *Fusarium sp, Phytophthora sp, Pythium sp* তাদের মারক ভূমিকা নেয় সহায়ক মৃত্তিকা-পেলে। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে মাটি যদি অবদমনকারী হয় তাহলে রোগের প্রকোপ অনেকটাই কমে যায়। মূলতঃ মাটিতে অন্য জীবাণুর উপস্থিতি এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী। মাটিতে *Penicillium,. Trichoderma* ইত্যাদি ছত্রাক বা *Pseudomanas* বা *Bacillus* ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি মাটিতে একধরনের অনাক্রমণ্যতা প্রদান করে। এই জীবাণুগুলির সাথে প্যাথোজেনের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে অসহযোগিতার। আসহযোগিতার (antagonism) কারণগুলি নানাবিধ হতে পারে।

(i) প্যাথোজেনের মধ্যে পরজীবিরূপে প্রতিরোধী জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে ফলে প্যাথোজেনের মৃত্যু অবশ্যম্ভবী।

(ii) খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতায় প্যাথোজেন এঁটে উঠতে পারে না।

(iii) অসহযোগী জীবাণু নিঃসৃত বিভিন্ন রাসায়নিক অ্যান্টিবায়োটিকরূপে কাজ করে প্যাথোজেনকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

(iv) অসহযোগী জীবাণুর বিপাকীয় পদার্থের প্রভাবে প্যাথোজেন কার্যকারিতা হারায়।

তবে দেখা গেছে যে যে সমস্ত জীবাণু মাটির স্বাভাবিক বসবাসকারী তাদের পক্ষেই এই ভূমিকা অধিগ্রহণ সম্ভব। বাইরে থেকে মাটিতে জীবাণু প্রয়োগ করে মাটিতে অসহযোগী করে তোলা অন্ততঃপক্ষে কৃষিক্ষেত্রে এখনও সফল হয় নি যদিও গবেষণাগারে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে।

(b) ফাঁদ উদ্ভিদের (**Trap Plant**) এর ব্যবহার ঃ পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য এটি একটি অভিনব পদ্ধতি। বীন, গোমরিচ বা স্কোয়াশ জাতীয় ফসলের জমির চারপাশে যদি কয়েকসারি উচ্চতাসম্পন্ন ভুট্টা, রাই, ইত্যাদির চারা লাগানো যায় তাহলে ভাইরাসবহনকারী অ্যাফিড (Aphid) জাতীয় পোকা প্রথমে এই ফাঁদগুলিকে আক্রমণ করে। ভাইরাস যেহেতু Aphid এ স্থায়ী বসবাসকারী নয় সেহেতু সেগুলি ফাঁদেই মুক্ত হয় এবং Aphid যে সময় বীন বা গোলমরিচের সান্নিধ্যে আসে সেই সময় সেটি ভাইরাসমুক্ত। কীটনাশক দ্বারা সহজেই Aphid পোকা মারা যায় কিন্তু ভাইরাস নয়। বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে এই পদ্ধতি কার্যকর যদিও খরচসাপেক্ষ বটে।

(c) বিরোধী উদ্ভিদ (**Antagonistic Plants**) এর ব্যবহার ঃ কয়েক ধরণের উদ্ভিদ যেমন গাঁদা, শতমূলী ইত্যাদি নিমাটোড জাতীয় কৃমি—যারা উদ্ভিদের লক্ষ্যণীয় ক্ষতিসাধন করে, তাদের বৃদ্ধি ও জননে বাধা দান করে। সাধারণতঃ এই সময় উদ্ভিদের মূল নিঃসৃত কোন কোন পদার্থ নিমাটোডের পক্ষে হানিকার হয়ে থাকে। সহজেই নিমাটোড বা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এমন ফসলের মাঝে মাঝে গাঁদা জাতীয় গাছ লাগালে ফসল ক্ষতি অনেকটা কমানো যায়।

14.3.2 প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ :

যে সমস্ত জীবজ নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি সরাসরি সংক্রমণ ক্ষেত্রে বা আক্রান্ত অংশে প্রয়োগ করা হয় তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ **বিরোধী জীবাণু** (Antagonistic microorganism) সংক্রমনের আগে বা পরে আক্রান্ত অঞ্চলে প্রয়োগ করে সংক্রামক জীবাণুকে ধ্বংস করা হয়।

(a) **বিরোধী ছত্রাক ঃ কয়েকটি উদাহরণ**

- শীতপ্রধান অঞ্চলে পাইন গাছ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রোপন করা হয় যাতে কাঠ পাওয়া যায়। কাঠের জন্য মূল গাছটিকে মাটিতে রেখে তার শাখা-প্রশাখা ছেদন করার রীতি আছে। এই কাটা অংশ দিয়ে *Heterobasidion annosum* নামক ছত্রাক পাইনের শেকড়কে আক্রমণ করে এবং পচন সৃষ্টি করে। দেখা গেছে যে কাটার পর ছেদন অংশে যদি *Peniophora gigantea* নামক ছত্রাকের রেণু কাটার সাথে সাথে মাখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সংক্রমণ হতে পারে।
- রাঙা আলুর অবনমন বা Wilt সৃষ্টিকারী ছত্রাক হল *Fusarium oxysporum,* মজার কথা হল এই ছত্রাকের অপর একটি প্রকরণ আছে যা অসংক্রামক। রোপন কালে বীজ আলুতে সংক্রমন ঘটলে অসংক্রামক strain টি প্রয়োগে সংক্রমন তাড়ানো যায়।
- টম্যাটোর ফুল থেকে ফল আসার মধ্যবর্তী দশায় যদি *Penicillium* নামক ছত্রাক দ্বারা সেটিকে বীজায়িত করা যায় তাহলে *botrytis* নামক ছত্রাকের ক্ষতিকারী সংক্রমণ প্রতিহত হয়।

- কমলালেবু বা সাধারণ লেবুর ফল তোলার পর গুদামে বা সাধারণভাবেই সেগুলি *Penicillium digitatum* দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সংক্রমণ সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয় যদি ফসল তোলার পর *Trichoderma* নামক অপর একটি ছত্রাকের রেণু দ্বারা স্প্রে করা যায়।

- মূলে বসবাসকারী মিথোজীবি ছত্রাক হল **মাইকরহিজা** (Mycorrhizae)। এরা মূলের ভিতরে *(এণ্ডোমাইকরহিজা)* বা বাইরে *(একটোমাইকরহিজা)* বসবাস করে এবং মূল থেকে খাদ্য পাবার বিনিময়ে উদ্ভিদকে জল ও পরিপোষক সংগ্রহে সহায়তা করে। এই জাতীয় ছত্রাক প্রয়োগে বহু সংক্রমন বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদে এড়ানো যায়। পাইন গাছের *Phytophthora cinnamoni* দ্বারা আক্রান্ত চারা গাছে মাইকরহিজা স্প্রে করলে সম্পূর্ণভাবে বা উল্লেখযোগ্যভাবে সংক্রমণ হার কমে যায়।

(b) বিরোধী ব্যাকটেরিয়া **ঃ** কয়েকটি উদাহরণ

- ডালিম, আঙুর জাতীয় ফল বা গোলাপ জাতীয় ফুল গাছের ক্রাউন গল রোগ হয় *Agrobacterium tumefaciens* এর প্রভাবে। এই ব্যাকটেরিয়ার অপর একটি একই গন কিন্তু ভিন্ন প্রজাতির সদস্য *Agrobacterium radiobacter* এর প্রভাবে সম্পূর্ণ ভাবে অকার্যকরী হয়ে পড়ে।

- দানাশস্য, ভুট্টা, গাজর ইত্যাদির বীজ *Bacillus subtitis* নামক ব্যাকটেরিয়ার জলীয় মিশ্রণে ধুয়ে নিয়ে রোপন করলে সংক্রমনঘটিত ফসলহানি অনেকটা কমে যায়। একইভাবে *Pseudomonas* নামক ব্যাকটেরিয়া, আক্রান্ত মূলে প্রয়োগ করলে নরম পচন রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।

- নানা রকমের শক্ত খোলার ফল যেমন আখরোট, ডালিম, পীত ইত্যাদির ফসল তোলার পর *Bacillus subtitis* দ্বারা শোধন করলে বাদামী পচন সৃষ্টি কারী ছত্রাক *Monilia fructicola* অন্ততঃপক্ষে নয় দিনের জন্য অকার্যকরী থাকে। ইতিমধ্যেই ফসল বাজারে চলে আসে বা গুদামজাত করার দরকার হলে এই সময়কাল পরে পুনরায় স্প্রে করা যায়।

- *Pseudomonas* বা *Bacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন উদ্ভিদের উর্ধ্বাংশে অবস্থান করে। এগুলি হল অসংক্রামক, কিন্তু ঐ একই অঞ্চলে থাকে (অর্থাৎ পাতায় বা শাখায়) *Psudomonos synergiae* এর মত সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া, সহ অবস্থানে অবশ্য সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া অকার্যকরী। তাই আপেল গাছের পাতায় *Psudomonas* এর সংক্রমনের ক্ষেত্রে অসহযোগী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা স্প্রে করা একটি চালু রীতি।

(c) বিরোধী ভাইরাস **ঃ** ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নিমাটোড বা পতঙ্গ সবাই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমনে ব্যাকটেরিওফাজ (Bacteriophage) ভাইরাস প্রয়োগ করে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। তাও কেবলমাত্র গবেষণাগারের পরিবেশে, কার্যক্ষেত্রে কাজ প্রয়োগে ব্যাকটেরিয়া দমনের কোন নজীর নেই। তবে সম্ভাবনা আছে বলেই এ সংক্রান্ত গবেষণা জারি আছে।

অনুশীলনী - 3

1. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিন ঃ

a) বীন চাষের ক্ষেত্রে জমির চারপাশে ভুট্টা চারা লাগানো হয়।

b) ফসলের মাঝে মাঝে গাঁদার চারা লাগালে সংক্রমন কমানো যায়।

c) টম্যাটোর ফল আসার পূর্বে সেটিকে *Penicillium* দ্বারা স্প্রে করা ভাল।

d) *মাইকরহিজার* উপস্থিতি রোগ দমনে সহায়ক ভূমিকা নেয়।

e) দানা শস্য *Bacillus* এর জলীয় মিশ্রণে ধৌত করা হলে রোগের প্রকোপ কমে যায়।

2. "মাটিতে জীবাণুর উপস্থিতি প্যাথোজেনের পক্ষে অসহযোগী" এই উক্তির স্বপক্ষে অন্ততঃ তিনটি কারণ নির্দেশ করুন।

3. বাঁদিকের স্তম্ভে সংক্রামক জীবাণু ও ডান দিকের স্তম্ভে সেটির প্রতিরোধী জীবাণুর নাম দেওয়া আছে। যথাযথভাবে তাদের মেলান ঃ

(i) *Heterobasidium sp*	(a) *Bacillus subtitis*
(ii) *Botrytis sp*	(b) মাইকরহিজা
(iii) *Phytophthora sp*	(c) *Agrobacterium radiobacter*
(iv) *Agrobacterium tumefaciens*	(d) *Penicillium*
(v) *Monilia fructicola*	(e) *Peniophora*

14.4 রোগ দমনের ভৌত পধতি (Physical Methods of Disease Control) :

14.4.1 উত্তাপের ব্যবহার ঃ

(a) মাটি ঃ বীজতলা বা খামার বাড়ির মাটি শুষ্ক অথবা বাষ্পীয় উত্তাপ দ্বারা *শোধন* (Sterilization) করা যায়। 50^0C উষ্ণতায় নিমাটোড ও বেশ কিছু ছত্রাক (উদাঃ *উমাইসিটিস* গোষ্ঠীযুক্ত ছত্রাক) অপসারিত হয়, তবে অধিকাংশ উদ্ভিদ সংক্রমণকারী ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি 60^0C থেকে 72^0C উষ্ণতায় দূরীভূত হয়। আগাছা এবং অন্যান্য কয়েকপ্রকার ব্যাকটেরিয়া 82^0C এর বেশি উষ্ণতায় বাঁচে না। TMV জাতীয় ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে শোধন উষ্ণতা 100^0C এর ধারে কাছে হওয়া উচিৎ। সাধারণতঃ মাটি শোধনের সময় সর্বনিম্ন 82^0C উষ্ণতায় আধঘন্টা মাটিকে রাখা হয় এবং এ কাছে ইদানীং বৈদ্যুতিক উত্তাপ ব্যবহার করা হয়।

(b) উত্তপ্ত জলের ব্যবহার ঃ বীজ, বীজকন্দ ও অন্যান্য অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদ অংশ উত্তপ্ত জল (Hot water treatment) ব্যবহার করে শোধন করা যায়। এক্ষেত্রে বীজত্বকে উপস্থিত প্যাথোজেন নিষ্ক্রিয় করার রীতি বহুদিন ধরে ধান, গমন জাতীয় দানাশস্যের চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর কারণ হয় বীজ জাতীয় সুপ্ত উদ্ভিদ অঙ্গ প্যাথোজেনের থেকে বেশি সময় ধরে অপেক্ষাকৃত বেশি উষ্ণতা সহ্য করেও কার্যকরী থাকতে পারে। বীজ থেকে বীজে এবং বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে উষ্ণতা এবং শোধনকালের স্থায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। যেমন গমের স্মাট রোগের ক্ষেত্রে 52°C উষ্ণতা 10 মিনিটের জন্য ব্যবহার্য।

(c) উত্তপ্ত বায়ুর ব্যবহার ঃ গুদামজাত শস্যের ক্ষেত্রে উত্তপ্ত বায়ু ব্যবহার (Hot air treatment) করে বীজ বা অঙ্গজ জননকারী অংশ থেকে অতিরিক্ত জল অপসারিত করে সুফল পাওয়া যায়। যেমন রাঙা আলুর ক্ষেত্রে 28°C থেকে 32°C উষ্ণতায় 2 সপ্তাহ রেখে দিলে যেমন ক্ষত অংশ চট করে শুষ্ক হয়ে যায় তেমনি *Rhizopus* নামক ছত্রাকের বা *মোলড* (Mould) ছত্রাকের সংক্রমণ এড়ানো যায়।

14.4.2 আলোক নিয়ন্ত্রিত রোগ দমন পদ্ধতি :

বিভিন্ন ছত্রাক যেমন *Alternaria, Botrytis* ইত্যাদির ক্ষেত্রে রেণু উৎপাদনের উপযোগী আলো হল অতিবেগুণী রশ্মির নিকটবর্ত্তী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো (360mm এর কম)। নার্সারী বা নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রে উদ্ভিদের চাষে *অতিবেগুণী আলোর ছাঁকনি* (ultravilet filter) ব্যবহার করে এই প্যাথোজেনগুলির সংক্রমণ এড়ানো সম্ভব।

14.4.3 শৈত্য প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ :

স্বাভাবিকভাবে রোগ দমনের বা নিয়ন্ত্রণের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য পধতি হল শৈত্য প্রয়োগ। হিমঘরে রাখা শস্য থেকে প্যাথোজেন অপসারিত হয় না সত্য তবে প্যাথোজেনের বৃধি বা বিপাকক্রিয়া গুরুতরভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফল, আলু এইসব ফসল এই পদ্ধতিতেই দীর্ঘদিন রোগমুক্ত রাখা সম্ভব হয়।

14.4.4 বিকিরণের ব্যবহার :

বিভিন্ন বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ যেমন **uv** আলো, **X** রশ্মি, () গামা রশ্মি ইত্যাদি ব্যবহার করে দেখা গেছে যে রোগ নিয়ন্ত্রণে ঐ রশ্মির বিকিরণের অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য ভূমিকা আছে। তবে বিকিরকের এই মাত্রা উদ্ভিদ কোশের পক্ষেও হানিকর তাই এখনও সফলভাবে বিকিরণ ব্যবহার করে রোগহীন ফসল বাজারে আসে নি।

অনুশীলনী - 4

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

a) মাটি থেকে ছত্রাক, আগাছা ও ব্যাকটেরিয়া অপসারণের উপযুক্ত উষ্ণতা কি ?

b) গমের স্মাট (Smut) রোগ দমনে বীজ শোধনের জন্য জলের উষ্ণতা ও স্থায়িত্বকাল কি?

c) উত্তপ্ত বায়ু ব্যবহার করে বীজ শোধনে সুফল পাবার কারণ কি ?

d) অতিবেগুণী আলোর ছাঁকনি কিভাবে সংক্রমন প্রতিরোধ করে?

e) কোন বিকিরিত রশ্মি ফসলরক্ষায় সবচেয়ে কার্যকরী?

2. রোগ দমনের পাঁচটি ভৌত পদ্ধতির নাম লিখুন।

14.5 জীবাণু দমনের রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical methods of plant disease Control) :

জীবনের হাত থেকে ফসলকে শস্যক্ষেত্রে বা শস্যাগারে রক্ষা করার সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল রাসায়নিক যৌগগুলির ব্যবহার। এই যৌগগুলি জীবাণুর বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে অঙ্কুরোদগমের সময় সক্রিয় বাধাদান করে অথবা সরাসরি জীবাণুকে আক্রমণ করে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। রাসায়নিকগুলির বিষয়ে আলোচনার আগে সেগুলোর প্রয়োগবিধি সংক্রান্ত আলোচনা কাজে আসবে বলে মনে হয়।

14.5.1 রাসায়নিক জীবাণুনাশকের প্রয়োগবিধি :

- **পত্রবাহী শাখায় গুঁড়ো ছিটানো অথবা স্প্রে করা :** মূলতঃ ছত্রাকজাতীয় প্যাথোজেনকে দমনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলি এভাবে প্রয়োগ করা হয়। এরা প্রতিশেধক জাতীয় (Protectant) রাসায়নিক এবং সংক্রমনের পূর্বেই এদের প্রয়োগ করা হয়। অপেক্ষাকৃত নতুন ছত্রাকনাশকগুলি অবশ্য নির্মূলক (eradicant) রূপে কাজ করে এবং সংক্রমণ মহামারীর রূপ ধারণ করলেই এগুলির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গুঁড়ো হিসাবে ছড়ানোর থেকেও স্প্রে করলে সুফল বেশি পাওয়া যায়। তবে খুব বৃষ্টির সময় স্প্রে-র তুলনায় অপর পদ্ধতিটি বেশি কার্যকরী। অধিকাংশ সময়ই স্প্রে করার জন্য মূল রাসায়নিকটির সাথে অন্য সহযোগী যৌগ মেশানো হয়ে থাকে। *চুনের জল* (lime water) বা *ঘন তেল* (essential oil) ইত্যাদি মেশানোর রীতি আছে। ধোঁয়ার মত করে ছত্রাকনাশক ছড়িয়ে দিয়ে বা স্প্রে করে ফসলের প্রায় সমস্ত উন্মুক্ত উপরিতলকেই তার আয়ত্বে আনতে হয় কেন না এগুলি সরাসরি সংযোগেই ক্রিয়াশীল। কচি পাতা অথবা মুকুলের সংবেদনশীলতা অপেক্ষাকৃত কম হবার দরুণ সেটি ছত্রাকনাশকের প্রভাব পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই কাটিয়ে ওঠে। সুতরাং প্রথমবার প্রয়োগের পর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আবার স্প্রে করা হয়। ব্যবধানটি 7 থেকে 14 দিনের অথবা তারও বেশি হতে পারে। প্যাথোজেনের প্রকৃতি, ফসলের সংবেদনশীলতা, আক্রমণের ব্যাপকতা ইত্যাদির উপরই নির্ভর করে সময়ের ব্যবধান ও স্প্রের মাত্রা। একই ঋতুতে 2 বার থেকে 15 বার পর্যন্ত স্প্রে করার দরকার হতে পারে (চিত্র নং 14.1)।

- **বীজ শোধন :** বীজ অথবা বীজ কন্দ, মূল ইত্যাদি শোধন করা হয় সেই সমস্ত রাসায়নিক যৌগ দিয়ে যা অঙ্কুরের *ড্যাম্পিং অফ* (damping off) বা নেতিয়ে পড়া রোগ প্রতিহত করতে পারে। এক্ষেত্রে বীজের সাথে জীবাণুনাশকের গুড়ো মিশিয়ে দেবার অথবা ঘন জীবাণুনাশক দ্রবণে বীজকে ভেজানোর

রীতি আছে। কেবল এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে জীবাণু নাশকের ঘনত্ব যেমন জীবাণুর পক্ষে হানিকারক হতে পারে ঠিক তেমনভাবেই বীজের পক্ষেও হানিকারক হতে পারে। এই কাজে সাধারণতঃ অজৈব তাম্র ও দস্তাঘটিত রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করা হয়।

- **মাটি শোধন :** মাটি শোধনে সব চাইতে চালু প্রয়োগিক পদ্ধতি হল **ধুমায়ন** (fumigation)। ধোঁয়ার মত করে রাসায়নিক ছড়িয়ে মাটিতে নিমাটোড, ছত্রাক ব্যাকটেরিয়ামুক্ত করা হয়। কিছু কিছু ছত্রাক নাশক মাটিতে গুঁড়ারূপেও ব্যবহৃত হয়। অতি সাম্প্রতিককালে সেচের জলের মাধ্যমে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করেও মাটি শোধন করা হচ্ছে।

- **উদ্ভিদের ক্ষতস্থানের শোধন :** যে সমস্ত উদ্ভিদে ছাঁটাই বা ছেদন চাষের কাজের জন্যই অত্যন্ত জরুরী তাদের ক্ষেত্রে এই ছেদনস্থান জীবাণুর একটি পছন্দসই প্রবেশপথ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে উন্মুক্ত কলাকে 0.5–1.0 শতাংশ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্বারা বা 10–20 শতাংশ ক্লোরকস (Clorox) দ্বারা অথবা 70 শতাংশ ইথাইল অ্যালকোহল দ্বারা (স্পিরিট) দ্বারা শোধন করা হয় এবং অবশেষে ক্ষতস্থানটির উপর ল্যানোলিন (lanolin), রেজিন (resin) ও গঁদ (gum) এর মিশ্রণ 10 : 2 : 2 অনুপাতে বুলিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষত-প্রলেপ হিসাবে বাজারে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলির প্রয়োগেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার কেননা বেশি মাত্রায় এগুলি রোদগমন না করে রোগ বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

- **ফসল তোলার পর শোধন :** অধিকাংশ জীবাণুনাশক যা শস্যাগারে ফসল বিশেষতঃ ফল ও সবজি বাঁচানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তাদের ক্রেতা বা গ্রহীতার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। এজন্য অধিকাংশ জীবাণুনাশক অত্যন্ত লঘু দ্রবণ রূপে ব্যবহার করা হয় এবং ফল বা সবজি তাতে ডুবিয়ে তুলে নেওয়া হয়। গ্যাস ব্যবহারের বিশদ অপেক্ষাকৃত কম এবং SO_2 জাতীয় গ্যাস ব্যবহার করে ফল রক্ষা করা হয়ে থাকে। বোরাকস (Borax), থায়াবেনডাজোল (Thiabendazole) গন্ধক (Sulphur), বেনজোয়িক অ্যাসিড (Benzoic acid) ইত্যাদি প্রয়োগে ফসল তোলার পর ফলের মধ্যে লেবু ও কমলা, আপেল, কলা, আঙুর, তরমুজ এবং সবজির মধ্যে আলু দীর্ঘদিন সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

14.5.2 বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক জীবাণুনাশক (Chemicals used in disease control) :

শত শত উন্নত ধরনের জীবাণুনাশক আজ ফসল রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটির সম্পর্কে নিচে আলোচিত হল।

- **তাম্রঘটিত যৌগ :** বোর্দো মিশ্রণ (Bordeaux mixture) হল সব থেকে প্রচলিত তাম্রঘটিত জীবাণুনাশক। এটি হল কপার সালফেট ও চুনজল (ক্যালসিয়াম হাইড্রকসাইড) এর মিশ্রণ। রোগের প্রকৃতি বুঝে বিভিন্ন অনুপাতে এইগুলির মিশ্রণ প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে সবচাইতে প্রচলিত অনুপাত হল 16 শতাংশ কপার সালফেট বা তুঁতে, 8 শতাংশ চুনজল এর মিশ্রণ। এছাড়া 8 : 8 : 100 বা 10 : 10 : 100 অনুপাতে উপরিউক্ত যৌগদুটির জল ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে কেবলমাত্র তুঁতেই হল প্যাথোজেনের পক্ষে ক্ষতিকারক যৌগ। চুনজলের প্রয়োগ সম্ভবতঃ উদভিদের ক্ষেত্রে এর হানিকারক প্রভাব এড়ানোর জন্য। বিশেষতঃ ছত্রাক নাশক হিসাবে এটি অধিক প্রচলিত।

- সালফার (Sulfur) ঘটিত যৌগ ঃ গন্ধক গুঁড়োরূপে বা তরলমিশ্রণরূপে ফলগচন, গুঁড়াচিতি (powdery mildew) বা পাতার ধ্বসা রোগ (leaf blight) এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালফার যৌগ 1 থেকে 6 শতাংশ অনুপাতে জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। 30°C উষ্ণতার চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় এই যৌগ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ গন্ধক সংবেদী গাছের যেমন টম্যাটো, তরমুজ, আঙুর ইত্যাদির ক্ষেত্রে হানিকারক।

- জৈব সালফার যৌগ ঃ আধুনিককালে সবচাইতে বহুল ব্যবহৃত ছত্রাকনাশক হল জৈব সালফার যৌগগুলি। এরা সবই ডাইথায়োকার্বামিক অ্যাসিড (dithiocarbamic acid) এর রূপভেদ। ছত্রাকদেহে এরা আইসোথায়োসায়ানেট (-N=C=S) গঠন করে যা সালফারঘটিত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির সালফাইড্রিল group (-SH) কে অকেজো করে দেয় ফলে ছত্রাকের উৎসেচকতন্ত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। এদের মধ্যে উল্লেখ্য হল :

  থিরাম (Thiram) ঃ দুই ডাই থায়োকার্বামিক অ্যাসিড অনু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গঠন করে এই যৌগটি, যা বীজ ও কন্দ শোধনে কাজে লাগে।

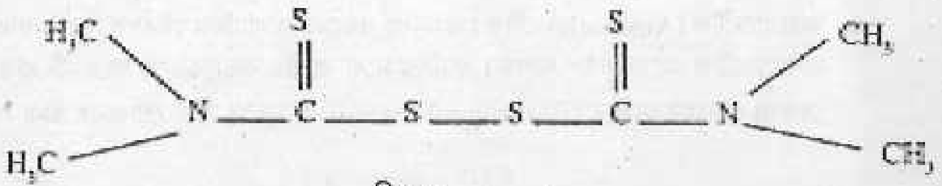

থিরাম

  ফেরবাম (Ferbam) ঃ তিনটি ডাইথায়োকার্বানেট অনু দ্বারা গঠিত যৌগ। পাতায় সংক্রমন রোধে ব্যবহৃত হয়।

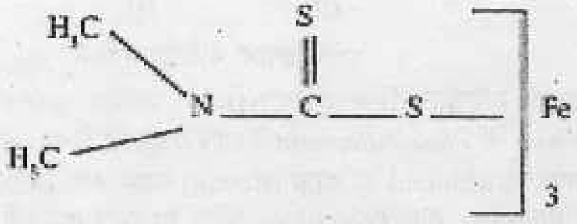

ফেরবাম

ডাইথেন *Z-78* নামে ব্যাপকভাবে প্রচলিত যৌগটির রাসায়নিক নাম হল জিনেব (Zineb)। এটি পাতা ও বীটপের বিভিন্ন অংশ এবং মূল, ফল, ফুল ইত্যাদির ছত্রাকদমনে ব্যবহার্য অসাধারণ উপযোগী রাসায়নিক। এটিতে ডাইথায়োকার্বামিক অ্যাসিড ছাড়াও আছে দস্তা বা Zinc ডাইথেন *M-22* তে থাকে দস্তার বদলে ম্যাঙ্গানিজ। এটিও অত্যন্ত সফল ছত্রাকনাশক যা গুদামজাত আলু, টম্যাটো ইত্যাদির সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। এটির রাসায়নিক নাম হল ম্যানেব (Maneb)।

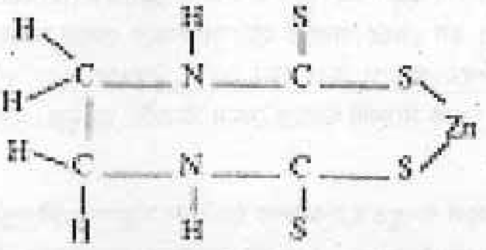

জিনেব

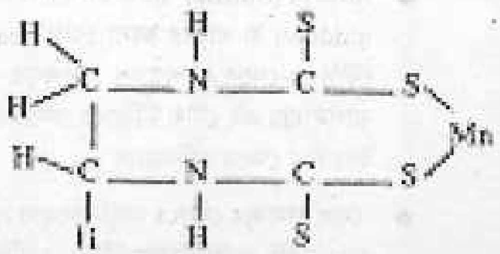

ম্যানেব

কুইনোন (Quinones) : উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন ফেনলঘটিত যৌগের জারনের ফলে স্বাভাবিকভাবে গঠিত হয় কুইনোন নামক যৌগ। এটির জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্য সংশয়াতীত কিন্তু কৃত্রিমভাবে কেবলমাত্র দুটি কুইনোন যৌগ আজ অবধি সংশ্লেষ করা গেছে। এর মধ্যে ডাইক্লোন (dichlone) ফল, ফুল ও সবজির পচন রোধে কার্যকরী।

- অ্যারোমেটিক (Aromatic) যৌগ : এমনবহু রকমের রাসায়নিক যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের অ্যারোমেটিক বলয় জীবাণু নাশক। এগুলির মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে বেশ কয়েকটি বাজারে এসেছে।

হেকসা ক্লোরোবেনজিন (Hexachlorobenzene) বা HCB বীজ শোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

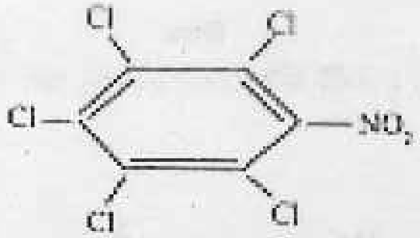

পেন্টাক্লোরো নাইট্রোবেনজিন

পেন্টাক্লোরো নাইট্রোবেনজিন বা PCNB হল মাটিতে ব্যবহার্য জীবাণুনাশক। *Rhiozoctonia, Sclerotiana* বা *Plasmodiophora* ইত্যাদি ছত্রাকের উপর এর হানিকারক প্রভাব আছে।

ডাইক্লোরান (Dichloran) বা বট্রান (Botran) নামে এবং DCNA নামে পাওয়া যায় তা ফল বা সবজির *Rhizopus* এবং *Penicillium* ঘটিত সংক্রমণে কার্যকরী।

ক্লোরোথ্যালোনিল (Chlorothalonil) যা ব্র্যভো (Bravo) নামে বাজারে পাওয়া যায় তা পাতা ফল, দানাশস্যের বিভিন্ন রোগে কার্যকরী।

বাইফেনিল (biphenyl) হল আর একটি জীবাণুনাশক সুগন্ধী যৌগ (aromatic compound) যা উদ্বায়ী এবং ফলের সংরক্ষণকালীন দশায় *Penicillium, Botrytis* ইত্যাদির ছত্রাকের সংক্রমণের হাত থেকে ফলকে বাঁচায়।

- হেটোরোসাইক্লিক (Heterocyclic) যৌগ : কয়েকটি বিশেষভাবে উপযোগী ছত্রাকনাশক এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত কেন না তারা সাধারণত ছত্রাকের $-NH_2$ ও $-SH$ গ্রুপ গঠনে বাধা দান করে ফলে অ্যামিনো যৌগ বা উৎসেচক সংশ্লেষিত হতে পারে না।

এদের মধ্যে কয়েকটির গঠন ও কার্য নীচে বর্ণিত হল ঃ

(i) ক্যাপটান (**Captan**) ঃ পাতা বা ফুলের বা ফলের দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী। বীজ রক্ষাকারীরূপেও এটির প্রচলন আছে।

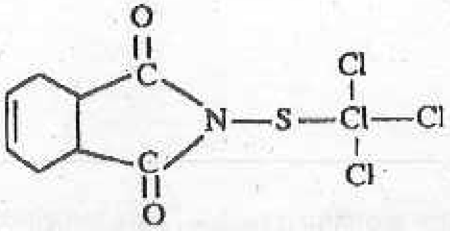

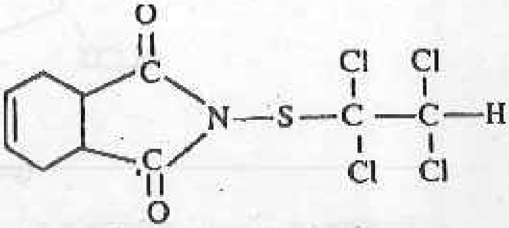

ক্যাপটান   ক্যাপটাফল

(ii) ক্যাপটাফল (**Captafol**) ঃ যা সাধারণতঃ *ডাইফোল্যাটান* (difolatan) নামে বাজারে চালু আছে। সেটির ধর্ম ক্যাপটান সদৃশ। উপরন্তু এটি অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী সক্ষমতা প্রদর্শন করে অথচ এটির উদভিদের উপর বিষক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম। এটির ব্যবহার ফলের সংরক্ষণে অধিকতর।

(iii) অ্যাইপ্রোডায়োন (**Iprodione**) ঃ এটি হল একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক জীবাণুনাশক। সাধারণত এটি পাতার সংস্পর্শে আসা ছত্রাকের বৃদ্ধি সংহত করে। ছত্রাক রেণুর অঙ্কুরেদগম বা ছত্রাক অনুসূত্রের বৃদ্ধি এর উপস্থিতিতে হতে পারে না। দানা শস্য বা শক্ত বা নরম ফল (যেমন আঙুর) ইত্যাদির সংরক্ষণে স্প্রে করে ব্যবহৃত হয়।

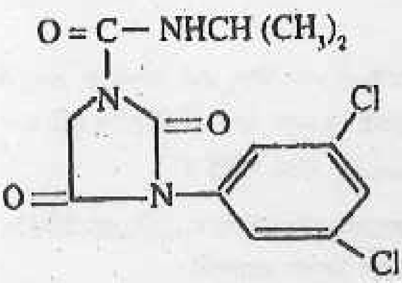

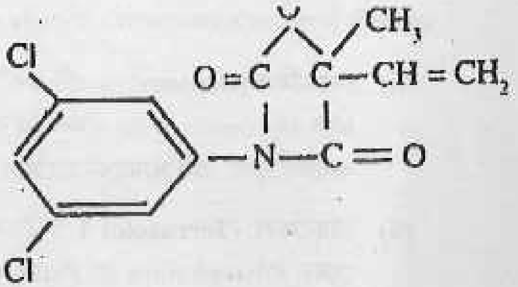

অইপ্রোডায়োন   ভিনক্লোজোনিল

(iv) ভিনক্লোজোনিল (**Vinclozolin**) ঃ যা *অরনালিন* (Ornalin) বা *ভরল্যান* (vorlan) নামে বিক্রিত হয় তা স্কেলরোসিয়া গঠন কারী ছত্রাকের দমনে বিশেষ উপযোগী। এই ছত্রাকগুলির মধ্যে আছে *Botrytis, Monilina, Sclerotiana* ইত্যাদি।

- বেনজিন যৌগ ঃ অনেকগুলি বেনজিন ঘটিত যৌগ বিভিন্ন জীবাণুর পক্ষে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে।

(i) ক্লোরোনেব (Chloroneb) হল 1, 4 ডাইক্লোরো 2, 5 ডাইমেথকসি বেনজিন। *Rhizoctonia*-র বিভিন্ন প্রজাতি এবং *Phytophthora cinnamoni*-র ক্ষেত্রে এটির উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে।

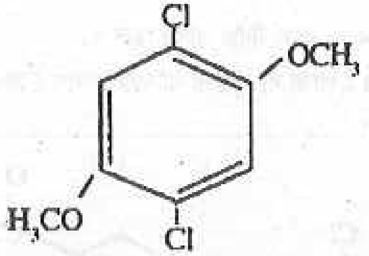

ক্লোরোনেব

- **সিস্টেমিক (Systemic) ছত্রাকনাশক ঃ** 1963 খ্রিস্টাব্দে অকসাথিন (Oxathin) নামক রাসায়নিকটির আবিষ্কারের সাথে সাথেই সারা দুনিয়ার উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানীদের কাছে এই ধরনের ছত্রাকনাশক সমাদৃত হয়। এটিকে সিস্টেমিক অথবা স্থানাতীত বলা কারণ এটি কেবলমাত্র প্রয়োগক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র উদ্ভিদদেহে সামগ্রিকভাবে ক্রিয়াশীল। অকসাথিন ছাড়াও পরবর্ত্তীকালে আরো অনেক এ জাতীয় ছত্রাকনাশক আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের কার্যপদ্ধতি অনুমানসাপেক্ষ এবং মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ ঃ

  (i) প্যাথোজেনের উৎসেচক ও অধিবিষের ক্ষমতা হ্রাস।

  (ii) এই ছত্রাকনাশক ছত্রাক কোশে অধি পরিমানে জমা হয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

  (iii) হাইফার কোশ পর্দা বা প্লাসমা পর্দার ক্ষতি সাধন করে।

  (iv) ছত্রাকের উৎসেচক সংশ্লেষ বন্ধ হয়ে যায়।

কয়েকটি সিস্টেমিক ছত্রাকনাশকের উদাহরণ হল ঃ

(i) **বেনোমিল (Benomyl) ঃ** এটি একটি বেনজআমাইডাজোল যৌগ এবং বিশেষতঃ কলা বা বাদাম চাষে *Mycosphaerella* নামক ছত্রাক দমনে কার্যকরী। অনুরূপ আর একটি যৌগ কৃমি নাশক রূপে কার্যকরী এবং এটি থায়াবেনডাজোল (thiabendazole) নামে পরিচিত।

(ii) **টেরাজোল (Terrazole) ঃ** *5-ইথকসি 3-ট্রাইক্লোরোমিথাইল* যৌগ যা ফাইকোমাইসিটিস ছত্রক যেমন *Phytophthora* বা *Pythium* এর সংক্রমণে বিশেষ কার্যকরী।

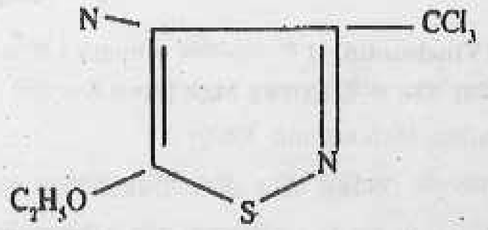

টেরাজোল

(iii) অকসাথিন (Oxathiins) : আগেই বলা হয়েছে যে অকসাথিন হল প্রথম আবিষ্কৃত সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক। একটি মুখ্যত কার্বকসিন ও অকসিকার্বকসিন ঘটিত যৌগ বা *রাষ্ট* ও *স্মাট* (Rust and smut) রোগের ছত্রাক দমনে বিশেষ উপযোগী।

কার্বকসিন বাজারে ভিটাভ্যাকস (Vitavax) নামে পাওয়া যায় এবং এটি দ্বারা ফসলে বীজ বিধৌত করলে নামক ছত্রাকঘটিত "নেতিয়ে পড়া রোগ" এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অন্যান্য এই জাতীয় ছত্রাকনাশকের মধ্যে ইমাজালিল (Imazalil), প্রোক্লোরাজ (Prochloraz), ট্রাইফোলিন (Trifoline) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

- **অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotics)** : উদ্ভিদরোগ দমনে সবচাইতে কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক গুলি হল স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin), টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline) ও সাইক্লোহেকসিমাইড (Cycloheximide)। এই তিন প্রকার যৌগই স্বাভাবিক উৎস সজ্ঞাত। *Streptomyces griseus* নামক অ্যাকটিনোমাইসিটি গোষ্ঠীর ব্যাকটেরিয়া প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই এগুলি উৎপাদন করে এবং ছত্রাকের সংক্রমণে প্রাকৃতিক পরিবেশেই বাধা দেয়।

(i) স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin) : বাজারে এগ্রিমাইসিন বা ফাইটোমাইসিন নামে ফসলের ঔষধ রূপে পাওয়া যায়। বীন, তুলা, সরষে, দানাশস্য এবং আলুর বিভিন্ন ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণে এরা কার্যকরী।

(ii) টেট্রাসাইক্লিন (Tetracyclines) : আক্ষরিক অর্থেই সংক্রামিত উদ্ভিদে ইনজেকশন করা যায়। ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির সংক্রমণে এটি ব্যবহৃত হয়।

(iii) সাইক্লোহেকসিমাইড (Cycloheximide) : বাজারে *অ্যাকটিডিওন* (Actidione) নামে পাওয়া যায়। ঘাস জাতীয় যে কোন গাছের (যেমন ধান, গম ইত্যাদি) *গুঁড়া চিতি* (mildew) রোগের ক্ষেত্রে এটি কার্যকরী তবে এটির উদ্ভিদদেহে বিষক্রিয়া অত্যন্ত বেশি ফলে ব্যবহার অত্যন্ত বিধিবদ্ধ।

- **বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ (Growth regulators)** : উদ্ভিদের কিছু বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ বা হরমোন সংক্রমণ কমাতে বা তাড়াতে সাহায্য করে। পাতায় *কাইনেটিন* (Kinetin) স্প্রে করলে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া খর্বতা বা মুকুলের প্রস্ফুটনে বাধা ইত্যাদি *জিব্বারেলিক অ্যাসিড* প্রয়োগে দূরীভূত করা যায়।

- **হ্যালোজেনঘটিত হাইড্রোকার্বন Halogenated hydrocarbons)** : D-D *(ডাইক্লোরোপ্রোপেন - ডাইক্লোরোপ্রোপেন)*, EDB *(ইথীলিন ডাইব্রোমাইড)*, MB *(মিথাইল ব্রোমাইড)* ইত্যাদি পদার্থ 1940 খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত এবং 1980-র দশক পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে এগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত।

- **অর্গানোফসফেট (Organophosphates)** : থিমেট (Thimet); ডাইসিসটোন (Disyston), মোক্যাপ (Mocap) ইত্যাদি অর্গানোফসফেট যৌগ হল মূলতঃ কীটনাশক। কিন্তু এগুলি উদ্ভিদদেহেও গৃহীত হয়

এবং নিমাটোড জাতীয় উদ্ভিদকৃমি নিয়ন্ত্রণে সমান কার্যকরী। জলে দ্রাব্য মিশ্রণ রূপে অথবা দানারূপে এগুলি বাজারে মেলে এবং ফসল বোনার আগে ও পরে ব্যবহার্য। পোকার নার্ভতন্ত্রকে অকেজো করে এটি কাজ করে।

- **কার্বামেট (Carbamate) :** কার্বোফিউরান (Carbofuran), যা ফিউরাডান নামক বাজার চলতি নামে অত্যন্ত বিখ্যাত— সেটিও বিভিন্ন কীট যারা মাটিতে বসবাস করে তাদের ক্ষেত্রে কার্যকরী ফসল পোনার আগে মাটিতে রাসায়নিকটি ছড়িয়ে দিতে হয়। কীটের *কোলিন এসটারেজ* (Choline estarase) নামক উৎসেচককে অকেজো করে ফেলে এটি তার পক্ষাঘাত ঘটাতে সক্ষম।

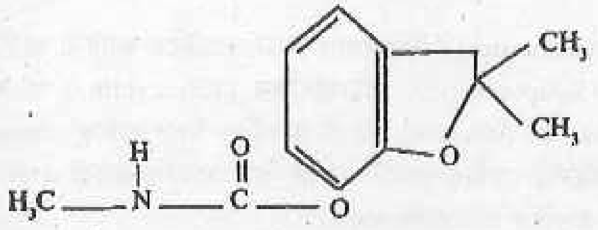

অনুশীলনী - 5

1. ডান দিকের স্তম্ভের বিষয়গুলির সাথে বামদিকের বিষয়গুলি সঠিকভাবে মেলান ঃ

(a) বোর্দো মিশ্রণ	(i) অ্যারোমেটিক যৌগ
(b) ফেরবাম	(ii) হেটোরোসাইক্লিক যৌগ
(c) ডাইক্লোন	(iii) ডাইথায়োকার্বামিক অ্যাসিড
(d) PCNB	(iv) তাম্রঘটিত যৌগ
(e) ক্যাপটাফল	(v) কুইনোন

2. নিম্নলিখিত ছত্রাকনাশকগুলির রাসায়নিক গঠনের চিত্র নীচে দেওয়া আছে। সঠিকভাবে সেগুলিকে মেলানঃ টেরাজোল, PCNB, ক্যাপটান, কার্বোফিউরান

a)

b) 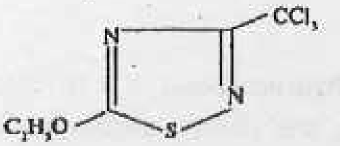

d) 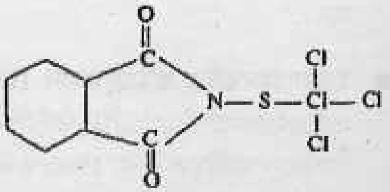

c) 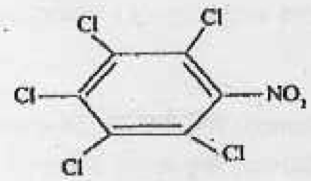

14.5.3 রাসায়নিক যৌগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা (Precautions) :

এতক্ষণ আমরা কিছু রাসায়নিক যৌগ নিয়ে আলোচনা করলাম যেগুলি উদ্ভিদের সংক্রমণ নিরোধী ভূমিকার জন্য চাষীভাইদের কাছে সমাদৃত। যদিও এগুলি কীটনাশকগুলির তুলনায় কম বিষাক্ত তবু এগুলি যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রবণতা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের পক্ষে খারাপ। আর নিমাটোড দমনের জন্য কীটনাশক তো শস্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতেই হয়। এই সমস্ত কারণে উন্নত দেশে কীট ও ছত্রাকনাশক উৎপাদন, বিপনন ও ব্যবহারের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। আনুমানিক প্রতি 10,000 এ জাতীয় যৌগের মধ্যে মাত্র একটি ছাড়পত্র পায়। তারপরেও টানা 7 থেকে 9 বছর সেটির কার্যকারিতা ও নিরাপদ ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেই সেটি বিপননের অধিকার পাওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই উদ্দেশ্যে দুটি সংস্থা আছে; FDA অর্থাৎ Food and Drug Association এবং EPA অর্থাৎ Environment Protection Agency পারে এই ছাড়পত্র দিতে। দুটি নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে এরা ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। একটি হল, ফসল কাটার সুনির্দিষ্ট সংখ্যক দিন পূর্বে এটির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। অপরটি হল, প্রতি একরে যৌগটির মাত্রা সীমাবদ্ধ পরিমাণের অধিক হওয়া কিছুতেই চলবে না। নিয়ন্ত্রণ উপভোক্তার দিকে তাকিয়েই আরোপিত এবং আশা করা যায় মাত্রা ও দিনের ব্যবধান বজায় রাখলে ফসল বিষবাহক রূপে ভোক্তার স্বাস্থ্যহানির কারণ হবে না।

14.6 সারাংশ

উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলিকে মূলতঃ চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল যথাক্রমে কৃষ্টিগত নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি, রাসায়নিক পদ্ধতি, ভৌত পদ্ধতি এবং জীবজ পদ্ধতি। সব কটি ক্ষেত্রেই হয় জীবাণুর সংস্পর্শ রোধ করে অথবা প্যাথোজেনকে বিনাশ করে রোগটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কৃষিকার্যে পদ্ধতিগত পরিবর্তন এনে যখন রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন তাকে বলে কৃষ্টিগত নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি। শস্যক্ষেত্রের ভৌগলিক অবস্থান, মাটির ব্যবহার, রোপনের কাল, রোগ-এড়ানো প্রকরণের ব্যবহার, বীজ বাছার কাজে সতর্কতা অবলম্বন এবং সর্বোপরি *কোয়ারানটাইন* এর নীতি অনুসরণ করে জীবাণুর সংস্পর্শ এড়ানো যায়। এই পদ্ধতিতে সরাসরি প্যাথোজেনকে আক্রমণ করা হয় সেটির *পুষ্টি সঙ্কট* তৈরি করে। জীবজ নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিতে অন্য জীব বা জীবাণুর দ্বারা প্যাথোজেনের সম্পূর্ণ অপসারণ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে অপ্রত্যক্ষভাবে মাটি ও *ফাঁদ উদ্ভিদ* অথবা *বিরোধী উদ্ভিদ* ব্যবহার করে সাফল্য পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী ছত্রাক, বিরোধী ব্যাকটেরিয়া এবং *বিরোধী ভাইরাস* ব্যবহার করে সরাসরি প্যাথোজেনের বৃদ্ধি ও বিস্তারে বাধা দান করা সম্ভব। রোগ দমনের ভৌত পদ্ধতিতে উত্তাপ, শৈত্য অথবা *বিকিরণের সাহায্যে* জীবাণু বিনাশ করা হয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হল *রাসায়নিক পদ্ধতি*। বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করে মাটি অথবা বীজ অথবা উদ্ভিদের ক্ষতস্থান এবং সর্বোপরি ফসল কাটার পর শস্যাগারের ফসল *জীবাণুমুক্ত* করা সম্ভব। জীবাণুনাশক রাসায়নিক গুলি বহু শ্রেণিতে বিভক্ত। এরা *তাম্র* বা *সালফার ঘটিত যৌগ, অ্যারোমেটিক* বা *হেটেরো সাইক্লিক যৌগ, বেনজিন যৌগ* বা *সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক*। এছাড়া *অ্যান্টিবায়োটিক* বা *উদ্ভিদ হরমোন* বা *কার্বোফিউরান যৌগ* হতে পারে। এদের সবকয়টির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যবহারটি মেনে চলা প্রয়োজন। নয়তো অতিরিক্ত প্রয়োগে ফসল তথা গ্রহীতা এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে।

14.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. কোয়ারানটাইন বলতে কি বোঝায়? উদ্ভিদের কোয়ারানটাইনের ক্ষেত্রে অনুসৃত মূলনীতি কি কি? উদ্ভিদ সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলি কি কি?
2. জীবজ নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিতে কিভাবে রোগ দমন করা সম্ভব? সুনির্দিষ্ট উদাহরণসহ আলোচনা করুন।
3. উদ্ভিদের রোগদমনে রাসায়নিক জীবাণুনাশক কি কি উপায়ে প্রয়োগ করা হয়? রাসায়নিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিৎ কেন?
4. উদ্ভিদ রক্ষায় — (ক) সালফার ঘটিত যৌগ (খ) অ্যারোমেটিক যৌগ (গ) বেনজিন যৌগ (ঘ) সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক এবং (ঙ) অর্গানোফসফেট যৌগের ভূমিকা উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

14.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1 (উত্তরের জন্য অংশাঙ্কিত জায়গাগুলি দেখুন)

প্রশ্ন 1. (a) 14.2.1a

(b) 14.2.1c

(c) 14.2.1d

(d) 14.2.1f

(e) 14.2.1c

প্রশ্ন 2. 14.2

প্রশ্ন 3. 14.2

অনুশীলনী - 2

প্রশ্ন 1. (a) Destructive insects and Pests act (1914)

(b) 16 টি

(c) সুখিয়াপোখরি, দার্জিলিং

(d) আপেলের ক্রাউন গল

(e) ধানের ব্লাস্ট রোগ, 1918, দঃ পূঃ এশিয়া

প্রশ্ন 2. (a) *Puccinia graminis*

(b) আখের লোহিত পচন

(c) যুক্তরাষ্ট্রে আলুর বীজ শোধন

(d) গম বীজকে 60°C উষ্ণতার জলে শোধন

অনুশীলনী -3

প্রশ্ন 1. (a) এক্ষেত্রে ভুট্টা অ্যাফিড পোকা বাহিত ভাইরাসের জন্য ফাঁদ উদ্ভিদের কাজ করে।

(b) গাঁদা নিমাটোডের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তারে বাধা দান করে।

(c) সেক্ষেত্রে *Botrytis sp* নামক ছত্রাকের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(d) মাইকরহিজা হল উদ্ভিদের মূলে বসবাসকারী মিথোজিবী ছত্রাক যা সংক্রমণ প্রতিহত করে যেমন পাইন গাছে *Phytophthora* সংক্রমন প্রতিহত করা।

(e) নরম পচন রোগ প্রতিহত করে।

প্রশ্ন 2. (i) প্যাথোজেন পরজীবি রূপে তারা রোগদমন করে।

(ii) খাদ্যের জন্য প্যাথোজেনের সাথে প্রতিযোগিতা করে।

(iii) অ্যান্টি বায়োটিক পদার্থ নিসৃত করে।

প্রশ্ন 3. (i) (e) (ii) d

(ii) (b) (iv) c

(v) a

অনুশীলনী - 4

1. (a) 82°C

(b) 52°C, 11 মিনিট

(c) অতিরিক্ত জল অপসারণ

(d) *Botrytis, Alternaria* ইত্যাদির রেণু উৎপাদনের জন্য অতিবেগুনী আলো দরকার।

(e) গামা রশ্মি

2. 14.2 অংশাঙ্কিত পাঠ্যাংশ দ্রষ্টব্য।

অনুশীলনী - 5

1. (a) .... (iv)
   (b) .... (iii)
   (c) .... (v)
   (d) .... (i)
   (e) .... (ii)

2. (a) .... কার্বোফিউরান
   (b) .... টেরাজোল
   (c) .... PCNB

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. 14.2.1 অংশাঙ্কিত পাঠ্যাংশ দ্রষ্টব্য। মূলনীতিগুলি লেখার জন্য বহির্বিশ্ব থেকে আগত কোন উদ্ভিদ ভারতবর্ষে এলে পর পর কোন কোন সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার সেগুলির কথাই উল্লেখ করা দরকার। পর্যায়গুলি এ রকম ঃ

   বিমানবন্দর / সমুদ্রপোত / স্থলভাগ → পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র → নিরীক্ষা → রোগমুক্ত দশা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া → চাষের জন্য আমদানিকারকের হাতে প্রত্যার্পন।

   আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির নাম উল্লেখ করুন।

2. 14.3 অংশ দ্রষ্টব্য। একটা ছক দেখিয়ে তারপর লেখা শুরু করলে ভাল হয়।

এবার প্রতিটি ক্ষেত্রের উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন

3. 14.5.1 অংশে জীবাণুনাশক প্রয়োগের উপায় সম্পর্কে বলা আছে। সতর্কতার জন্য 14.5.3 অংশ দেখুন।

4. 14.5.2 অংশ দেখুন। প্রতি প্রকার যৌগের জন্য একটি কি দুটি উদাহরণ দিন এবং কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটি লিখে উত্তর দিন।

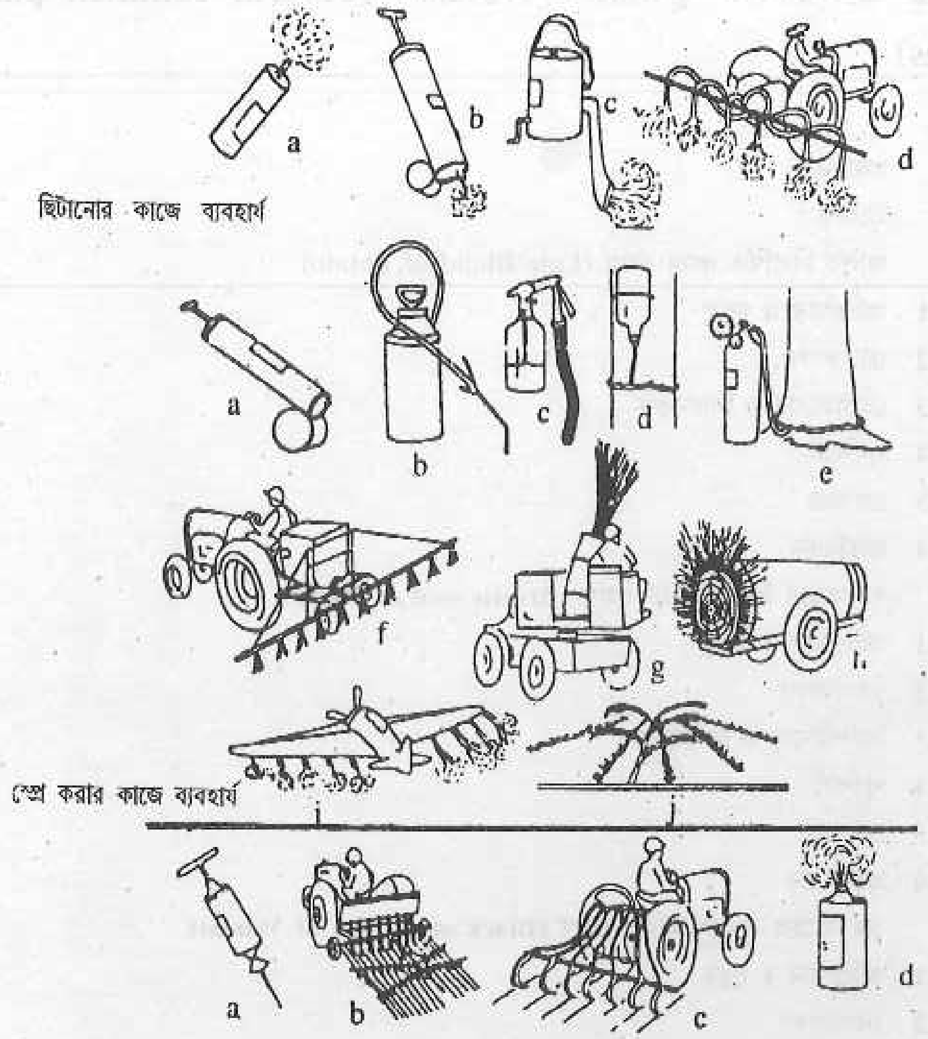

চিত্র নং 14.1 ঃ *জীবাণুনাশক ব্যবহারের নানা কৌশল—*

ছিটানোর কাজে ব্যবহার্য ঃ (a)—(c) বহনযোগ্য যন্ত্র; (d) ট্রাক্টর লগ্ন যন্ত্র

স্প্রে করার কাজে ব্যবহার্য ঃ (a)—(c) বহনযোগ্য যন্ত্র; (d)—(e) গাছে ইনজেকশন; (f)—(g) ট্রাক্টরলগ্ন; (h) সবদিক অভিমুখী স্প্রে; (i) উড়োজাহাজের মাধ্যমে এবং (j) সেচেরূপ জলের মাধ্যমে স্প্রে।

ধোঁয়া প্রয়োগ ঃ (a) হাতকামান, (b)—(c) ট্রাক্টার কামান; (d) ধোঁয়া নিঃসরণকারী আধার

একক 15 ☐ কয়েকটি সুপরিচিত উদ্ভিদরোগ (Several common plant diseases)

গঠন

15.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

15.2 আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ (Late Blight of Potato)

15.2.1 প্রাপ্তিস্থান ও গুরুত্ব

15.2.2 রোগলক্ষণ

15.2.3 রোগজীবাণু ও নিদানতত্ত্ব

15.2.4 পূর্বশর্ত

15.2.5 রোগচক্র

15.2.6 প্রতিবিধান

15.3 ধানগাছের পিঙ্গল চিটে রোগ (Brown spot of Rice)

15.3.1 প্রাপ্তিস্থান ও গুরুত্ব

15.3.2 রোগলক্ষণ

15.3.3 রোগজীবাণু ও নিদানতত্ত্ব

15.3.4 পূর্বশর্ত

15.3.5 রোগচক্র

15.3.6 প্রতিবিধান

15.4 গম গাছের কৃষ্ণবর্ণ মরিচা রোগ (Black stem rust of Wheat)

15.4.1 প্রাপ্তিস্থান ও গুরুত্ব

15.4.2 রোগলক্ষণ

15.4.3 রোগজীবাণু ও নিদানতত্ত্ব

15.4.4 পূর্বশর্ত

15.4.5 রোগচক্র

15.4.6 প্রতিবিধান

15.5 পাট গাছের কাণ্ডের পচন (Stem rot of jute)

15.5.1 প্রাপ্তিস্থান ও গুরুত্ব

15.5.2 রোগলক্ষণ

15.5.3 রোগজীবাণু ও নিদানতত্ত্ব

15.5.4 পূর্বশর্ত
15.5.5 রোগচক্র
15.5.6 প্রতিবিধান
15.6 সারাংশ
15.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
15.8 উত্তরমালা

15.1 প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককগুলিতে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল উদ্ভিদের রোগ হবার কারণ এবং তাদের প্রতিবিধানের উপায়সমূহ। যেহেতু আলোচনাটি ছিল সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সেহেতু বিশেষ বিশেষ রোগের নাম আলোচনায় এসে থাকলেও একটি বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রসঙ্গটি আলোচিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমরা এখনও কিছুই জানতে পারি নি। এই এককটিতে সেই ধারণাটি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি সংক্রামক রোগ, সে প্রাণী বা উদ্ভিদ যারই হোক না কেন, সেটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে রোগটির ঐতিহাসিক এবং স্থানিক গুরুত্ব নিয়ে সবচেয়ে আগে বলা উচিৎ। দ্বিতীয়তঃ আসে সেই রোগর লক্ষণ অর্থাৎ সনাক্তকরণের উপায় সমূহ জানা। তৃতীয়তঃ জানা দরকার রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুটি কি? রোগ থেকে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা বলা যায়। নতুবা অজানা রোগের ক্ষেত্রে এই সনাক্তকরণ পর্যায়টি একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য পর্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে। চতুর্থতঃ নিদানতত্ত্ব। এই কথাটি বলতে আমরা প্যাথোজেন ও পোষকে আন্তঃসম্পর্ক নির্ণায়ক বিষশয়গুলিকে বুঝি। এরপর রোগচক্র, অর্থাৎ একটি প্যাথোজেনের প্রাথমিক সংক্রমণ থেকে শুরু করে যে পর্যায়ক্রমিক ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে সেটি আবার সুপ্ত দশা লাভ করে, সেটি একটি চক্রাকার ঘটনাক্রম। একে বলা হয় রোগচক্র। অবশেষে জানা দরকার প্রতিবিধানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়সমূহ। আমাদের দেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রধান তিনটি খাদ্য ফসল অর্থাৎ ধান, গম ও আলুর প্রধানতম রোগ তিনটির কথা এই পর্যায়ে আলোচিত হবে। এছাড়া আমাদের মূল অর্থকরী ফসল পাটের একটি সাধারণ রোগের কথাও আমাদের আলোচ্যসূচীতে আছে।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের কারণ, বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণ সমূহ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।
- ধান গাছের চিটে রোগ যাকে হেলমিনথোস্পোরিয়াম রোগও বলা হয়ে থাকে সেটির কারণ, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ নির্ণয় করতে পারবেন।
- গম গাছের আলগা ছেটো বা স্মাট রোগের কারণ, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ নির্দেশ করতে পারবেন।
- পাঠ গাছের কাণ্ড-পচন রোগের কারণ, বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- এছাড়া প্রতিটি রোগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিবিধানের উপায়গুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসাবে এই বিষয়গুলির গুরুত্ব সম্বধে অবহিত হবেন এবং প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

15.2 আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ (Late blight of Potato) :

আলুর *(Solanum tuberosum)* সবচেয়ে সাধারণ কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক রোগগুলির মধ্যে একটি হল এই রোগ। এই রোগের ফলে ছত্রাক সংক্রমণে আলু গাছের ভূ-উপরিস্থ অংশ মরে যায় এবং ভূনিম্নস্থ কন্দ আক্রান্ত হয়ে শুষ্ক অথবা সিক্ত পচনের শিকার হয়।

15.2.1 প্রাপ্তিস্থান ও গুরুত্ব (Occurence and Importance) :

আলু ফসলটির উৎস হল দঃ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার উত্তর ভাগ (North Andese)। রোগটিও ঐ অঞ্চলেই বহুদিন সীমাবদ্ধ ছিল। 1830-40 খ্রিস্টাব্দে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে আলুর রোগটি গিয়ে পৌঁছাল উত্তর আমেরিকা ও ইয়োরোপে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রোগটির মহামারীর রূপ নিল। 1842 খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই সমস্ত ইয়োরোপের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং 1845 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করল। যে সমস্ত দেশে আলু প্রধান ভোজ্য সেই সমস্ত দেশে বিশেষতঃ আয়ারল্যান্ডে প্রভাব পড়ল মারাত্মক। 40 লক্ষ মানুষের দেশ আয়ারল্যান্ডে 1845-46 এর দুর্ভিক্ষের কারণই ছিল আলুর এই ধ্বসা রোগ। ভারতবর্ষে রোগটির প্রথম দেখা পাওয়া যায় 1870 ও 1880 খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে। 1909 খিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া যা নাকি ততদিন পর্যন্ত রোগটির কবলমুক্ত বলে অনুমান করা হচ্ছিল, তার প্রতিটি প্রদেশে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতে রোগের প্রথম বার্তা আসে নীলগিরি পর্বতের আলুর চাষ থেকে। এরপর দার্জিলিং-এ ইউরোপ থেকে আনীত আলুর চাষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ততদিন পর্যন্ত ছত্রাকটির শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি সমতলভূমির উষ্ণতার আবহাওয়ার অনুকুল ছিল না। কিন্তু 1899-1900 খ্রিস্টাব্দে রোগটি প্রথম বাংলার হুগলী জেলায় দেখা যায়। 1901-02 খ্রিস্টাব্দে সমস্ত বাংলাদেশে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর প্রায় দশ বছর অন্য কোন জায়গা থেকে রোগটির সুলুক সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিন্তু 1913 খ্রিস্টাব্দে জোরহাট, রঙপুর, ভাগলপুর থেকে, 1928 খ্রিস্টাব্দে বিহারের পুসা থেকে এবং 1933 এ পাটনা থেকে রোগটির কথা জানা যায়। 1943 খ্রিস্টাব্দে মীরাট ও দেরাদুন অঞ্চলের ফসলগুলি আক্রান্ত হয় এবং তখন থেকে প্রায় প্রতি বছর উত্তর ভারতের আলু ফসল ধ্বসা রোগের শিকার হয়েছে। বলা ভাল, এই একই রোগ দেখা যায় টম্যাটোর ক্ষেত্রেও এবং ক্ষতির বহর সেক্ষেত্রেও নেহাৎ কম নয়।

15.2.2 রোগলক্ষণ ও নিদানতত্ত্ব (Symptoms and Etiology) :

রোগ সবচাইতে আগে প্রকাশিত হয় পাতায়। অঙ্কুর দশায় অথবা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় যখনই হোক না কেন রোগের প্রথম প্রকাশ সাধারণতঃ হয় জানুয়ারি মাসে। পাতায় বাদামী রঙের অথবা বেগুনী কালচে রঙের সিক্ত পচনশীল দাগরূপে রোগটির প্রথম প্রকাশ ঘটে। দাগগুলি প্রথমে সীমাবদ্ধ এবং পরে পাতার কিনারা থেকে মধ্যশিরার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ার হার আবহাওয়ার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। যদি আবহাওয়া আর্দ্র হয় তাহলে আক্রান্ত পাতাটি এক থেকে চার দিনের মধ্যেই পচে যায়। কিন্তু পাতার প্রান্তে বা শীর্ষে প্রথম লক্ষণ দেখা দেবার পর আবহাওয়া যদি শুষ্ক, আর্দ্রতাবিহীন থাকে তখন সংক্রমণ বিস্তার লাভ করে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। পচনশীল অংশগুলি শুষ্কই থাকে এবং কুঁকড়ে যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় আক্রান্ত চারা বা শস্যক্ষেত্র থেকে পচা সবজির গন্ধ পাওয়া যায়। বস্তুতঃপক্ষে বিলম্বিত ধ্বসা রোগ সনাক্ত করণের একটি সহজ অথচ নিশ্চিত উপায় হল গন্ধ।

সাধারণতঃ নীচের দিকের পাতাগুলি আক্রান্ত হয় সবচেয়ে আগে কিন্তু যদি আবহাওয়া আর্দ্র থাকে তাহলে অন্যান্য পাতাগুলি ও কাণ্ড একইরকমভাবে পচনশীলতার শিকার হয়। এই অবস্থায় বিশেষতঃ ভোরে বা ভেজা ভেজা

দিনে কালচে বেগুনী দাগের বাইরে একটি হালকা, প্রায় বিবর্ণ সবুজ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এই হালকা সবুজ ও বেগুনী কালচে দাগের সংযোগস্থল পরিস্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। পাতাটির বিপরীত তলে ঠিক ঐ সংযোগ রেখার বিপরীতে একটি সাদাটে বা ধূসর গুঁড়োর মত পদার্থ চোখে পড়ে। এই পদার্থ আসলে ছত্রাকের রেণুধারণ যা পাতার পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বাইরে এসে অজস্র রেণু উৎপাদন করেছে। শুষ্ক আবহাওয়ায় পাতা থেকে এই গুঁড়ো পাউডারসদৃশ ভাবটি অদৃশ্য হয় (চিত্র 15.1a)।

অনুকূল পরিবেশে মাটির তলার কন্দটিও সংক্রামিত হয়। সংক্রমণ মাটিতে পড়ে যাওয়া সংক্রামিত পাতা থেকে অথবা মাটি থেকে হতে পারে। এমন কি যদি উপরোর্ধ আক্রান্ত হয় তাহলেও ভূনিম্নস্থ কন্দ আকারে ছোট অথবা সংখ্যায় কম হয়ে যেতে পারে। কন্দে সংক্রমণের প্রথম লক্ষণটি খোসার উপর কালচে বেগুনী দাগের আকারে প্রকাশিত হয় এরপর বাদামী শুষ্ক পচন খোসা থেকে কন্দের 1 cm গভীর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অনুকুল পরিবেশে কন্দ পচে যায় এবং সেটি থেকে রোগের বিশেষ দুর্গন্ধটি নিঃসৃত হতে থাকে (চিত্র 15.1b)।

15.2.3 রোগজীবাণু (Causal organism) :

আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের জীবাণু হল ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত একটি ছত্রাক যার নাম *Phytophthora infestans* ছত্রাকটির অণুসূত্রগুলি অন্তঃপরজীবিরূপে পোষকে কোশান্তররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করে। অনুসুত্রের হাইফাগুলি বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এবং প্রস্থ প্রাচীর বিহীন। হাইফা পুষ্টি সংগ্রহের জন্য গদাকৃতি চোষক গঠন করে (চিত্র 15.1c) পোষক অভ্যন্তরস্থ অণুসূত্র *রেণুধারক* (Sporangiophore) সৃষ্টি করে এবং সেগুলি পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বা কন্দের লেন্টিসেল নামক স্বাভাবিক ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরের পরিবেশের সান্নিধ্যে আসে। রেণুধারক গুলি সরু, বর্ণহীন, শাখান্বিত এবং অনিয়তভাবে বৃদ্ধি পায়। রেণুধারকের প্রতিটি শাখার অগ্রপ্রান্ত ছুঁচালো হয় এবং সেগুলি *রেণুস্থলী* বহন করে (চিত্র 15.1d) প্রতিটি *রেণুস্থলী* (sporangium) 7 থেকে 30 টি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট ঈষৎ লেবুর মত আকৃতি বিশিষ্ট। প্রতিটির অগ্রপ্রান্তে একটি করে ছুঁচালো অংশ থাকে। রেণুস্থলী গঠিত হবার পরও শাখাটি অথবা রেণুধারকটি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। সেক্ষেত্রে রেণুস্থলী রেণুধারকের পাশে অবস্থান করে। রেণুস্থলী অঙ্কুরিতে হতে পারে সরাসরি অঙ্কুর নালী (germ tube) গঠন করে অথবা চলরেণু উৎপাদন করে। চলরেণু (Zoospore) রেণুস্থলীর ছুঁচালো অংশ দিয়ে বাইরে নির্গত হয়। এরা দ্বি-ফ্ল্যাজেলাযুক্ত (চিত্র 15.1e)। ফ্ল্যাজেলাদ্বয়ের মধ্যে একটি রোমশ কিন্তু অপরটি মসৃন। পরিবেশে মুক্ত হবার পর কিছুক্ষণ এরা সন্তরণশীল অবস্থায় থাকে। তারপর ফ্ল্যাজেলা ত্যাগ করে স্থির হয়। সাধারণতঃ পাতার উপর একটি জলের স্তরে এরা অঙ্কুরিত হয় এবং অঙ্কুর-হাইফা সরাসরি পাতার বহিঃত্বককে বেদ করে অথবা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে পোষককে সংক্রামিত করে। রেণুস্থলীর পরিনাম অনেকটাই প্রকৃতির উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল। কম উষ্ণতায় চলরেণু গঠিত হয় কিন্তু উষ্ণতা বেশি থাকলে রেণুস্থলী সরাসরি সংক্রমণকারী-নালিকা (germ tube) গঠন করে।

ছত্রাকটির যৌন জনন সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় না। তবে দেখা গেছে যে এক্ষেত্রে উগ্যামীর যৌন জনন ঘটা সম্ভব। ক্লিনটন (Clinton) 1911 খ্রিস্টাব্দে ছত্রাকরি কৃত্রিম *কৃষ্টি মাধ্যমে* (artificial culture medium) *উস্পোর* (oospore) গঠিত হতে দেখেন। পরে *মারফি* (Murphy) 1927 এ আয়ারল্যান্ডে প্রাকৃতিক পরিবেশে সংক্রামিত আলুতেও উস্পোর গঠিত হবার তথ্য দেন। ব্যারেট (Barret) 1948 এ ছত্রাকটিকে ভিন্নবাসী হিসাবে চিহ্নিত করেন।

সংক্রমনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন যৌবনের অনুপস্থিতিই প্রাকৃতিক পরিবেশে যৌন জননের ঘটনা বিরল হবার কারণ বলে অনুমিত হয়।

15.2.4 পরিবেশগত পূর্বশর্ত (Predisposing Factors) :

রোগটির প্রধান পূর্বশর্তগুলি হল অতিরিক্ত আর্দ্রতা (প্রায় 90 শতাংশ) এবং অনুকূল উষ্ণতা। গড় তাপমাত্রা যেখানে 25°C এর অধিক সেখানে এই রোগের প্রকোপ নেই বললেই চলে। তবে উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলে গড় তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি এবং সেখানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব আছে। আগেই বলা হয়েছে রেণুস্থলীর অঙ্কুরোদগম দুভাবে হতে পারে। 12°C থেকে 14°C তাপমাত্রায় চলরেণু গঠন করে এবং 28°C তাপমাত্রায় সংক্রমণকারী-নালী (herm tube) গঠন করে রেণুস্থলী অঙ্কুরিত হয়। অণুসূত্র গঠনের সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা হল 16 থেকে 18°C এবং রেণুস্থলী গঠনের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা 9°C থেকে 26°C এর মধ্যে থাকে। অঙ্কুর নালী 21°C থেকে 28°C তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভাল ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রোগটির প্রাবল্য রোগজীবাণুর বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশের তাপমাত্রার বিভিন্নতার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে কম তাপমাত্রা (যা রেণুস্থলী গঠনে সহায়ক) এবং পরবর্তী পর্যায়ে সামান্য বেশি তাপমাত্রা (যা রেণুস্থলীর অঙ্কুরোদগমে সহায়ক) ছত্রাকটির সান্নিধ্যে আসা পোষককে অনেক বেশি রোগপ্রবণ করে তোলে। এতদভিন্ন মাটির জল ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, জল ও নাইট্রোজেনের অণুপাত, পাতার জল-পরিমাণ ইত্যাদির রোগপ্রাবল্য নির্ণায়ক ভূমিকা আছে। মাটিতে জলের পরিমাণ যখন 15 থেকে 20 শতাংশ তখন সেটা রেণুস্থলীর স্থায়িত্ব বজায় রাখতে অনেক বেশি সহায়ক। দেখা গেছে অনুকূল তাপমাত্রায় ঐ রকম মাটিতে রেণুস্থলী 9-10 সপ্তাহ তার *সংক্রমনতা* (Pathogenicity) বজায় রাখে। অপেক্ষাকৃত কম দিন কার্যকরী থাকে চলরেণু। 2 থেকে 3 সপ্তাহের বেশি চলরেণু সংক্রমণশীল থাকে না। খরার মরশুমে বা উচ্চ তাপমাত্রায় প্যাথোজেনটি মরে যায়। আলু যখন গ্রীষ্মকালে প্রাকৃতিক উষ্ণতায় গুদামজাত করা হয় তখন সংক্রমণজনিত ফসলক্ষতির হার অনেক কম উপরন্তু এই আলুকে উচ্চ তাপমাত্রায় মরশুমে বাইরে রেখে প্যাথোজেন মুক্ত করা সম্ভব। অপরপক্ষে হিমঘরে রাখা আলুকে সংক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ফসলক্ষতির সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যায়। জলের তুলনায় নাইট্রোজেনের অনুপাত যত বেশি ফসলের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তত বেশি, তেমনি পাতায় জলের পরিমাণ যত বেশি সংক্রামিত হবার প্রবণতা তত বেশি হয়ে থাকে। রোগটির ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা মহামারীর চেহারা নিতে পারে নিম্নলিখিত পরিবেশ-আনুকূল্যে পেলে ঃ

a) রাতের অন্ততঃ চারঘণ্টা সময় তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কের তুলনায় কম।
b) রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10°C বা তার চেয়ে সামান্য বেশি।
c) পরদিন আকাশে মেঘ থাকা অর্থাৎ সূর্যালোকের প্রাবল্য কম হওয়া; এবং
d) পরবর্তী 24 ঘণ্টায় অন্ততঃপক্ষে 0.1 মি. মি. বৃষ্টিপাত।

আলু চাষের ক্ষেত্রে এই পরিবেশগত অবস্থাকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

15.2.5 রোগচক্র (Disease cycle) :

ছত্রাকটির *প্রতিকূলতা অতিক্রমণকারী দশা* (Perennating stage) যে ঠিক কোনটি বা কোনগুলি তা নিয়ে দীর্ঘকালীন মত-বিভিন্নতা আছে। অন্ততঃ ছয়টি সম্ভাবনার কথা বলা যায় যার দরুন প্রতিবার অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসার সাথে সাথেই ছত্রাকটি তৎপর হয়ে ওঠে ঃ

a) মাটিতে অনুসূত্ররূপে ছত্রাকটি প্রতিকূলতা কাটিয়ে দেয়

b) গুদামজাত কন্দে স্থায়ী কিনতু সুপ্ত অনুসূত্ররূপে থেকে যাবার সুযোগ আছে

c) উস্পোর বা সুপ্ত অযৌন রেণু রূপে ছত্রাকটি মাটিতে সুপ্ত থাকে

d) অনুসূত্ররূপে নয় কিন্তু তার *নির্যাসরূপে* (mycoplasm) ছত্রাক কন্দে থেকে যেতে পারে

e) ছত্রাকের *ফলদেহ* (fruit body) রূপে মাটিতে থেকে যাওয়া বীজ কন্দে সুপ্ত থেকে যেতে পারে, অথবা

f) *স্কেলেরোসিয়া* (Sclerotia) বা ঐ জাতীয় গঠন তৈরি করে মাটির মধ্যে মিশে থাকতে পারে।

এই সম্ভাবনাগুলির মধ্যে দুটি সর্বজনগ্রাহ্য এবং নিঃসন্দেহে রোগের প্রাথমিক প্রাদুর্ভাব এর জন্য দায়ী। এগুলি হল (a) মাটিতে ছেড়ে আসা বীজ কন্দে সুপ্তভাবে থেকে যাওয়া অনুসূত্র এবং (b) গুদামজাত কন্দে সুপ্ত অনুসূত্র। এই আলু যখন বীজরূপে ব্যবহার করা হয় তখন সেখান থেকেই ছড়ায় প্রাথমিক সংক্রমণ। ভারতীয় আবহাওয়ায় যেখানে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা এতটাই বেশি, সেখানে মাটিতে অণুসূত্রের বেঁচে থাকার সুযোগ নেই বললেই চলে। হিমঘরের ব্যবহার এবং হিমঘরের আলুকে বীজ হিসাবে শস্যক্ষেত্রে রোপন আমাদের দেশের উষ্ণ পরিবেশে ছত্রাকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করছে যদিও মহামারী দেখা দেবার অনুকূল পরিবেশ এমন কি শীতেও এদেশে তৈরি হয় না।

আক্রান্ত কন্দ থেকে যখন চারা তৈরি হয় তখন ছত্রাকও অনুসূত্ররূপে তার ভিতর উর্দ্ধমুখে বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ চারার কাণ্ডে কর্টেকস বা আদিকলা অংশে অণুসূত্রগুলি *রেণুধারক* (sporangiophore) ও *রেণুথলী* (sporangia) গঠন করে। পাতায় সংক্রমণ সাধারণতঃ এই সমস্ত রেণুথলী থেকে ছড়ায়। মাটির কাছাকাছি সংক্রমণের এই প্রাথমিক প্রাবল্য মাটি থেকে আহৃত উচ্চ আর্দ্রতার জন্য হওয়াই স্বাভাবিক।

গৌণ সংক্রমণের জন্য দায়ী হল স্পোরানজিয়া বা রেণুথলী যা প্রাথমিক সংক্রমণের কারণে উৎপাদিত হয়। রেণুথলী নিজে অঙ্কুর নালী গঠন করে অথবা চলরেণু গঠন করে নতুন নতুন সুস্থ গাছে সংক্রমণ ছড়িয়ে চলে। কাণ্ড বা পাতার ক্ষত বা স্বাভাবিক ছিদ্র যেমন লেন্টিসেল বা পত্ররন্ধ্র দিয়ে *সংক্রমণ হাইফা* (infection hypha) পোষকে প্রবেশ করে। কন্দে ছত্রাকটির সংক্রমণ "চোখ" বা লেন্টিসেলের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পরিণত কন্দের সংক্রমণ প্রবণতা অপরিণত কন্দের থেকে অনেক বেশি। তবে এমনও হয় যে বারবার গৌণ সংক্রমণের পরও উদ্ভিদের উর্দ্ধাংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কন্দ দুর্বল হয়ে পড়েছে কিন্তু আক্রান্ত হয়নি। বৃষ্টিপাত শিশিরপাত ইত্যাদির ফলে পাতা থেকে বা কাণ্ড থেকে রেণু বা রেণুথলী যখ মাটিতে এসে জমা হয় তখনই কন্দ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। মাটি আলগা হলে এবং মাটিতে বালির ভাগ বেশি হলে এই সম্ভাবনা আরো বেশি থাকে। যহি হোক, প্রতিকূল পরিবেশ ফিরে আসার আগে ছত্রাকটি পুনঃ পুনঃ রেণু ও রেণুথলী উৎপাদন করে বহুবার গৌণ সংক্রমণ ঘটায়। ফলে রোগের প্রসার ও ব্যাপকতা বাড়ে। প্রতিকূল পরিবেশ ফিরে এলে অণুসূত্র বা সুপ্ত রেণুরূপে ছত্রাকটি প্রতিকূলতা অতিক্রমণকারী দশায় পুনঃ প্রবেশ করে।

(চিত্র নং 15.1f)।

15.2.6 প্রতিবিধান (Control measures) :

আলুর বিলম্বতি ধ্বসা রোগটি ছত্রাকনাশকের সাহায্যে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনা যায় কিন্তু মনে রাখা দরকার যে রোগ যেহেতু ছড়ায় গৌণ সংক্রমণে অর্থাৎ বাতাসে ভেসে আসা রেণু বা রেণুস্থলীর মাধ্যমে, সেহেতু বড় অঞ্চল জুড়ে আলু চাষের ক্ষেত্রে আশে পাশের সব কটি শস্যক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক প্রতিরোধ পরিকল্পনা গড়ে ওঠা উচিৎ। প্রতিবিধান প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষতা দুইই হতে পারে।

মূলে বসবাসকারী মিথোজীবি ছত্রাক হল মইকরহিজা (Mycorrhizae)। এরা মূলের ভিতরে *(এন্ডোমাইকরহিজা)*

- অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

1. বীজ নির্বাচন ঃ আক্রান্ত শস্যক্ষেত্রের আলুকে কখনই বীজ রূপে ব্যবহার করা যাবে না। কেননা বীজকে ছত্রাকনাশকে বিধৌত করেও সংক্রমণ এড়ানো যায় না। এমনকি সুস্থ বীজ আলু ব্যবহার করেই যে সংক্রমণ এড়ানো যাবে তাও নয় তবে তার ফলে রোগের সংক্রমণকালটিকে অনেক পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর লাভ একটাই। অঙ্কুর দশার থেকে পরিণত গাছ সংক্রমণ প্রতিরোধে বেশি সক্ষম এবং এই পর্যায়ে ছত্রাকনাশক স্প্রে করার কাজটিও সুবিধাজনক।
2. স্বাস্থ্যবিধি ঃ চাষ স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আলু তোলার সময় পাতার সাথে ছোঁয়া লাগে যতদূর সম্ভব কম। ফসল তোলার পর গাছের অবশিষ্টাংশ কখনই মাঠে পড়ে পচতে দেওয়া উচিত নয়।
3. ফসল তোলার সময় ঃ যে সব গাছে বা ক্ষেতে আলুর চারা আক্রান্ত হয়েছে সেখানে ফসল তোলা উচিৎ একটু দেরি করে। এতে শুষ্কতার প্রভাবে ছত্রাকের অনুসূত্র বা রেণু মরে যায়।
4. কন্দ বেছে নেওয়া ঃ ফসল তোলা উচিৎ শুষ্ক সময়ে যখন তাপমাত্রাও একটু বাড়তির দিকে। আক্রান্ত ও সন্দেহজনক কন্দকে আলাদা করে বেছে রাখা উচিৎ এবং সেগুলিকে সুস্থ কন্দের সাথে একই জায়গায় গুদামজাত করা উচিত নয়।
5. সংরক্ষণ পূর্ববর্তী নিয়মাবলী ঃ সংরক্ষিত অবস্থায় আলুকন্দকে গৌণ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে 90 মিনিট ধরে 1 : 1000 অনুপাতে *মারকিউরিক ক্লোরাইড* দ্রবণে বিধৌত করে, শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষিত করা উচিৎ। মনে রাখা দরকার এই আলু খাবার পূর্বে ভালভাবে দীর্ঘ সময় ধুয়ে খাওয়া উচিৎ।
6. সংরক্ষণ ঃ ঠাণ্ডা অথচ শুকনো এবং ভাল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে এমন সংরক্ষণ কেন্দ্রে রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু আর্দ্র, বায়ু চলাচল কম এমন সংরক্ষণ কেন্দ্রে ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়ে। সংরক্ষণের সেরা তাপমাত্রা হল 2 থেকে 4°C.

- প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

(i) ছত্রাকনাশক স্প্রে ঃ ফসলের পাতায় ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। যে সব অঞ্চলে রোগটির প্রকোপ আছে সেসব অঞ্চলে রোগের লক্ষণ দেখা দেবার স্বাভাবিক সময়ের বহু আগে থেকেই স্প্রে করা দরকার। প্রথম স্প্রে করা উচিত চারা যখন 6 সপ্তাহ বয়সী এবং 6 থেকে 8 ইঞ্চি লম্বা। প্রতি দশ থেকে পনের দিন অন্তর অন্তর পরবর্তী পর্যায়ে স্প্রে চালিয়ে যাওয়া উচিত। মধ্যবর্তী সময়ে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে ওষুধ ধুয়ে যাবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে দুটি স্প্রের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান

কমানো যেতে পারে। স্প্রে করার জন্য শক্তিশালী যন্ত্র ব্যবহার করা উচিৎ যাতে ঘন কুয়াশার মত হয়ে ওষুধ পাতার দুই পাশ এবং সমস্ত ভূ-উপরিস্থ অংশের সংস্পর্শে আসতে পারে। কেননা গৌণ সংক্রমণের মাধ্যমে রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে গেলে ছত্রাকের রেণুস্থলীকে উদ্ভিদের বর্হিগাত্র থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত করতে হবে।

ছত্রাকনাশকগুলির মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয় ছিল *বোর্দো মিশ্রণ* (Bordeaux mixture)। প্রথম পর্যায়ে 4 : 4 : 50 অনুপাতে এবং পরবর্তী পর্যায়ে 6 : 6 : 50 অনুপাতে স্প্রে করা যেতে পারে। সাধারণতঃ 15 থেকে 21 দিনের ব্যবধানে 2 থেকে 3 বার স্প্রে করা হয়। আধুনিককালে অবশ্য অন্যান্য তাম্রঘটিত ছত্রাকনাশক যেমন *কিউপ্রাভিট* (cupravit), *Fycol 8E, পেরেনক্স* (Perenox) বা *ব্লাইটকস - 50* (Blitox-50) ব্যবহার করা হয়। এগুলি 0.2 থেকে 0.5 শতাংশ দ্রবণ রূপে ঘন স্প্রে করা হয়। বর্তমানে ডাই থায়োকার্বামেট ছত্রাকনাশকগুলি তাম্রঘটিত ছত্রাকনাশককে ব্যবহারের দিক থেকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। এগুলির মধ্যে *ডাইথেন D-14, ডাইথেন Z-78* খুব কাজে দেয়। প্রতি হেক্টরে প্রতি লিটার জলে থেকে 2.5 কেজি ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করা দরকার।

2. **ছত্রাকনাশক গুঁড়ো ছিটানো (dusting) ঃ** গুঁড়ো ছিটানো স্প্রে-র মত কার্যকরী কখনই নয়। যদি একান্তই দরকার হয় তাহলে শিশিরসিক্ত গাছের উপরই গুঁড়ো ছেটানো উচিৎ। তামা-চুন ঘটিত গুঁড়া যেমন 12½ পাউণ্ড কপার সালফেট বা তুঁতে এবং 50 পাউণ্ড চুনজল মিশিয়ে নিয়ে ছেটালে উপকার পাওয়া যায়।

3. **রোগ প্রতিরোধী প্রকরণের চাষ (use of resistant variety) ঃ** যেখানেই সম্ভব সেখানে এর চাইতে ভাল প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিছু নেই। কতগুলি physiological race-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 0 ও 1, 3, 4 যে গুলি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। আলুর একটি সমগোত্রীয় উদ্ভিদ *Solanum demissum* যা কেবলমাত্র মধ্য মেক্সিকোয় পাওয়া যায়, সেটি *Phytophthora infestans* এর প্রতি যথেষ্ট প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যে সমস্ত আলু বীজে বা চারায় সংকরায়ণের ফলে *S. demissum* এর এই প্রতিরোধী জীনটিকে সঞ্চারিত করা গেছে সেগুলি সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে জীবাণুকে প্রতিরোধ করতে পারে।

অনুশীলনী - 1

1. **নিম্নলিখিত তথ্যগুলির উত্তর ডানপাশে দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটির তলায় দাগ দিন ঃ**

(a)	আলুর ধ্বসা একটি ভারতে উদ্ভূত রোগ।	হ্যাঁ / না
(b)	রোগটির প্রভাবে আয়ারল্যান্ডে একটি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।	হ্যাঁ / না
(c)	এই রোগের জীবাণুটি একটি বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।	হ্যাঁ / না
(d)	ছত্রাকটির রেণুস্থলী কেবলমাত্র চলরেণু গঠন করে অঙ্কুরিত হয়।	হ্যাঁ / না
(e)	উচ্চ আর্দ্রতা আলুর ধ্বসা রোগের সহায়ক।	হ্যাঁ / না

2. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(a) আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের জীবাণু হল ________।

(b) ________ হল জীবাণুটির সংক্রমণ সাফল্যের তিনটি পূর্বশর্ত হল ________ ________ ________ এবং ________।

(c) ছত্রাকটির সম্ভাব্য দুটি প্রতিকূলতা অতিক্রমণকারী দশা হল ________ এবং ________।

(d) রোগটির গৌণ সংক্রমণের জন্য দায়ী অংশ হল ________।

(e) ________ একটি ছত্রাকনাশ যা স্প্রে করা হয় এবং ________ হল অপর একটি ছত্রাকনাশক যা গুঁড়া হিসাবে ছেটানো হয়।

15.3 ধান গাছের পিঙ্গল চিটে রোগ (Brown spot of rice) :

15.3.1 প্রাপ্তিস্থান ও গুরুত্ব (Occurence and Importance) :

ধানের এই রোগটি সারা পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলে দেখা যায়। এটি মতান্তরে ধনের *(Oryza sativa L.)* পাতা দাগ (Leaf spot) রোগ নামে পরিচিত। সংক্রামকের পরিচিত জ্ঞাপক হেলমিনথোস্পোরিয়াম (Helminthosporium disease) রোগ নামেও এটিকে অভিহিত করা হয়। দঃ পূঃ এশিয়া, জাপান, ফিলিপাইনস এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রোগটির প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশি। ভারতে প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় 1922 খ্রিস্টাব্দে এবং তার পর থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও দক্ষিণে রোগটি বারবার ফসলের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি তিনভাবে হতে পারে ঃ

a) বীজের হ্রাসপ্রাপ্ত অঙ্কুরোদগমের হার।

b) চারাধানের পাতায় চিটে লাগার ফলে পাতার সালোকসংশ্লেষ তলের হ্রাস-ফলে চারা দুর্বল হয়ে পড়া। এটাই রোগের সব চাইতে ক্ষতিকর দিক।

c) দানায় সংক্রমণ বা দানা থেকে সংক্রমণ বীজধানে ছড়িয়ে পড়া। ফলে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনে হ্রাস হবার সাথে সাথে পরবর্তী চাযও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা।

15.3.2 রোগলক্ষণ (Symptoms) :

পোষকের যে কোন অংশ আক্রান্ত হতে পারে এবং যে কোন দশায় চারায় রোগলক্ষণ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। বীজ ধান থেকে চারা না বেরোনোও একটি লক্ষণ যা সংক্রামিত বীজ বপন করলে প্রায়শই ঘটে থাকে। অঙ্কুরে সংক্রমণের প্রকাশ ছোট্ট ছোট্ট বাদামী গোল থেকে ডিম্বাকৃতি দাগের আকারে। দাগগুলি ক্রমশঃ পচনশীল হয়ে ওঠে এবং সমস্ত মুকুলটিই পচে নষ্ট হয়ে যায়। রোগের সব চাইতে দৃষ্টিগ্রাহ্য লক্ষণ ফুটে ওঠে পাতায়। পাতায় দাগগুলি

পিঙ্গল বা ঘন বাদামী, ডিম্বাকৃতি বা চক্ষু আকৃতির এবং উপরিতলে সীমাবদ্ধ। এগুলি আকার বিভিন্ন হতে পারে খুব ছোট থেকে মাঝারি। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে 1-14 মি.মি. × 0.5-3 মি.মি. আকারের দাগ দেখা যায়। এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং সারা পত্রতল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে (চিত্র 15.2a)। ছোট দাগগুলি পুরোপুরি বাদামী কিন্তু বড় দাগগুলির কেন্দ্রস্থল হালকা হলুদ বা ময়লাটে সাদা বা ধূসর হতে পারে। প্রতিটি দাগকে ঘিরে একটি হলদেটে আভা (halo) পরিলক্ষিত হয় যা বস্তুতঃপক্ষে ক্লোরোসিসের প্রকাশ বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। পরে, দাগগুলি একে অন্যের সাথে জুড়ে গিয়ে বড়সড় অনিয়তাকার অঞ্চলে রূপান্তরিত হতে পারে এবং চূড়ান্ত ক্ষেত্রে সমস্ত পাতাটি পিঙ্গল হয়ে শুকিয়ে যায়। পাতার গোড়ায় (leaf sheath) বা কাণ্ডেও একই রকমের দাগ লক্ষ্য করা যায়। দাগগুলি প্রথমাবস্থায় মসৃণ থাকলেও পরবর্তীকালে ছত্রাকরেণু উৎপাদিত হলে সেগুলি অমসৃণ ভেলভেট ধরনের চেহারা নেয়।

শীষে সংক্রমণের রকমফের রোগটির প্রাবল্যের উপর নির্ভরশীল। চূড়ান্ত ক্ষেত্রে শীষ দেখা না দিতে পারে নয়তো তীব্রতার উপর নির্ভর করে ছত্রাক ধানের *খোসা* (glume) বা দানাকে সংক্রামিত করে। শীষে সংক্রমণ খোঁজার সব চাইতে ভাল উপায় শীষের গাঁটটিকে লক্ষ্য করা। দাগগুলি সবচেয়ে আগে এখানে দেখা দেয়। এরফলে মঞ্জরী কোঁকড়ানো বা অসংগঠিত চেহারায় প্রতীয়মান হয়। এই পর্যায়ে সংক্রমণ প্রতিহত না হলে দানার খোসা বা দানা দাগাক্রান্ত তো হয়ই খোসার মধ্যে দানা আদৌ না আসতে পারে ফলে ফসলহানি হয় (চিত্র 15.2b)।

15.3.3 রোগজীবাণু (Causal organism) ও নিদানতত্ত্ব (Etiology) :

ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক *Helminthosporium oryzae* Breada deHaan. এই রোগের জন্য দায়ী। ছত্রাকটির *পারফেক্ট দশা* (Perfect stage), *Cochliobolus miyabeanus* (Ito and Kurbay.) Dickson নামে পরিচিত।

ছত্রাকের অনুসূত্রগুলি শাখাযুক্ত এবং পোষক কলার মধ্যে কোশান্তর রন্ধ্র দিয়ে অথবা অন্তঃকোশীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। অঙ্গজ হাইফাগুলি অনুভূমিক। এগুলি থেকে যে বায়বীয় উল্লম্ব হাইফা নির্গত হয় সেগুলি বস্তুতঃপক্ষে কনিডিয়া বহনকারী কনিডিওফোর। এরা সাধারণতঃ খাটো, প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত, শাখান্বিত অথবা শাখাবিহীন হয়। কনিডিওফোরগুলির গোড়ার দিক ঘন-বাদামী থেকে জলপাই বর্ণ বিশিষ্ট হয় এবং উপরের দিক অপেক্ষাকৃত হালকা বর্ণের হয়। উপযুক্ত পরিবেশে ছত্রাকের অনুসূত্র পোষকগাত্রের বাইরের দিকেও আস্তরণ তৈরি করে এবং এই আস্তরণ (mycelial mat) থেকেও কনিডিওফোর নির্গত হয়। একটি কনিডিওফোর ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন কনডিয়া (Conidia) গঠন করতে পারে। কনিডিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তির পর খসে গেলেও তার দাগটি বা সংযোগস্থলটি একটি হাঁটুর অস্থির মত স্থায়ী দাগ কনিডিওফোরের গায়ে রেখে যায় (চিত্র 15.2c)।

প্রতিটি কনিডিয়াম ঈষৎ বাঁকানো আকৃতির কতকটা কাস্তের মতো এবং প্রান্তদ্বয় ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। এগুলি প্রস্থপ্রাচীর যুক্ত এবং প্রস্থ প্রাচীরের সংখ্যা 5 থেকে 10টি পর্যন্ত হতে পারে (চিত্র 15.2c)। এগুলির আকার ছত্রাকটির শারীরবৃত্তীয় প্রকরণের উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে কম 56×15 মাইক্রন (μ) এবং সবচেয়ে বেশি 104×20 মাইক্রন (μ) দৈর্ঘ্য *x* প্রস্থ বিশিষ্ট কনিডিয়া লক্ষ্য করা যায়। বর্ণ বাদামী বা জলপাই-বাদামী হতে পারে। এগুলির গঠনক্রম অপসারী অর্থাৎ সবচেয়ে নীচের কনিডিয়ামটি সবচেয়ে প্রাচীন এবং ঊর্ধ্বতম কনিডিয়ামটি নবীনতম।

ছত্রাকের সাথে পোষকের আনাতঃ সম্পর্ক অন্য অনেক জৈব রাসায়নিক শর্তাদির সাথে সাথে একটি *অধিবিষ* (Toxin) দ্বারা বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়। *Helminthosporium Oryzae* ককলিওবোলিন (Cochliobolin) নামক একটি *অধিবিষ* (Toxin) উৎপাদন করে যা ধানের চারার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং মূলের বৃদ্ধি বা পাতার

শ্বসন ক্রিয়া এটির প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় যার ফলে পোষককোশের শারীরবৃত্তীয় ভারসাম্য নষ্ট হয়। এছাড়া ছত্রাকটি ভাল পরিমাণে *প্রোটিন ভঞ্জক উৎসেচক* (Proteolytic enzyme) নিঃসৃত করে যার ফলে পোষক কোশের প্রাচীরের সুসংবদ্ধতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং অনুপ্রবেশ সহজতর হয়।

15.3.4 পরিবেশগত পূর্বশর্ত (Predisposing Factors) :

যেহেতু রোগ ছড়ায় মূলতঃ বাতাসের মাধ্যমে, বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়া কনিডিয়ার সাহায্যে, সেহেতু বাতাসের গতিবেগ অন্যান্য শর্তাদির চেয়ে বেশি প্রভাবশালী। 4.0 থেকে 8.0 কিমি/ প্রতি ঘণ্টায় বায়ুর গতিবেগ কনিডিয়ার বিস্তার লাভে সব চাইতে সহায়ক। এর সাথে 27 – 28°C গড় উষ্ণতা, 90 – 99 শতাংশ আর্দ্রতা এবং 0.4 – 14.4 মি.মি. বৃষ্টিপাত কনিডিয়াবাহী সংক্রমণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। মেঘলা আবহাওয়া সংক্রমণ প্রাবল্যর জন্য দায়ী। ধান চাষ যেখানে সেচের জলের সাহায্যে হয় সেখানে রোগটির প্রাবল্য বেশি। বীজবপন যদি মাটির গভীরে হয় (deep sowing) তাহলে চারা বেরোতে সময় বেশি লাগে এবং সংক্রমণ হার বাড়ে। চারার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সংক্রামিত হবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন ও পটাশ ঘাটতি সংক্রমণের পক্ষে সহায়ক। এছাড়া পাতায় বিজারক শর্করা ও অ্যাসিডে বিশ্লেষিত হয় এমনে বহুশর্করার আধিক্য সংক্রমণ প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়।

কনিডিয়া গঠনের জন্য অনুকূল উষ্ণতা 21 থেকে 26°C এর মধ্যে; আর্দ্রতা 92.5 শতাংশ বা তার উর্ধে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কনিডিয়ামের অঙ্কুরোদগমের জন্য 25 থেকে 30°C উষ্ণতা এবং 92 শতাংশ আর্দ্রতা প্রয়োজন। রোগের লক্ষণ পিঙ্গল দাগ প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ ছায়াচ্ছন্ন স্থানে অনেক বেশি; সূর্যালোক দাগ সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

15.3.5 রোগচক্র (Disease cycle) :

রোগজীবাণু বীজের বাইরে বা ভেতরে যথাক্রমে কনিডিয়া রূপে বা অনুসূত্ররূপে প্রতিকূল পরিবেশ অতিবাহিত করে। অবশ্য খড় বা ক্ষেতের মধ্যে পড়ে থাকা ফসলের অবশিষ্টাংশ ছত্রাককে প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার আশ্রয়স্থল বলে কোথাও কোথাও দেখা গেছে। দুটি গ্রামীনী গোত্রের গাছ *Leersia hexandra* এবং *Echinochola colona* ছত্রাকটির *সহপোষক* (Collateral host) এবং ধানগাছের অভাবে ছত্রাক এগুলিকে সংক্রামিত করে বাঁচতে পারে। দুটি আগাছা *Cynodon sp* এবং *Setaria sp* হেলমিনথোস্পোরিয়ামকে প্রতিকূল পরিবেশে আশ্রয়দান করে। সুতরাং প্রাথমিক সংক্রামণ মূলতঃ বীজ থেকে হলেও উপরোক্ত যে কোন আশ্রয়স্থল থেকেই ছত্রাক শস্যক্ষেত্রে ধানগাছের উপর প্রাথমিক সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সংক্রামিত চারার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্যাথোজেন উর্ধমুখে সঞ্চারিত হয় এবং অচিরেই কনিডিয়া গঠন করে। বাতাস বাহিত কনিডিয়া গৌণ সংক্রমণ ঘটায়। নতুন নতুন পোষক উদ্ভিদ পুনঃ পুনঃ কনিডিয়া অঙ্কুরোদগমের আধার হতে পারে। অঙ্কুরোদগম একটি মিউসিলেজ ধাত্রের সাথে পাতার ত্বকে সংযুক্ত অবস্থায় হয়। প্রথমে *অঙ্কুর-নালী* (germ tube), পরে অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন করে ছত্রাকটি পোষক উদ্ভিদের বহিঃস্তককে স্থিত হয়। এরপর গঠিত হয় *সংক্রামক হাইফা* (infection hypha) যা অন্তঃ ও আন্তঃকোশীয় অনুসূত্র

উৎপাদন করে—রোগের প্রাবল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পরিবেশ অনুকূল থাকলে প্রতিটি দাগ থেকে অজস্র কনিডিওফোর বায়বীয় হাইফারূপে গুচ্ছাকারে গঠিত হয় এবং সেগুলি ক্রমান্বয়ে কনিডিয়া গঠন করে চলে। এভাবে একটি মরসুমে বহুবার গৌণ সংক্রমণ সাধিত হয় এবং চারা কাটার সময় যখন বাতাসে আর্দ্রতা কমে যায় বা রৌদ্র প্রখরতর হয়ে ওঠে তখন ছত্রাকটি পুনরায় প্রতিকূলতা অতিক্রমণকারী দশায় ফিরে যায় (চিত্র নং 15.2d)।

15.3.6 প্রতিবিধান (Control measures) :

ক. অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি ঃ

i) স্বাস্থ্যবিধি ঃ স্বাথবিধি দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ফসল তোলার পর আক্রান্ত উদ্ভিদের অর্থাৎ ধানগাছের সব অবশিষ্টাংশ, গোড়া ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। দ্বিতীয়তঃ *Phytophthora* যেহেতু সহপোষক (যেমন *Leersia sp*) বা আগাছাকে (যেমন *Cynodon sp*) আশ্রয় করে বাঁচে সেহেতু সে জাতীয় গাছ শস্যক্ষেত্রের আওতার বাইরে বেশ বড়সড় অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করা উচিৎ।

ii) বীজ নির্বাচন ঃ এমন স্থান বা অঞ্চল থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিৎ যেখানে রোগটির প্রকোপ নেই।

iii) বীজ শোধন ঃ যেহেতু প্যাথোজেন বীজের উপর বা ভিতরে বাঁচে সেহেতু বীজ শোধনের পদ্ধতিও দ্বিবিধ। বাইরের বীজাণু মারতে গেলে কেজি প্রতি বীজে 3 গ্রাম অ্যাগ্রোসান বা সেরেসান দিয়ে বীজ বিধৌত করা। ভিতরের প্যাথোজেনকে নিষ্ক্রিয় করতে 55^0C উষ্ণতায় 10 মিনিট বীজকে বিধৌত করে ব্যবহার করা। রাসায়নিক ব্যবহারের তুলনায় এটি অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি।

iv) বীজতলায় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ঃ বীজতলায় নিষ্টাসিন (Nystacin) বা গ্রিসিওফালভিন (Gresiofulvin) ব্যবহার করে অঙ্কুরগুলিকে সংক্রমণ প্রতিরোধী করে তোলা যায় তবে অনেক সময় তা অঙ্কুরের বা বীজের ক্ষতিও করে।

v) কৃষ্টি পদ্ধতি ঃ যথার্থ পরিমান নাইট্রোজেন প্রয়োগ, বীজ বপন ও চারা লাগানোর জন্য সঠিক সময় নির্বাচন রোগ এড়াতে সাহায্য করে।

খ. প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

i) ছত্রাকনাশক স্প্রে ঃ বোর্দো মিশ্রণ (5 : 5 : 50) অনুপাতে অথবা 0.2 শতাংশ ডাইথেন **Z 78** স্প্রে করলে রোগের প্রকোপ কমানো যায়। এছাড়া 0.1% হিনোসান (Hinosan), 1% **Bla-S**, 0.2% ব্লাইটকস ইত্যাদি পাতায় স্প্রে করে রোগ নিয়ন্ত্রণের কথা জানা আছে।

ii) ছত্রাকনাশক গুঁড়ো ছিটানো **(dusting)** ঃ 0.1% জৈব-পারদঘটিত মিশ্রণ ছিটিয়ে সুফল পাওয়া গেছে। শিষ বের হওয়ার পর ও ফসল কাটার আগে এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী দিনগুলিতে 3 থেকে 4 বার ছিটানো হলে ছত্রাক অকার্যকরী হয়ে পড়ে।

iii) রোগ প্রতিরোধী প্রকরণ ঃ যেহেতু *Helminthosporium*-এর বিরুধে প্রতিরোধ বহু জীনের সামন্বয়িক ক্রিয়ার ফল সেহেতু রোগপ্রতিরোধী প্রকরণ পাওয়া শক্ত। তার মধ্যে পদ্মা, **IR-24** (Singh & Sharma 1975) অপেক্ষাকৃত ভাল প্রতিরোধ প্রদর্শন করে।

অনুশীলনী - 2

1. ধানগাছের পিঙ্গল চিটে রোগের সনাক্তকারী লক্ষণটি অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।
2. রোগটির রোগজীবাণুর অঙ্গজ দশা ও কনিডিয়া উৎপাদনকারী দশার নাম কি কি ?
3. রোগটি ধান চাষের কি ধরনের ক্ষতি করতে পারে?
4. নিম্নলিখিত পর্যায়গুলির জন্য উপযুক্ত শর্ত পাশের ফাঁকা জায়গায় লিখুন।
   a) কনিডিয়ার অঙ্কুরোদগম ______________।
   b) কনিডিয়া গঠন ______________।
   c) কনিডিয়ার বিস্তার ______________।
5. রোগজীবাণুটির ধান ভিন্ন অন্য সহপোষকগুলির মধ্যে গ্রামিনী গোত্রের দুটি গাছের নাম লিখুন।
6. ধানের দুটি রোগ প্রতিরোধী প্রকরণের নাম লিখুন।

15.4 গম গাছের কৃষ্ণবর্ণ মরিচা রোগ (Black stem rust of Wheat) :

গম গাছের মরিচা রোগ তিন ধরনের হতে পারে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সংক্রামক রোগজীবাণু ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের আলোচ্য কৃষ্ণ মরিচা *Puccinia graminis* var *tritici* Eriks. and Henn.-এর প্রভাবে, পীত *মরিচা* (yellow or stripe rust) *Puccinia striiformis* West.-এর প্রভাবে এবং পাতার (পিঙ্গল বা কমলা মরিচা রোগ *P. reconita* Rob. ex Desm.-এর প্রভাবে হয়ে থাকে।

15.4.1 প্রাপ্তিস্থান ও গুরুত্ব (Occurence and Importance) :

নানা পুঁথিপত্র, পুরোনো নথি ইত্যাদির মাধ্যমে জানা যায় যে মরিচা রোগটি রীতিমতো প্রাচীন। পুরোনো রোমান সাহিত্য ও কাব্যে এটির বিবরণ আছে তবে রোগটির যথার্থ কারণ খুঁজে বের করার কৃতিত্ব পারসুন (Persoon, 1797) এর। 1797 খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম নজরে আনেন যে গম গাছের কাণ্ডে যে মরিচা রোগ হয় তার জন্য দায়ী একটি ছত্রাক *Puccinia graminis*। ছত্রাকটির জীবনচক্রে দ্বিরূপতার জন্যই সেটির সম্পূর্ণ জীবন চক্র 1865 র আগে জানা যায় নি। ডি বেরী (De Bary) সর্বপ্রথম কৃত্রিম মাধ্যমে ছত্রাকটি বাঁচিয়ে রেখে এবং সেখান থেকে জীবাণু পোষকে স্থানান্তরিত করে দেখেন যে জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে জীবাণুটির একটি নয় দুটি পোষক দরকার। তার একটি হল গম এবং অপরটি হল বারবেরি গাছ।

পৃথিবীর প্রায় সব গম উৎপাদনকারী দেশে রোগটির প্রাদুর্ভাব রয়েছে। তবে মাঝারি ধরনের আর্দ্র আবহাওয়া ও হালকা বৃষ্টিপাত স্নাত অঞ্চলে রোগটির হানিকর প্রভাব অনেক বেশি।

15.4.2 রোগলক্ষণ (Symptoms) :

পাতায় ও ডাঁটিতে *লাল মরিচা* বা red rust এর আবির্ভাব হল রোগের প্রথম লক্ষণ। এই লাল দাগগুলি ছত্রাকটির একটি রেণু উৎপাদনকারী গঠন *ইউরেডোসোরাস* (Uredosorus) এর বহিঃপ্রকাশ। এই গঠন থেকে উৎফাদিত রেণুগুলি লাল বর্ণের তাই দাগের নাম লাল মরিচা। কিছু সময় পরে অর্থাৎ শীতের প্রারম্ভে এই লাল দাগগুলিই কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। আদতে এই অংশে তখন অপর একটি রেণু উৎপাদনকারী গঠন *টিলিউটোসেরাস* (Teleutosorus) গঠিত হয়। উৎপাদিত রেণুটি কৃষ্ণ বর্ণ *টিলিউটোরেণু*-তাই দশাটির নাম কৃষ্ণ মরিচা বা black rust; রোগটি এই দশার নামে অধিক সুপরিচিত।

পাতা বা ডাঁটিতে লম্বাটে বাদামী বা লালচে-বাদামী দাগ *সোরাসের* (Sorus) এর আবির্ভাব নিশ্চিত করে। সোরাসগুলির নাম আগেই বলা হল—*ইউরেডোসোরাস*। এগুলি বহিঃস্তককে ফাটিয়ে বাতাসে উন্মুক্ত হয়। তখন দাগগুলির ঈষৎ অবতল এবং ছিদ্রাল অবস্থা সহজেই খালি চোখে লক্ষ্য করা যায়। দাগের আকার, আকৃতি এবং পরিমান আবহাওয়া ও পোষকের বাধাদানের ক্ষমতা—দুইয়ের উপরই নির্বরশীল। অন্যান্য দাগের ক্ষেত্রে যা হয়—দাগের চারপাশে ক্লোরোসিস ঘটিত *আভা* বা halo এখানে কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না। দাগের চারপাশে ক্লোরোসিস ঘটলেও সে অংশ এত তাড়াতাড়ি মরে যায় যে হালকা ভাবটি চোখে পড়ে না। সোরাসের মধ্যে অগনিত লালচে গুঁড়ার মত ইউরোডোস্পোর (uredospore) গঠিত হয়। এটাই রোগের লাল মরিচা দশা (চিত্র 15.3 a)। শীতের আগমনে লাল মরিচাকে প্রতিস্থাপিত করে কৃষ্ণবর্ণ মরিচা। দাগগুলি একই রকম কিন্তু কালো, সোরাসের নাম তখন *টিলিউটোসোরাস* এবং সেখান থেকে যে রেণু উৎপাদিত হয় তার নাম *টিলিউটোরেণু* (Teleutospore) এগুলি কালো, মসৃণ তাই অনেক বেশি চকচকে (চিত্র 15.3a) এবং সোরাসের সাথে সংযুক্ত থাকার প্রবণতা এই রেণুর অনেক বেশি।

আগেই বলা হয়েছে জীবাণুটির পোষক দুটি। *টিলিউটো রেণু* শীতকালটা সুপ্ত অবস্থাতেই কাটায় এবং অনুকূল পরিবেশে এটা পুনরায় গমগাছকে সংক্রামিত করতে পারে না। বরং এর তখন দরকার হয় বিকল্প পোষকের যার নাম *Berberis vulgaris* চলতি কথায় বারবেরি গাছ (Barberry plant)।

বারবেরিতে সংক্রমণের প্রথম প্রকাশ হালকা হলদে দাগের আকারে যেগুলি পাতার উপরিতলে সীমাবদ্ধ (চিত্র 15.4a) দাগগুলি ক্রমশঃ বড় হয় লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে এবং মধ্য ভাগ মধুর মত গাঢ় রস চুঁইয়ে নিঃসরণ করে। অল্প কিছুদিন পরে দাগগুলির ঠিক উল্টোদিকে পাতার নিম্নতল পরীক্ষা করলে দেখা যায় ছোট ছোট কাপ আকৃতির গঠন আবির্ভূত হয়েছে। এগুলিকে বলে এসিয়া এবং এখান থেকে উৎপাদিত রেণু হল এসিওরেণু (Aecia and aeciospore) (চিত্র 15.4a)। দাগগুলির সাথে সাথে আক্রান্ত অঞ্চলে অর্থাৎ পাতার সংক্রামিত অংশে অস্বাভাবিক হারে *কোশ বৃদ্ধি ও বিভাজন* (hypertrophy) পরিলক্ষিত হয়। ফল বা পত্রবৃন্তে অনুরূপ অতিবৃদ্ধিজনিত ফাঁপা দাগ পরিলক্ষিত হয়।

15.4.3 রোগজীবাণু ও নিদানতত্ত্ব (Causal organism and Etiology) :

বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক *Puccinia graminis* var *tritici* গম গাছের (*Triticum aestivum*) এর এই রোগের জন্য দায়ী।

ছত্রাক obligate parasite এবং ছত্রাকটির অণুসূত্র পোষক কলার মধ্যে সাধারণতঃ আন্তঃকোশীয় ভাবে অর্থাৎ কোশান্তররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পায়। অণুসূত্র 3.5 মাইক্রন (μ) বেধ বিশিষ্ট হাইফা দ্বারা গঠিত। হাইফাগুলি প্রস্থ প্রাচীরযুক্ত ও শাখান্বিত। কোশের মধ্যে হাইফাগুলি অতিক্ষুদ্র গদাকৃতি শাখান্বিত বা শাখাবিহীন *চোষক* (haustoria) প্রেরণ করে খাধ্য সংগ্রহ করে। জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত এবং বিভিন্ন পোষকের উপর গঠিত বিভিন্ন রেণুর ভিত্তিতে *Puccinia graminis* এর বৃদ্ধির ও জননের অন্ততঃপক্ষে পাঁচটি পর্যায়কে চিহ্নিত করা যায়।

এর মুখ্য পোষক হল গম গাছ। আক্রান্ত গম গাছে অনুকূল পরিবেশে ছত্রাকের হাইফাগুলি পাতার বহিঃস্তকের ঠিক তলায় গুচ্ছাকারে পুঞ্জীভূত হয়। এভাবে গঠিত হয় প্রথম রেণু উৎপাদনকারী গঠন যা ইউরেডোসোরাস বা ইউরেডিয়াম (uredium) নামে পরিচিত। সোরাসের গোড়া থেকে বহু সংখ্যক সবৃন্তক ইউরেডো*রেণু* উৎপাদিত হয়। প্রতিটি ইউরেডোরেণু ডিম্বাকৃতি, বাদামী-বর্ণের এবং কন্টকময় প্রাচীর যুক্ত। একটি রেণু একটি মাত্র কোশ বিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং প্রাচীরগাত্রে সমদূরত্বে চারটি জার্ম ছিদ্র বা অঙ্কুর ছদ্র বর্তমান। পুঞ্জীভূত রেণুর চাপে পোষকের পাতার বহিঃস্তক ফেটে যায় এবং রেণু বিদারিত হয়। বিদারিত রেণু পুনঃপুনঃ সংক্রমণ সৃষ্টি করতে পারে, ফলে এই ইউরোডোরেণুর মাধ্যমে যতদিন পরিবেশ অনুকূল থাকে ততদিন গৌণ সংক্রমণ হয়।

মরশুমের শেষ দিকে অর্থাৎ শীতের প্রারম্ভে ঐ একই অনুসূত্র থেকেই একই পোষকে গঠিত হয় টিলিউটোসোরাস বা টিলিয়া (Telia), *টিলিউটোস্পোর* গুলি সোরাস তথা বৃন্তের সাথে অনেক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। প্রতিটি *টিলিউটোরেণু* দ্বিকোশী। কোশদ্বয়ের প্রান্তভাগ ক্রমশ সরু। প্রতিটি প্রান্তে একটি করে জার্ম ছিদ্র আছে। রেণুর প্রাচীর অত্যন্ত পুরু কিন্তু মসৃণ। রেণু প্রাচীর কৃষ্ণ বর্ণের। ইউরোডোরেণুর মত বিদারিত হবার সাথে সাথেই এটি অঙ্কুরিত হতে পারে না বরং বহুদিন ধরে এরা বিশ্রামরত অবস্থায় থেকে যায় এবং এটিই ছত্রাকের *প্রতিকূলতা অতিক্রমণকারী দশা* (চিত্র 15.3d দ্রষ্টব্য)।

আগেই বলা হয়েছে টিলিউটোরেণু গম গাচের উপর অঙ্কুরিত হতে পারে না। এটি সাধারণতঃ মাটিতে অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুর-নালী (germ tube) অঙ্কুরোদগমের পরে একটি 4 কোশ বিশিষ্ট অতিক্ষুদ্র অণুসূত্র গঠন করে যাকে বলে প্রোমাইসেলিয়াম (চিত্র 15.3ঙ)। চারটি কোশের প্রতিটি থেকে একটি করে বৃন্তের ন্যায় অংশ সৃষ্ট হয় যাদের বলে স্টেরিগমাটা (Sterigamata)। প্রতি কোশের এই বৃন্তের উপর একটি করে গোলাকার ক্ষুদ্র একসোখী এক নিউক্লিয়াসযুক্ত বেসিডিওরেণু গঠিত হয়। চারটি বেসিডিওরেণুর মধ্যে যৌণতার ফারাক আছে। দুটি দাতা বা + যৌনতা বিশিষ্ট এবং দুটি গ্রহীতা বা —যৌনতা বিশিষ্ট। রেণুগুলির পরিণতি দ্বিবিধ পতে পারে। এগুলি জলে বা জলের উপস্থিতির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্কুরিত হতে পারে তবে কোনভাবেই গমগাছকে সংক্রামিত করতে পারে না। তবে বিকল্প পোষক *Barberis vulgaris* এর সান্নিধ্যে এলে এগুলি থেকে অঙ্কুর-নালী (germ tube) নির্গত হয়ে বারবেরি পাতার বহিঃস্তককে সরাসরি ভেদ করে অনুপ্রবেশ করে। এক নিউক্লিয়াসযুক্ত বেসিডিওরেণু থেকে সৃষ্ট সংক্রামক হাইফাও *এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট* (monokaryotic) হয় এবং পোষক দেহের মধ্যে আন্তঃ ও অন্তঃকোশীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। পাতার উপরিতলে ছত্রাকটি ছোট ছোট ফ্লাসক আকৃতির সোরাস গঠন করে। এই সারস গুলির নাম হল পিকনিয়া (Pycnia) এবং এই ফ্লাস্ক আকৃতির গঠনের মুখে ছোট্ট একটি ছিদ্র বা রন্ধ্র বর্তমান যার নাম *অসটিওল* (Ostiole) (চিত্র 15.4a ও b)। নিকনিয়া দুরকমের হাইফা দিয়ে তৈরি। এক ধরনের হাইফা তৈরি করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

গোলাকার রেণুস্থল জনন কোশ যার নাম *স্পারমাসিয়া* (spermatia)। অপর হাইফাগুলি অপেক্ষাকৃত ওপরের দিকে গঠিত হয় এবং অসটিওল ছিদ্রমুখে এগুলির প্রান্তভাগ বাতাসে উন্মুক্ত হয়। এই হাইফাগুলি কোন জনন কোশ বা জনন রেণু উৎপাদন করে না। কিন্তু এরা নিঃসন্দেহে জননকারী হাইফা যাদ্রে *গ্রহীতা হাইফা* বা *ফ্লেকসাস হাইফা* (Flexous hypha) নামে অভিহিত করা হয়। বেসিডিওরেণুর যৌনতা যেহেতু নির্দিষ্ট, সেহেতু সেটি থেকে তৈরি হওয়া অনুসূত্র এবং পিকনিয়ার যৌনতাও সুনির্দিষ্ট। একটি (+) হাইফা থেকে গঠিত পিকনিয়া (+) স্পারমাসিয়া ও (+) গ্রহীতা হাইফাই গঠন করে। পিনকনিয়ার কেন্দ্রস্থলে অসটিওল ছিদ্রমুখে ঘন মধুর মত তরল জমা হয় যা পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। সাধারণতঃ পতঙ্গবাহিত হয়ে স্পারমাসিয়া তার বিপরীত ধর্মী গ্রহীতা হাইফার সান্নিধ্য পায়। এর কারণ (+) স্পারমাসিয়া কখনও (+) গ্রহীতা হাইফার সাথে মিলিত হবে না। (–) অণুসূত্রের ক্ষেত্রেও এটা সমান সত্য। সুতরাং পতঙ্গ মাধ্যমে (+) স্পারমাসিয়া যখন (–) গ্রহীতা হাইফার (Receptive hypha) সংস্পর্শে আসে তখন দুটি বিপরীত যৌনতার নিউক্লিয়াস পাশাপাশি আসে। এই পদ্ধতি ছত্রাকের জীবনচক্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পর্যায় এবং দ্বিত্বকরণ (dikaryotization) নামে পরিচিত। এর ফলে হাইফা যা এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট বা (–) হাইফা ছিল তা দ্বি-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট (+) এবং (–) উভয় যৌনতার হাইফার রূপান্তরিত হয়। গ্রহীতা হাইফা থেকে দ্রুত সমস্ত এক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হাইফা দ্বি-নিউক্লিয়াসযুক্ত হয়ে যায়। অচিরেই *পিকনিয়ার* ঠিক বিপরীতে পাতার নিম্নতলে অপর একটি কাপ সদৃশ গঠন লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হরিদ্রাভ এবং পাতার বহিঃস্তককে বিচ্ছিন্ন করে এই অংশ থেকে শৃঙ্খলাকারে অজস্র রেণু উৎপাদিত হয়। এই সেরাসটি হল বিকল্প পোষকে দ্বিতীয় দশা এবং এটির নাম হল এসিয়াম (Accium)। রেণুগুলি এসিওরেণু (acciospore) নামে পরিচিত। এগুলি গোলাকার বা ঈষৎ চতুস্কোনাকার, *দ্বিনিউক্লিয়াসযুক্ত* (dikaryotric), কন্টকময় প্রাচীর বিশিষ্ট এবং চার থেকে ছয়টি *জার্ম -ছিদ্র যুক্ত*। এগুলি কিন্তু পুনরায় বারবেরি গাছকে সংক্রামিত করতে পারে না। বাতাসে বাহিত হয়ে গম গাছের সংস্পর্শে এলে *এসিওরেণু* গমের পাতায় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে নতুন সংক্রমণ ঘটায়। গমে এই সংক্রমণ পরবর্তী বছরের লাল মরিচা দশার সূত্রপাত ঘটায় যেখান থেকে এই চক্র পুনর্বার আবর্তিত হতে শুরু করে (চিত্র 15.4 ও b) সুতরাং জানা গেল ছত্রাকটি এক প্রকার *হেটারোসিয়াস* (heteroecious), *ম্যাক্রোসাইক্লিক* (macrocyclic) এবং *পলিমরফিক* (Polymorphic) রাস্ট ছত্রাক। যেমন এই ছত্রাকটি গম গাছকে মুখ্য পোষক উদ্ভিদরূপে ও বারবেরী উদ্ভিদকে বিকল্প বা গৌণ পোষক রূপে গ্রহণ করেছে তাই *হেটারোসিয়াস*। এক্ষেত্রে ম্যাক্রোসাইক্লিক বলতে দীর্ঘ চক্র সমন্বিত জীবনচক্র বোঝায় এবং টিলিউটোরেণু ছাড়াও এক বা একাধিক দ্বিনিউক্লিয়াস বিশিষ্ট রেণুর উৎপত্তি ঘটছে। এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ব্যাসিডিওরেণু ও নিকনিওরেণু ব্যতীত অন্য সকলপ্রকার রেণু দ্বি নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট, তাই পলিমরফিক।

15.4.4 পরিবেশগত পূর্বশর্ত (Predisposing Factors) :

টিলিউটোরেণুর অঙ্কুরোদগমের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা 18 থেকে 21°C। শীতের পরে ক্রমাবর্তনশীল কুয়াশা ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল পরিবেশে রেণুর অঙ্কুরদোগম সব চাইতে ভাল হয়। বায়ু প্রবাহ বেসিডিওরেণুকে বিকল্প পোষকের কাছে নিয়ে যেতে সহায়ক। বেসিডিওরেণু স্থির বায়ুতে বা ক্ষীণ বায়ুপ্রবাহে দূরবর্তী বারবেরি গাছ এর উপর পতিত হতে না পারলে সংক্রমণ পুনরায় গম গাছে ফিরে আসতে পারে না। বারবেরি পাতায় গঠিত পিকনিয়া থেকে স্পারমাশিয়া'র স্থানান্তরন পতঙ্গ ছাড়াও বৃষ্টিপাত অথবা গড়িয়ে পড়া শিশিরধারার উপর নির্ভরশীল। তাই বৃষ্টিপাত বারবেরি পাতায় এসিওরেণু গঠনের সহায়ক। এসিওরেণু কর্তৃক গম গাছে সংক্রমণ বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল এবং বায়ুর গতিবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হালকা বৃষ্টিপাত ও মাঝারি মানের আর্দ্রতা গমগাছে লাল মরিচা দশা অর্থাৎ ইউরেডোরেণু গঠনে সাহায্য করে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে পাতায় দাগ অপেক্ষাকৃত কম পরিমানে দেখা দেয়। ফসলের

ক্ষতির হার নির্ভর করে ইউরেডোরেণু উৎপাদনের অনুকূল সময়ে চারা কোন দশায় আছে তার উপর। শীষ আসার আগে বা অব্যবহিত পরে সংক্রমণ বাড়লে খোসার মধ্যে দানা সঞ্চিত হয় না এবং খোসা ফাঁপা থেকে যায়।

15.4.5 রোগচক্র (Disease cycle) :

ছত্রাকের জীবনচক্রের বিভিন্ন দশাগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা রোগচক্রের আভাস পেয়েছি। ছত্রাকটি প্রতিকূল দশা টিলিউটোরেণুরূপে খড় বা গোড়ায় অতিবাহিত করে। অনুকূল পরিবেশ ফিরে না এলে এই রেণু 18 মাস পর্যন্ত সুপ্ত থাকার নজীর আছে। এই রেণু মাটিতে বা অন্য কোন মাধ্যমে বেসিডিওরেণু গঠন করে অঙ্কুরিত হয়। বেসিডিওরেণু যৌনতার রূপান্তরি অনুযায়ী (+) বা (–) হাইফা গঠন করে বারবেরি পাতাকে সংক্রামিত করে ফলে (+) বা (–) এক নিউক্লিয়াস যুক্ত অনুসূত্র গঠিত হয় যা ক্রমে (+) বা (–) পিকনিয়া গঠন করে। (+) পিকনিয়া থেকে গঠিত স্পারমাশিয়া (–) পিকনিয়ায় গঠিত গ্রহীতা হাইফার উপর পতিত হলে বা এর বিপরীতটি ঘটলে *দ্বি-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট দশা* (dikaryotic phase) এর শুরু হয়। এই দশায় বারবেরি পাতায় এসিওরেণু উৎপাদিত হয়। এই দ্বি-নিউক্লিয়াস যুক্ত রেণু গম গাছে পতিত হলে মূল পোষকে সংক্রমণ সাধিত হয়। এই রেণু যে হাইফা গঠন করে তা দ্বি-নিউক্লিয়াসযুক্ত অর্থাৎ n+n এবং ইউরোডোসোরাস গঠন করে এই হাইফা রেণু গঠন করে। ইউরেডোরেণু n+n নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং বিদারিত সোরাস থেকে তা বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। অনুকূল পরিবেশে এই রেণু কেবলমাত্র গম গাছে (বা অন্য শস্যজাতীয় গাছ) অঙ্কুরিত হতে পারে। গম গাছের পাতায় একটি জলীয় তলে এটি অঙ্কুর নালী গঠন করে অঙ্কুরিত হয় এবং পাতার পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে সংক্রামক হাইফা গঠন করে পোষক কলার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। অনুপ্রবিষ্ট হাইফা আবার নতুন করে ইউরোডোসোরাস এবং ইউরেডোরেণু গঠন করে অর্থাৎ এভাবেই গৌণ সংক্রমণ সাধিত হয়। পাতার তলে রেণুর পতন থেকে শুরু করে নতুন করে রেণু উৎপাদন এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র 14 থেকে 18 দিনের। সুতরাং একটি গম চাষের সময়কালের মধ্যে বহুবার ইউরেডোরেণুর দ্বারা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গৌণ সংক্রমণ হতে পারে। ফসল পাকার সময় অর্থাৎ শীতের শুরুতে সোরাসগুলি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং নতুন নতুন কৃষ্ণবর্ণ সোরাসও সৃষ্টি হয়। এই দশাটি হল টিলিউটোরেণু উৎপাদনকারী দশা এবং এই দশাতেই ছত্রাক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। এই দশায় উপনীত হবার পূর্বে নিউক্লিয়াসদ্বয়ের মধ্যে মিলন ঘটে ফলে হাইফা তথা রেণু ডিপ্লয়েড বা 2n ক্রোমোজোম সংখ্যা বিশিষ্ট হয় (চিত্র 15.5)।

15.4.6 প্রতিবিধান (Control measures) :

A. অপ্রত্যক্ষ :

i) সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পদ্ধতিটি হল গমের মরিচা রোগ প্রতিরোধকারী প্রকরণগুলি চারা হিসাবে ব্যবহার।

ii) শস্যক্ষেত্রের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বারবেরি গাছ অপসারণ করে ছত্রাকটির জীবনচক্রে বাধাপ্রদান করা যায় এবং তাতে সংক্রমণজনিত ক্ষতি কমে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ইউরেডোরেণু প্রতিকূল দশা কাটিয়ে উঠতে পারে সেই সমস্ত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সর্বত্র এর ফলে প্রাথমিক সংক্রমণ ব্যাপকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

iii) স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা আক্রান্ত শস্যক্ষেত্রের গোড়া বা অবশিষ্টাংশ জ্বালিয়ে ফেলা হলে বিশ্রামদশার টিলিউটোরেণু ধ্বংস হয়।

iv) বিকল্প পোষক যা আগাছার মত শস্যক্ষেত্রে বা তার আশেপাশে জন্মায় যেমন ধান্য (Poaceae) গোত্রের উদ্ভিদ অপসারিত করা দরকার। কেন না ছত্রাক এগুলির আশ্রয়েও কার্যক্ষম (viable) থাকতে পারে *Briza minor* হল এমনই একটি আগাছা।

B. প্রত্যক্ষ :

i) ছত্রাকনাশক ঃ গন্ধক, ডাইক্লোন (dichlone) জিনেব (Zineb) ইত্যাদি অত্যন্ত সফলভাবে *Puccinia* দমনে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রতি মরশুমে 4 থেকে 10 বার প্রয়োগ না করলে মরিচা রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত। তবে এ ভাবে চাষ করলে ফসলের যথাযথ দাম পাওয়া গেলেও কোন লাভ থাকা সম্ভব নয়। তাই দস্তা এবং ম্যানেব **(maneb)** এর মিশ্রণ দুইবার স্প্রে করলে এবং আবহাওয়া বুঝে বাড়তি সতর্কতা নিলে 75 শতাংশ ফসল রক্ষা করা সম্ভব। প্রথমবার স্প্রে 0 থেকে 5 শতাংশ ফসল আক্রান্ত হলে এবং দ্বিতীয়বার তার 14 দিন পরে করা দরকার। মিশ্রণটির ফসল রক্ষাকারী ও ছত্রাক দমনকারী দুটি ভূমিকাই আছে।

ii) অ্যান্টিবায়োটিক ঃ অ্যাসিডিওন (Acidione) এবং সেইজাতীয় অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক যেমন সালফাডায়াজিন (Sulphadiazine) সালফাপাইরাজিন (Sulphapyrazine) সালফাপিরিডিন (Sulphapyridine) ইত্যাদি ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে।

C. কৃষি পদ্ধতি :

i) তাড়াতাড়ি পাকে এমন প্রকরণ ব্যবহার করা উচিত।

ii) নাইট্রেট এর ভাগ জমিতে কম হলে সংক্রমণ বাড়ে সুতরাং এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

iii) একইভাবে জমিতে ফসফেট এর সঠিকমাত্রা ফসলকে অনাক্রমন্যতা প্রদান করে।

iv) গভীরভাবে (deep sowing) বীজ বুনলে অঙ্কুর সংক্রমণ প্রবণ হয়ে পড়ে, তাই এই পদ্ধতি অনুসরণ না করাই ভাল।

অনুশীলনী - 3

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

a) গম গাছের কৃষ্ণ মরিচা রোগের জীবাণুর নাম হল ______________।

b) এটি ______________ শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক।

c) এটির একটি মুখ্য পোষক আছে যার নাম ______________ এবং একটি গৌণ পোষক আছে যার নাম ______________।

d) মুখ্য পোষকে উৎপাদিত হয় রেণুগুলি হল ______________ ও ______________।

e) গৌণ পোষকে উৎহাদিত সোরাসগুলি হল ______________ ও ______________।

2. বাঁদিকের বক্তব্যগুলির সাথে ডানদিকের বিষয়গুলি সঠিকভাবে মেলান :

(a) কৃষ্ণ মরিচা	(i) টিলিউটোরেণু
(b) অসটিওল	(ii) বেসিডিওরেণু
(c) শৃঙ্খলাকারে গঠিত রেণু	(iii) পিকনিয়া
(d) গৌণ সংক্রমণ	(iv) এসিওরেণু
(e) যৌন দ্বিরূপতা	(v) ইউরেডোরেণু

3. ছত্রাকটির এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট **n** দশা, দ্বি-নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট **n+n** দশা এবং ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট **2n** দশার একটি করে রেণুর নাম লিখুন।

15.5 পাট গাছের কাণ্ড পচন (Stem rot of jute) :

15.5.1 প্রাপ্তিস্থান ও গুরুত্ব (Occurence and Importance) :

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব আছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশে রোগটি পাট ফসলের ক্ষতি করে।

ক্ষতি দ্বিবিধ। প্রথমতঃ কাণ্ডের সংক্রমণের ফলে পাটগাছের *(Corchorus capsularis* L.) বাষ্ট তন্তুর মান প্রত্যাশিত মাত্রা অর্জন করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ সংক্রমণ প্রবল হলে উৎপাদনই অনেক কমে যায়। পাট গাছের চারা বোনা হয় ঘনসংবদ্ধভাবে, কিন্তু ক্ষেত্রে কোন কোন অংশে ফাঁকা হয়ে গেলে বাকী চারাগুলি ব্যাপকভাবে শাখান্বিত হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এতটা শাখান্বিত পাট চারার তন্তু প্রায় অব্যবহার্য, ফলে প্রত্যক্ষ ক্ষতির সাথে সাথে পরোক্ষ ক্ষতিও কম নয়।

15.5.2 রোগলক্ষণ (Symptoms) :

বৃদ্ধির যে কোন দশায় রোগের প্রকাশ দেখা যেতে পারে। চারাগাছগুলিতে সংক্রমণের শুরু মাটির কাছাকাছি অংশে অর্থাৎ গোড়ার দিকে। গোড়ার পর্ব অংশে এবং বীজপত্রের গায়ে কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখা যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারাগাছগুলিতে নেতিয়ে পড়ার লক্ষণ দেখা যায়। সিক্ত আর্দ্র আবহাওয়ায় *নেতিয়ে পড়া* (damping off) লক্ষণ অনেক দ্রুততার সাথে চারাকে বিনষ্ট করে। শুষ্ক আবহাওয়ায় চারাগাছগুলি তিন পাতা বিশিষ্ট দশায় উপনীত হতে পারে কিন্তু তারপর তাদের মধ্যে ধ্বসারোগের লক্ষণসমূহ চোখে পড়ে এবং অচিরেই চারাটি *পচনক্ষত*(necrotic) সৃষ্টি করে মরে যায়।

পরিণত গাছের সর্বপ্রথম আক্রান্ত অংশ হল পাতা। পাতার শীর্ষভাগে এবং ফলকপ্রান্তে পচনশীল দাগ দেখা যায়। দাগগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্রমশঃ মধ্যশিরা ও পত্রবৃন্তেও দাগ ছড়িয়ে যায়। আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে এবং নগ্ন কাঠির মত কাণ্ড দণ্ডায়মান থাকে (চিত্র নং 15.6b)।

কাণ্ডে রোগলক্ষণের প্রথম প্রকাশ পর্ব অংশে। এক্ষেত্রে কৃষ্ণ বর্ণ পচনক্ষতগুলি ঈষৎ অবতল হয়। এই অংশে বস্তুতঃপক্ষে ছত্রাকের ফলদেহ *পিকনিডিয়াম* (pycnidium) গঠিত হয়। দাগগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কাণ্ডকে বেষ্টনীর মত আবর্তন করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাণ্ড ফেটে যায় এবং *বাস্ট* তন্তু (bast fibre) গুলি অপুষ্ট রোমের ন্যায় কাণ্ডের বাইরে বেরিয়ে আসে। অবশেষে গাছ মরে যায় (চিত্র নং 15.6a)।

মূল আক্রান্ত হবার হার অপেক্ষাকৃত কম। বায়বীয় অংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেলে তারপর মূল সংক্রামিত হয়। মূলগুলি চিরে *চিরে যায়* (Shredding) এবং সহজেই মাটি থেকে উপড়ে নেওয়া যায়। চূড়ান্ত ক্ষেত্রে মূলের গায়ে ছত্রাকের *ফলদেহ* (fruit body) স্ক্লেরোসিয়া গঠিত হয়।

ফল বা ক্যাপসুলে সংক্রমণের ফলে সেগুলি কালো হয়ে যায় এবং বীজগুলি বিবর্ণ ও হালকা হয় (চিত্র 15.6 c)।

15.5.3 রোগজীবাণু ও নিদানতত্ত্ব (Causal organism and Etiology) :

ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক *Macrophomina phaseolina* (Tissi) Goid (= *M. Phaseoli* (Maubl.) Ashby) পাট গাছের কাণ্ড পচন রোগ সৃষ্টি করে।

ছত্রাকটির মাইসেলিয়াম বা অণুসূত্র শাখান্বিত, প্রস্থ প্রাচীরযুক্ত হয় এবং পোষক কলায় আন্তঃকোশীয় বা অন্তঃকোশীয় ভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। পোষকের ত্বক এবং *বহিঃস্তর* (cortex) সর্বাপেক্ষা বেশি আক্রান্ত হয়। পোষকের ত্বকে *ফ্লাস্ক* আকৃতির অবতল *পিকনিডিয়াম* গঠিত হয়। ত্বক বিদীর্ণ হয় এবং পিকনিওরেণুগুলি বাইরে নির্গত হয়। বাতাসের সাহায্যে এরা পুনঃ পুনঃ সংক্রমণ ঘটিয়ে নতুন নতুন পোষককে আক্রান্ত করে। রেণুগুলি দৈর্ঘ্যে 16-17 মাইক্রন (μ) এবং প্রস্থে 6-10 মাইক্রন (μ) হয়ে থাকে (চিত্র নং 15.6d)।

ছত্রাকটি একটি ফলদেহবাহী দশাতেও পাওয়া যেতে পারে। এটি স্ক্লেরোসিয়া বহনকারী দশা যার নাম *Rhizoctonia bataticola* (Tab.) Butlar স্ক্লেরোসিয়াম কিন্তু ত্বকে নয় বরং পোষকের কলার গভীরে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের লিগনিনবিহীন কোশে ও মজ্জাংশুর কোশে গঠিত হয়। এগুলি ঘন কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ব্যাস 40-85 মাইক্রন (μ) হতে পারে।

15.5.4 পরিবেশগত পূর্বশর্ত (Predisposing Factors) :

জমিতে পটাশের ও নাইট্রোজেনের পরিমান কম হলে পাট গাছ সহজেই আক্রান্ত হয়। এককভাবে নাইট্রোজেনের পরিমান কম হলেও পাটগাছের সংক্রমন প্রবণতা বাড়ে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমান রোগের প্রাবল্য নিয়ন্ত্রক। আর্দ্রতা বাড়লে রোগের প্রকোপ বাড়ে। উষ্ণতা যেমন পাটচাষের ঠিক তেমনই তার প্যাথোজেনের বৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলে। উষ্ণতা 18^{0}C এর কম হলে রোগের প্রকোপ আশাতীতভাবে কমে যায়। শীতল ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ছত্রাকটি পাট গাছকে আক্রমণ করতে পারে না।

15.5.5 রোগচক্র (Disease cycle) :

ছত্রাক অণুসূত্র বা স্ক্লেরোসিয়ারূপে মাটিতে বা বীজে প্রতিকূল দশা অতিবাহিত করে। তবে প্রাথমিক সংক্রমণ সাধারণতঃ রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহারের ফলে হয়। বীজ থেকে অঙ্কুর নির্গত হলে ছত্রাকের মাইসেলিয়াম তার মধ্যে উর্দ্ধাভিমুখে বাড়ে। পিকনিডিয়া ও পিকনিওরেণু উৎপাদিত হয় এবং অধিকাংশ চারা ধ্বংস হয়। পিকনিওরেণু গৌণ সংক্রমণের জন্য দায়ী।

পরিণত গাছ 4 যখন 5 থেকে মাস বয়সের হয় তখন ছত্রাকটি স্ক্লেরোসিয়া গঠন করে। স্ক্লেরোসিয়া হল প্রতিকূলতা অতিক্রমণকারী দশা। বিশ্রামকাল এতদভিন্ন বীজে মাইসেলিয়ামরূপে অতিবাহিত হতে পারে। অনুকূল পরিবেশে পুনরায় প্রাথমিক সংক্রমণ সাধিত হয় (চিত্র নং 15.7)।

15.5.6 প্রতিবিধান (Control measures) :

A. অপ্রত্যক্ষ ঃ

i) স্বাস্থ্যবিধি ঃ জমিতে নিকাশী ব্যবস্থা, আগাছা পরিস্কার, নিয়মিত নিড়ানো ইত্যাদির ফলে গাছ রোগমুক্ত থাকে।

ii) বীজ নির্বাচন ঃ রোগমুক্ত অঞ্চলের থেকে সংগৃহীত বীজ ব্যবহার করা উচিত।

iii) সার ঃ সঠিক মাত্রায় **NPK** এর ববহার রোগকে দূরে রাখে। এককভাবে নাইট্রেট বাড়ালে রোগের প্রকোপ বরং বেড়ে যায় তাই সমন্বায়ক ব্যবস্থাটি জরুরী।

iv) প্রতিরোধক প্রজাতি ঃ পাটের রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির চাষ করলে সবচেয়ে বেশি সুফল পাওয়া সম্ভব।

B. প্রত্যক্ষ ঃ

i) ছত্রাকনাশক স্প্রে ঃ বোর্দো মিশ্রণ (2.25 : 2.25 : 2.25 অনুপাতে) বা গন্ধক বা পেরেনকস স্প্রে করলে ছত্রাক সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

ii) বীজ শোধন ঃ এগ্রোসান (Agrosan) **GN,** সেরেসান ইত্যাদির জৈব-পারদঘটিত যৌগ দ্বারা বীজ বিধৌত করলে বীজগাত্রের সাথে সংযুক্ত মাইসেলিয়াম মরে যায়।

অনুশীলনী - 4

1. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

(a) পাট গাছের কাণ্ড পচনের জন্য দায়ী জবাণুটির নাম হল ______________।

(b) এটি একটি ______________ শ্রেণির ছত্রাক।

(c) ছত্রাকটির পিকনিয়াল দশায় উৎপাদিত গঠন হল ______________।

(d) ছত্রাকটির ফলদেহবাহী দশায় উৎপাদিত গঠন হল ______________।

(e) ছত্রাকটি পাট গাছের ______________ তন্তুর ক্ষতিসাধন করে।

2. নিম্নে বাঁদিকে পাটের দশা বা অংশের নাম আছে। ডানদিকে সেই অংশ বা দশায় রোগলক্ষণটি এক কথায় লিখুন

(a) চারা ________________।

(b) ফল ________________।

(c) কাণ্ড ________________।

(d) পাতা ________________।

(e) মূল ________________।

15.6 সারাংশ :

উদ্ভিদের রোগ ঘটানোর কারণ যেমন বহুবিধ তেমনি উদ্ভিদের রোগের সংখ্যাও প্রায় অগণিত। এমন কোন উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া অসম্ভব যা কোন না কোন রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় না। সবগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করার অবকাশ নেই, তবে সবকটি ক্ষেত্রেই রোগটি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে গেলে আমাদের যে জিনিসগুলি জানা দরকার সেগুলি হল রোগটির প্রাদুর্ভাব কোন অঞ্চলে হয়? রোগ জীবাণুটি কি? পোষকের সাথে সেটির আন্তঃ সম্পর্ক কি? আবহাওয়ার প্রভাবই বা কিরকম? রোগটি বৎসরের পর বৎসর ফিরে আসে কি করে? রোগটির প্রতিবিধানের উপায়গুলি কি কি ? এই কয়টি বিশেষ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে বিশেষ কয়েকটি রোগের ক্ষেত্রে। রোগগুলি হল (i) আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ। এটির রোগজীবাণু হল *Phytophthora infestans* নামক ছত্রাক। সংক্রমণে মূলতঃ ভূ-উপরিস্থ অংশ এবং অতি সংক্রমণে কন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (ii) ধান গাছের পিঙ্গল চিটে রোগ। *Helminthosporium oryzae* নামক ছত্রাক এটির কারণ। ধানের পাতা, কাণ্ড, ডাঁটি এবং অত্যধিক সংক্রমণে শস্যদানা আক্রান্ত হয়। (iii) গম গাছের কৃষ্ণবর্ণ মরিচা রোগ যা *Puccinia graminis* নামক বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাকের সংক্রমণে হয়। এটি একটি দ্বিপোষক লালিত ছত্রাক। মুখ্য পোষক হল গম এবং গৌণ পোষক হল বারবেরি গাছ। (iv) পাট গাছের কাণ্ড পচন। রোগটি *Macrophomina phaseolina* নামক ছত্রাকের প্রভাবে হয় এবং পাতা বা অঙ্কুর বা পরিণত কাণ্ড আক্রান্ত হতে পারে। ফসল চারটির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফসল। গম অপেক্ষাকৃত কম অঞ্চলে এ রাজ্যে চাষ করা হয়। ফসলগুলির মধ্যে দুটি দানাশস্য, একটি মুখ্য সবজি এবং একটি মুখ্য অর্থকরী ফসল। ফলে রোগগুলির আলোচনা এই পর্যায়ে এমনভাবে করা হল যাতে রোগগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনার ভিত্তি দৃঢ় হয়।

15.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

1. আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের লক্ষণগুলি চিত্রসহ বর্ণনা করুন। রোগটি দমন করার উপায়গুলি কি কি ?
2. ধান গাছের চিটে রোগের রোগজীবাণু ও নিদানতত্ত্ব আলোচনা করুন। রোগচক্রটি রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শিত করুন।
3. মুখ্য ও গৌণ পোষক বলতে কি বোঝায়? *Puccinia graminis* var *tritici* এর মুখ্য পোষকে ও গৌণ পোষকে সৃষ্ট দশাগুলি কি কি এবং দশাগুলি জীবনচক্রে কিরূপে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত?
4. পাট গাছের কান্ডের পচন রোগের লক্ষণগুলি কি কি? রোগটির ফলে ফসলের কি ধরনের ক্ষতি হওয়া সম্ভব? রোগটি প্রতিবিধানের উপায় কি?

15.8 উত্তরমালা :

অনুশীলনী - 1

1. (a) না
   (b) হ্যাঁ
   (c) না
   (d) না
   (e) হ্যাঁ

2. (a) *Phytophthora infestans* নামক ছত্রাক।
   (b) 90% আর্দ্রতা, 25^0C গড় তাপমাত্রা এবং মেঘলা আকাশ।
   (c) বীজ কন্দে অণুসূত্ররূপে এবং উস্পোররূপে
   (d) রেণুস্থলী
   (e) বের্দো মিশ্রণ ও কপার সালফেট— চুনজল মিশ্রণ

অনুশীলনী - 2

1. পাতার গায়ে পিঙ্গল বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ থাকে যাকে ঘিরে ক্লোরোসিস আভা পরিলক্ষিত হয়।
2. অঙ্গজ দশা : *Helminthosporium oryzae*

   কনিডিয়া দশা : *Cochliobolus miyabeanus*
3. হ্রাসপ্রাপ্ত অঙ্কুরোদগম, পাতায় সংক্রমণের জন্য সালোকসংশ্লেষের ঘাটতি ও বীজে সংক্রমণের দরুন শস্যহানি।

4. (a) 25 – 30°C উষ্ণতা

(b) 21 – 26°C উষ্ণতা

(c) 4.0 – 8.0 কিমি / ঘন্টা বায়ুর গতিবেগ

5. *Leersia sp* এবং *Echinochola sp.*

6. পদ্মা এবং IR-24

অনুশীলনী - 3

1. (a) *Puccinia graminis* var *tritici*

(b) বেসিডিওমাইসিটিস

(c) *Triticum aestivum; Berberis vulgaris*

(d) ইউরেডোরেণু ও টিলিউটোরেণু

(e) পিকনিয়া ও এসিয়া

2. (a) – (i)

(b) – (iii)

(c) – (iv)

(d) – (v)

(e) – (ii)

3. n দশা ঃ প্রোমাইসেলিয়াম দশায় বেসিডিওরেণু

n+n দশা ঃ এসিয়া দশার এসিওস্পোর

2n দশা ঃ টিলিউটোসোরাস দশার টিলিউটোস্পোর

অনুশীলনী - 4

1. (a) *Macrophomina Phaseolina*

(b) ডিউটেরোমাইসিটিস

(c) পিকনিওরেণু

(d) স্ক্লেরোসিয়া

(e) বাষ্ট

2. (a) নেতিয়ে পড়া

(b) বিবর্ণ ও হালকা বীজ

(c) অবতল পচনক্ষত

(d) কৃষ্ণবর্ণদাস ও খসে পড়া

(e) চিরে যাওয়া

প্রান্তিক প্রশ্নাবলী

1. 15.2.2 এবং 15.2.6 অংশাঙ্কিত অংশে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। উত্তর লেখার সময় লক্ষণগুলি (a) পাতায় (b) কাণ্ডে (c) কন্দে — এইভাবে ভাগ করে লিখুন। সঙ্গে প্রয়োজনীয় চিত্র দিন। রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি একই রকমভাবে অংশাঙ্কিত করে আলোচনা করুন।

2. 15.3.3 এবং 15.3.5 রেখাঙ্কিত অংশ নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখুন।

3. কোন দ্বিরূপ জীবাণু মুখ্যত যে পোষকের উপর জীবনচক্র অতিবাহিত করে তাকে বলে মুখ্য পোষক কিনতু জীবনচক্র সম্পূর্ণ করার জন্য জীবাণুটির যদি অন্য কোন পোষক প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে বলে গৌণ পোষক।

   গমে ও বারবেরি পাতায় সৃষ্ট দশাগুলি হল :

   গমে : ইউরিডোসোরাস n+n দশা ও টিলিউটোসোরাস দশা (2n)।

   বারবেরি : পিকনিয়া ও এসিয়া দশা

   গমের লাল মরিচা দশা থেকে শুরু করে → টিলিউটোসোরাস → প্রোমাইসেলিয়াম → বেসিডিওরেণু → বারবেরিতে সংক্রমণ → পিকনিয়া → এসিয়া দশা → এসিওরেণু → গম গাছে পুনরাক্রমণ।

   এই পরস্পরসংযুক্ত দশাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করতে হবে।

4. 15.5.2, 15.5.1 এবং 15.5.6 অংশাঙ্কিত পাঠ থেকে উত্তরটি দেখুন এবং তারপর নিজের ভাষায় লিখুন।

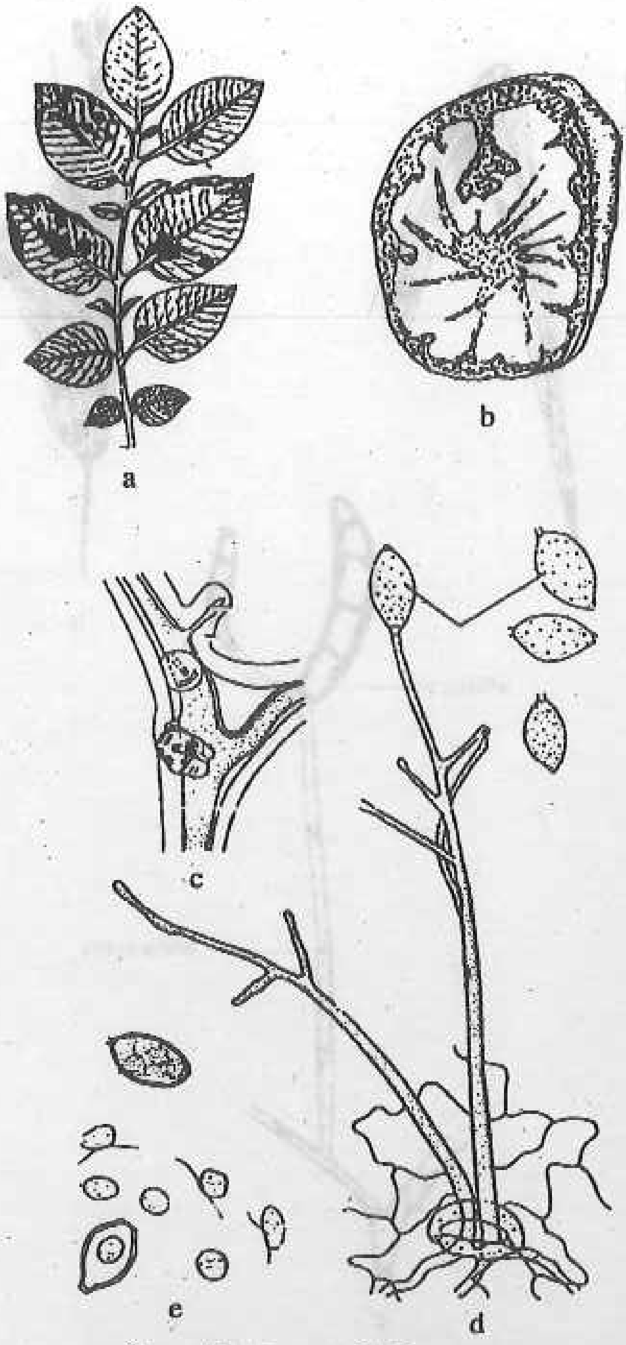

চিত্র নং 15.1 ঃ *আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ ঃ*
(a) পাতায় এবং (b) কন্দে রোগ লক্ষণ; (c) হাইফা চোষক গঠন করে পোষক থেকে খাদ্য আহরণ করে (d) রেণু ধারক ও রেণুস্থলী (e) রেণুস্থলীর অঙ্কুরোদগম্

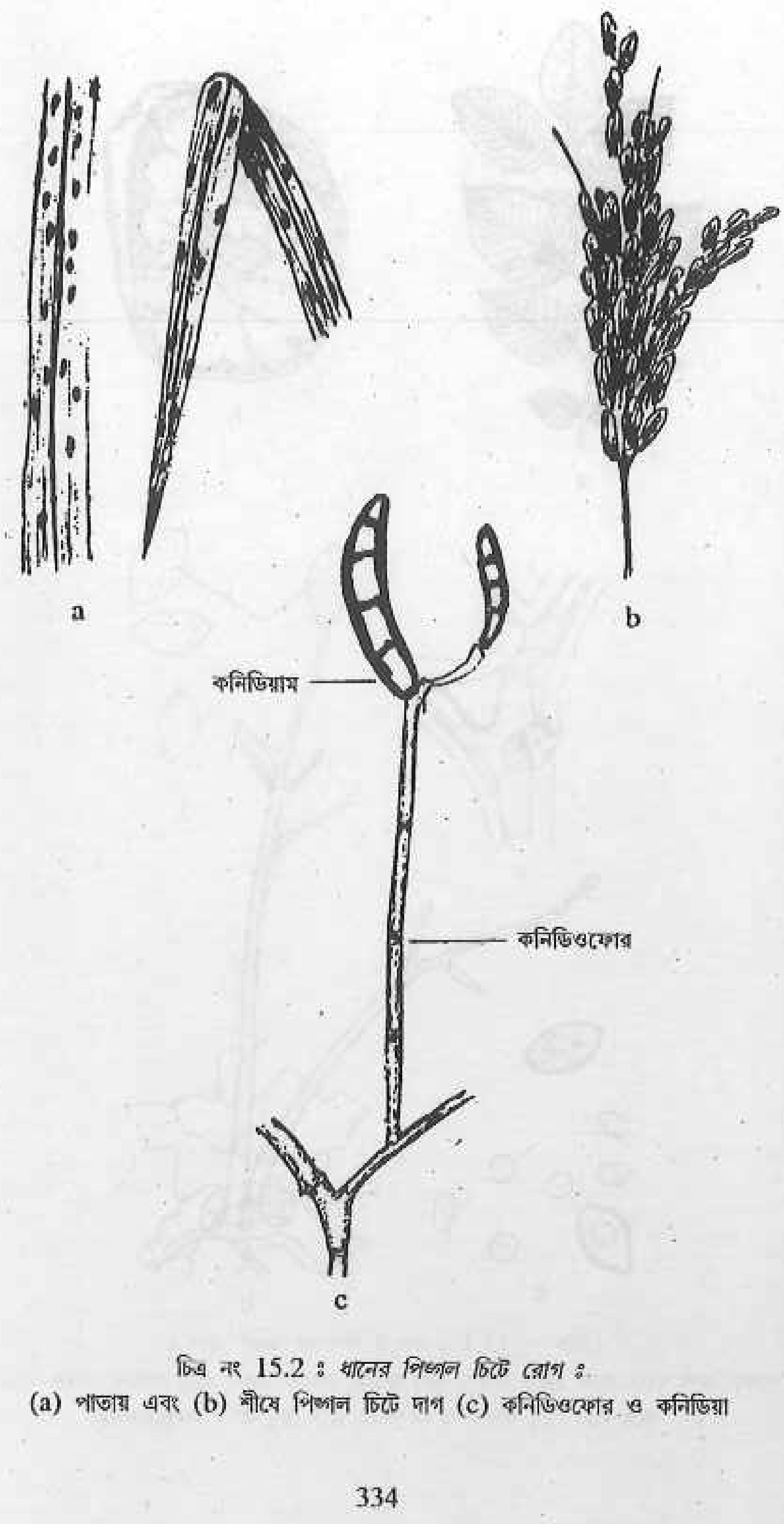

চিত্র নং 15.2 : ধানের পিঙ্গল চিটে রোগ :
(a) পাতায় এবং (b) শীষে পিঙ্গল চিটে দাগ (c) কনিডিওফোর ও কনিডিয়া

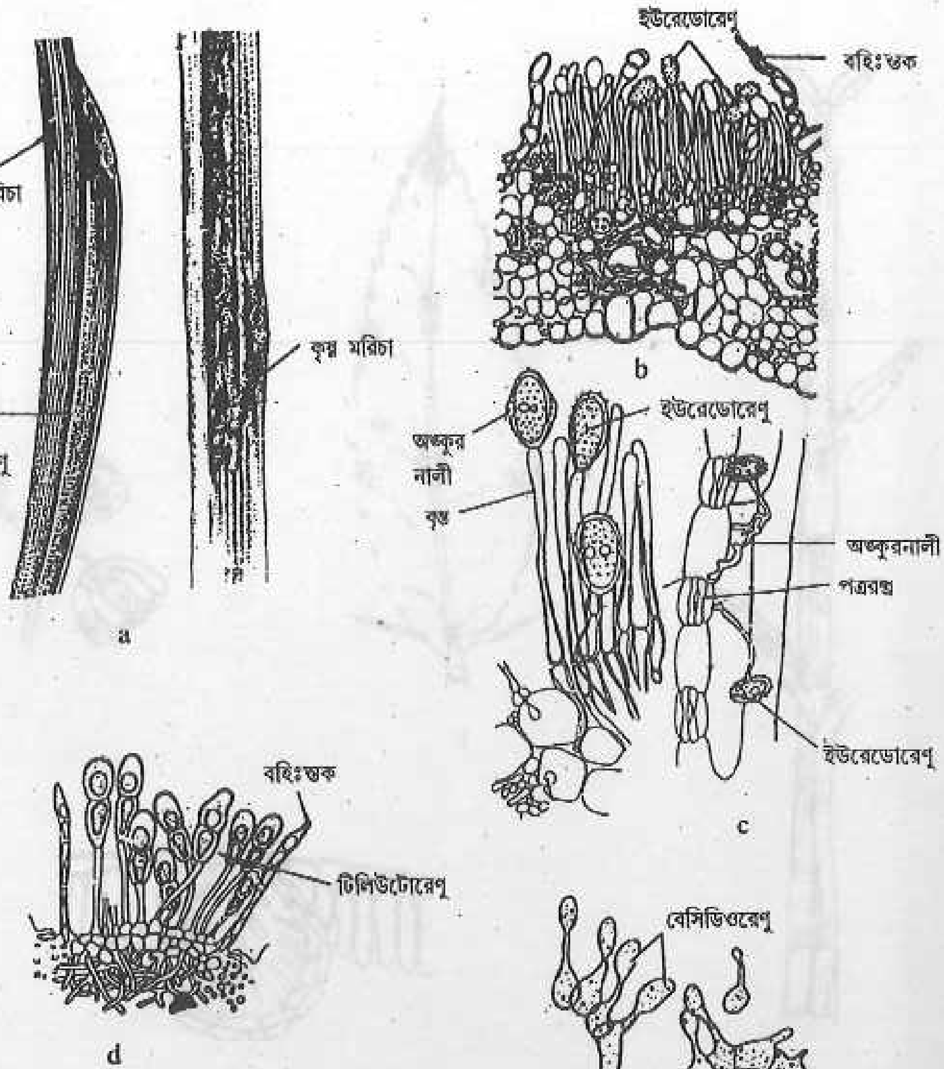

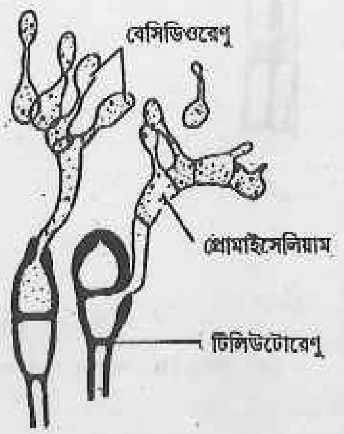

চিত্র নং 15.3 : *গম গাছের কৃষ্ণ মরিচা রোগ :*
(a) গম গাছের পাতায় লোহিত ও কৃষ্ণ মরিচা (b) ইউরেডোসোরাস ও ইউরেডোরেণু (c) ইউরেডোরেণু ও তার অঙ্কুরোদগম (d) টিলিউটোরেণু ও টিলিউটোসোরাস (e) টিলিউটোরেণুর অঙ্কুরোদগম ও বেসিডিওরেণু গঠন

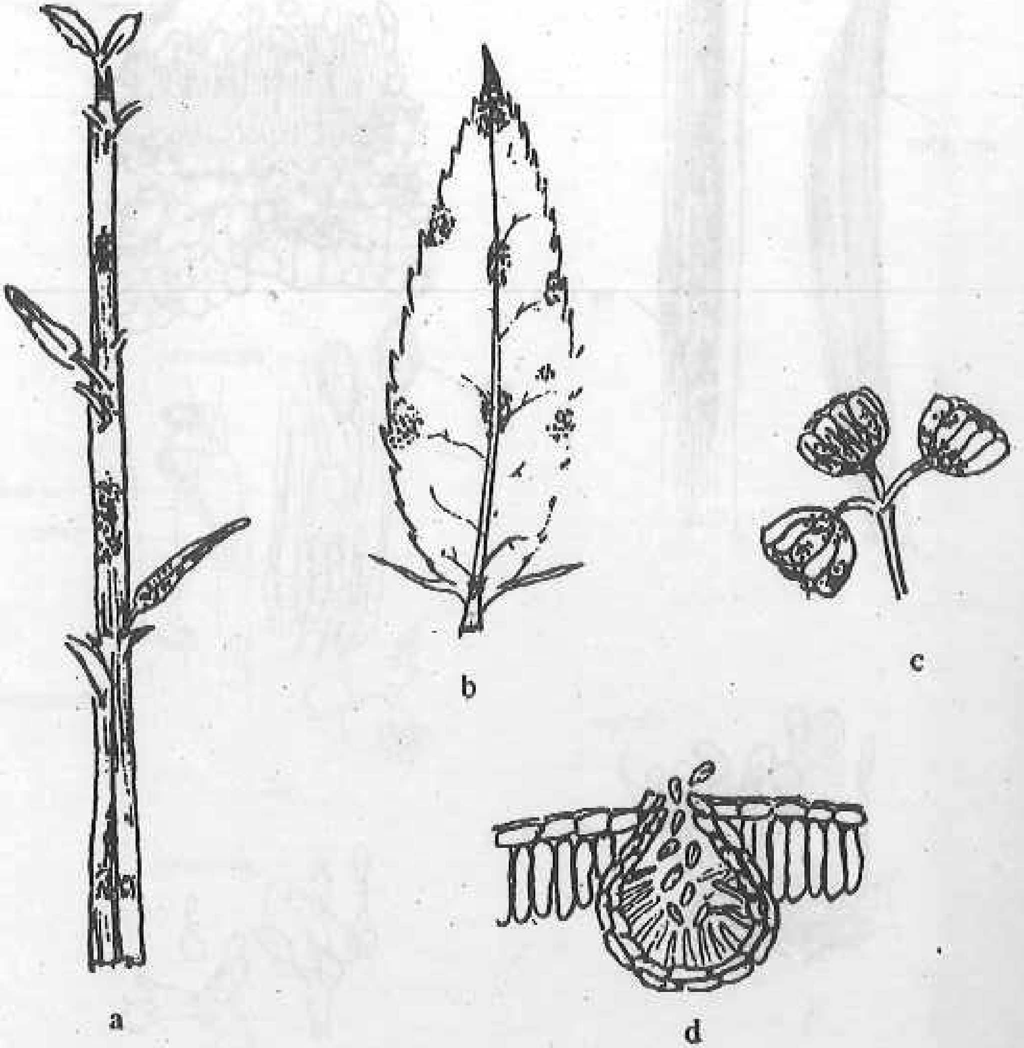

চিত্র নং 15.4 ঃ পাট গাছের কাণ্ড পচন রোগ ঃ
(a) কাণ্ডে (b) পাতায় (c) ফল ও বীজে পচনক্ষত (d) পিকনিডিয়াম ও পিকনিওরেণু

একক 16 □ ভারতবর্ষে ফসলের ক্ষতিসাধনকারী কতকগুলি রোগের লক্ষণ ও রোগজীবাণু (Several important diseases of crop plants in India–their symptoms and causal organisms) :

গঠন

16.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

16.2 দানা শস্যের রোগ

16.2.1 ধান ঃ (ক) ব্লাষ্ট, (খ) বাদামী দাগ (গ) ধ্বসা (ঘ) গোড়া পচন (ঙ) কাণ্ড পচন (চ) উদবাতা (ছ) বাষ্ট (জ) ভাইরাসঘটিত রোগ

16.2.2 গম ঃ (ক) মরিচা (খ) ছেতো রোগ (গ) বাষ্ট (ঘ) গোড়া পচন (ঙ) গুঁড়া চিতি (চ) পাতার ধ্বসা রোগ (ছ) পাতার দাগ।

16.2.3 জোয়ার

16.2.4 বাজরা

16.2.5 ভুট্টা

16.3 ডাল শস্য

16.3.1 ছোলা ঃ(ক) ধ্বসা (খ) নেতিয়ে পড়া (গ) মরিচা

16.3.2 বীন ঃ (ক) গুঁড়া চিতি (খ) শুষ্ক মূল পচন (গ) পাতার দাগ বা ছিটে (ঘ) ঢেঁকি রোগ (ঙ) মরিচা

16.3.3 মটর

16.4 সবজি

16.4.1 আলু ঃ (ক) নাবি ধ্বসা (খ) জলদি ধ্বসা (গ) বাদামী পচন

16.4.2 গাজর ঃ (ক) নরম পচন (খ) পাকানো মূল

16.4.3 বীট ঃ (ক) পাতার দাগ (খ) মরিচা রোগ

16.4.4 বাঁধাকপি

16.4.5 ফুলকপি

16.4.6 মূলা ঃ শ্বেত মরিচা

16.4.7 পিঁয়াজ

16.4.8 টম্যাটো

16.5 তৈলবীজ

16.5.1 বাদাম ঃ (ক) টিক্কা রোগ (খ) মরিচা

16.5.2 সূর্যমুখী : পাতার রোগ
16.5.3 সরষে
16.5.4 নারকেল : মুকুল পচন
16.6 ফলদায়ী উদ্ভিদ
16.6.1 আম : (ক) গুঁড়া চিতি, (খ) টেঁড়ি, (গ) গোলাপী রোগ
16.6.2 লেবু : (ক) ক্যাঙ্কার (খ) আঠা ক্ষরণ (গ) পাতা খসা ও ফলপচন
16.6.3 কলা : (ক) পানামা রোগ (খ) মোকো রোগ (গ) বাঞ্চি টপ
16.7 অর্থকরী ফসল
16.7.1 আখ : (ক) লোহিত পচন (খ) ছেতো (গ) অবনমন (ঘ) লাল ডোরা
16.7.2 তুলা : (ক) অবনমন (খ) গোড়া পচন (গ) ব্ল্যাক আর্ম
16.7.3 পাট : (ক) মূল বা কাণ্ড পচন (খ) গুঁড়া চিতি (গ) স্ফীতি
16.7.4 তামাক : (ক) সোঁদা লাগা (খ) কালো ছিট (গ) ব্যাঙ চক্ষু (ঘ) বর্ণালী
16.7.5 চা : (ক) ফোসকা (খ) লাল মরিচা
16.7.6 পান : (ক) গোড়া পচন বা পাতা পচন
16.7.7 কাজু
16.8 প্রতিকারের উপায়
16.9 সারাংশ
16.10 প্রান্তিক প্রশ্নাবলী
16.11 উত্তরমালা

16.1 প্রস্তাবনা

এই এককটিতে আমরা ভারতবর্ষে চাষ করা হয় এমন কয়েকটি ফসলের কয়েকটি সাধারণ রোগ, রোগলক্ষণ এবং রোগ জীবাণুর নাম জানতে পারব। সত্যি কথা বলতে কি অন্য এককগুলির থেকে এই এককটির বিন্যাস এতটাই ভিন্তর যে এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের গুরুত্ব দাবী করে। আমাদের মনে রাখা দরকার ভারতবর্ষে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয় এমন উদ্ভিদের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য অনন্য। ভারতের মোট উৎপাদনের 45 শতাংশ হল কৃষিজ উৎপাদন এবং 70 শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। ভারতবর্ষের 327 মিলিয়ন হেক্টর জমির মধ্যে 42 শতাংশ চাষযোগ্য। 137 মিলিয়ন হেক্টর চাষ যোগ্য জমির মধ্যে প্রায় 40 ভাগ জমি সেচের আওতাভুক্ত বাকী অংশে জমির ভরসা বর্ষার জল এবং প্রাকৃতিক আশীর্বাদ। বৃষ্টিপাতও আমরা জানি চূড়ান্ত অসম, কোথাও বছরে 5 সেমি আবার কোথাও 300 সেমি, এমতাকথায় রোগ কেবলমাত্র প্যাথোজেনঘটিত কারণে ঘটবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। পরিবেশগত কারণে বহু ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফসলের রোগের কথা বললে সেগুলির কথা অবশ্যই আসবে। এছাড়া আসবে প্রতিটি রোগের নিদানতত্ত্ব এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের উপায়। আমরা এই এককে যেহেতু একটি মাত্র অধ্যায়ের মধ্যে বিষয়টি আলোচনা করছি সেহেতু কয়েকটি সাধারণ ফসলের সাধারণ রোগ এবং তাদের

শস্যক্ষেত্রে চিনে নেবার উপায় হিসেবে দৃষ্টিগ্রাহ্য রোগলক্ষণগুলি আলোচিত হয়েছে। ফসলগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান দানা ও ডালশস্য, তৈলবীজ, ফল এবং কয়েকটি অর্থকরী ফসলের কথা কেবলমাত্র আলোচিত হল। এর বাইরে আরো অনেক কৃষিজ দ্রব্য বা উৎপাদন বিভিন্ন প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হয় যেগুলির কথা এখানে বলা সম্ভব হল না। কাঠ ও ওষধি উৎপাদনকারী কোন উদ্ভিদের কথাই এখানে আলোচিত হয়নি।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ভারতের দানাশস্যের প্রধান প্রধান রোগগুলি কি এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন।
- ভারতের ডাল শস্যের কি কি রোগ হয় তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- ভারতে তৈলবীজ চাষের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান প্যাথোজেন গুলি কি কি তা নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন।
- ভারতের কয়িকটি ফলের রোগ ও তাদের জীবাণু কি কি তা নির্ণয় করতে পারবেন।
- ভারতের কয়েকটি অর্থকরী ফসল যেমন আখ, পাট, তামাক, পান, চা, কাজু ইত্যাদির সাধারণ কয়েকটি রোগের কারণ ও লক্ষণ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।
- একটি সুনির্দিষ্ট রোগজীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট রোগলক্ষণ মোটামুটি ভাবে সবরকম পোষকে একই রকম—এই তথ্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- বিশেষ রোগ এবং তার প্যাথোজেনের সনাক্তকরণ কিভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করা যায় এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

16.2 দানাশস্যের রোগ (Diseases of cereal crops) :

16.2.1 ধান (Oryza sativa L) :

ভারতবর্ষের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। সমুদ্রস্তর থেকে শুরু করে 7000 ফুট উচ্চতা পর্যন্ত ধান চাষ হয়। ধানের রোগগুলি প্যাথোজেন ঘটিত অথবা পরিবেশগত কারণে হয়ে থাকে। এদেশে প্যাথোজেনঘটিত রোগগুলির মধ্যে 30 টি ছত্রাকঘটিত। এগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটির কথা বলা হল।

A. রোগের নাম ঃ ব্লাষ্ট (Blast)

রোগ লক্ষণ ঃ পাতার উপর চক্ষু আকৃতির দাগ। দাগের মধ্যভাগ সাদাটে এবং প্রান্তভাগ বাদামী শীষের গোড়ায় সংক্রমণ কালচে দাগের মতো বেষ্টনী তৈরি করে। দানা আসা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় বাড়াবাড়ি রকমের সংক্রমণের ক্ষেত্রে।

প্যাথোজেন ঃ ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক *Pyricularia oryzae*

B. রোগের নাম ঃ বাদামী দাগ (Brown spot)

রোগ লক্ষণ : গোল থেকে ডিম্বাকার বাদামী রঙের দাগ। দাগ প্রথমাবস্থায় পাতায় এবং পত্রমূলে এবং পরে শীষে ও দানায় ছড়িয়ে পড়ে। দাগগুলি 0.5 – 2 মি.মি. × 2 – 5 মি.মি. আয়তনবিশিষ্ট।

প্যাথোজেন : ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক *Helminthosporium oryzae*

C. রোগের নাম : ব্লাইট (Blight) বা ধ্বসা

রোগ লক্ষণ : 5 – 10 মি.মি. লম্বা ভেজা ভেজা হলুদ রঙের দাগ। দাগ প্রথমে পাতার শীর্ষে ও প্রান্তভাগে এবং পরে মধ্য শিরা অঞ্চলে দেখা যায়। রোগের প্রকোপ বাড়লে সব দাগগুলি একত্রিত হয়ে খড়ের মত বাদামী রঙের পচনশীল দাগ গঠন করে। অনেক সময় ফোঁটা ফোঁটা ঘোলাটে দ্রবণ সদৃশ ব্যাকটেরিয়া ও উদ্ভিদরসের মিশ্রণ পচনশীল অংশ থেকে নিঃসৃত হয়ে পাতার উপর জমা হয়। যখন শুকিয়ে যায় তখন এই ফোঁটাগুলি কাঁটার মত পাতার উপর জমে থাকে এবং পাতায় হাত বোলালে সহজেই স্পর্শের মাধ্যমে অনুভব করা যায়।

প্যাথোজেন : *Xanthomonas Oryzae* নামক ব্যাকটিরিয়া

D. রোগের নাম : গোড়া পচন (Foot Rot)। ভারতবর্ষে এর প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম।

রোগ লক্ষণ : বীজতলা বা শস্যক্ষেত্র উভয় জাগয়াতেই দেখা যায়। বীজতলায় আক্রান্ত অঙ্কুরগুলি সবুজ বর্ণ হারিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। স্বাভাবিক অঙ্কুরের তুলনায় রোগাক্রান্ত অঙ্কুর লম্বা হয় এবং ক্রমশঃ উপর থেকে নুয়ে পড়তে থাকে। শস্যক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত চারাগুলি অতিরিক্ত লম্বা হয় এবং সুস্থ উদ্ভিদের তুলনায় তাড়াতাড়ি শীষ চলে আসে। এই আক্রান্ত উদ্ভিদের মূল ব্যাপকভাবে শাখান্বিত হয়ে যায় এবং মাটির উপর প্রথম বা দ্বিতীয় পর্ব অংশ থেকেও মূল নির্গত হয়। ছত্রাকের রেণু উৎপাদনকালে গাছের গোড়ায় গোলাপী দাগ দেখা যায়। শীষের গোড়া ও কাণ্ড চিরে ফেললে সাদা রঙের ছত্রাকের আস্তরণ চোখে পড়ে। শীষ এলেও তাতে দানা হয় না এবং দুই থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে চারা মরে যায়।

প্যাথোজেন : ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত *Fusarium moniliforme* নামক ছত্রাক

E. রোগের নাম : কাণ্ড পচন (Stem Rot)।

রোগ লক্ষণ : কাণ্ডের গোড়া থেকে প্রচুর সংখ্যক ছড়ানে শাখার উদ্ভব। শাখাগুলি বা ছড়াগুলি সংক্রমণের প্রাবল্য বাড়লে বিবর্ণ হয়ে পচে যায়। পাতায় শিরা বরাবর ছোট ছোট, অনিয়তাকার কালো দাগ দেখা যায়। কাণ্ড চিরে ফেললে প্রচুর পরিমানে ছাই রঙের ছত্রাকের অণুসূত্র-স্তর দেখতে পাওয়া যায়। বহিরে থেকে মাটির উপর কাণ্ডের 2/3 ইঞ্চি উচ্চতা পর্যন্ত অংশে শ্যাওলা সবুজ দাগ বৃত্তাকারে চোখে পড়ে।

রোগজীবাণু : ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক *Sclerotium oryzae* পূর্ণতাপ্রাপ্ত যৌন দশা *Leptosphaeria salvinii* নামে পরিচিত এবং এই দশাটি অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত।

F. রোগের নাম ঃ উদবাতা রোগ (Udbatta Disease)। এটি ভারতবর্ষের অতি সংকীর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রোগ। উদবাতা কথাটি দক্ষিণ ভারতীয় যার অর্থ হল আগরবাতি। তামিলনাড়ুর মাদুরাই, কেরালার উনাদ এবং কর্ণাটিকের কোল্লেগাল ও দক্ষিণ কানমাড়া জেলাগুলিতে সীমাবদ্ধ।

রোগ লক্ষণ ঃ পাতার গোড়া থেকে যে শীষ বেরোয় তা বিবর্ণ, নোংরা ধরনের শক্ত এবং অনেকাংশে ধূপকাঠি বা আগরবাতির মত দেখতে। এই শীষে কোন দানা হয় না।

রোগজীবাণু ঃ ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত *Ephelis oryzae*

G. রোগের নাম ঃ বাণ্ট (Bunt)। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ছাড়া বাকী ভারতবর্ষে এর প্রকোপ ততটা নেই।

রোগ লক্ষণ ঃ শীষের একটি কি দুটি দানা আক্রান্ত হয়। কালো ছোট্ট দাগের রূপ নিয়ে রোগলক্ষণ প্রথম পরিণত চালের গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। হাতে টিপলে চাল গুঁড়ো হয়ে যায় এবং কালচে পাউডারের মত হয়ে ছত্রাক রেণু চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু ঃ বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত *Neovossia horrida* নামক ছত্রাক।

H. রোগের নাম ঃ ভাইরাস ঘটিত রোগ

রোগ লক্ষণ ঃ সাধারণতঃ ভাইরাস বা মাইকোপ্লাজমার আক্রমণে একই রকম লক্ষণ দেখা যায়। এদের প্রকারভেদ রোগলক্ষণের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। লক্ষণগুলি হলঃ

a. চারার খর্বতা

b. শীষ সংখ্যাও আকৃতিতে কম এবং বিবর্ণ .... টুংরো ভাইরাস (Tungro Virus)

bb. শীষ সংখ্যা ও আকৃতিতে অনেক বেশি

c. পাতার বিবর্ণতা এবং নুয়ে পড়া .... ইয়োলো ডোয়ার্ফ (Yellow dwarf)

cc. পাতা উন্নত (অর্থাৎ নুয়ে পড়া নয়)

এবং পাতার গায়ে মরচের মত দাগ ....Grassy Stunt

aa. চারার খর্বদা দেখা যায় না কিন্তু বিবর্ণতা ও পাকানো ভাব চোখে পড়ে .... *Orange leaf*

(চিত্র 16.1 এ ধানের কয়েকটি রোগের রোগলক্ষণ প্রদর্শিত হয়েছে।)

16.2.2 গম :

ভারতবর্ষে মূলতঃ উত্তর ভারত এবং মধ্য ভারতে গমের চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া উপকূলবর্তী অঞ্চলেও কিছু পরিমানে গম চাষ হয়। প্রধান প্রজাতি হল তথাকথিত bread wheat যার বৈজ্ঞানিক নাম **Triticum aestivum L.** এছাড়া *T. durum* Desf. এবং *T. dicoccum* Schuble এর চাষও হয়ে থাকে। গাঙ্গেয় সমভূমি থেকে শুরু করে হিমালয়ে 9000 ফুট উচ্চতা পর্যন্ত গম চাষ হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রোগের কথা নিম্নে আলোচিত হল ঃ

A. রোগের নাম ঃ মরিচা (Rust)।

ভারতবর্ষে গমের তিনপ্রকার মরিচা রোগ পাওয়া যায়। কালো মরিচা রোগ (Black stem rust), 1827 খ্রিস্টাব্দ থেকে বারবার এই রোগ মহামারী রূপে আবির্ভূত হয়েছে। 1947 এ মধ্যপ্রদেশে এবং 1956 - 57-এ পশ্চিমবঙ্গে এই মহামারী দেখা দিয়েছিল।

রোগ লক্ষণ ঃ পাতা, পত্রমূল, শীষ এবং কাণ্ডের গায়ে প্রথমে বিবর্ণ এবং পরে কালচে বাদামী রঙের দাগ। দাগগুলি থেকে পরে মরিচার মত গুঁড়ো গুঁড়ো ছত্রাক রেণু চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী অবস্থায় এই দাগগুলি কালো হয়ে যায় এবং সেখান থেকে কালো রঙের মরিচার মত গুঁড়া উৎপাদিত হয়। অতি সংক্রমনের দরুণ উদ্ভিদ খর্ব হয়ে যায় এবং দূর থেকে আক্রান্ত উদ্ভিদকে চেনা যায়।

রোগজীবাণু ঃ *Puccinia graminis* নামক বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

পাতার মরিচা রোগ বা গোলাপী মরিচা রোগ (Leaf or Orange Rust) ঃ

রোগলক্ষণ ঃ পাতায় ছোট্ট ছোট্ট কমলা রঙের গোলাকৃতি দাগ। এই দাগ খুব বিরল ক্ষেত্র ছাড়া কখনও কাণ্ড বা পুষ্পমঞ্জরীতে দেখা যায় না। ক্রমশঃ দাগগুলি বাদামী থেকে কালো হয়ে যায়।

রোগজীবাণু ঃ *Puccinia recondita* নামক ছত্রাক।

হলুদ বা ডোরাকাটা মরিচা (Yellow or Stripe Rust) ঃ

রোগ লক্ষণ ঃ প্রথমে পাতায় উজ্জ্বল হরিদ্রাভ দাগ এবং পরে পত্রমুল, কাণ্ড, পুষ্পমঞ্জরী অর্থাৎ শীষে দাগগুলি ছড়িয়ে পড়ে। পাতার দুটি শিরা মধ্যবর্তী অংশে লম্বালম্বিভাবে দাগগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় তাই ডোরাকাটা বা Stripe Rust নামকরন। পরে এই দাগগুলি কালো হয়ে যায়। উভয় ক্ষেত্রে মরিচার মত রেণু দেখে বা স্পর্শের মাধ্যমে বোঝা যায়।

রোগজীবাণু ঃ *Puccinia striiformis* নামক ছত্রাক।

B. রোগের নাম ঃ আলগা স্মাট বা ছেতো রোগ (Loose Smut of Wheat)।

সারা পৃথিবীর সাথে ভারতবর্ষেও পাওয়া যায়। প্রবল সংক্রমণের ক্ষেত্রে ত্রিশ শতাংশ ফসল বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

রোগ লক্ষণ ঃ কেবলমাত্র শীষ আসার সময়ই রোগলক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং এর আগে সুস্থ উদ্ভিদের সাথে রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের কোন পার্থক্যই চোখে পড়ে না। আক্রান্ত উদ্ভিদের শীষের প্রতিটি দানা সংক্রামিত হয় এবং শস্যের পরিবর্তে সেখানে কেবলমাত্র কালো রঙের পাউডারের মত গুঁড়ো জমে থাকে। এই নগ্ন কালো গুঁড়োর অথবা "ছেতো"য় আবৃত পুষ্পমঞ্জরীটি পরিণত অবস্থায় একটি মসৃণ, রূপালী, ঝিল্লি পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। পরিণত দশায় এই আবরণী ভেদ করে শীষটি বাতাসের সংস্পর্শে আসে এবং রেণুগুলি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। "ছেতো" বস্তুত এই রেণু সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

রোগজীবাণু ঃ বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত *Ustilago nuda* (পূর্বনাম *U. triticii* নামক ছত্রাক) ।

C. রোগের নাম ঃ বান্ট (Bunt disease)। ভারতবর্ষে গমের তিন প্রকার বান্ট রোগ হয়ে থাকে।

(ক) অমসৃণ রেণু বান্ট ঃ *Tilletia caries* এর সংক্রমণ

(খ) মসৃণ রেণু বান্ট ঃ *T. foetida* সংক্রমণ

(গ) দানার বান্ট (Karnal bunt) ঃ *Neovossia indica* সংক্রমন

তিনটিই বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

রোগ লক্ষণ ঃ কোন ক্ষেত্রেই পুষ্পমঞ্জরী আবির্ভাবের আগে কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে শীষের পরিণতি সুস্থ উদ্ভিদের তুলনায় তাড়াতাড়ি ঘটে এবং শীষগুলি কালচে সবুজ হয়ে যায়। শীষে *খোসা* (glume) আবৃত দানার বদলে থাকে খোসায় মোড়া ছত্রাক রেণুর মত। প্রথম ক্ষেত্রে রেণুগুলি অমসৃণ প্রাচীর বিশিষ্ট এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এগুলি মসৃণ প্রাচীর বিশিষ্ট।

দানার বান্ট সাধারণতঃ একটি বা দুটি দানায় সীমাবদ্ধ থাকে। সেসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দানাটি আক্রান্ত না হয়ে তার অংশবিশেষে আক্রান্ত হতে পারে। সব কটি ক্ষেত্রেই বান্ট রোগের যা বৈশিষ্ট্য সেই দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

D. রোগের নাম ঃ গোড়া পচন (Foot Rot)।

রোগ লক্ষণ ঃ অঙ্কুরোদগমের পর পরই মুলে পচন দেখা দেয়। যদি সংক্রমণ পরিণত উদ্ভিদে হয় তাহলে গোড়া বর্ণহীন এবং নরম হয়ে যায়। শেষ অবধি অঙ্কুর বা পরিণত গাছ যাই হোক না কেন নুয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু ঃ *Pythium graminicola* এবং *P. arrhenomanes*

দুটিই হল ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

E. রোগের নাম : গুঁড়া চিতি (Powdery mildew) : শীতপ্রধান অঞ্চলে গম চাষের বড় শত্রু হল এই রোগ।

রোগ লক্ষণ : ধূসর সাদাটে পাউডার সদৃশ আস্তরণ পাতার উপর দেখতে পাওয়া যায়। রোগের প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে এগুলি কালচে বর্ণ ধারণ করে। পচনশীল অংশের কোন কোন অঞ্চলে ক্ষুদ্র কালো কালো দাগ দেখা যায়। এগুলি ছত্রাকের ফলদেহ পেরিথেসিয়া।

রোগজীবাণু : *Erysiphe graminis*। এটি অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক।

F. রোগের নাম : পাতার ধ্বসা রোগ (Leaf blight)।

রোগ লক্ষণ : ফসল শস্যক্ষেত্রে 7 থেকে 8 সপ্তাহ বয়সের হলে প্রথম রোগলক্ষণ দেখা দেয়। প্রথমে পাতায় লালচে বাদামী ডিম্বাকৃতি দাগ সীমাবদ্ধ অঞ্চলে দেখা যায়। পরে দাগগুলি অনিয়তভাবে বেড়ে যায় এবং দাগগুলির প্রান্তভাগ উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পরবর্তীক্ষেত্রে অনেকগুলি দাগ এক সাথে জুড়ে গিয়ে পাতার বড়সড় অঞ্চলকে অনেকটা পোড়া পোড়া রূপ দেয় যাতে করে বহুদূর তেকেও রোগাক্রান্ত গাছ বা তার পাতা চেনা যায়।

রোগজীবাণু : ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক *Alternaria triticina*

G. রোগের নাম : পাতার দাগ (Leaf spot)।

রোগ লক্ষণ : সাধারণতঃ অঙ্কুরের বা পাতার পচন 1-2 মি.মি. লম্বা হলদে রঙের ডিম্বাকার দাগ আবির্ভাবের মাধ্যমে শুরু হয়। ক্রমশঃ এগুলি গাঢ় বর্ণ ধারণ করে এবং সমস্ত অঙ্কুরটি গাঢ় বাদামী হয়ে নুয়ে পড়ে। পরিণত পাতায় দাগগুলি পরস্পরের সাথে মিলে গিয়ে শুষ্ক খড়ের মত রঙ বিশিষ্ট বড় বড় জোরায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি দাগ বা ডোরার মধ্যভাগ গাঢ়, প্রান্তভাগ বাদামী হয় এবং সেটি একটি হলদে রঙের আভা (halo) দ্বারা ঘেরা থাকে।

রোগজীবাণু : *Helminthosporium sativum* নামক ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

(চিত্র 16.2 তে গমের কয়েকটি রোগলক্ষণের চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয়েছে।)

16.2.3 জোয়ার (*Sorghum vulgare* Pers.) :

ভারতবর্ষে মানুষ ও পশুর খাদ্যরূপে জোয়ারের চাষ হয় কম বৃষ্টির অঞ্চলে প্রায় 180 লক্ষ হেক্টর জমিতে। সারা পৃথিবীতে জোয়ারের প্রায় 50 টি রোগ হয়ে থাকে তার মধ্যে 30 টি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। নীচের তালিকায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির কথা বলা হল।

সারণি—1

রোগের নাম	রোগলক্ষণ	রোগজীবাণু
ছেতো (Smut)	দানাকে প্রতিস্থাপিত করে ধূসর রঙের "ছেতো"র আবির্ভাব	*Sphacelotheca sorghi*
মরিচা (Rust)	পাতায় প্রথমে বাদামী পরে কালচে মরচের মত গুঁড়ো বিশিষ্ট দাগ।	*Puccinia purpurea*
পালক-চিতি রোগ (Downy mildew)	পাতার নিম্নতলে সাদাটে 'ছাতা'র আস্তরণ। পাতা ক্রমশঃ অসংখ্য খণ্ডে চিরে চিরে গিয়ে চেরা পালকের মত রূপ নেয়।	*Sclerospora sorghi*
পাতার দাগ (Leaf spot) বা পাতার ধ্বসা রোগ (Leaf blight)	পাতায় মাকু আকৃতির দাগ বা আয়তাকার থেকে অনিয়তাকার লালচে দাগ	*Cercospora sorghi* *Hilminthosporium turcicum*
আরগট (Ergot)	শীষে মধুর মত ফোঁটা ফোঁটা তরলের আবির্ভাব। দানা ক্রমশঃ ছত্রাক রেণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়।	*Sphacelotheca sorghi*

16.2.4 জোয়ার (*Pennisetum typhoides* L.) :

ভারতবর্ষে বহু নিম্নবিত্ত মানুষের খাদ্য এই দানাশস্য। প্রায় 120 লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়। যে কোন ধরনের জমিতে চাষ করা যায় বলে ধান বা গম যেখানে বাঁচে না সেখানেও ফলানো যায়। 20টির মত রোগের সন্ধান পাওয়া গেছে যার মধ্যে নীচের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

সারণি—2

রোগের নাম	রোগলক্ষণ	রোগজীবাণু
সবুজ শীষ (Green Ear) বা পালক-চিতি (Dowry mildew)	শীষের বদলে সেখান থেকে অসংখ্য সবুজ রঙের অপুষ্ট পাতার মত অংশের আবির্ভাব	*Sclerospora graminicola*
মরিচা রোগ (Rust)	গম বা জোয়ারের মরিচা রোগের ন্যায়	*Puccinia penniseti*

রোগের নাম	রোগলক্ষণ	রোগজীবাণু
ছেতো রোগ (Smut)	দানার বদলে সেখানে 100-150u ব্যাসের ছত্রাক রেণু দ্বারা গঠিত spore ball এর আবির্ভাব মত রূপ নেয়।	*Tylosporium penicillariae*
আরগট (Ergot)	মধুর মত তরল আক্রান্ত পুষ্প-মঞ্জরী থেকে চুঁইয়ে পড়ে	*Claviceps microcephala*

16.2.5 ভুট্টা (*Zea mays* L.) :

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত এই উদ্ভিদটি পশুখাদ্য এবং মানুষের খাদ্যরূপে চাষীদের কাছে জনপ্রিয় 20টি রোগের কথা জানা গেছে যার মধ্যে নীচের কয়েকটি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় :

সারণি—3

রোগের নাম	রোগলক্ষণ	রোগজীবাণু
ছেতো বা স্মাট (Smut)	শীষে বা দানায় ফোলা ফোলা স্ফীতি (gall) এর আবির্ভাব। স্ফীতিগুলি ফেটে গিয়ে কালো পাউডার সদৃশ গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে।	*Ustilago maydis* (*পূর্বনাম -U. zeae*)
বাদামী দাগ (Brown spot)	পাতায় ভেজা ভেজা বিবর্ণ থেকে লালচে বাদামী দাগ।	*Physoderma maydis*
মরিচা (Rust)	গম বা জোয়ারের মরিচা রোগের ন্যায়	*Puuccinia sorghii*
ধ্বসা রোগ (Leaf blight)	পাতায় ও কাণ্ডে বাদামী দাগ যা বিবর্ণ আভাযুক্ত halo দ্বারা আবৃত থাকে	*Phaeosphaeria maydis*
বর্ণালী (Mosaic)	পাতায় ছিটে ছিটে বিবর্ণ দাগ	Maize mosaic virus

(চিত্র 16.3 তে গৌণ শস্যগুলির কয়েকটি রোগলক্ষণ প্রদর্শিত হল।)

16.3 ডাল শস্য (Pulse crops) :

দানাশস্যের পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফসল হল ডাল। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ প্রোটি জাতীয় খাদ্যের জন্য ডালের উপর নির্ভরশীল। সমস্ত প্রকার ডালই লেগুমিনোসি গোত্রের প্যাপিলিওনেসী উপগোত্রভুক্ত উদ্ভিদ এবং শুঁটি (legume) জাতীয় ফল উৎপাদনই হল এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে মোট 29 কোটি হেক্টর জমিতে ডাল চাষ হয় এবং বাৎসরিক উৎপাদন 12-13 কোটি টন।

16.3.1 ছোলা (Cicer arietinum L.) :

উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যে চাষ হয়। এককভাবে অথবা মিশ্র ফসল হিসাবে অন্য ফসলের অন্তবর্তী সময়ে চাষ করা হয়। ভারতবর্ষে ছয় / সাতটি রোগের প্রাদুর্ভাব আছে।

A. রোগের নাম : ধ্বসা (Blight)

রোগ লক্ষণ : প্রথমে পাতায় ভেজা ভেজা গোলাকার দাগ। দাগগুলির মধ্যভাগ হলদেটে ধূসর এবং প্রান্তভাগ বাদামী। অচিরেই কাণ্ড ও শুঁটিতে দাগ দেখা যায়। ক্রমশঃ দাগগুলি কাণ্ডকে বেষ্ট করে ফেলে এবং দাগগুলির কেন্দ্রীয় অংশে কালো কালো বিন্দু সদৃশ পিকনিডিয়ার আবির্ভাব ঘটে।

রোগজীবাণু : ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত *Ascochyta rabiei.* যৌন জননকারী দশা অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত এবং *Mycosphaerella pinodes* নামে পরিচিত।

B. রোগের নাম : অবনমন অথবা নেতিয়ে পড়া (Wilt)

রোগ লক্ষণ : চারা শীর্ষ থেকে নিম্নভাগের দিকে নুয়ে পড়ে এবং অচিরেই মরে যায়। ভূমিসংলগ্ন অংশে পচন ও বিবর্ণতা চোখে পড়ে। গাছ সহজেই মাটি থেকে উপড়ে ফেলা যায়। মূলগুলিতেই সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়।

রোগজীবাণু : *Fusarium orthoceros,* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক।

C. রোগের নাম : মরিচা (Rust)

রোগ লক্ষণ : পাতার উভয় দিকে ডিম্বাকার বাদামী গুঁড়াসংযুক্ত দাগ। পরে দাগগুলি শুঁটিতে ছড়িয়ে পড়ে। দাগগুলি পরে কালো হয়ে যায় কেন না এগুলিতে তখন কালো রঙের টিলিউটোস্পোর গঠিত হয়।

রোগজীবাণু : *Uromyces ciceris-arietini;* বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক।

16.3.2 বীন : ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার বীন চাষ করা হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

i) সয়াবীন *(Clycine max.* Merr.)

ii) রাজমা বীন *(Phasealus vulgaris* L.)

iii) দেশী সীম *(Dolichos lablab* L.)

iv) বরবটি *(Vigna sinensis* L.)

সব কয়টিতেই একই ধরনের রোগ সংক্রমন পরিলক্ষিত হয়।

A. রোগের নাম : গুঁড়া চিতি (Powdery mildew)

রোগ লক্ষণ : পাতায় সাদাটে পাউডারের মত গুঁড়ো দেখা যায় পরে গুঁড়ো কাণ্ড ও উদ্ভিদদেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও বৃদ্ধির যে কোন দশায় আক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে তবু ফুল ফোটার সময় সর্বাধিক সংক্রমণ দেখা যায়।

রোগজীবাণু : *Erysiphe polygoni;.* অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক।

B. রোগের নাম : শুষ্ক মূল পচন (Dry Root Rot)

রোগ লক্ষণ : প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে যায়। দুই তিন দিনের মধ্যে পাতা নুয়ে পড়ে বা খসে পড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে গাছ নেতিয়ে পড়ে। কাণ্ডের বাকল অংশে কালচে দাগ দেখা যায়। গাছ উপড়ে আসে এবং মূলে শুষ্ক পচন দেখা যায় ফলে মূল সহজেই উদ্ভিদদেহ থেকে বিভিন্ন হয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু : ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত *Macrophomina phaseoli.*

C. রোগের নাম : পাতার দাগ (Leaf spot) অনেক রকম পাতার দাগের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হল *Cercospora* ঘটিত দাগ।

রোগ লক্ষণ : পাতায় সিক্ত পচনশীল দাগ। অচিরেই আক্রান্ত অংশ বাদামী বা লালচে-বাদামী বর্ণ ধারণ করে। দাগের কেন্দ্রীয় অংশে ধূসর রঙের ছত্রাকরেণু চোখে পড়ে। অতি সংক্রমণের ক্ষেত্রে দাগ পাতা থেকে কাণ্ড ও শুঁটিতে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু : *Cercospora sp;* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

D. রোগের নাম : ঢেঁড়ি রোগ (Anthracnose)

রোগ লক্ষণ : ভূ-উপরিস্থ যে কোন অংশ আক্রান্ত হতে পারে তবে সবচাইতে সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় শুঁটিতে। প্রথমে সিক্ত পচনশীল দাগ যা পরে বাদামী হয়ে যায় এবং বৃত্তাকার ধারণ করে। দাগগুলির কেন্দ্র অবতল থাকে এবং চারপাশে গাঢ় লাল বা হলুদ বা কমলা আভা দেখা যায়।

রোগজীবাণু : *Glomerella lindemuthiana;* অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

E. রোগের নাম : মরিচা (Rust)

রোগ লক্ষণ : বহু সংখ্যক গোলাকার দাগ পাতার উপর গুচ্ছাকারে গঠিত হয়। দাগগুলির উপর বাদামী বা মরচে রঙের গুঁড়া দেখা যায়। পরে বহু দাগ একত্রিত হয়ে পাতার বড় অঞ্চলকে আবৃত করে ফেলে।

রোগজীবাণু : *Uromyces appendiculatus,* বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

(চিত্র 16.4 -এ কয়েকপ্রকার ডালশস্যের রোগলক্ষণ প্রদর্শিত হল।)

16.3.3 মটর (*Pisum sativum* L.) :

রোগলক্ষণগুলি অন্য আর পাঁচটা শুঁটির মতই। রোগজীবাণুর নাম নিচে বিবৃত হল :

A. মরিচা — *Uromyces fabae*

B. গুঁড়া চিতি — *Peronospora viciae*

C. অঙ্কুরের ধ্বসা রোগ — *Pythium* Sp.

D. পাতার দাগ — *Cercospora cruenta*

16.3.4 মুগ (*Phaseolus mungo* Roxb.) :

A. ঢেঁড়ি রোগ — *Clomerella lindemuthiana*

B. শুষ্ক মূল পচন — *Macrophomina phaseoli*

C. পাতার দাগ — *Cercospora canescens*

D. মরিচা দাগ — *Uromyces appendiculatus*

রোগ লক্ষণগুলির জন্য 16.3.2 অংশাঙ্কিত বিষয়টি দ্রষ্টব্য।

16.3.5 মসুর (*Lens esculenta* Moench.) :

A. শুষ্ক মূল পচন — *Macrophomina phaseoli*

B. মরিচা — *Uromyces fabae*

C. অবনমন (Wilt) — *Fusarium orthoceras*

রোগলক্ষণ বীন এবং ছোলার মতই।

অনুশীলনী - 1

1. নিম্নে উললিখিত রোগগুলির পাশে তাদের জন্য দায়ী জীবাণুর নাম লিখুন।

(a) ধানের ব্লাস্ট রোগ ____________________।

(b) গমের গুঁড়া চিতি রোগ ____________________।

(c) গমের ছেতো রোগ ____________________।

(b) ভুট্টার ধ্বসা রোগ ____________________।

(c) ধানের চারার খর্বতা ____________________।

2. ভারতবর্ষের যে কোন *তিনটি* ডালশস্য এবং তাদের একটি করে রোগের নাম বলুন।

16.4 সবজি (Vegetables) :

বিজ্ঞানী হিল (Hill) এর মত (1952) অনুযায়ী সবজির প্রকারভেদ তিনটি। (a) মৃতগত সবজি (b) পাতা সবজি ও (c) ফল সবজি। সুতরাং সংক্রামণের ধরণ ও জীবাণুর ধরন প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন।

16.4.1 আলু (Solanum tuberosum L.) :

ভারতবর্ষে সবজি হিসাবে চাষ করা হলেও ইয়োরোপ, রাশিয়া বা আমেরিকার নানা অঞ্চলে আলু প্রধান খাদ্যরূপে চাষ করা হয়। ভারতবর্ষে উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, পাঞ্জাব, বিহার ইত্যাদি প্রদেশে সর্বমোট 9-10 লক্ষ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয় এবং বার্ষিক উৎপাদন 20 মিলিয়ন মেট্রিক টন।

A. রোগের নাম : বিলম্বিত ধ্বসা অথবা নাবি ধ্বসা (Late Blight)

রোগ লক্ষণ : 15 এককে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

রোগজীবাণু : *Phytophthora infestans;* ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক।

B. রোগের নাম : জলদি ধ্বসা (Brown spot)

রোগ লক্ষণ : পাতায় বিভিন্ন আকারে অনিয়তাকার বাদামী বা কালচে বাদামী দাগ। দাগগুলি অভিকেন্দ্রিক বৃত্তাকার রেখার সমন্বয়ে গঠিত। কন্দ ও মূলে সংক্রমনের ক্ষেত্রে শুষ্ক পচন দেখা যায়। পত্রবৃন্ত আক্রান্ত অবস্থায় কিঞ্চিৎ অবতল।

রোগজীবাণু : *Alternaria solani;* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক।

C. রোগের নাম : বাদামী পচন (Blight)

রোগ লক্ষণ : প্রথমে ফসল তোলার পূর্বেই গাছের খর্বতা প্রাপ্তি, পাতার বিবর্ণতা, অবশেষে গাছের নেতিয়ে পড়া। কাটা কান্ডের গোড়া থেকে ব্যাকটেরিয়ার দ্রবণ রসের মত গড়িয়ে পড়ে। কন্দের সংক্রমনে "চোখ" কালচে হয়ে যায় এবং কন্দের ভিতর থেকে ময়লা/ ঘোলা দ্রবণ চুঁইয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু : *Pseudomonas solanecerum;* নামক ব্যাকটিরিয়া

এছাড়াও আলুতে ভাইরাস এবং কৃমি (nematode) সংক্রমণ হতে পারে।

16.4.2 গাজর (*Daucas carota* L.) :

A. রোগের নাম : নরম পচন (Soft Rot)

রোগ লক্ষণ : নরম, সিক্ত, অনিয়তাকার দাগ। প্রথমে দাগ গাজরের খোসায় ও পরে কেন্দ্রের দিকে প্রসারিত হয়।

রোগজীবাণু : *Erwinia carotovora;* নামক ব্যাকটেরিয়া।

B. রোগের নাম : পাকানো মূল (Root Knot)

রোগ লক্ষণ : মূলের অর্থাৎ গাজরের পেঁচানো গঠন। গিঁটের মত বহিরাকৃতি।

রোগজীবাণু : *Meloidogyne javanica* নামক নিমাটোড।

16.4.3 বীট (*Beta vulgaris* L.) :

A. রোগের নাম : পাতার দাগ (Leaf spot)
   রোগ লক্ষণ : ডালের পাতার দাগের মত
   রোগজীবাণু : *Cercospora beticola;*

B. রোগের নাম : মরিচা রোগ (Root Knot)
   রোগ লক্ষণ : ডাল শস্যের মত
   রোগজীবাণু : *Puccinia beta-bengalensis*

16.4.4 বাঁধাকপি (*Brassica oleracea* var *capitala* L.) :

A. রোগের নাম : সোঁদা লাগা বা ড্যাম্পিং অফ (Damping off)
   রোগ লক্ষণ : ছত্রাক অঙ্কুরিত বীজকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত চারা বিবর্ণ সবুজ রঙের হয় এবং বাদামী সিক্ত দাগ কাণ্ডের গায়ে বেষ্টনীর আকারে দেখা যায়।
   রোগজীবাণু : *Pythium* Sp; ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

B. রোগের নাম : কালো পচন (Black Rot)
   রোগ লক্ষণ : পাতার প্রান্তভাগে ক্লোরোসিস জনিত দাগ, যা পরে কেন্দ্রতিগ হয়ে বিস্তৃত হয় এবং 'V' আকৃতি ধারণ করে। আক্রান্ত পাতায় শিরা-উপশিরা কালো হয়ে যায়।
   রোগজীবাণু : *Xanthomonas campestris;* নামক ব্যাকটেরিয়া।

C. রোগের নাম : গদাকৃতি মূল (Club root)
   রোগ লক্ষণ : মূল আক্রান্ত হবার আগে কোন লক্ষণ থাকে না। তারপর খর্বতা পরিলক্ষিত হয় এবং মাটি থেকে গাছ উপড়ে ফেললে মূলে ফোলা ফোলা গদাসদৃশ বৃদ্ধি চোখে পড়ে।
   রোগজীবাণু : *Plasmodiophora brassicae;* নামক ব্যাকটিরিয়া

16.4.5 ফুলকপি (*Brassica oleracea* var *botrytis* L.) :

বাঁধাকপির সব কয়টি প্যাথোজেনই ফুলকপিতে সংক্রমন ঘটায়। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রোগ হলঃ

A. গুঁড়া চিতি : — *Peronospora parasitica*

B. শ্বেত মরিতা (White Rust) : — *Albugo candida*

16.4.6 মূলা (*Raphanus sativus* L.) : একটি রোগই মারাত্মক।

A. রোগের নাম ঃ শ্বেত মরিচা (White Rust)

রোগ লক্ষণ ঃ মরিচা রোগের ন্যায় কিন্তু সাদা রঙের দাগের পাতায় ও কাণ্ডে আবির্ভাব। দাগগুলি পত্রতলের তুলনায় উত্তল এবং 1 থেকে 2 মি.মি. ব্যাস বিশিষ্ট। অনেকসময় অনেকগুলি দাগ একত্রিত হয়ে বড় সড় অনিয়তাকার অঞ্চল গঠন করে। উত্তল দাগ ফেটে গিয়ে পরে সাদা ছত্রাকরেণু ছড়িয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু ঃ *Albugo candida*

16.4.7 পিঁয়াজ (*Allium cepa* L.) :

সবচাইতে সাধারণ রোগ হল ধ্বসা (Blight), মাংসল পেঁয়াজকলির গায়ে সাদাটে ঈষৎ অবতল ছোট ছোট দাগ। পরে দাগ পেঁয়াজ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় এবং পেঁয়াজের পচন দেখা যায়।

রোগজীবাণু ঃ *Alternaria palandui;* এবং *A. Porri* নামক ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

16.4.8 টম্যাটো (*Lycopersicon esculentum* Mill.) :

আলুর মতই এখানে একই জীবাণুঘটিত জলদি ধ্বসা (Early blight) ও নাবি ধ্বসা (Late blight) দেখা যায়। এছাড়া ফলের রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

A. ফল পচন ঃ *Phytophthora infestans* ঘটিত

B. ফল ক্যাঙ্কার (Fruit Canker) ঃ *Corynebacterium* নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। এক্ষেত্রে পুরো ফলটি পচে না গিয়ে আক্রান্ত অংশ আলগা হয়ে খসে পড়ে।

C. ভাইরাস ঘটিত রোগ যেমন বর্ণালী (Mosaic),

D. মাইকোপ্লাজমা ঘটিত রোগ মুকুল বৃদ্ধি বা (big bud) রোগ। এক্ষেত্রে কাণ্ডের অগ্রভাগ অত্যন্ত স্ফীত হয়ে যায় এবং এই গাছে ফলন হতে দেখা যায় না। ফলের বদলে গাঢ় সবুজ এই স্ফীত অংশই বেড়ে ওঠে, সেটি অত্যন্ত শক্ত এবং কাষ্ঠল।

চিত্র 16.5 'এ কয়েকটি সবজির রোগলক্ষণ দেখানো হল।

16.5 তৈলবীজ (Oil seeds) :

ভারতবর্ষে ভোজ্য তেল রূপে প্রধানতঃ সরষে, বাদাম, তিষি, সয়াবীন, রেড়ী ইত্যাদির চাষ করা হয়। প্রায় 20 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ভারতবর্ষে তেল চাষ হয় এবং ক্রমশঃ এর পরিমান বাড়ছে।

16.5.1 বাদাম (***Arachis hypogaea* L.**) : ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভোজ্য তেল।

A. রোগ : টিক্কা রোগ (Tikka disease)

রোগ লক্ষণ : *Cercospora* নামক ছত্রাকের দুটি প্রজাতি দুই রকম রোগলক্ষণ সৃষ্টি করে। *C. personata* পাতায় 3-4 মি.মি. ব্যাসযুক্ত দাগ সৃষ্টি করে। চারা বের হওয়ার মাসখানেক পরে প্রথম লক্ষণ দেখা যায় এবং ক্রমশঃ পাতা ঝরে পড়ে।

C. arachidicola হল অপর একটি প্রজাতি যার প্রভাবে দাগগুলি অন্য দাগের তুলনায় অনেক বড় হয় এবং হলদে রঙের বৃত্তাকার আভা (halo) দ্বারা আবৃত থাকে।

রোগজীবাণু : *C. Personata* এবং *C. arachidicola* হল ডিউটেরোমাইসিটিস গোষ্ঠীর ছত্রাক।

B. রোগ : মরিচা (Rust),

রোগ লক্ষণ : রোগ লক্ষণ অন্য সব মরিচা রোগের মত।

রোগজীবাণু : *Puccinia arachidis*

রোগ : ভাইরাসঘটিত বর্ণালী ও গোলাপাকার (rossete) ধারণ। পাতাগুলি একসাথে গোছা বেঁধে গোলাপফুলের মত আকার ধারণ করে এবং পাতার আকারও অত্যন্ত কমে যায়।

16.5.2 সূর্যমুখী (***Helianthus annus* L.**) :

A. রোগ : পাতার দাগ (Leaf spot)

রোগ লক্ষণ : পাতায় বাদামী দাগ। দাগগুলির কেন্দ্র গাঢ় বাদামী, প্রান্ত হালকা এবং হলুদ আভার আস্তরণ থাকে। দাগ 2–3 মি.মি. ব্যাসযুক্ত।

রোগজীবাণু : *Alternaria helianthi* ডিউটেরোমাইসিটিস গোষ্ঠীর ছত্রাক।

16.5.3 সরষে (***Brassica campestris* L.**):

রোগগুলির কথা আমরা ইতিপূর্বেই অন্য ফসলের আলোচনা প্রসঙ্গে জেনেছি।

A. ধ্বসা (Blight) : *Alternaria brassicae*

B. শ্বেত মরিচা (White Rust) : *Albugo candida*

C. চিতি (Downy mildew) : *Peronospora brassicae*

D. কালো পচন (Black rot) : *Xanthomonas campestris*

16.5.4 নারকেল (*Cocos nucifera* L.) :

সারা দক্ষিণ ভারতে প্রধান ভোজ্য তেল নারকেলের ব্যবহারিক গুরুত্ব নানাবিধ। সুতরাং শুধু তেল হিসাবে আলোচিত হলেও প্যাথোজেনগুলি ফল, কয়ের বা ছোবড়া সব কিছুর পক্ষেই হানিকারক।

A. রোগ : মুকুল পচন (Tikka disease)

রোগ লক্ষণ : নারকেলের একেবারে কেন্দ্রের মুকুলপত্রটি প্রথমে হলদেটে হয়ে যায় এবং পাতার মুকুলের গোড়া পচে গিয়ে সেটি খসে পড়ে। পুরানো পাতায় সংক্রমণ ছড়াতে পারে এবং অবতল দাগের আকারে সারা পাতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। দাগগুলির প্রান্তভাগ অনিতাকার ও সিক্ত। শে। পর্যন্ত পুরো চূড়াটি খসে পড়ে।

রোগজীবাণু : *Phytophthora palmivora;* ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

চিত্র 16.6 'এ কয়েকপ্রকার তৈল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের রোগলক্ষণ প্রদর্শিত হল।

অনুশীলনী - 2

1. নিম্নে উল্লিখিত সবজি ও তৈলবীজগুলির নামের পাশে তাদের একটি করে রোগের নাম লিখুন এবং রোগটির জন্য দায়ী জীবাণুটির নাম লিখুন :

	রোগের নাম	জীবাণু
(a) আলু	__________	__________
(b) বাদাম	__________	__________
(c) বাঁধাকপি	__________	__________
(d) গাজর	__________	__________
(e) সরষে	__________	__________

16.6 ফলদায়ী উদ্ভিদ (Fruits) :

16.6.1 আম (*Mangifera indica* L.) :

A. রোগ : গুঁড়া চিতি (Late Blight)

রোগ লক্ষণ : মুকুলের শুরু থেকে শেষের দিকে পচন। কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে ক্ষতি বেশি হয়। অবশেষে মুকুল খসে পড়ে

রোগজীবাণু : *Oidium mangifera* নামক ছত্রাক।

B. রোগ : ঢেঁড়ি (Anthracnose)

রোগ লক্ষণ : কচি পাতা, কাণ্ড, মুকুল এবং ফল আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত অংশে ফোসকার মত ফেঁপে ওঠা দাগ দেখা যায়। দাগগুলি কালো গুটির মত হয় এবং শুষ্ক হয়। এই দাগের ঠিক নীচে ফলের মাংস শক্ত হয় এবং বিস্বাদ হয়।

রোগজীবাণু : *Colletotrichum gloeosporioides* নামক ডিউটেরোমাইসিটিস ছত্রাক।

C. রোগ : গোলাপী রোগ (Pink Disease)

রোগ লক্ষণ : কাণ্ডের উপর গোলাপী পাউডারসদৃশ আস্তরণ। কাণ্ডের অন্তঃস্থ কলায় ছত্রাক প্রচুর পরিমানে রেণু গঠন করে। কাণ্ড নেতিয়ে পড়ে, পাতা খসে যায় এবং শাখাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু : *Pellicularia salmonicolor*

16.6.2 লেবু :

লেবুর গনটির নাম হল ***Citrus***, এর যে সমস্ত প্রজাতির চাষ হয় সেগুলি হল ***C. sinensis*** (মোসাম্বী), ***C. reticulata*** (কমলালেবু), ***C. aurantifolia*** (টক লেবু)। সবকটিতে একইরকম সংক্রমণ হয়।

A. রোগ : ক্যাঙ্কার (Canker)

রোগ লক্ষণ : মাটির উপরিবর্তী সব কয়টি অংশই আক্রান্ত হয়। প্রথমে ছোট্ট সিক্ত গোল দাগ আবির্ভূত হয় পরে এগুলি বাদামী হয়ে ফেটে যায়। দাগ 2–3 মি.মি. ব্যাসবিশিষ্ট এবং খোসাতেই সীমাবদ্ধ যদিও এই কারণে লেবু বা কমলালেবুর বাজার দর প্রচুর কমে যায়।

রোগজীবাণু : *Xanthomonas citri;* নামক ব্যাকটেরিয়া।

B. রোগ : আঠা ক্ষরণ বা (Brown spot)

রোগ লক্ষণ : সিক্ত বড় দাগ বিশেষতঃ কাণ্ডের গোড়ার দিকে। দাগ বাদামী হয়ে যায় এবং সেখান থেকে আঠার মত পদার্থ ক্ষরিত হয়। গোড়া থেকে দাগ এবং আঠা ক্ষরণ উপর ও নীচ দু'দিকেই বিস্তৃত হয়।

রোগজীবাণু : *Phytophthora* গনের বিভিন্ন প্রজাতি। যথা— *P. citrophthora, P. parasitica, P. Palmivora*

C. রোগ : পাতা খসা ও ফল পচন (Leaf Fall and Fruit Rot)

রোগ লক্ষণ : একই সংক্রমণের দুটি রূপ। পাতায় সিক্ত দাগ যা পাতার $\frac{1}{2}$ বা $\frac{1}{3}$ অংশকে পচিয়ে ফেলে। ছাতা লাগা পাতা খসে পড়ে। ফলের বোঁটার দিক থেকে সংক্রমণ শুরু হয় এবং বোঁটা দুর্বল হয়ে ফল খসে পড়ে।

রোগজীবাণু : *Phytophthora palmivora*

16.6.3 কলা (*Musa* sp.) ঃ ফল হিসাবে ভারতে মূলতঃ **Musa paradisica**-র চাষ হয়।

A. রোগ ঃ পানামা রোগ (Panama disease)

রোগ লক্ষণ ঃ আলাদা করে প্রতিটি পাতা একে একে নুয়ে পড়ে। পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং ক্লোরোসিস জনিত ছোপ দেখা যায়। দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে পুরো গাছ নুয়ে পড়ে। দঃ আমেরিকায় পানামা অঞ্চলে প্রথম এই রোগলক্ষণ দেখা যায় তাই এমন নাম।

রোগজীবাণু ঃ *Fusarium oxysporum;* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

B. রোগ ঃ মোকো রোগ (Moko Disease)

রোগ লক্ষণ ঃ মূলতঃ ক্ষতস্থান দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে রোগটি হয়। প্রথমে পাতার ফলকে বিশেষতঃ গোড়ার দিকে হলদে ভাব এবং অবশেষে নুয়ে পড়া।

রোগজীবাণু ঃ *Pseudomonas solanacearum* নামক ব্যাকটেরিয়া।

C. রোগ ঃ বাঞ্চি টপ (Bunchy top)

রোগ লক্ষণ ঃ সংক্রমিত গুঁড়িকন্দ থেকে সম্প্রসারিত রোগ। মেন অংশ থেকে বের হওয়া চারার পাতাগুলি ছোট ছোট, বর্ণালী ছিটে যুক্ত হয়। ফল হয় না।

রোগজীবাণু ঃ ভাইরাস, যা *Pentalonia* নামক অ্যাফিড পোকার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

16.7 অর্থকরী ফসল :

বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের মধ্যে ভারতবর্ষে শর্করা উৎপাদনকারী ফসল যেমন আখ (Sugar-yielding crop), তন্তু উৎপাদনকারী (Fibre crops) তুলা ও পাট পানীয় উৎপাদনকারী চা ও কফি (Beverages), রবার, তামাক (Plantation crops) ইত্যাদির কথা বলা যায়।

16.7.1 আখ (*Saccharum officinarum* L.) :

ভারতের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল প্রায় 5 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়। উত্তরপ্রদেশ ছাড়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ইক্ষু চাষ হয়।

A. রোগ ঃ লোহিত পচন (Red rot)

রোগ লক্ষণ ঃ পাতায় বিবর্ণতা, পাতার প্রান্তভাগ গুটিয়ে যাওয়া। 4 থেকে 8 দিনের মধ্যে সমস্ত গাছই নুয়ে পড়ে। কাণ্ডে লাল রঙের দাগ আখের খুব সাধারণ রোগলক্ষণ। এছাড়াও একটি সাদাটে ছোপ দেখা যায় এবং সেখানে ঘন অণুসূত্রের বাড়বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

রোগজীবাণু ঃ *Colletorichum falcatum,* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

B. রোগ ঃ ছেতো বা স্মাট (Smut)

রোগ লক্ষণ ঃ সহজতম সনাক্তকরণ। উদ্ভিদের বৃদ্ধি কম বা খর্বাকার। কেন্দ্রস্থ কাণ্ড একটি ময়লাটে, ছেতো লাগা, অতি দুর্বল পুচ্ছ সদৃশ অংশ যা লম্বায় কয়েক ফুট হতে পারে। প্রথমে সমগ্র অংশটি একটি রূপোলী আচ্ছাদনে মোড়া থাকে যা পরে ফেটে গিয়ে অজস্র কালো কালো ছত্রাকরেণু বাতাসে মুক্ত হয়।

রোগজীবাণু ঃ *Ustilago scitaminea,* বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

C. রোগ ঃ অবনমন বা (Wilt)

রোগ লক্ষণ ঃ 4 থেকে 5 মাস বয়সের চারায় প্রথম লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আখগুলি ক্রমশঃ নুয়ে পড়ে। পাতা হলুদ হয়ে যায়। কাণ্ড চিরলে মধ্যভাগে কালচে লাল উল্লম্ব ডোরা দেখা যায় এবং দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

রোগজীবাণু ঃ *Cephalosporium saechari,* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

D. রোগ ঃ লাল ডোরা (Red stripe)

রোগ লক্ষণ ঃ পাতায় লাল ডোরার ক্লোরোসিস আক্রান্ত অঞ্চল। ডোরা লম্বায় বেশ কিছুটা কিন্তু চওড়ায় মাত্র 0.5 থেকে 1.0 মি.মি.। পরে বেশ কিছুটা অঞ্চলের ডোরাগুলি জুড়ে গিয়ে পাতার উপরিতলে লালচে পচন এবং ঠিক তার নিম্নতলে সাদাটে আস্তরণ চোখে পড়ে।

রোগজীবাণু ঃ *Xathomonas rubrilineans,* নামক ব্যাকটেরিয়া।

16.7.2 তুলা :

ভারতীয় তুলা ***Gossypium arboreum* L.** ও ***G. herbaceum* L.** চাষ হয় বৃষ্টি স্নাত অঞ্চলে এবং সেচপ্রাপ্ত ভূমিতে চাষ হয় আমেরিকান তুলা ***G. hirsusum* L.**

A. রোগ ঃ অবনমন বা (Wilt)

রোগ লক্ষণ ঃ চারার যে কোন দশায়। অঙ্কুরের বীজপত্রে বাদামী বৃত্তাকার দাগ এবং পরে সেটির মৃত্যু। পরিণত গাছে বয়স্ক পাতার গায়ে সবচেয়ে আগে লক্ষণ দেখা যায় এবং তারপর ক্রমশঃ উপরের পাতাগুলি আক্রান্ত হয়। কাণ্ডও বিবর্ণ হয়ে যায়। অবশেষে গাছ নুয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু ঃ *Fusarium oxysporum*

B. রোগ ঃ গোড়া পচন (Root rot)

রোগ লক্ষণ ঃ হঠাৎ করে গাছের নেতিয়ে পড়া ও মৃত্যু। ক্ষেতে রোগটি একটি অভিকেন্দ্রিক বৃত্তের বিন্যাসে পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত গাছ সহজেই উপড়ে ফেলা

যায় এবং সমগ্র মূলতন্ত্রটি তখন দেখা যায় পচনশীল। অনেক সময় কালো বিন্দু সদৃশ ছত্রাকের স্ক্লেরোসিয়া (Sclerotia) মূলের গায়ে চোখ পড়ে।

রোগজীবাণু : *Rhizoctonia bataticola,* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

C. রোগ : ব্ল্যাক আর্ম (Black arm)

রোগ লক্ষণ : 4 অঙ্কুরের বীজপত্রে সিক্ত দাগ, পাতায় কৌণিকভাবে সিক্ত দাগের আবির্ভাব, কাণ্ড ও শাখায় কালো বা কালচে বাদামী অবতল পচনশীল দাগ, ফলে পরিণতির আগেই গাছ নুয়ে পড়ে। তুলার বলও আক্রান্ত হয় এবং তাতে কালো অবতল ছোপ দেখা যায়।

রোগজীবাণু : *Xanthomonas malvacearum* নামক ব্যাকটেরিয়া।

16.7.3 পাট (*Corchorus capsularis*) : পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতম অর্থকরী উদ্ভিদ।

A. রোগ : মূল বা কাণ্ডের পচন (Root or Stem Rot)

রোগ লক্ষণ : অঙ্কুরের গোড়ায় বা বীজপত্রে কালো সরু ডোরার মত দাগ। পরিণত উদ্ভিদে প্রথমে পাতায় পরে কাণ্ডের পর্ব অঞ্চলে কালো রঙের বেষ্টনীর মত দাগ। বাকল খসে পড়ে এবং অচিরেই উদ্ভিদ নুয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু : *Macrophomina phaseoli,* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক।

B. রোগ : গুঁড়া চিতি (Powdery mildew)

রোগ লক্ষণ : অন্য ফসলের গুঁড়া চিতি রোগের মত।

রোগজীবাণু : *Oidium* Sp.

C. রোগ : অবনমন বা (Gall)

রোগ লক্ষণ : কাণ্ডের গোড়ার দিকে সবুজ রঙের স্ফীতি। পরিণত অবস্থায় স্ফীতিগুলি ফেটে যায়।

রোগজীবাণু : *Diplodia Corchori,* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

16.7.4 তামাক (*Nicotiana tabacum* L.) :

মূলতঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন যা সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে আমদানি হয়। ভারতে প্রায় 5 লক্ষ হেক্টর জমিতে 30 লক্ষ টন উৎপাদন হয়ে থাকে।

A. রোগ : সোঁদা লাগা (Damping off)

রোগ লক্ষণ : কচি চারা থেকে শুরু করে বড় পরিণত গাছ সব কিছুই আক্রান্ত হতে পারে। প্রথমে কাণ্ডের গাছে ভেজা ভেজা সোঁদা দাগ দেখা যায় যা ক্রমশঃ উপরে ও নীচের দিকে বিস্তৃত হয়। দুই দিনের মধ্যে কাণ্ড পচে যায়।

রোগজীবাণু : *Pythium aphanidermatum;* ফইকোমাইসিটিস শ্রেণিভুক্ত ছত্রাক।

B. রোগ : কালো ছিট দাগ (Black Shank)

রোগ লক্ষণ : কাণ্ডের গায়ে অতি ক্ষুদ্র ছিট ছিট কালো দাগ। খকনও দাগগুলি কাণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে। অতি সংক্রমণে দাগগুলি নীচির দিকে প্রসারিত হয়। আক্রান্ত কোশ কলা চুপসে যায় এবং একটি অবতল ছাপ থেকে যায়। ক্রমশঃ গাছ নুয়ে পড়ে।

রোগজীবাণু : *Phytophthora parasitica* var *nicotianae;* ফাইকোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

C. রোগ : ব্যাঙ-চক্ষু পত্রদাগ (Frog-eye leaf spot)

রোগ লক্ষণ : অপেক্ষাকৃত পরিণত পাতার রোগ, পাতার গায়ে বাদামী রঙের দাগ যার কেন্দ্রে সাদা এবং তাকে ঘিরে গাঢ় বাদামী প্রান্তভাগ। দেখতে ব্যাঙের চোখের মত তাই এমন নাম।

রোগজীবাণু : *Cercospora nicotianac* ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

D. রোগ : বর্ণালী (Mosaic)

রোগ লক্ষণ : পাতার শিরা বরাবর বিবর্ণতা যা পরে হালকা ও সবুজ বর্ণের ক্রমান্বয় সজ্জা বিন্যাসে বর্ণালী গঠন। এর সাথে পাতায় ফোসকার মত উপবৃদ্ধি দেখা যায়।

রোগজীবাণু : TMV বা টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস।

16.7.5 চা (*Camellia sinensis* (Linn.) O.Ktz.) :

ভারতবর্ষ বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিদেশী মুদ্রা আহরণকারী ফসল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1000 মিঃ উচ্চতা থেকে শুরু করে 4500 মিঃ উচ্চতা পর্যন্ত চা চাষ হয়।

A. রোগ : ফোসকা ধ্বসা (Blister Blight)

রোগ লক্ষণ : পাতায় ছোট ছোট বিবর্ণ বা গোলাপী গোলাকার দাগ যা সাধারণতঃ বর্ষার পরেই চোখে পড়ে। প্রথমে বাগানের একটা দুটো চারায় এবং পরে সমস্ত গাছেই ছড়িয়ে যায়। দাগগুলি ½ থেকে 2 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট হয় এবং ফুলে উঠে ফোসকার মত আকৃতি লাভ করে।

রোগজীবাণু : *Exobasidium Vexans;* বেসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাক।

B. রোগ : লাল মরিচা (Red rust)। এটি একটি বিরল **শৈবালঘটিত** রোগ।

রোগ লক্ষণ : পাতায় শৈবালের অঙ্গজ দেহ মরচে লাগা দাগের মত আবির্ভূত হয়। দাগগুলি গোল, 10–15 মি.মি. ব্যাসযুক্ত এবং রোমযুক্ত। পাতার উপরিতলে সীমাবধ তবে কখনও কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরাশ্রয়ী পরজীবী শৈবালের বসতি করার দরুন এই দাগ সৃষ্টি হয়।

রোগজীবাণু : *Cephaleuros parasiticus;* নামক ক্লোরোফাইসি শ্রেণির শৈবাল।

16.7.6 পান (*Piper betle*) :

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর-হাওড়া অঞ্চলে ছাড়াও বিহার উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে পান চাষ হয়।

A. রোগ : গোড়া পচন (Foot Rot) বা পাতা পচন (Leaf Rot)

রোগ লক্ষণ : অনেকবার এই রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। প্রথমে কাণ্ডের গায়ে কালো দাগ দেখা যায়। পরে পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং উপর থেকে নীচের দিকে লতা নুয়ে পড়ে। ভাল করে লক্ষ্য করলে মাটি থেকে শুরু করে কাণ্ডের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত একদম পচে গেছে দেখা যায়। পচন মূলেও পরিলক্ষিত হয়। পচন লাগা পাতা প্রথমে ঘন বাদামী এবং পরে কালো হয়ে যায়।

রোগজীবাণু : *Phytophthora parasitica*

এছাড়া পানের সাধারণ রোগগুলি হল :

1. চিতি (Mildew) : *Oidium piperis* সংক্রমণ
2. পাতার দাগ (Leaf spot) : Colletotrichum piperis সংক্রমণ

এই রোগগুলির লক্ষণ আগেই আলোচিত হয়েছে। অন্য উদ্ভিদের মত লক্ষণ পানেও সৃষ্ট হয়।

16.7.7 কাজু (*Anacardium occidentale* L.) :

ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী অঞ্চলে কাজু চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় কিছু কাজু চাষ হয়। কাজু গাছ অত্যন্ত প্রতিরোধী হবার দরুণ খুব কম আক্রান্ত হয়। তবে কমলা রোগ বা কাজুর Pink Disease অপেক্ষাকৃত সাধারণ রোগ। কচি শাখায় কমলা আভা এবং পরবর্তীকালে শাখাটির নুয়ে পড়া ও পতন হল এই রোগের লক্ষণ।

রোগজীবাণু : *Pellicularia salmonicolor*

কয়েকটি অর্থকরী ফসলের চিত্ররূপ চিত্র 16.7 'এ প্রদর্শিত হল।

অনুশীলনী - 3

1. নিম্নে উল্লিখিত ফসলগুলির একটি করে রোগের নাম ও জীবাণুর নাম পাশের ফাঁকা অংশে উলেলল্লখ করুন :

	রোগের নাম	জীবাণুর নাম
(a) পাট	______________	______________
(b) লেবু	______________	______________
(c) পান	______________	______________
(d) আখ	______________	______________
(e) আম	______________	______________

2. নিম্নলিখিত রোগগুলির দমনে প্রযোজ্য একটি করে জীবাণুনাশকের ব্যবসায়িক নাম পাশের ফাঁকা অংশে লিখুন।

রোগ	জীবাণুনাশক
(a) ধ্বসা	____________
(b) ঢেঁড়ি	____________
(c) বীজের উপর ছত্রাক অনুসূত্র	____________
(d) ফলে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ	____________
(e) ছেতো রোগ	____________

16.8 রোগগুলির প্রতিকারে ব্যবহার্য কয়েকটি জীবাণুনাশক :

যে রোগগুলির সনাক্তকারী বৈশিষ্ট এখানে আলেচিত হল সেগুলির রোগজীবাণুর নামও আমরা জানতে পেরেছি। আমরা এও জেনেছি জীবাণুটি কি ধরনের অর্থাৎ ছত্রাক না ব্যাকটেরিয়া না ভাইরাস। স্বাভাবিকভাবেই রোগগুলির নিয়ন্ত্রণে একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়ার মত ধারণা তৈরি করাই এই অধ্যায়টির উদ্দেশ্য। প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংযোজিত না করে এখানে সারণিরূপে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে রোগগুলির সংক্রমণ প্রতিহত করার উপায় আলোচিত হল। তবে প্রাথমিক ব্যবস্থাটুকু করার পর ফসল বাঁচাতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শই বাঞ্ছনীয়।

সারণি - 16.1 ঃ কয়েকটি সাধারণ জীবাণুনাশক ও তাদের প্রয়োগ

জীবাণুনাশক	প্রয়োগ
1. থিরাম, আরাসান, থিমার, টারসান-75	সবজির বীজ বা গুঁড়ি কন্দের শোধনে, সীম, ভুট্টা, ফুল, জোয়ারে স্প্রে ছত্রাক নাশক রূপে।
2. নাবাম, ডাইথেন ডি-14	ছত্রাকনাশকরূপে পাতায় ও মাটিতে স্প্রে। ধ্বসা, মরিচা, ঢেঁড়ি, সোঁদা লাগা, মূল পচন ও কোঁকড়ানো পাতার জন্য।
3. ডাইথেন Z-78 ডাইথেন M-22	ছত্রাকনাশকরূপে পাতায় স্প্রে। আলু ও টম্যাটোর নাবি ও জলদি ধ্বসা এবং লঙ্কা চারার নেতিয়ে পড়া রুখতে।

জীবাণুনাশক	প্রয়োগ
4. ম্যানেব	ছত্রাকনাশক স্প্রে।
ডাইথেন M-45	আলু ও টম্যাটোর নাবি ও জলদি ধ্বসা মটর, বীন ও সীমের মরিচা, গুঁড়া চিতি কুমড়োর শ্বেতপচন বা বাদামের টিক্কা রোগ, আমের ঢেঁড়ি রোগ।
5. ডাইথেন S-31	দানা শস্যের মরিচা রোগ।
6. কারাবাম ব্ল্যাক, ফারমোসাইড, কোরোমেট	পাতায় ছত্রাকনাশক স্প্রে হিসাবে ও মাটিতে ছত্রাকনাশক হিসাবে ধৌতকারী মাধ্যম। পাতার দাগ ও মরিচা রোগ দমনে। কিন্তু আলুর জলদি বা নাবি ধ্বসার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয়।
7. পেরেনকস্, লাল ও হলুদ কপার অক্সাইড	সরষে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলা ছাড়া অন্য সব ফসলের বীজ শোধনে, ঢেঁড়ি পালকে চিতি, সোঁদা, নেতিয়ে পড়া ইত্যাদি রোগ।
8. কোব্রেডন	গম বীজ শোধনে
9. কিউপ্রাভিট, প্লাইটকস্ কিউপ্রামার	50% তামার মিশ্রণ। ধ্বসা, পচন, ডাই-ব্যাক ইত্যাদি ছত্রাকঘটিত রোগের ক্ষেত্রে স্প্রে।
10. সেরেসান	ছত্রাকনাশক বীজ শোধক।
11. অ্যাগ্রোসান	দানাশস্য, বাদাম, সবজি, তুলা ইত্যাদির বীজ শোধনে। ধানের ব্লাস্ট রোগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক স্প্রে।
12. ফলপেট	ছত্রাকনাশক স্প্রে। ফল, ফুল, ইত্যাদিতে প্রতিরোধক স্প্রে ও গুঁড়া চিতি রোগের দমনে।
13. ভিভাট্যাক্স, প্ল্যান্টভ্যাক্স	ছেতো বা Smut রোগ প্রতিরোধে স্প্রে।
14. এগ্রিমাইসিন, স্ট্রেপটোসাইক্লিন	ফলের ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ দমনে।
15. নিস্টাটিন (nystatin) পিমারিসিন	ছত্রাকনাশক অ্যান্টিবায়োটিক দানাশস্যের ছত্রাকঘটিত রোগে বিশেষতঃ ধানগাছের ব্লাস্ট রোগে।

16.9 সারাংশ :

আলোচ্য এককটি অন্যগুরি তুলনায় একটু স্বতন্ত্র। এখানে কিছু অতি সাধারণ সুপরিচিত উদ্ভিদরোগ, ভারতে দের প্রাদুর্ভাব আছে, সেগুলির সনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংকেতসূত্র দেওয়া হয়েছে। যদিও ভারতবর্ষে সল, রোগ ও রোগজীবাণুর বৈচিত্র্য এত স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবু মুখ্য ফসলসমূহ যেমন ধান, পাট, ডাল, আম, কলা, পান যা পশ্চিমবঙ্গে হয় তার সাথে সাথে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ফসল যেমন গম, জোয়ার, বাজরা, ডালশস্য, তামাক, তুলা ইত্যাদির কথাও এখানে আলোচিত হয়েছে। রোগগুলির মধ্যে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে ছত্রাকঘটিত রোগের উপর। কিছু ব্যাকটেরিয়াঘটিত ও ভাইরাসঘটিত রোগ যা প্রাসঙ্গিক সেগুলির কথাও এখানে বলা হয়েছে। তবে নিমাটোড ঘটিত রোগ আলোচিত হয়নি বললেই চলে। যে সমস্ত রোগ পরিবেশগত কারণে হয়ে থাকে সেগুলি এই আলোচনায় আসে নি। পর্যায়টির শেষে আলোচিত রোগগুলির প্রতিকারে ব্যবহার্য কিছু ছত্রাক/ জীবাণুনাশক এবং তাদের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

16.10 প্রান্তিক প্রশ্নাবলী :

প্রান্তিক প্রশ্নাবলী :

1. ভারতে দানাশস্যগুলির মধ্যে প্রধান দুটির দুটি করে রোগের নাম, জীবাণুর নাম, রোগলক্ষণ ও প্রতিষেধকের উল্লেখ করুন।
2. ভারতে চাষ করা হয় এমন দুটি সবজি ও দুটি তৈলবীজের একটি করে রোগের নাম, রোগলক্ষণ, রোগজীবাণুর নাম উল্লেখ করুন।
3. পশ্চিমবঙ্গে দুটি প্রধান অর্থকরী ফসলের দুটি করে রোগের নাম, রোগজীবাণুর নাম ও রোগলক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

12.10 উত্তরমালা :

অনুশীলনী - 1

1. (a) *Pyricularia oryzae (পাইরিকুলারিয়া ওরাইজি)*
   (b) *Erisiphe graminis (এরিসাইফি গ্রামিনিস)*
   (c) *Ustilago nuda (উস্টিলাগো নুডা)*
   (d) *Phaeosphaeria maydis (ফিওস্ফিরা মেডিস)*
   (e) Tungro virus (টুংরো ভাইরাস)

2. শস্য রোগের নাম

শস্য	রোগের নাম
(i) ছোলা	মূল পচন
(ii) মটর	মরিচা
(iii) মুগ	টেঁড়ি রোগ

অনুশীলনী - 2

জীবাণু	রোগের নাম
(a) *Phytophthora infestans* (ফাইটপথোরা ইনফেসটানস্)	নাবি ধ্বসা
(b) *Cercospora arachidicola* (সারকোস্পোরা অ্যারকিডিকোলা)	টিক্কা রোগ
(c) *Plasmodiophora brassicae* (প্লাসমোডিওফোরা ব্রাসিকি)	গদাকৃতি মূল
(d) *Erwinia carotovora* (আরউইনিয়া ক্যারোটোভোরা)	নরম পচন
(e) *Albugo candida* (অ্যালবুগো ক্যান্ডিডা)	শ্বেত মরিচা

অনুশীলনী - 3

1.

রোগের নাম	জীবাণুর নাম
(a) কাণ্ড পচন	*Macrophomina phaseoli* (ম্যাক্রোফোমিনা ফ্যাসিওলি)
(b) ক্যাঙ্কার	*Xanthomonas citri* (জ্যান্থোমোনাস সিট্রি)
(c) পাতার দাগ	*Colletotrichum piperis* (কোলেটোট্রিকাম পাইপেরিস)
(d) লোহিত পচন	*Colletotrichum falcatum* (কোলেটোট্রিকাম ফালকাটাম)
(e) টেঁড়ি	*Colletotrichum gloeosporoides* (কোলেটোট্রিকাম গ্লিওস্পোরয়ডেস)

2. (a) ডাইথেন - Z 78

(b) নাবাম

(c) সেরেসান

(d) এগ্রিমাইসিন

(c) ভিভাট্যাকস / প্ল্যান্টাক্স

· প্রান্তিক প্রশ্নাবলী :

সারণি আকারে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। যেমন :

1. দানাশস্য রোগের নাম	জীবাণুর নাম	রোগলক্ষণ	প্রতিষেধক
ধান ব্লাস্ট	*Pyricularia oryzae*	(i) পাতার উপর চক্ষু সদৃশ দাগ (ii) শীষের গোড়ার কালচে বেষ্টনী	অ্যাগ্রোসান
বাদামী দাগ	*Helminthosporium Oryzae*	গোল বা ডিম্বাকার বাদামী রঙের দাগ প্রথমে পাতায় পরে কাণ্ড ও পুষ্পমঞ্জরীতে	ব্লাইটক্স
গম মরিচা	*Puccinia graminis* var *tritici*	পাতায় বাদামী দাগ এবং লালচে মরিচার মত গুঁড়া। পরে দাগগুলি কালো হয়ে যায় এবং কালো রঙের গুঁড়া তৈরি করে।	ডাইথেন M-45
আলগা ছেঁতো	*Ustilago nuda*	পুষ্পমঞ্জরীতে দানার পরিবর্তে কালো রঙের পাউডার সদৃশ গুঁড়া।	প্ল্যান্টাক্স

2 এবং 3 নং প্রশ্নের উত্তর একইভাবে সাজিয়ে লিখুন।

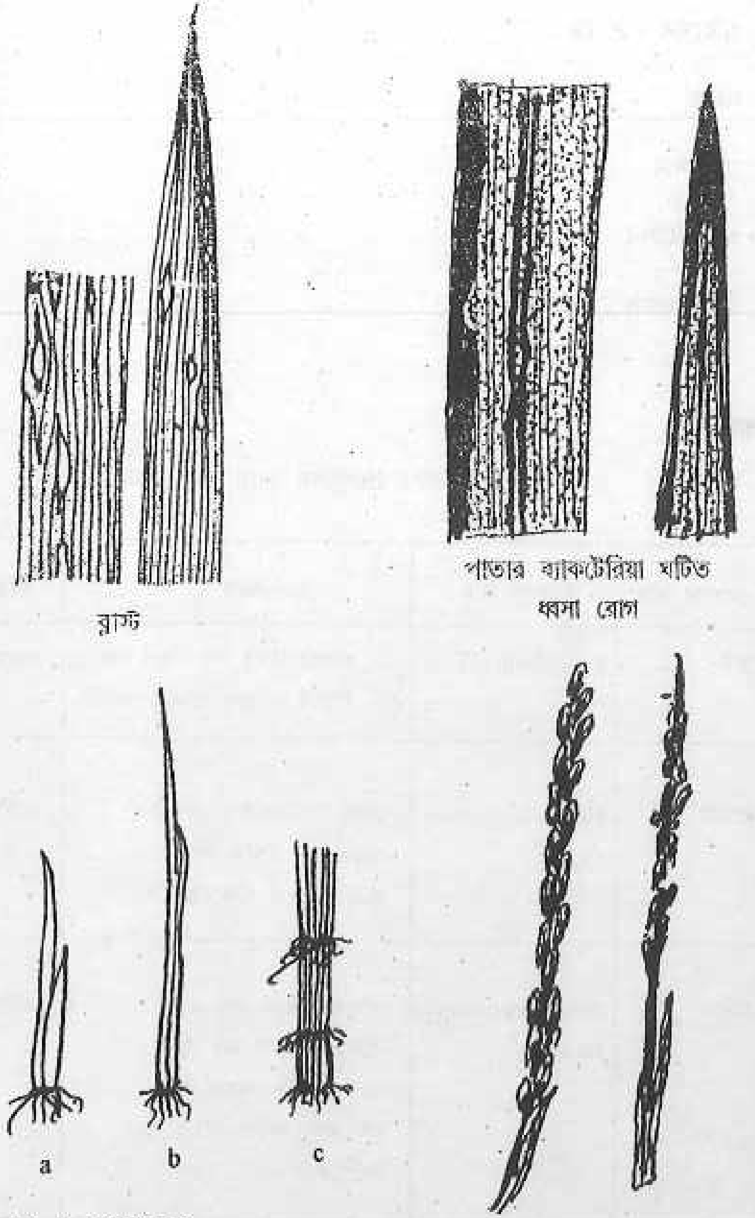

গোড়া পচন ঃ (a) সুস্থ চারা
(b) আক্রান্ত চারা সরু ও লম্বা
(c) কাণ্ডের গোড়ার দু একটি পর্ব থেকে গৌণ মূল উৎপাদন

উদবাতা রোগ
আগরবাতি সদৃশ পুষ্প মঞ্জরী

চিত্র নং 16.1 ঃ *ধানের কয়েকটি রোগের লক্ষণ*

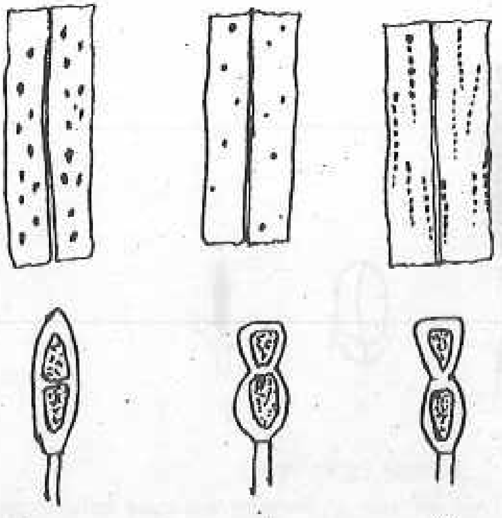

a b c

গম গাছের মরিচা রোগ ঃ (a) কৃষ্ণ মরিচা, জীবাণু ঃ *Puccinia graminis*

(b) কমলা মরিচা ; জীবাণু ঃ *P. recondita*

(c) হলুদ বা পীত মরিচা ; জীবাণু ঃ *P. Striiformis*

প্রতি প্রকার সংক্রমণের জীবাণুর আলাদা আলাদা গঠন বিশিষ্ট টিলিউটোস্পোর লক্ষ্যণীয়
পাতায় দাগের প্রকৃতিও সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন।

গম গাছের আলগা ছেতো রোগ
আক্রান্ত পুষ্পমঞ্জরী

পাতার ধ্বসা রোগ

চিত্র নং 16.2 ঃ *গম গাছের কয়েকটি রোগের লক্ষণ*

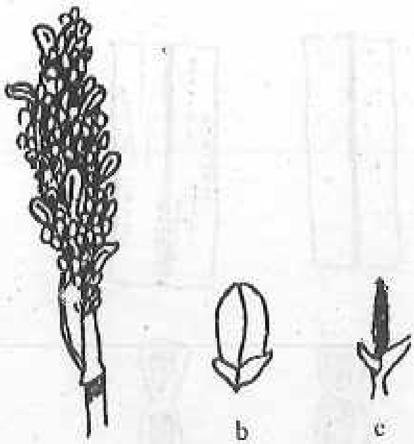

a b c

জোয়ারের ছেতো রোগ

(a) আক্রান্ত পুষ্পমঞ্জরী (b) রেণু পূর্ণ দানা (c) বিদারণের পর দানার আসল চেহারা

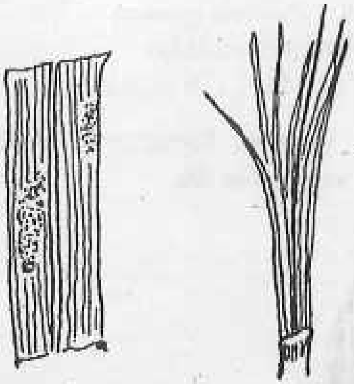

a b

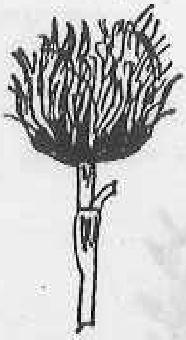

c

বাজরার চিতি রোগ
আক্রান্ত পুষ্পমঞ্জরী

জোয়ারের "পালকে চিতি" রোগ

(a) পত্রফলকে পাউডার সদৃশ "চিতি"

(b) পাতা চিরে গিয়ে পালকের নায় আকৃতি লাভ

ভুট্টার ছেতো রোগ
আক্রান্ত পুষ্পমঞ্জরী

চিত্র নং 16.3 ঃ অন্যান্য দানা শস্যের রোগলক্ষণ

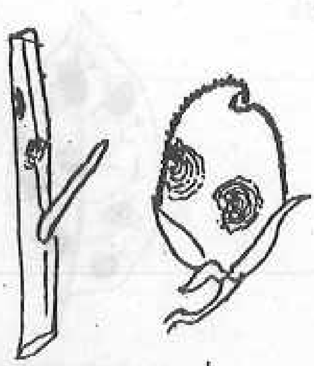

a b

ছোলার ধ্বসা রোগ
(a) কাণ্ডে পচনক্ষত
(b) ফলে পচন ক্ষত

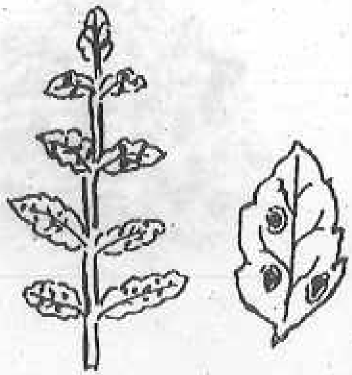

ছোলার ধ্বসা রোগ
আক্রান্ত পাতা

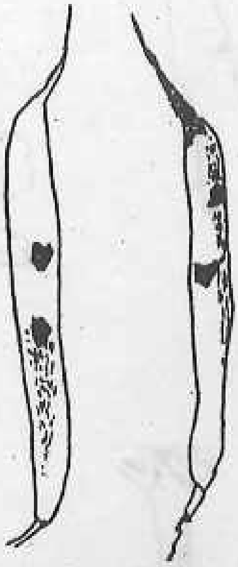

বিনের ঢেঁড়ি রোগ
জীবাণু : *Colletorichtan* Sp.

চিত্র নং 16.4 : কয়েক প্রকার ডাল শস্যের রোগলক্ষণ

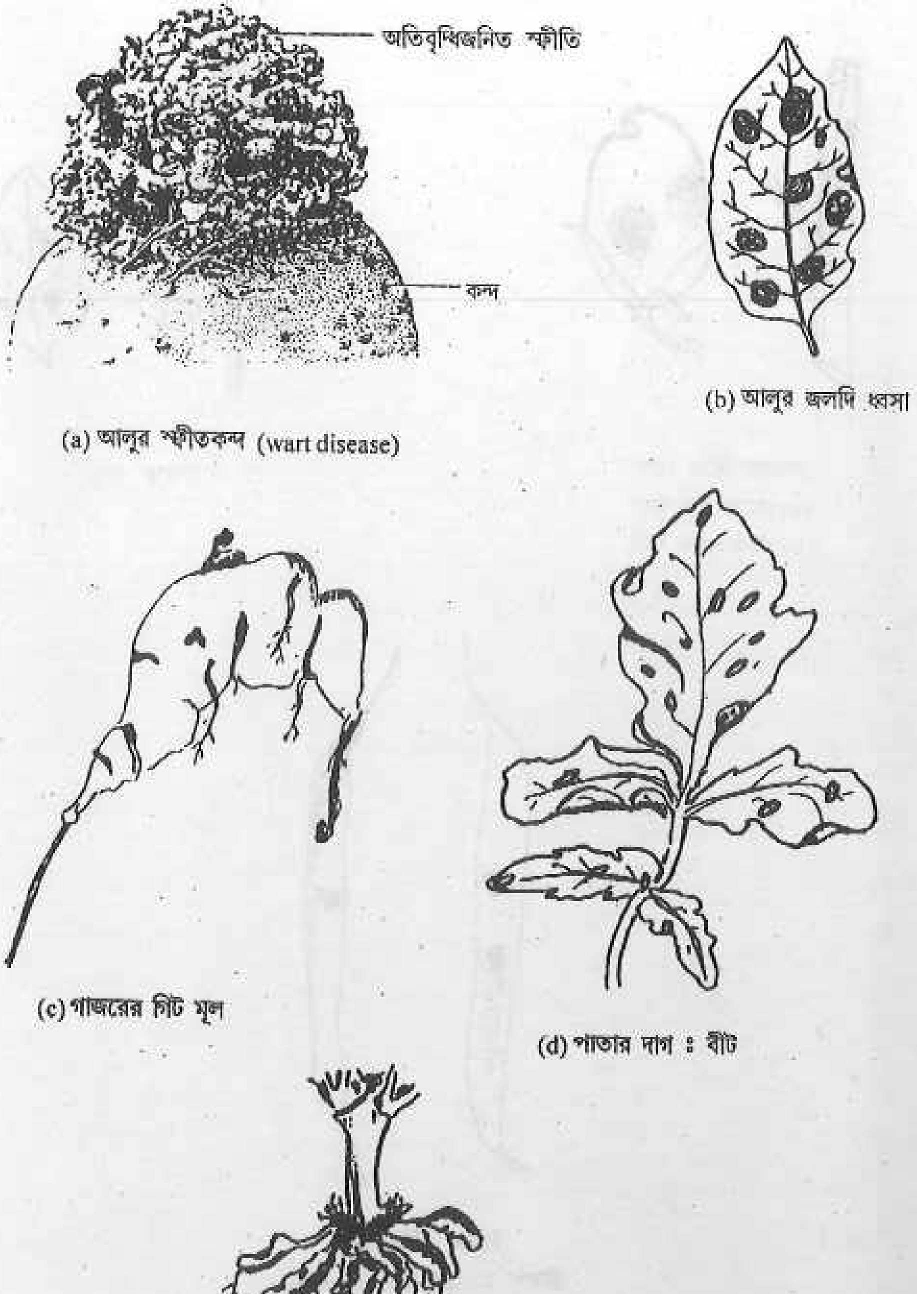

(a) আলুর স্ফীতকন্দ (wart disease)

(b) আলুর জলদি ধ্বসা

(c) গাজরের গিট মূল

(d) পাতার দাগ : বীট

(e) বাঁধা কপির গদাকৃতি মূল

চিত্র নং 16.5 : *কয়েক প্রকার সবজির রোগলক্ষণ*

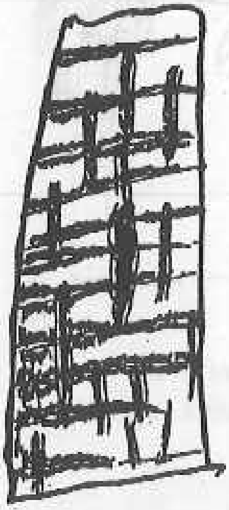

নারিকেলের কাণ্ডে ক্ষরণ

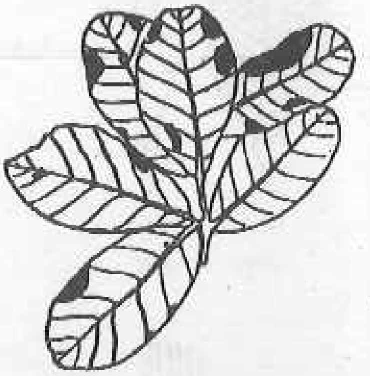

বাদামের টিক্কা রোগ

সরিষার সাদা মরিচা

(a) পাতায় (b) পুষ্পমঞ্জরী ও পুষ্পে

চিত্র নং 16.6 ঃ তৈল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের রোগলক্ষণ

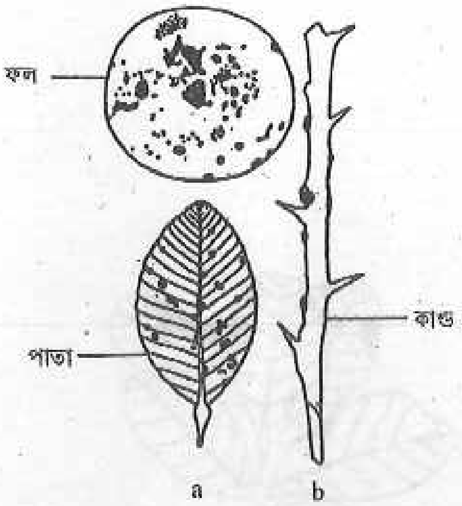

লেবুর ক্যাঙ্কার

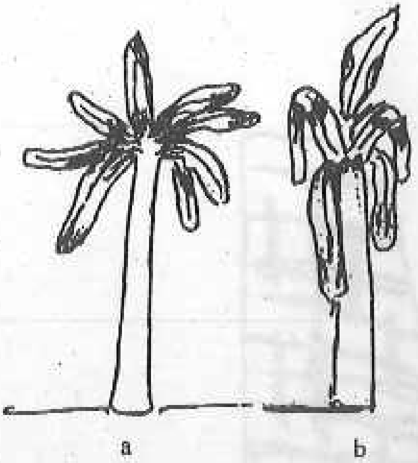

কলা গাছের বান্চি টপ

(a) প্রথমাবস্থা (b) রোগের প্রাবল্য বৃদ্ধির পর

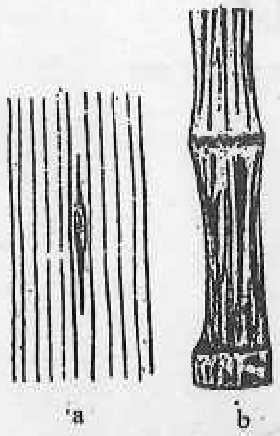

আখের লোহিত পচন

(a) পাতায় (b) কাণ্ডে

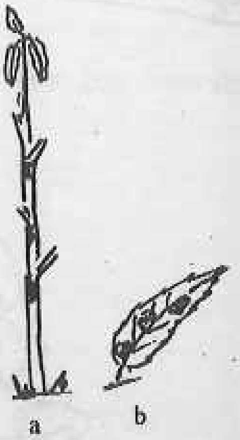

পাটের কাণ্ড পচন

(a) কাণ্ডে (b) পাতায়

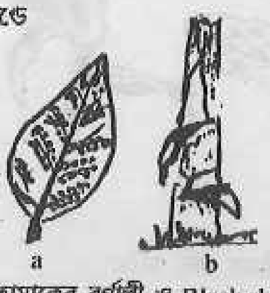

তামাকের বর্ণালী ও Black shank

(a) বর্ণালী (b) ব্ল্যাক স্যাঙ্ক

চিত্র নং 16.3 ঃ কয়েকপ্রকার ফল ও অর্থকরী ফসলের রোগলক্ষণ

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : ₹ 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006